

নির্ব্যাপ্তি প্রবন্ধ

২



মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

নির্বাচিত প্রবন্ধ - ২

মাসিক আলকাউসার-এ প্রকাশিত গবেষণামূলক

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-সংকলন

[মহররম '২৬হি.-মহররম '৩২হি. = ফেব্রু.'০৫ঈ.-ডিসে.'১০ঈ. পর্যন্ত]

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

প্রকাশনা বিভাগ

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

নির্বাচিত প্রবন্ধ - ২

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

প্রকাশক

প্রকাশনা বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

প্রধান দপ্তর : ৩০/১২, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬

প্রধান প্রাঙ্গণ : হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১৩

ফোন : ৮০০১৪৯৪, ০১৯৭৩ ২৯৫ ২৯৫

E-mail : publisher.markaz@yahoo.com

প্রকাশকাল

জুমাদাল আখেরা ১৪৩৭ হি.

এপ্রিল ২০১৬ ঈ.

মূল্য

৩৮০ (তিনশ আশি) টাকা মাত্র

স্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

Nirbachito Probondho -2 By : Mawlana Muhammad Abdul
Malek. Published by Department of Publication Markazud
Dawah Alislamia Dhaka.
Price : Tk. 380.00 Us\$ 12.00.

আমাদের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

আলহামদু লিল্লাহ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর প্রকাশনা বিভাগের নতুন বই 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' এর দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হল। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব কর্তৃক মাসিক আলকাউসার-এ লিখিত প্রবন্ধগুলোর সংকলিত রূপ হচ্ছে 'নির্বাচিত প্রবন্ধ'।

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব ইলমী ও তাহকীকী জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। আল্লাহ তাআলার রহমতে তাঁর হাতে বাংলাদেশে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক গবেষণার ময়দানে অনেক বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম পেয়েছে। তাঁর দেশী-বিদেশী জগদ্বিখ্যাত আসাতেযায়ে কেরাম যেমনিভাবে তাঁর ইলম ও তাহকীকের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর উপর আস্থা রেখেছেন, তেমনি এদেশের উলামা-তালাবা ও দ্বীনদার সমাজ তাঁকে ইলম ও তাহকীকের ময়দানে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে বরণ করে নিয়েছেন।

মহররম ১৪২৬ হি. মোতাবেক ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে মারকাযের পক্ষ থেকে বের হওয়া শুরু হয় মাসিক আলকাউসার। মাসিক আলকাউসারের লেখাগুলো বহুনিষ্ঠ ও তাহকীকী মানে উত্তীর্ণ হয় মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেবের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে। অন্যান্য লেখার ইলমী সম্পাদনার পাশাপাশি প্রথম সংখ্যা থেকেই তিনি আলকাউসারের বিভিন্ন বিভাগে নিয়মিত লিখে আসছেন। শিক্ষার্থীদের পাতা ও প্রচলিত ভুল বিভাগ দু'টি তাঁর দ্বারাই পরিচালিত হয়। এ ছাড়া প্রায় প্রতি মাসেই সাধারণ পাঠক মহলের উদ্দেশ্যে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নিবন্ধ আলকাউসারে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

বক্ষ্যমাণ ‘নির্বাচিত প্রবন্ধ ১ ও ২’ সে নিবন্ধগুলোরই সংকলিত রূপ। আলকাউসারের প্রথম সংখ্যা থেকে ২০১০ ঈ. সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত নিবন্ধগুলো এই দু’টি মলাটে স্থান পেয়েছে। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব তাঁর লেখায় যেসব বিষয় খেয়াল রেখে থাকেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সময়ের প্রয়োজনীয়তা, অহেতুক বিতর্ক এড়িয়ে চলা, ইলমী ভ্রান্তি-নিরসন ও তাহকীকের যথাযথ মান নিশ্চিত করা। এ মলাট দু’টোতেই তাঁর এমন কয়েকটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে যেগুলো লেখার জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করেছেন, দেশের লাইব্রেরিগুলো ছাড়াও বিভিন্ন দেশের বহু নামী-দামী গ্রন্থাগার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এরপর তা আলকাউসারের পাঠকদের জন্য পেশ করেছেন।

আলকাউসারে প্রকাশিত এ নিবন্ধগুলো বই আকারে প্রকাশের জোর দাবী চলছে বিগত কয়েক বছর থেকেই। দেৱীতে হলেও এখন তা আপনাদের সামনে রয়েছে। বই দু’টি পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার বিভিন্ন স্তরে যারা বিভিন্নভাবে শ্রম দিয়েছেন আমি তাদের সকলের এবং বিশেষত মাওলানা মুতীউর রহমানের শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। পাঠক মহলের কাছে কোন ভুল বা অসংগতি প্রকাশ পেলে তা আমাদেরকে অবগত করার জন্য বিনীত অনুরোধ থাকল, যেন তা পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে দেওয়া যায়।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া-তাআলা তাঁর অনুগ্রহে বই দু’টি, এগুলোর লেখক, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা, মাসিক আলকাউসার এবং দু’টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেকোনভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন, আমীন।

وَإِخْرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ
রঈস, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

২৪-০৬-১৪৩৭ হি.

০৩-০৪-২০১৬ ঈ



পেশ লফজ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ !

কখনো বড়দের নির্দেশে, কখনো দোস্ত-আহবাবের কথায়, আবার কখনো দিলের তাকাযা থেকেই মাসিক আলকাউসারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখার সুযোগ হচ্ছে। পাঁচ-ছয় বছর আগে মারকাযুদ দাওয়াহর দারুত তাসনীফের দায়িত্বশীলগণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, আলকাউসারে প্রকাশিত এসব প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হবে। অনেক পাঠকের পক্ষ থেকেও এই বিষয়ের তাগাদা অব্যাহত ছিল।

আমি বেরাদারে আযীয মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহকে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন এই প্রবন্ধগুলো নযরে সানী করেন। কারণ, এই প্রবন্ধগুলো তিনিই উর্দু থেকে বাংলায় তরজমা করেছেন। তিনি সাধ্যমত সুন্দর ও সুচারুরূপেই নযরে সানীর কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এতে মাশাআল্লাহ অনেক প্রবন্ধের বিষয় ও ভাষা আগের চেয়ে বেশি গতিশীল ও সাবলীল হয়েছে। কিছু কিছু প্রবন্ধ আমিও নযরে সানী করেছি।

এই সংকলন প্রায় চার বছর আগেই ছাপার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু বিভিন্ন ওযর ও সীমাবদ্ধতার কারণে ছাপার কাজ বিলম্ব হতেই থেকেছে। আল্লাহ তাআলার শোকর যে, এখন ছাপার সুযোগ হচ্ছে।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

ধারাবাহিকতার দাবী তো এটাই ছিল যে, প্রথমে আলকাউসারের সম্পাদক, মারকাযুদ দাওয়াহর মুদীর ও ইফতা বিভাগের প্রধান হযরত মাওলানা মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুমে প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করা হবে। আসলে ওগুলোও ছাপার জন্য প্রায় প্রস্তুত। আমরা আশা করি, কিছু দিনের মধ্যেই সেগুলো পাঠকের সামনে পেশ করতে পারব।

সম্মানিত পাঠকের কাছে অনুরোধ, এই কিতাবে কোন স্থানে ভুল নযরে এলে মেহেরবানী করে মাসিক আলকাউসারের ঠিকানায় চিঠি লিখে বান্দাকে অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা আপনার তাসহীহ ও সংশোধন থেকে উপকৃত হব।

এই সংকলনটি প্রস্তুত করার পেছনে বেরাদারে মুহতারাম মাওলানা মুতীউর রহমানের অনেক শ্রম ও মেহনত শামিল আছে। আল্লাহ তাআলা তাকে আপন শান মোতাবেক সওয়াব ও প্রতিদান দান করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সবরকমের কল্যাণ ও তারাক্কী নসীব করুন। আমীন।

هَذَا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَبَارَكَ وَسَلَّم عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

কেন্দ্রীয় কুতুবখানা

প্রধান প্রাঙ্গণ

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

২৪-০৬-১৪৩৭ হি.

রবিবার, বাদ আসর

বিষয় সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা	০৫
(৪) আরকানে আরবাতা	০৫
রমযান ও ঈদের চাঁদ : কার দায়িত্ব কী	১৫
রমযান অর্জনের মৌসুম তবে ...রোযাকে ঢাল বানান, এই ঢালকে অক্ষুণ্ণ রাখুন এবং ঈদকে 'ওয়ীদে' পরিণত না করুন	২৩
এই ঢালকে অক্ষুণ্ণ রাখুন	২৫
ঈদের স্বরূপ ও উদযাপনের পদ্ধতি	২৭
ঈদকে 'ওয়ীদ' বানাবেন না	২৮
ঐক্য ও সংঘর্ষের ইবাদতে কেন এত অনৈক্য ও অসংঘর্ষ	৩৩
হজ্ব বিশ্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বলিষ্ঠ প্রকাশ	৩৩
বিদায় হজ্বের খুতবায় ইতিহাদের দাওয়াত	৩৫
প্রীতি ও অনুরাগ মুমিনের স্বভাবধর্ম	৩৭
হজ্বের সফরে প্রীতি ও মহব্বত অতি প্রয়োজন	৩৮
অপ্রীতিকর আচরণের মৌলিক কারণ	৩৯
১. স্বভাবের বিপরীত কোনো কিছু সহ্য হয় না	৩৯
২. সফরসঙ্গীদের বে-উসুলী বা না-মুনাসিব আচরণে অধৈর্য হওয়া	৪০
৩। সৌদি সরকারের অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার কারণে বিরক্তি	৪১
৪. কাফেলার আমীর ও এজেন্সিওয়ালাদের আচরণে অসন্তুষ্টি	৪২
৫. মাসায়েলের ইখতিলাফ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হওয়া	৪৪
হজ্বের সফরনামা : কিছু অনুভব-অনুভূতি	৪৭
অন্যান্য প্রসঙ্গ	৫২
২. খেলাফত আন্দোলনের ইতিহাস	৫২
৩. সফরনামায় উল্লেখিত দেশগুলোর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাস	৫২

৪. প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়	৫৩
হজ্জের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়	৫৫
কয়েকটি নিবেদন	৫৯
সফরনামার জন্য মুবারকবাদ	৬১
(৫) ফাযায়েলে আওকাত	
ফযীলতপূর্ণ দিবস-রজনী ও ফযীলতবিষয়ক হাদীস	
সতর্কতা ও সচেতনতা খুবই প্রয়োজন	৬৫
মহররম ও নববর্ষ : শিক্ষা ও নির্দেশনা	৭৩
চান্দ্রমাস ও চান্দ্রবর্ষের চর্চার প্রয়োজনীয়তা	৭৫
মহররম ও আশুরার গর্হিত কার্যকলাপ	৭৫
প্রতারণার নতুন রূপ	৭৬
সফর মাস : প্রচলিত কুসংস্কার ও সময়ের শুভ-অশুভ	৭৯
সময়ের শুভ-অশুভ : একটি পর্যবেক্ষণ; সুলক্ষণ ও কুলক্ষণের ব্যাপারে	
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ	৮৫
কুরআন থেকে শুভ-অশুভ নির্ণয় করা	৮৭
প্রকৃত অকল্যাণ কোথায়	৮৮
রজব, মেরাজ ও শবে মেরাজ : কিছু কথা	৮৯
মাহে রজব	৮৯
ইসরা ও মেরাজ : মেরাজের তাৎপর্য বিষয়ে একটি কথা	৯২
২. খুবই দুঃখজনক একটি বিকৃতি	৯৪
মেরাজে অর্জিত চৌদ্দটি নির্দেশনা!	৯৫
৪. মেরাজে কত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে	৯৬
৫. ইসরা-মেরাজের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অঙ্গ	৯৭
৬. দুটি ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত	১০০
শবে মেরাজ	১০২
বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শাবান ও শবে বরাত	১০৩
হাদীসটির সনদবিষয়ক আলোচনা	১০৫
এই রাতের আমল	১০৬
পরের দিন রোযা রাখা	১০৮
এ রাতের নফল আমল সম্মিলিত নয়, ব্যক্তিগত	১০৯
এ রাতের আপত্তিকর কাজকর্ম	১১০
শবে বরাত : কিছু ভ্রান্তি নিরসন	১১১

উলামায়ে সালাফের উক্তির আলোকে শবে বরাত	১১৭
যিলহজ্ব, হজ্ব ও কুরবানী	১২১
বাইতুল্লাহর হজ্ব	১২২
কুরবানী	১২২
সুন্নাহর আলোকে কুরবানী	১২৭
নয়া যমানার তাহরীফী ফেতনা	১৩০

(৬) তালীম ও দাওয়াত

দ্বীনী দাওয়াতের মতো সবার জন্য দ্বীনী তালীমের ব্যবস্থা করাও অপরিহার্য	১৩৯
ব্যাপক দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা	১৩৯
দ্বীনী ইলমের ব্যাপকতার গুরুত্ব	১৩৯
সহীহ তেলাওয়াতের গুরুত্ব, এ ব্যাপারে আমাদের কী দায়িত্ব	১৪৫
স্কুল-কলেজের ইসলামিয়াতের সিলেবাস : একটি পর্যালোচনা	১৪৯
১. পরিভাষা ও পরিচিতি/ ২. আকীদা-বিশ্বাস এবং চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি/ ৩. আহকাম ও মাসায়েল/ ৪. হাদীস ও রেওয়ায়াত/ ৫. আয়াত ও হাদীসের তরজমা / ৬. অন্যান্য/ ৭. মৌলিক কিছু প্রস্তাবনা	১৫৫
পরিভাষা ও পরিচিতি	১৫৬
ইবাদত শব্দের অর্থ	১৫৬
দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত মূলত ঈমান ও আমলের জয়বা পয়দা করার মেহনত	১৬৯
দাওয়াত ও তাবলীগের অর্থ	১৭০
এই কাজের আসল নাম তাহরীকে ঈমান	১৭১
ঈমানের মেহনতকে জরুরি মনে না করার কারণসমূহ	১৭২
দ্বীনদার হওয়ার জন্য দুনিয়া ছাড়তে হয় না	১৭৩
জুমার দিনেও ব্যবসা বন্ধ রাখা জরুরি নয়	১৭৫
সামান্য সময় বের করে ঈমানের সবক তাজা করে নাও	১৭৬
হাকীমুল উম্মত (রহ.)এর একটি চমৎকার উক্তি	১৭৬
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)এর মূল বক্তব্য	১৭৮
তিনদিনের আগে ও পরে	১৭৮
হাদীস শরীফে ঈমান তাজা করার তাগিদ	১৭৮
সব কাজে ভাগাভাগি চলে না	১৭৯
ঈমান ও আমলের মেহনত সবার উপর ফরয	১৮০
উন্নতির চাবিকাঠি	১৮১

একটি ব্যতিক্রমী ইজতিমা	১৮৩
সাত কারী চৌদ্দ রাবী : একটি আলোচনা	১৯১

(৭) জীবন-চরিত

আহ! আশরাফী ফুল বাগানের সর্বশেষ ফুলটি ...!	১৯৫
১. উম্মতের প্রতি দরদ ও মাখলূকের প্রতি স্নেহ-মমতা	১৯৬
২. উম্মতের কল্যাণের অকল্পনীয় স্পৃহা	১৯৬
৩. দ্বীনী গাইরত ও নাহি আনিল মুনকার	১৯৭
৪. মানুষকে কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করার ফিকির	১৯৮
৫. এহইয়ায়ে সুন্নতের জয়বা	১৯৮
৬. ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ এবং এতে সহজতা অবলম্বন	২০০
৭. মাদরাসা ও মসজিদ সুন্নী বানানোর তাগিদ	২০১
৮. জরুরি বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি	২০৩
৯. শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা	২০৩
১০. তাহকীকের শওক	২০৪
দুটি বড় অবদান-(১) মজলিসে দাওয়াতুল হক	২০৬
মজলিসে দাওয়াতুল হকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য	২০৮
তাবলীগী জামাআত ও মজলিসে দাওয়াতুল হক	২০৯
মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশে	২১০
আশরাফুল মাদারিস হারদুই	২১০
জীবনের শেষ দিনগুলো	২১১
হযরতের সাথে লেখকের প্রথম ও শেষ মুলাকাত	২১২
ঈসালে সওয়াবের একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা	২১৩
আরো উলামায়ে কেরাম ও বুয়ুর্গানে উম্মত	২১৪
ফেদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসআদ মাদানী (রহ.)	২১৭
হযরত খতীব সাহেব : কিছু স্মৃতি [১৯২৮-২০০৭ঈ.]	২২৫
হযরত মাওলানা আমীনুল ইসলাম [রহ. মার্চ ১৯৩২-নভেম্বর ১৯, '০৭ঈ.]	২৩১
আলহাজ্ব আবদুল ওয়াদুদ খান সাহেব [১৯৩৮?-মে ১১, ২০০৮ঈ.]	২৩৩
কয়েকজন আকাবিরের ইন্তেকাল : আল্লাহই আমাদের রক্ষাকর্তা আমাদের অভিভাবক	২৩৫
পাঠকবৃন্দের প্রতি দুআয়ে মাগফেরাতের আবেদন	২৩৯
(৮) সমালোচনা-পর্যালোচনা	
গবেষণা : অধিকার ও নীতিমালা	২৪১

শাস্ত্রীয় যোগ্যতার মাপকাঠি	২৪৩
গবেষণার নিয়ম-নীতি	২৪৪
আমিও বলি, কোথায় যাব, কার কাছে যাব!	২৫১
বাইতুল্লাহকে চিত্র ও মূর্তি থেকে পবিত্র করার বিষয়ে	
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদক্ষেপ	২৬১
দেয়ালে ও স্তম্ভে অঙ্কিত ছবি	২৬৩
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে চিত্র ও চিত্রকর	২৬৭
রাওয়াইউল বয়ানের পূর্ণ বয়ান কি লক্ষ করা হয়েছে	২৭৪
চিত্র অঙ্কন অবৈধ ঘোষণার কারণ	২৭৫
মূর্তি ও ভাস্কর্যের পারস্পরিক যোগসূত্র	২৮২
বিচারপতি, আপনার বিচার করবে কে?	২৮৭
যাবীহুল্লাহ কে-এ প্রশ্ন কেন?	৩০৫
১। কুরআন মাজীদের আলোকে	৩০৬
২। বাইবেলের বর্ণনার আলোকে	৩১০
৩। তারীখ-ইতিহাসের আলোকে	৩১৩
৪। সকল যুগের গবেষকদের বিশ্লেষণের আলোকে	৩১৪
(৯) বিবিধ	
সাক্ষাৎকার [তাহকীকুত তুরাস-মুদ্রিত-অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ সম্পর্কে]	৩১৭
সাক্ষাৎকার : 'ভাষার বিশুদ্ধতা শরীয়তের কাম্য'	৩২৫
ইসলাহী মাজালিস : একটি অনন্য উপহার	৩৩৯
বইয়ের ভূবন	৩৪৩
সাহিত্যের বাগানে আবাবো 'পুষ্প'র সুবাস	৩৪৭
(১০) বিভিন্ন কিতাবের ভূমিকা	
ভূমিকা : তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন (১ম খণ্ড)	
১. কুরআনের প্রতি পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে ঈমান আনা	৩৪৯
২. কুরআন মাজীদের আদব ও সম্মান রক্ষা করা	৩৫০
৩. কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত	৩৫০
৪. কুরআন মাজীদের হেদায়াত ও বিধানাবলির অনুসরণ	৩৫২
৫. কুরআনে তাদাব্বুর এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ	৩৫৩
৬ কুরআন মাজীদের তালীম ও তাবলীগ	৩৫৫
৭. নিজেকে, নিজের আওলাদকে এবং অধীনদেরকে কুরআনের	
শিক্ষা ও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত না রাখা	৩৫৫

কুরআন মাজীদেৰ তালীম ও তাদাব্বুরকে ব্যাপক ও সহজ করার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামেৰ ভূমিকা	৩৫৬
ভূমিকা : তাফসীৰে তাওযীহুল কুরআন (৩য় খণ্ড)	
কুরআন বোঝাৰ চেষ্টা : কিছু নিয়মকানুন	৩৫৯
হিফযে কুরআন	৩৫৯
কিছু নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়েদা	৩৬২
কিছু উসূল ও নিয়মকানুন	৩৬৪
বিশেষ সাবধানতা	৩৬৯
ভূমিকা : ফেরেশতাদেৰ বিস্ময়কর জীবনকথা	
ফেরেশতাদেৰ উপর ঈমান, ইমাম সুযুতী (রহ.) ও আলহাবায়িক গ্রন্থেৰ অনুবাদ সম্পর্কে কিছু কথা	৩৭৩
ফেরেশতাদেৰ সম্পর্কে মৌলিক আকীদাসমূহ	৩৭৪
ফেরেশতাদেৰ ব্যাপারে কুফরী বিশ্বাসসমূহ	৩৭৬
‘আলহাবায়িক ফী আখবারিল মালায়িক’ ও তার অনুবাদ	৩৭৭
ভূমিকা : কিতাবুল জিহাদ	
জিহাদেৰ হাকীকত, হেকমত ও কিছু ভ্রান্তিৰ নিরসন	৩৮১
জিহাদেৰ পরিচয়, উদ্দেশ্য ও ফলাফল	৩৮১
শরয়ী জিহাদ ও অন্যান্য লড়াইয়েৰ মধ্যে পার্থক্য	৩৮৭
১. দ্বীন প্রতিষ্ঠাৰ সকল প্রচেষ্টাই কি ‘জিহাদ’	৩৯১
২. জিহাদে আকবর কিসেৰ নাম	৩৯২
৩. জিহাদ কি ইকদামী, না শুধুই দিফায়ী	৩৯৩
৪. তাবলীগেৰ অনুমতি পেয়ে যাওয়াই কি জিহাদ পরিত্যাগেৰ জন্য যথেষ্ট	৩৯৪
৫. জিহাদেৰ বিধান কি বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতিৰ কারণে ছিল	৩৯৯
ভূমিকা : তাসাওউফ কী ও কেন	
এই মেহনতেৰ উদ্দেশ্য	৪০৫
ভূমিকা : মাযহাব ও তাকলীদ কী ও কেন	
হাদীস থাকতে ফিকহেৰ প্রয়োজন হয় কেন	৪১৫
‘মাযহাব’ কী এবং ‘তাকলীদ’ কাকে বলে	৪১৮
তাকলীদ-বিরোধীরা কী বলতে চান	৪১৯
বন্ধমান বইটিৰ ব্যাপারে কিছু কথা	৪২২

রমযান ও ঈদের চাঁদ : কার দায়িত্ব কী

রমযানুল মুবারক হচ্ছে ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহর নৈকট্য-অন্বেষণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌসুম। এ সময় আল্লাহ তাআলার রহমত ও মাগফেরাতের জোয়ার আসে। রমযান শেষে আসে ঈদুল ফিতর, যা কুরআনের ভাষায় আল্লাহর নেয়ামতের পরিপূর্ণতা। তাই এ মাসে মুমিন হৃদয়ে ঈমানী লয়যত তরঙ্গায়িত হতে থাকে। ফলে তার সমগ্র সত্তায় আনন্দ ও প্রশান্তির ঢেউ খেলতে থাকে; কিন্তু এখন পাপাচার ও অনাচারের ব্যাপক বিস্তারে সমাজের পরিবেশ এতই দূষিত হয়ে যাচ্ছে যে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তা মন-মস্তিষ্কে আক্রান্ত করে। ফলে ঈমানী প্রশান্তি বিনষ্ট হতে থাকে এবং কলবের নূরানিয়্যাত হ্রাস পেতে থাকে। ইদানীং গোদের উপর বিষফোঁড়ার ন্যায় আরেকটি নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। তা এই যে, রমযান বা ঈদের চাঁদ সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিলে অনেকে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়, এমনকি তা ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্তও গড়ায়। গত বছর রোযা ও ঈদের চাঁদকে কেন্দ্র করে যেসব অপ্ৰীতিকর ঘটনা ঘটেছে তা যেকোন মুসলমানের জন্যই পীড়াদায়ক। এ বিষয়ে মাসিক আলকাউসারের যিলকদ '২৭, ডিসেম্বর '০৬ সংখ্যায় একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

সমাজ-পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য ব্যক্তি-সংশোধন ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টাই একমাত্র পথ। এ ক্ষেত্রে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং তরবিয়ত ও তায়কিয়ার মেহনত সর্বাধিক ফলপ্রসূ। তবে সাময়িক প্রচেষ্টা হিসাবে রমযানের দিনগুলো উত্তম পরিবেশে কাটানোর এবং অন্তত এই মোবারক দিনগুলোতে ঘরের পরিবেশে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা আশু কর্তব্য।

আর চাঁদকে কেন্দ্র করে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদের যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তা যে অর্থহীন একটি কাজ; বরং এক ধরনের গোনাহে বে-লয়যত, এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা একেবারেই অবাঞ্ছিত এবং এর প্রধান কারণ শরীয়তের হকুম-আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞতা।

আমরা যদি একটিমাত্র নীতি অনুসরণ করতে পারি তাহলেও এই সমস্যা বহুলাংশে দূর হবে। তা এই যে, আমরা সকলে জরুরি বিষয়গুলোর প্রয়োজন পরিমাণ ইলম অর্জন করব এবং যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকব, তেমনি দ্বিতীয় বিষয়াদিতে, বিশেষত শরীয়তের সূক্ষ্ম বিষয়গুলোতে, যে সম্পর্কে আমাদের মোটেই জানাশোনা নেই কিংবা থাকলেও তা শুধু অন্যের মুখে শোনা কিছু তথ্যের হালকা ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এ জাতীয় বিষয়ে কোন আলেমের সাথে তো দূরের কথা, নিজেদের মধ্যেও তর্ক-বিতর্ক করব না। এই নীতি অনুসরণ করলে বিভিন্ন দ্বিতীয় বিষয়ে সংঘটিত বিবাদ-বিসংবাদ সম্পূর্ণ না হোক, বহুলাংশে অবশ্যই হ্রাস পাবে।

কিন্তু এই নীতি অনুযায়ী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো বিবেচক মানুষ ক'জন আছেন। আমাদের অধিকাংশের অবস্থা এই যে, সামান্য বিষয়কেও হাততালি দিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে আনন্দ বোধ করি। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করা হয় শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কারণে।

এই ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার প্রতিকারের জন্য সর্বপ্রথম কর্তব্য হল, চাঁদসংক্রান্ত শরীয়তের আহকাম ও মাসায়েল, বিশেষত রমযান ও দুই ঈদের চাঁদের শরয়ী আহকাম ও মাসায়েলের বিস্তৃত ইলম হাসিল করা। এ বিষয়ে কুরআন হাদীস ও তার ভাষ্য-ফিকহে ইসলামীর আলোকে উম্মাহর বিশিষ্ট আলেমগণ প্রয়োজনীয় পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন। তার মধ্যে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)-এর পুস্তিকা 'রুয়াতে হিলাল' অত্যন্ত সহজ ও সর্বজনবোধ্য ভাষায় লিখিত। বাংলা ভাষায়ও তা অনূদিত হয়েছে। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন অন্তত এই পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করেন এবং তা বোঝার চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয় কর্তব্য এই যে, যদি কখনো চাঁদ প্রমাণিত হওয়া, না-হওয়া নিয়ে সরকারি চাঁদদেখা কমিটি এবং উলামায়ে কেরামের মধ্যে কিংবা খোদ আলেমদের মধ্যেই মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তখন শরীয়তের দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের করণীয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

এ মুহূর্তে আমি কিছু কথা আরয় করতে চাই এবং আশা করি মনোযোগের সাথে কথাগুলো পাঠ করা হবে।

১. প্রথম নিবেদন, যে সম্পর্কে ইতোপূর্বেও ইঙ্গিত করেছি, তা এই যে, আমরা কেউ যেন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিজ অঙ্গনের বাইরে পা না রাখি। এটা একদিকে যেমন শরাফত ও দিয়ানতের পরিপন্থী, অন্যদিকে তা বিভিন্ন জটিলতা, এমনকি

বিবাদ-বিসংবাদেরও সূত্রপাত ঘটায়। জগতের অন্য সকল ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি দ্বীনের ক্ষেত্রেও শুধু এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মতই গ্রহণযোগ্য। অন্যদের মতামত না শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য, না সামাজিকভাবে। দু'চারজন হুজুগে মানুষ যারা সব ধরনের অভিনব বিষয়ে আকর্ষণ বোধ করে এবং অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে সমাজের মানুষের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্ট করে তারা ছাড়া আর কারো কাছে তা স্বীকৃতি পায় না। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

কোন কোন 'চিন্তাবিদ'-যাদের দ্বীনী উলূমের পারদর্শিতা তো দূরের কথা, কুরআন হাদীসের ভাষায় কুরআন হাদীস বোঝার যোগ্যতাটুকুও নেই— এই সমাধান দিয়েছেন যে, রমযানের সূচনা, সমাপ্তি, ইসলামী ঈদ ও চাঁদের সাথে সংযুক্ত অন্যান্য ইবাদত চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল না রেখে ক্যালেন্ডারভিত্তিক করে দেওয়া উচিত। বৈজ্ঞানিক নীতিমালা অনুযায়ী প্রণীত এসব ক্যালেন্ডারে ভুল-ভ্রান্তি থাকে না এবং এতে মতানৈক্যও হয় না। এ ক্ষেত্রে চাঁদ-দেখা-কমিটিরও প্রয়োজন হবে না। ক্যালেন্ডারের মাধ্যমেই বহু বছরের রমযানের সূচনা-সমাপ্তি ও ঈদের তারিখ আগাম জানিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

এই সমাধান আপাত দৃষ্টিতে অতি চমৎকার মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সম্পূর্ণ বাতিল ও পরিত্যাজ্য। কেননা, তা শরীয়তের নীতি ও স্বভাব এবং কুরআন হাদীসের পরিষ্কার নির্দেশনার সম্পূর্ণ বিরোধী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত গোটা উম্মাহর ইজমা যে, চাঁদসংশ্লিষ্ট ইবাদত চাঁদ দেখার সাথে যুক্ত, চাঁদের জন্ম বা আকাশে বিদ্যমানতার সাথে নয়।

এখানে মনে রাখা উচিত যে, ক্যালেন্ডারের ভিত্তি যদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন চাঁদের উপর হয়, তবে তা দর্শনযোগ্যই নয়। (রুয়াতে হেলাল মওজুদা দাওর মে, জিয়াউদ্দীন লাহোরী, মাহিরে ফালাকিয়াত।) চোখে দেখা ছাড়া তার আগাম সময় নির্ধারণ করার নিশ্চিত কোন উপায় নেই। এজন্য খোদ জ্যোতির্বিদদের মাঝেই এ বিষয়ে মতানৈক্য হয়ে থাকে। এ বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার পারদর্শী ব্যক্তিদের উদ্ধৃতি ও আলোচনার জন্য দেখুন— 'রুয়াতে হেলাল মওজুদা দাওর মে' জিয়াউদ্দীন লাহোরী; 'ইসলামী মাহ আওর রুয়াতে হেলাল, শরীয়ত আওর ইলমে ফালাক কি রোশনী মে' ইয়াকুব কাসেমী পৃ. ৩১-৭৩; রুয়াতে হেলাল, মুফতী মুহাম্মাদ শফী পৃ. ৭, ২৬-৩২

যদি চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্য সময় আগাম নির্ধারণ করা সম্ভবও হয় তবু দেখা ও দেখার সম্ভাবনা এক বিষয় নয়। চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহকে শরীয়ত সংযুক্ত করেছে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে, দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনার

সাথে নয়। এজন্য যে ক্যালেন্ডার চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্য সময়ের উপর ভিত্তি করে প্রণীত, তার সাথে রমযান ও ঈদকে সংযুক্ত করার প্রশ্নই আসে না। এজন্য অতীতে যেমন ঈদ ও রমযান চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল ছিল, আজও তেমনি থাকবে। এর উপরই নবী-যুগ থেকে অদ্যাবধি উম্মাহর ফকীহগণের ইজমা রয়েছে এবং এটাই হল কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা।

আধুনিক চিন্তাবিদগণ যতই চেষ্টামেচি করুন, এর কোন মূল্য শরীয়তে নেই। তাদের কারো যদি এই ধারণা থাকে যে, তাদের সমাধান কুরআন ও হাদীসসম্মত তবে তা সম্পূর্ণ অমূলক। আয়াত ও হাদীসের তাহরীফ ও অপব্যাক্ষ্য ছাড়া এই দাবি প্রমাণ করা কোন উপায় নেই।

কিছু চিন্তাবিদ মনে করেন, চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে হলেও এমন কোন নিয়ম হওয়া উচিত, যার মাধ্যমে গোটা মুসলিম-জাহানে একই দিন রমযানের সূচনা এবং একই দিন রমযানের সমাপ্তি ও ঈদ হবে। তাদের ধারণা মতে এই নিয়ম তৈরি হওয়া জরুরি এবং এছাড়া ঈদের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই দাবিও অমূলক। সকল জনপদে একই দিন রমযান শুরু করা এবং একই দিন ঈদ করার কোন আদেশ শরীয়তে নেই। না এটা মুসলমানদের জন্য জরুরি, না এতে বিশেষ সওয়াব ও ফযীলত রয়েছে; তেমনি ঈদের উপকারিতা এবং ইবাদতের কোন শরয়ী মাকসাদ ও হেকমতও এর সাথে যুক্ত নয়।

সাহাবা-যুগে একযোগে রমযান ও ঈদ পালনের কোন তোড়জোড়, উদ্যোগ-আয়োজন ছিল না। রমযান ও ঈদ মদীনায় কোন দিন হত, মক্কায় অন্য কোন দিন, তেমনি শামে কোন দিন, ইরাক ও মিসরে ভিন্ন কোন দিন। সকল শহরে একই দিনে রোযা ও ঈদ করা, সে সময়ের উপায়-উপকরণের সাহায্যে যতটুকু সম্ভব ছিল সাহাবায়ে কেরাম ততটুকুর জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। যদি একযোগে রোযা ও ঈদ পালন শরীয়তের দৃষ্টিতে মুস্তাহাবও হত তাহলেও সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন এর জন্য সাধ্যমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

তো আমার প্রথম আরয এই যে, আমরা যেন দ্বীনী বিষয়াদিতে, বিশেষত রোযা ও ঈদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সম্পর্কে প্রস্তাব দেওয়া থেকে বিরত থাকি। আমরা বিশেষজ্ঞ আলেমদের কাছে প্রশ্ন করতে পারি, কিন্তু কোন প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই। উপরন্তু নিজের প্রস্তাব সম্পর্কে একগুয়ে মনোভাব পোষণ করা এবং একে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত ঘটানো যে কত নিন্দনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২. দ্বিতীয় আরয এই যে, কখনো যদি সরকারি চাঁদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্তের উপর সকল হক্কানী আলেম আপত্তি করেন, সেক্ষেত্রে কমিটির দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হল, ঘোষিত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা করা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে যদি কিছু আলেম আপত্তি করেন আর অন্যরা কমিটির সিদ্ধান্তের সাথে দিয়ানতদারীর সাথে একমত হন তাহলে এর অর্থ হবে, চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে আলেমদের মাঝেই, যারা সবাই হানাফী মাযহাবের অনুসারী, মতানৈক্য হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের করণীয় কী, তা তো তাঁদের জানাই আছে কিংবা জেনে নিতে পারবেন, তবে তাতে ইলম ভাইদের জন্য, আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দান করেন, আরবী ভাষায় একটি পুস্তিকা রচনার ইচ্ছা আছে। এ প্রবন্ধে শুধু সাধারণ মানুষের করণীয় সম্পর্কে বলতে চাই।

আহলে হক আলেমদের অন্যান্য মতভেদের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের যা করণীয় উপরোক্ত ক্ষেত্রেও তাই করণীয়। তা এই যে, যে আলেমের প্রতি আপনি আস্থাশীল কিংবা সাধারণত যে আলেমকে আপনি মাসআলা জিজ্ঞেস করে থাকেন, তাঁর ফতওয়া মোতাবেক আমল করবেন। তবে এ সিদ্ধান্ত সবার উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। কেননা যখন একই মাযহাবের আহলে হকের মাঝে ইখতেলাফ দেখা দিয়েছে, তখন আপনি কীভাবে এই আশা করতে পারেন যে, সবাই এক আলেমের তাহকীক মোতাবেক আমল করবেন। জগতের সকল মানুষ আপনার শাইখেরই মুরীদ হবেন কিংবা প্রত্যেকে আপনার পছন্দনীয় মুফতী সাহেবের ফতওয়া অনুযায়ী চলবেন তা অপরিহার্য নয়। যদি মুত্তাবিয়ে সুন্নত অন্য কোন শাইখ বিদ্যমান থাকেন, তবে যার ইচ্ছা সে তাঁরও মুরীদ হতে পারে, তেমনি ইলমে দ্বীনের পারদর্শী অন্য কোন আলেম বিদ্যমান থাকলে, যার ইচ্ছা সে তাঁর নিকট থেকেও মাসআলা জিজ্ঞেস করতে পারে এবং তাঁর ফতওয়া অনুযায়ী আমল করতে পারে। এ বিষয়ে আপনার বাধা দেওয়ার কিংবা এই বলে সমালোচনা করার কোন অধিকার নেই যে, তুমি ঈদের দিন কেন রোযা রাখলে কিংবা তুমি ত্রিশতম রোযা কেন পরিত্যাগ করলে?

৩. তৃতীয় কথা চাঁদ দেখা কমিটি সম্পর্কে। এ সম্পর্কে আগেও আরয করেছিলাম যে, সরকারের দায়িত্ব হল চাঁদ দেখা কমিটিকে শক্তিশালী এবং চাঁদ বিষয়ক সকল বিধি-বিধান অনুসরণে কমিটিকে বাধ্য করা। নিশ্চয় হেলাল কমিটির নির্ধারিত নীতিমালা আছে। তা দেশের নির্ভরযোগ্য আলেমদের সামনে পেশ করে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রয়োজন থাকলে তা করা উচিত এবং তাঁদের স্বাক্ষর ও সত্যায়ন গ্রহণ করে তা প্রচার করা উচিত, যাতে আলেম ও দ্বীনদার শ্রেণী আশ্বস্ত হতে পারেন।

এ কমিটি সম্পর্কে জনগণের আস্থা সৃষ্টির জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, সে সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে লিখেছি। সংক্ষিপ্ত আকারে আবার তা উল্লেখ করছি।

ক. কমিটি কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মানুষের রোযা ও ঈদ এবং অন্যান্য ইবাদতের গুরুত্ব অনুধাবন করে চাঁদের বিষয়টি বিবেচনা করবে এবং চাঁদ দেখা কমিটির সকল সদস্যকে, জেনারেল শিক্ষিত হলেও এ বিষয়ক সকল মাসআলা ভালভাবে জানিয়ে দেবে এবং হেলাল কমিটিকে চাঁদবিষয়ক সকল বিধি-বিধান অনুসরণে বাধ্য করবে।

খ. দেশের নেতৃস্থানীয় আলেমদের আরো কয়েকজনকে এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কমিটির অধিকাংশ সদস্য যেন ফিক্‌হ বিষয়ে দক্ষ হন এমনভাবে তা বিন্যস্ত করা উচিত।

গ. চাঁদ দেখা কমিটিকে বাধ্য করতে হবে যে, চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য পাওয়া গেলে তারা চাঁদের ঘোষণা দিতে পারবে; কিন্তু সাক্ষ্য ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ না হওয়ার ক্ষেত্রে চাঁদের ঘোষণার ব্যাপারে তড়িঘড়ি করতে পারবে না। প্রয়োজনে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। সকল সদস্য উপস্থিত থাকতে না পারলে তারা অন্যান্য সদস্যকে চাঁদের ঘোষণার ক্ষমতা অর্পণ করে বৈঠক অব্যাহত রাখবে।

ঘ. বৈঠক সমাপ্ত হওয়ার পরও একটি সাবকমিটি বিদ্যমান থাকবে, যাদের কাছে পরবর্তী সময়ে আসা সংবাদ, সাক্ষ্য ইত্যাদি উপস্থাপন করা যায়। এই কমিটিতে এক দুজন অভিজ্ঞ মুহাক্কিক আলেম থাকা জরুরি।

ঙ. হেলাল কমিটির সভাপতি বা প্রধান একজন মুহাক্কিক আলেমকেই বানানো উচিত। সরকারের মন্ত্রী/সচিবগণ কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি থাকতে পারেন।

চ. প্রতি জেলার শাখা কমিটিগুলোকেও আরো ব্যাপক ও সুশৃঙ্খল করা প্রয়োজন এবং প্রত্যেক শাখা কমিটিতেই নির্ভরযোগ্য আহলে হক আলেমদেরকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। এই কমিটিগুলো সার্বক্ষণিকভাবে সাধারণ মুসল্লিদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখবে এবং কেন্দ্রের সাথেও এই কমিটিগুলোর সম্পর্ক নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য থানায় থানায় মসজিদ ও মাদরাসাভিত্তিক শাখা কমিটি থাকা প্রয়োজন।

ছ. মিডিয়াকে বাধ্য করতে হবে, তারা যেন চাঁদের বিষয়ে শুধু চাঁদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্তই প্রচার করে এবং কমিটির ভাষায় প্রচার করে। কেননা তারা

নিজেদের পক্ষ থেকে চাঁদের সংবাদ প্রদান করলে মানুষ কীভাবে সেই সংবাদের উপর নির্ভর করবে?

যদি এমন দায়িত্বশীল খোদাভীরু দ্বীনদার কর্মকর্তা ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের সমন্বয়ে চাঁদদেখা কমিটি কার্যকর থাকে, তবে এমন বিধানও করা যাবে যে, চাঁদের ঘোষণা ও সম্প্রচার চাঁদ দেখা কমিটি ছাড়া দেশের অন্য কেউ করতে পারবে না।

মোটকথা, এ জাতীয় জরুরি পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে চাঁদ দেখা কমিটির নির্ভরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করা সরকারের জন্য অপরিহার্য। অন্যথায় একসময় হয়ত দেখা যাবে, উলামায়ে কেরাম মুসলিম জনগণের ইবাদত-বন্দেগীকে রক্ষা করার জন্য বর্তমান চাঁদ দেখা কমিটির বিকল্প খুঁজতে এবং জনগণকে সেই বিকল্পের উপরই নির্ভর করার ফতওয়া দিতে বাধ্য হবেন।

আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদেরকে বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন এবং বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা তাদের জন্য সহজ করে দিন। আমীন।#

[সেপ্টেম্বর-অক্টোবর '০৭ঈ.]

রমযান অর্জনের মৌসুম তবে ...

রোযাকে ঢাল বানান, এই ঢালকে অক্ষুণ্ণ রাখুন এবং
ঈদকে 'ওয়ীদে' পরিণত না করুন

রমযানুল মুবারক বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। এই মাসের দিবস-রজনীকে আল্লাহ তাআলা খায়ের ও বরকত দ্বারা পূর্ণ করে রেখেছেন। তাকওয়া অর্জনের অনুশীলন এবং ইবাদত-বন্দেগী ও নেক আমলের ভরা বসন্ত বানিয়েছেন। এ মাস শুধু একটি মাসই নয়; বরং গোটা বছরের তাপ-সঞ্চয়ের মৌসুম। এ মাস থেকেই মুমিন গোটা বছরের তাকওয়া-তাহারাতের পুঁজি সঞ্চয় করে। গোটা বছরের ঈমানী প্রস্তুতি এ মাস থেকেই গ্রহণ করে। হাদীস শরীফের ভাষায় : 'আল্লাহ তাআলার কসম! মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে উত্তম মাস আর নেই এবং মুনাফিকদের জন্য এর চেয়ে ক্ষতির মাসও আর নেই। মুসলমান এ মাসে (গোটা বছরের জন্য) ইবাদতের শক্তি ও পাথেয় সঞ্চয় করে।'।

আরো বলেছেন, এ মাস মুমিনের জন্য অতিকল্যাণকর এবং মুনাফিকের জন্য অকল্যাণজনক। -মুসনাদে আহমদ ২/৩৩০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৪০

সহীহ ইবনে খুযাইমাতেও এই হাদীস (হাদীস ১৮৮৪) শব্দের সামান্য পার্থক্যের সাথে বিদ্যমান রয়েছে।

উপরোক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, রমযানের খায়ের ও বরকত থেকে বঞ্চিত থাকা মুনাফিকীর দলীল।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিফাক থেকে রক্ষা করুন এবং মুমিনের মতো এ মাসের ইস্তেকবালের তাওফীক দান করুন। অতপর মুমিনের মতোই এই মূল্যবান সময়কে কাজে লাগানোর তাওফীক নসীব করুন।

আল্লাহ তাআলা যেমন রমযানকে খায়ের ও বরকত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের মৌসুম বানিয়েছেন, তেমনি গোটা বছরের ঈমানী কুওয়াত হাসিলের কেন্দ্র বানিয়েছেন। উপরন্তু নিজ অনুগ্রহে সৃষ্টিজগতে এমন অনেক পরিবর্তন দান করেন, যা গোটা পরিবেশকেই খায়ের ও বরকত দ্বারা ভরপুর করে দেয়।

হাদীস শরীফে আছে যে, এ মাসে আল্লাহর হুকুমে জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বড় বড় জ্বিন ও শয়তানকে বন্দী করা হয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে—

يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ

“হে কল্যাণ-অন্বেষী, অগ্রসর হও, হে অকল্যাণের পথিক, থেমে যাও।”

এর প্রভাবে রমযান মাসে চেতনে বা অবচেতনে ভালো কাজের প্রেরণা জাগ্রত হয়। সৌভাগ্যবান ওইসব ব্যক্তি, যারা এই আসমানী প্রেরণার কদর করে এবং হিম্মতের সাথে কর্মের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমরা যদি রমযানের ফাযায়েল সম্পর্কে অবগত হই তবে বুঝতে পারব যে, রমযান হল তিজারতের মৌসুম। কিন্তু কোন তিজারত? রমযান হল আখেরাতের তিজারতের মৌসুম। যে তিজারতের মাধ্যমে মানুষ আখেরাতের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে, যে তিজারতের মুনাফা হল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতুন নায়ীম এবং যে তিজারতে সফল হওয়া ছাড়া দুনিয়ার সকল তিজারত শুধু ব্যর্থতা ও ব্যর্থতা।

রমযানে সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ নয়, তবে তাতে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়া যেন এ মাস পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এসেছে—এটা এই নেয়ামতের না-শোকরী ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশেষত ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে রমযানের শেষ দশকে বিপণী বিতানগুলোর যে অবস্থা পরিলক্ষিত হয় তা খুবই দুঃখজনক। ব্যবসায়ীরা দিনরাত বিক্রি ও মুনাফা নিয়ে ব্যস্ত, আর অন্যরা শুধু কেনাকাটাতেই নয়, বিপণী বিতানগুলোর পরিদর্শন ও প্রদক্ষিণে মগ্ন, না ফরয নামাযের জামাতের গুরুত্ব, না তারাবীর জামাতে উপস্থিতি, না পূর্ণ তারাবীহ পড়ার তাওফীক। তেলাওয়াত, তাসবীহ, দুআ ও রোনাযারীর তো প্রশ্নই অবান্তর। এরপর নগ্নতা ও নারী-পুরুষের সহবিচরণসহ অন্যান্য হারাম কাজ তো রয়েছেই, যা লানত ও অভিসম্পাত ডেকে আনে।

মনে রাখা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে রমযান হল, আখেরাতের তিজারতের মৌসুম। এ সময়টা বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করা উচিত। অন্তত ফরয রোযা ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা তারাবীর সাথে সেহরীর সময় তাহাজ্জুদ, কিছু পরিমাণে হলেও যিকির ও তেলাওয়াত প্রত্যেকেরই করা উচিত। বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্যে এত বেশি মগ্ন হওয়া উচিত নয় যে, ফরয নামাযের জামাত ও তারাবীহ ছুটে যায়। এছাড়া ব্যবসায় ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা এবং সুদ ও জুয়াসহ সকল হারাম কার্যকলাপ থেকে তো সারা বছরই বেঁচে থাকা ফরয, রমযান মাসে এর অপরিহার্যতা আরও বেড়ে যায়। কেননা, বরকতপূর্ণ সময়ের গোনাহও অত্যন্ত কঠিন ও ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে।

এই ঢালকে অক্ষুণ্ণ রাখুন

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে— الصَّيَّامُ جُنَّةٌ অর্থাৎ রোযা হল ঢাল। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৮৯৪

রোযা গোনাহ থেকে রক্ষাকারী ঢাল। রোযার মাধ্যমে অন্তরে তাকওয়া পয়দা হয়। ঈমানী হায়া জাগ্রত হয়, যা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার অনেক বড় উপায়। রোযা কবরে, হাশরে ও আখেরাতের সকল মনযিলে বান্দার জন্য ঢাল। সবশেষে তা জাহান্নামের আগুন থেকেও মুমিনকে রক্ষা করে।

তবে এগুলো তখনই হবে যখন রোযা শুধু নিয়ম পালন না হয়ে প্রকৃত রোযা হবে। নিয়ম পালনের রোযা বলতে উদ্দেশ্য হল সঠিক নিয়তের সাথে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রীমিলন এবং ওইসব কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা যা ফিকহ ও ফতোয়ার বিচারে রোযাকে বিনষ্ট করে। কোনো সন্দেহ নেই যে, এটুকু দ্বারা রোযার অপরিহার্যতা থেকে দায়মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু সে রোযা 'ঢাল' হয় না। রোযা তখনই ঢালস্বরূপ হয় যখন ঈমান ও ইহতেসাবের সাথে আদায় করা হয় এবং রোযার সকল আদব রক্ষা করা হয়।

সংক্ষেপে রোযার আদবগুলো এভাবে অনুধাবন করা যায় যে, রোযার হালতে রোযাদার আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ওইসব কাজ পরিত্যাগ করে যা বছরের অন্যান্য মাসে এমনকি রমযানের রাতেও তার জন্য হালাল। আর তা এজন্য পরিত্যাগ করে যে, রোযার হালতে এই কাজগুলো আল্লাহ তাআলা নিষিদ্ধ করেছেন। তাহলে যেসব কাজ সব সময়ের জন্য আল্লাহ তাআলা হারাম ও নিষিদ্ধ করেছেন, যথা গীবত, শেকায়েত, মিথ্যা, প্রতারণা, সুদ, জুয়া, খেয়ানত, আত্মসাৎ, ঝগড়া-বিবাদ, হারাম পানাহার, নামায না পড়া, সিনেমা, টিভি, ভিসিআর দেখা

ইত্যাদি পরিহার করা কি অপরিহার্য নয়? মোটকথা সকল রোযার আদব এটাই যে, হারাম কাজ ও হারাম বিষয় থেকে বিরত থাকবে এবং শুধু দুই অঙ্গের নয়, শরীরের সকল অঙ্গের রোযা রাখবে। মুখ, কান, চোখ ও হাত-পা সকল অঙ্গকে গোনাহ থেকে পবিত্র রাখবে। যাতে ওই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত না হতে হয়, যা এমন দুই মহিলা সম্পর্কে বলা হয়েছিল, যারা রোযার হালতে অন্যের গীবত করেছে। হাদীসটি এই—

إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمَا، وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا

“এরা দুজন ওই কাজগুলো থেকে তো বিরত থেকেছে যা আল্লাহ তাআলা (অন্য সময়) তাদের জন্য হালাল করেছেন, কিন্তু ওইসব কাজ থেকে বিরত থাকেনি যা আল্লাহ তাআলা (সবসময়ের জন্য) হারাম করেছেন।” -মুসনাদে আহমদ ৫/৪৩১

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত ইরশাদ রোযাদারের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য— “যে মিথ্যা, অভদ্র আচরণ ও গোনাহ পরিত্যাগ করে না তার পানাহার পরিত্যাগে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।” -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৩; ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৮৯১; সুনানে কুবরা, নাসায়ী হাদীস ৩২৪৫-৩২৪৮

তেমনি এই ইরশাদও— “রোযা শুধু পানাহার ত্যাগের নাম নয়; বরং অশ্লীল ও অর্থহীন কাজ থেকেও বেঁচে থাকা জরুরি। অতএব কেউ যদি রোযাদারের সাথে ঝগড়া করতে থাকে কিংবা অভদ্র আচরণ করতে থাকে তখন এই ভেবে নিজেকে নিবৃত্ত রাখবে যে, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।” -সহীহ ইবনে খুযায়মা হাদীস ১৯৯৬; সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস ৩৪৭০

হাদীস শরীফের মূল আরবী পাঠ এই—

لَيْسَ الصَّيَّامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصَّيَّامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهَلَ عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ.

মনে রাখা উচিত যে, রোযা দুনিয়া ও আখেরাতে ঢাল তখনই হবে যখন তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা হবে। যদি একে বিদীর্ণ করে ফেলা হয় তবে তো এর দ্বারা আত্মরক্ষার সুফল পাওয়া যাবে না। হাদীস শরীফে এসেছে—

الصَّيَّامُ جَنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرُقْهَا

“রোযা হল ঢাল, যে পর্যন্ত না তা বিদীর্ণ করা হয়।” -সহীহ ইবনে খুযায়মা হাদীস ১৮৯২

জিজ্ঞাসা করা হল, রোযা কীভাবে বিদীর্ণ হয়ে যায়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- **بِكَذِبٍ أَوْ غِيْبَةٍ** 'মিথ্যা বা গীবত দ্বারা।' -তবরানী, আওসাত, হাদীস ৭৮১০

ঈদের স্বরূপ ও উদযাপনের পদ্ধতি

ঈদুল ফিতর হচ্ছে রমযানুল মুবারকের মতো মহিমান্বিত মাস এবং সে মাসে রোযা রাখার তাওফীক লাভের আনন্দ। তাই এই মহা নেয়ামতের উপর আল্লাহ তাআলার শোকরগোয়ারী ও তাঁর বড়ত্ব বয়ান করাই হল এই আনন্দের মূলকথা।

আনন্দ প্রকাশের পদ্ধতি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত রয়েছে যে, গোসল করে পাক-সাফ হতে হবে; বেজোড় সংখ্যক খেজুর কিংবা কোনো মিষ্টিদ্রব্য খাবে। সদাকায়ে ফিতর আদায় করবে। নিজের সর্বোৎকৃষ্ট কাপড় পরিধান করবে, যা অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। এরপর তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহের দিকে যাবে। ইমামের পেছনে নামায আদায় করবে এবং খুতবা শ্রবণ করবে। ফেরার সময় সম্ভব হলে ভিন্ন রাস্তা দিয়ে ফিরবে। আসা-যাওয়ার সময় পথচারীদের এবং ঈদগাহে যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় তাদের সালাম করবে। কারো সাথে নতুন সাক্ষাৎ হলে মুসাফাহাও করবে। একে অন্যের জন্য কবুলিয়াতের দুআ করবে। এই সময় সাহাবায়ে কেরাম এই দুআ করতেন- **تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ** -ফাতহুল বারী ২/৫১৭

'ঈদ মোবারক' বলে শুভকামনা প্রকাশ করা যদিও মুবাহ, কিন্তু তা একটি রসমের মতো হয়ে গিয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, সালামের পরিবর্তে এই শব্দই ব্যবহার করা হয়। এ সময়ের মাসনূন দুআ তা-ই যা উপরে বলা হয়েছে।

এই হল ঈদুল ফিতরের দিন ঈদ উদযাপন করে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায়ের পন্থা। এ ছাড়া ঈদের দিন আরো যেসব কাজকর্মের রেওয়াজ আছে সেগুলোতে যদি কোনো না-জায়েয বিষয় ও অশ্লীলতা না থাকে, তবে তা মুবাহ হিসাবে গণ্য হবে, তবে সেগুলো ঈদের মাসনূন আমল নয়। তাই যেসব বিষয়কে মাসনূন মনে না করলে এবং এত গুরুত্ব না দেওয়া হলে যে, পরিত্যাগ করা দোষণীয়, তবে তাতে অসুবিধা নেই। অন্যথায় ওগুলো পরিত্যাজ্য বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর যেসব নাজায়েয ও অশ্লীল কার্যকলাপ সমাজে প্রচলিত রয়েছে সেগুলো সর্বাবস্থায়ই নাজায়েয, ঈদের বরকতময় দিবসে সেগুলোতে লিপ্ত হওয়া আরো মারাত্মক না-জায়েয বলে গণ্য হবে।

ঈদকে ‘ওয়ীদ’ বানাবেন না

আরবী ভাষায় ‘ঈদ’ অর্থ আনন্দ আর ‘ওয়ীদ’ অর্থ অভিশাপ। যদি আল্লাহর নেয়ামতের বে-কদরী করা হয় কিংবা অপব্যবহার করা হয় তাহলে তাঁর করুণা অভিশাপে পরিণত হয়।

ঈদ আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। প্রত্যেক জাতির ঈদ তথা উৎসব রয়েছে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে দুটো ঈদ (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) দান করেছেন।

অনেকের মনে হতে পারে যে, এটাও অন্যান্য জাতির পর্ব-উৎসবের মতোই একটি উৎসবমাত্র, কিন্তু বাস্তবতা এই যে, ইসলামী ঈদ অন্যান্য জাতির পর্ব-উৎসব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বরূপ ও তাৎপর্য এবং বিধান ও উদযাপন-পদ্ধতি সব দিক থেকে তা স্বতন্ত্র। এ বিষয়ে আলকাউসারের অক্টোবর-নভেম্বর ’০৬ সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছিল।

যদি ইসলামী ঈদকে শুধু একটি বার্ষিক উৎসব মনে করা হয় এবং অন্যান্য জাতির উৎসবের মতো ঈদের সাথেও মনগড়া কার্যকলাপ যুক্ত করা হয় তবে নিঃসন্দেহে ঈদ ‘ওয়ীদ’-এ (অভিশাপে) রূপান্তরিত হবে। আমাদের সমাজে এখন ঈদকে কেন্দ্র করে যেসব কার্যকলাপ হয় তা ঈদ ‘ওয়ীদ’-এ (অভিশাপে) পরিণত করার জন্য যথেষ্ট। যথা :

১. ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ছিল রমযানের মতো মাস এবং রোযার মতো ইবাদতের তাওফীক হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলার শোকর গোয়ারী করা এবং তাঁর বড়ত্ব ও মহিমা বর্ণনা করা। কিন্তু ‘মুসলিম সমাজে’ বহু আল্লাহর বান্দা এমন পাওয়া যায় যাদের না রোযার গুরুত্ব আছে, না নামাযের, অথচ ঈদের ‘শোভাযাত্রায়’ তারা সবার চেয়ে অগ্রগামী। যদি ঈদের দিনই তাদের চেতনা হয় এবং খালেস দিলে তওবা করে আহকামে শরীয়তের পাবন্দীর দিকে ফিরে আসা হয় তবে তো অতি উত্তম, অন্যথায় এদের সাধারণ অবস্থা এই যে, আকায়েদ ও আমাল এবং ফরয-ওয়াজিবের কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই। তারা নিজেদের মুসলমানিত্বের প্রমাণ শুধু এমন হাতেগোনা কিছু দিবসে প্রদান করতে আগ্রহী, যেগুলোতে কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে। আর সেগুলোর সাথেও তাদের সম্পর্ক শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বলাবাহুল্য যে, এই মানসিকতা-সে দ্বীনী জ্ঞানশূন্যতার কারণে হোক বা বুদ্ধিবৃত্তিক (?) কারণে- অত্যন্ত দুঃখজনক। এটা ইসলামের অত্যন্ত ভুল চিত্রায়ণ। নিঃসন্দেহে এই ধরনের মানসিকতা আল্লাহ তাআলার অভিশাপকে

ত্বরান্বিত করে। আল্লাহ তাআলাই আমাদের হেদায়েত ও হেফাযতের মালিক। তাঁর নিকটেই হেদায়েত ও হেফাযত প্রার্থনা করি।

২. ঈদগাহে এমন সব লোকের উপস্থিতিও কম নয়, যারা রমযানের মর্যাদা ও পবিত্রতা বিনষ্ট করতে কোনো সংকোচ বোধ করে না। গোটা রমযান মাসে না সিনেমা হলগুলোর উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়, না ভিসিআর, ডিশ, পত্র-পত্রিকার অশ্লীল বিষয় ও পাতার উপর। তেমনি প্রকাশ্যে পানাহার, হোটেল-রেস্তোরা, কফিশপ, রেস্টহাউস ইত্যাদির বিলাসিতা ও অশ্লীলতার উপরও কোনো বিধিনিষেধ আরোপিত হয় না; না রাষ্ট্রীয়ভাবে, না সামাজিকভাবে। আর না ওইসব লোকদের মধ্যেও এতটুকু চক্ষুলজ্জা আছে যে, যে মাসে বড় বড় শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় অন্তত সে মাসে তো নিজেদের এবং নিজেদের অধীনদেরকে অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা কর্তব্য।

অথচ ওইসব লোকও ঈদগাহে উপস্থিত থাকে। তাদের এই উপস্থিতি যদি তওবার নিয়তে হয়, অপরাধবোধের সাথে হয় এবং ঈদের নেয়ামতের কদরদানীর জন্য হয় তবে তো খুবই উত্তম, কিন্তু বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে তা মনে হয় না; বরং শুধু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করাই তাদের উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। বলাবাহুল্য যে, এই মানসিকতাও লানত ও অভিশাপের কারণ এবং ঈদকে ‘ওয়ীদে’ রূপান্তরিত করার মাধ্যম।

৩. ঈদ ইসলামের শিআর (নিদর্শন) এবং ঈদের দিনগুলো অত্যন্ত বরকতপূর্ণ। মনে রাখা উচিত যে, ইসলামে ‘শিআর’ প্রসঙ্গটি অত্যন্ত নায়ুক ও সংবেদনশীল। তেমনি বিশেষ বরকতপূর্ণ সময়গুলোর মর্যাদা বিনষ্ট করা অত্যন্ত ভয়াবহ। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, ঈদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সিনেমা হল ও টিভি-চ্যানেলে যেসব বিশেষ আয়োজন থাকে—তা এই ইসলামী নিদর্শনের প্রকাশ্য অবমাননা। যারা এসব বিষয়ের ব্যবস্থাপনা ও প্রচার-প্রচারণার সাথে কোনোভাবে সম্পৃক্ত এবং যারা এসব অশ্লীল দৃশ্য অবলোকনের মাধ্যমে ঈদ-উৎসব উদযাপন করে তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা একটি ‘শিআরে ইসলাম’—ইসলামের নিদর্শনের অবমাননার সাথে জড়িত কি না? ভেবে দেখুন, অবশেষে এটা কি ঈদ থাকল না ওয়ীদে রূপান্তরিত হল?

৪. ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন অবমাননার একটি দিক নারীদের মধ্যে দেখা যায়। ঈদের দিনে বহু নারী বেপর্দা বের হয় এবং সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে রাস্তা-ঘাটে ঘুরতে থাকে। শহর ও গ্রাম সর্বত্রই এই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এ বাড়ি থেকে সে বাড়ি, এ জায়গা থেকে সে জায়গা ...।

পর্দাহীন যদি হতেই হয়, তাহলে অন্তত ইসলামী ঈদের দিন নিজেকে সংযত রাখা উচিত। ইসলামী নিদর্শনের অবমাননার দ্বারা নিজের উপর চরম অত্যাচার করা তো কোনভাবেই সংগত নয়। এই ঈদ তো পাশ্চাত্য সভ্যতার অংশ নয়, এটা ইসলামের বিধান। অতএব ইসলামের বিধান মোতাবেক তা উদযাপন করাই মুসলমানের কর্তব্য। পাশ্চাত্যের নগ্নতা ও অশ্লীলতাকে এর সাথে যুক্ত করা কি মুসলমানের কাজ হতে পারে?

৫. ঈদকে ‘ওয়ীদ’ ও অভিশাপে এমন আরেকটি বিষয় আজকাল মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। যেহেতু ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ঈদ নিছক একটি উৎসব কিংবা এতে উৎসবের দিকটিই প্রধান, তাই তা উদযাপনের জন্য সাজসজ্জার সীমিতরিজ্ঞ আয়োজনে ডুবে যেতে দেখা যায়। রমযানের শেষ দশক এ কাজেই বরবাদ হয়ে যায়। এই সময় দিন-রাত মার্কেট ও শপিংমলগুলোতে প্রচণ্ড ভিড় থাকে। পুরুষের চেয়ে নারীদের ভিড়ই বেশি, আর অধিকাংশই বেপর্দা। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই মার্কেটিংয়ে ওইসব লোকই সবচেয়ে অগ্রগামী, যাদের না আছে রোযা-তারাবীর চিন্তা, না রমযানের মর্যাদা রক্ষার অনুভূতি। তাদের তো প্রকৃতপক্ষে ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ারই অধিকার থাকে না অথচ তারাই ঈদের ‘আয়োজনে’ সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত।

হাদীস শরীফে কুরবানী ঈদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘যার কুরবানী করার ইরাদা নেই সে যেন ঈদগাহে না আসে।’ অথচ কুরবানী হল ওয়াজিব কিংবা (কোনো কোনো মাযহাব মতে) সুন্নতে মুয়াক্কাদা। তো কুরবানী পরিত্যাগ করার কারণেই যখন এই ধমক দেওয়া হল যে, সে যেন ঈদগাহে না আসে তাহলে রোযার মতো ফরয বিধান যারা পরিত্যাগ করে তাদের কীভাবে ঈদগাহে হাজির হওয়ার অধিকার থাকে? তবে কেউ যদি নিজেকে অপরাধী মনে করে এবং অনুতপ্ত হয়ে ঈদগাহে উপস্থিত হয় তাহলে সেটা ভিন্ন কথা।

একটি শ্রেণী-মাশাআল্লাহ- রোযা রাখেন কিন্তু রমযানের শেষ দশকে তারাবীহ ছেড়ে তারাও মার্কেটিংয়ের চক্রে ফেঁসে যান। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, রমযানে দিবসের করণীয় হল রোযা আর রাতের করণীয় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ। তারাবীহ হল সুন্নতে মুয়াক্কাদা, যা এ থেকে বঞ্চিত থাকার অর্থ হল হাফেযের মুখ থেকে কুরআন মজীদ শ্রবণ করা থেকে বঞ্চিত থাকা। এটা কত বড় ক্ষতি!

এরপর যখন বেপর্দা নারীতে মার্কেটগুলো ছেয়ে গেছে তখন পুরুষরা কি তাদের ঈমান রক্ষা এবং দৃষ্টির হেফাযতের জন্য মার্কেটে ঘোরাঘুরি বর্জন করতে পারেন না।

কিছু মানুষ এমনও আছেন, যারা মাশাআল্লাহ রোযার সাথে তারাবীরও পাবন্দী করেন এবং তারাবীতে খতমও করে থাকেন। তবে তারা খতম করেন পনেরো বা বিশ রমযানের মধ্যেই। তারা শেষ দশকে শুধু সূরা তারাবীহ পড়ে থাকেন, জামাতের সাথে কিংবা একা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করা হয় সফরের সুবিধার জন্য। অথচ গোটা রমযানের মধ্যে শেষ দশকের ফযীলতই সবচেয়ে বেশি। এজন্যই এ অংশে ইতিকাফ ও লায়লাতুল কদর অব্বেষণের আদেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সালাফে সালাহীন রমযানের প্রথম বিশ দিনের তুলনায় শেষ দশকে নামায, তেলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতে অনেক বেশি মেহনতের সাথে মশগুল থাকতেন। এজন্য শেষ দশকের রাতগুলো আবাদ রাখা কর্তব্য। এগুলো কোনোভাবেই মার্কেটিংয়ের পেছনে নষ্ট করা উচিত নয়।

একটি বড় ভুল ধারণা এই যে, অধিকাংশ মানুষ ঈদের দিন নতুন পোশাক পরিধান করা এবং অন্যদের পরিধান করানো বা হাদিয়া দেওয়াকে ঈদের অপরিহার্য অংশ মনে করে, অথচ গোড়াতেই একথা ঠিক নয় যে, ঈদের জন্য নতুন কাপড় মাসনুন; বরং দলীল দ্বারা শুধু এটুকু প্রমাণ হয় যে, নিজের কাপড়গুলোর মধ্যে উত্তম ও পরিষ্কার কাপড়টি পরিধান করবে।

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَلْبَسُ فِي الْعِيدَيْنِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ

এক প্রস্থ উত্তম কাপড় বানিয়ে বা ক্রয় করে জুমা ও ঈদে পরিধান করাতে কোনো অসুবিধা নেই। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি উৎকৃষ্ট পোশাক ছিল, যা তিনি জুমা, ঈদ ও বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় পরিধান করতেন। -আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী ৩/২৮০-২৮১; যাদুল মাআদ ১/৪২৫

মোটকথা, পরিষ্কার ধোয়া কাপড় বা বিদ্যমান কাপড়গুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কাপড়টি ঈদের দিন পরিধান করা কাম্য। যদি ঘটনাক্রমে তা নতুন হয় তাহলেও অসুবিধা নেই, কিন্তু প্রত্যেক ঈদের জন্য নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা করাকে মাসনুন মনে করা মোটেই ঠিক নয় এবং এর স্বপক্ষে শরীয়তের কোনো দলীলও বিদ্যমান নেই।

মুসলমানদের স্বচ্ছলতার যুগ অতীত হয়েছে (যখন তাদের ধীন ও ঈমানের হালতও বর্তমানের চেয়ে হাজার গুণ ভালো ছিল) কিন্তু ইতিহাস থেকে প্রমাণ করা যায় না যে, তখন রমযান ছিল তাদের বাণিজ্যের মৌসুম আর ঈদ ছিল কেনাকাটা ও উদ্যোগ-আয়োজনের অনুষ্ঠান। এখন তো শুধু নতুন কাপড়ই নয়, চাই নতুন

জুতো, মহিলাদের সাজসজ্জার নতুন উপকরণ, এমনকি ঘরের আসবাবপত্রও নতুন হওয়া চাই। পুরানো শুধু একটি বস্তু, তা হচ্ছে ঈমান ও আমল। একে উন্নত ও নতুন করার কোনো আয়োজন নেই। বলাবাহুল্য, মুসলিম সমাজের এ এক দুর্ভাগ্যজনক চিত্র, যার নজির বিগত শতাব্দীগুলোতে পাওয়া যাবে না।

কেউ বলতে পারেন যে, ইসলামে জায়েয সাজসজ্জার অনুমতি আছে এবং ঈদের সময় তা পছন্দনীয়ও বটে? অবশ্যই পছন্দনীয়, তবে সীমার মধ্যে রাখা হলে। মুবাহ সাজসজ্জার মধ্যেও বাড়াবাড়ি করা নিষেধ। এরপর আলোচনা শুধু সাজসজ্জা সম্পর্কেই নয়; বরং এতে সীমালঙ্ঘন করে রমযানের সবচেয়ে বরকতময় সময়গুলোকে বিনষ্ট করা সম্পর্কেও। শরীয়তে এই সীমালঙ্ঘনও কি কাম্য ও পছন্দনীয়? নাউযুবিল্লাহ! এরপর মুবাহ ও বৈধ সাজসজ্জাকে বাহানা বানিয়ে যারা অবৈধ সাজসজ্জার পেছনে পড়ে যায় তাদের কথা তো ভিন্নই!

মোটকথা, রমযানের শেষ দশক নিজেকে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে অন্যান্য ঝামেলা থেকে মুক্ত করে ইবাদতে মশগুল করা উচিত। নফল নামায, কুরআন তেলাওয়াত, যিকর ও দুআ ইত্যাদিতে মশগুল হওয়া কর্তব্য। নিজেও ইতিকাফ করার চেষ্টা করবে এবং ঘরের লোকদেরও ইতিকাফের সুযোগ করে দেবে। মহিলাদেরও এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে। একই বছর সবার পক্ষে সম্ভব না হলে পালাক্রমে করার চেষ্টা করবে। আর দুই তিন দিনের নফল ইতিকাফ তো প্রতি রমযানে প্রত্যেকেই করতে পারেন।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, রমযানের শেষ দিনগুলো ঈদের ‘প্রস্তুতির’ জন্য নয়; বরং ঈমান ও আমলের তরক্কীর জন্য। আমাদের কর্মের দ্বারা এর বিপরীত কিছু প্রমাণ হলে সেটা হবে ইসলামের অত্যন্ত ভুল চিত্রায়ণ। আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন এবং সকল বিষয়ে সাহায্য করুন। আমীন।#

[সেপ্টেম্বর '০৮ঈ.]

ঐক্য ও সংযমের ইবাদতে কেন এত অনৈক্য ও অসংযম

ইসলাম তাওহীদের দ্বীন, যা মুসলমানদের সব ধরনের শিরক থেকে বেঁচে থাকার এবং তাওহীদের সূত্রে একতাবদ্ধ থাকার আদেশ করে। দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিতে তাওহীদ ও ইত্তিহাদ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এটাই গোটা মিল্লাতের সীমানা এবং শরীয়তের সকল আহকাম ও আমর-নাহির বুনিয়াদ।

ইসলাম মুসলমানদেরকে যে জীবনাদর্শ দান করেছে তাতে বিভিন্নভাবে তাওহীদ ও ইত্তিহাদের চর্চা করানো হয়েছে। যদিও সকল ইবাদতে আছে তাওহীদের মশুক এবং সকল ইজতিমায়ী কাজে আছে ঐক্যের অনুশীলন, কিন্তু ইসলামের পঞ্চম রোকন হজ্ব এমন একটি ইবাদত, যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাওহীদ ও ইত্তিহাদের জীবন্ত নিদর্শন। এজন্য এখান থেকে গুরুত্বের সাথে তাওহীদ ও ইত্তিহাদের সবকিছু নেওয়া উচিত।

আজকের অবসরে এ বিষয়ে কিছু কথা নিবেদন করব।

হজ্ব বিশ্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বলিষ্ঠ প্রকাশ

সর্বপ্রথম কথা, যা মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর ভাষায়:

একথা সত্য যে, ঔপনিবেশিক শাসন ও বৃহৎ শক্তিবর্গের কূটনৈতিক শঠতার ফলে ইসলামী উম্মাহ আজ বিভিন্ন বর্ণের জাতীয়তাবাদের অভিশাপের শিকার হয়ে পড়েছে। হজ্ব হচ্ছে সেই খণ্ডিত, কৃত্রিম ও অভিশপ্ত জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজনীন মহান ইসলামী জাতীয়তাবাদের বিজয়-উৎসব। এখানে এসে একাকার হয়ে যায় বিশ্বের শত কোটি তাওহীদবাদী মুসলমান। মুছে যায় ভাষা ও বর্ণের সব ব্যবধান। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় মানুষের হাতে গড়া ভৌগোলিক সীমারেখার বিভেদ-প্রাচীর; স্ব স্ব জাতীয় পোশাক ও পরিচয়, এত দিন যা ছিল তাদের একান্ত গর্বের, একান্ত আপনার, ত্যাগ করে তারা অঙ্গে ধারণ করে ইহরাম নামের স্বেতশুভ্র একক ইসলামী জাতীয় পোশাক। চোখের পানিতে, আবেগের উচ্ছ্বাসে ও

হৃদয়ের ভাষায় যে কোনো তফাৎ নেই তার বাস্তব প্রমাণ মেলে তালবিয়ায়। একই ভাষায়, একই সুরে, একই তালে লক্ষ লক্ষ হাজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হজ্ব-সংগীতের মিষ্টি মধুর সুরমূর্ছনায়— **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ**

হে প্রভু! আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার কোনো শরীক নেই। আমি হাজির। তোমারই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত। তোমারই বাদশাহী। তোমার কোনো শরীক নেই।

এখানে আমীর-গরীব ও বান্দা-মনিবের কোনো তফাৎ নেই। নেই ছোট-বড়র কোন ভেদাভেদ, নেই শাসিতের হীনম্মন্যতা ও শাসকের প্রভুত্বসুলভ অহঙ্কার। ইহরামের শ্বেতশুভ্র পোশাকে ও লক্ষ কণ্ঠের ভাবগম্ভীর লাব্বাইকা ধ্বনিতে সবকিছু ছাপিয়ে ভেসে উঠে সর্বজনীন ইসলামী বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। হজ্বের প্রতিটি আহকামে, প্রতিটি গতিবিধিতে সেই একই দৃশ্য জুড়িয়ে দেবে আপনার হৃদয়প্রাণ। ভেসে গুঁড়িয়ে দেবে ভাষা, বর্ণ ও রক্ত-কৌলিন্যের মিথ্যা অভিমান। এখানে এসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে দূর-নিকটের সাদা-কালো মুসলমান। বুকে বুক মিলিয়েছে আরব-আজমের আদম সন্তান। একসাথে তারা দৌড়াচ্ছে সাফা-মারওয়ার মাঝে, চলেছে মিনা-আরাফার পথে। অশ্রুসিক্ত চোখে, কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে দু'হাত তুলে মুনাজাত করছে জাবালে রহমতের পাদদেশে। মুয়দালিফার খোলা আকাশের নিচে, নরম বালুর বিছানায় একসাথে কাটছে সবার রাত। বিশ্ব-মানবতার মিলন-ঐক্যের সে কী অপূর্ব প্রকাশ!

فَإِذَا افْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ.

“অতপর যখন তোমরা দলে দলে আরাফা থেকে ফিরবে তখন মাশআরে হারামের নিকট আল্লাহর যিকির করবে এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে তাঁর যিকির করবে। এর আগে নিশ্চয়ই তোমরা অজ্ঞ ছিলে।” —সূরা বাকারা ১৯৮

অভিন্ন সবার গতি ও অবস্থান : একসাথে চলা, একসাথে থামা এবং একসাথে মক্কায় ফিরে আসা।

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

“হ্যাঁ, তোমরা ঠিক ততদূর গিয়ে ফিরে আসবে যতদূর অন্যরা যায় এবং আল্লাহর কাছে তোমরা মাগফিরাত কামনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।”

পৃথিবীতে হজ্ব ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কোনো জাতীয়তাবাদী আহ্বান ও অনৈসলামী শ্লোগান হাজারো ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ইসলামী উম্মাহকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারবে না কিছুতেই। স্বদেশপ্রেম তাদের যত গভীর হোক, জন্মভূমির আলো-বাতাস যত প্রিয়ই হোক, পৃথিবীর কোনো শক্তিরই সাধ্য নেই তাদের কা'বাকেন্দ্রিক জীবনের এই পরিক্রমাকে ভিন্ন কোনো কেন্দ্রবিন্দুতে আবর্তিত করার। কিয়ামত পর্যন্ত বাইতুল্লাহই থাকবে ইসলামী উম্মাহর প্রাণপ্রিয় কিবলা। কিবলামুখী হয়েই প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে পৃথিবীর শত কোটি তাওহীদবাদী মুসলমান। হজ্ব-মৌসুমে এখানেই তারা ছুটে আসবে প্রেমদগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা মেটাতে।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.

“আর (সে সময়ের কথা স্মরণ করুন-) যখন পবিত্র কাবা ঘরকে আমি মানুষের জন্য আশ্রয় ও নিরাপত্তার কেন্দ্র নির্ধারণ করেছি। আর মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে নির্বাচন করে নাও।” -সূরা বাকারা ১২৫

[আরকানে আরবাবা (মূল) পৃ. ৩২৫-৩২৭, অনুবাদ : মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ পৃ. ২৯২-২৯৪]

বিদায় হজ্বের খুতবায় ইতিহাদের দাওয়াত

দ্বিতীয় কথা এই যে, হজ্বের সকল আরকান ও আহকাম ইতিহাদের শিক্ষায় পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা উম্মতের সামনে আরাফার ময়দানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَلَا إِنَّ رِبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجْمِيٍّ وَلَا لِعَجْمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى. أَبْلَغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“হে লোকসকল! জেনে রেখো, তোমাদের ‘রব’ একজন এবং তোমাদের ‘আব’ (পিতা)ও একজন। জেনে রেখো, অনারবের উপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং আরবের উপরও অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর উপর সাদার এবং সাদার উপরও কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি তাকওয়া। আমি কি তোমাদেরকে পৌছে দিয়েছি? তারা বললেন, আল্লাহর রাসূল পৌছে দিয়েছেন।” -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৩৪৮৯

আরো বলেছেন-

هذا يومٌ حرامٌ ...

“আজকের এই দিবস মহিমান্বিত। এই ভূখণ্ড মহিমান্বিত। তোমাদের প্রত্যেকের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু অন্যের জন্য এই দিবস ও ভূখণ্ডের মতোই সম্মানিত। তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত। ...

আমি কি তোমাদেরকে বলব, মুসলিম কে? মুসলিম ওই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে। তেমনি মুমিন ওই ব্যক্তি, যার কাছে সকল মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা থাকে। মুহাজির ওই ব্যক্তি, যে গোনাহ ও পাপাচার ত্যাগ করে আর মুজাহিদ ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আদেশ পালনার্থে নিজের প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে।” -মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৩৭৫২

এর আগে ফত্বে মক্কার সময় মসজিদে হারামের খোলা মজমায় এলান করেছিলেন-

يا أيُّها النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ حِمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعْظُمُهَا بِأَبَائِهَا فَالنَّاسُ رَجُلَانِ رَجُلٌ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرَجُلٌ فَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

“হে লোকসকল! আল্লাহ তাআলা বাতিল করে দিয়েছেন জাহেলিয়াতের গোঁড়ামি এবং বাপদাদার নামে সম্মানবোধকে। এখন মানুষ দুভাবে বিভক্ত-নেককার-পরহেযগার, যে আল্লাহর কাছে প্রিয় ও সম্মানিত। আর বদকার-বদবখত, যে আল্লাহর কাছে তুচ্ছ ও ধিকৃত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যেন একে অপরকে চিনতে পার। নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন ...।” -তায়ফসীরে ইবনে আবী হাতিম, হাদীস ১৮৬২২; তায়ফসীরে ইবনে কাছীর ৪/২২৯

সেই সময় বা অন্য সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন-

النَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمَ مِنْ تَرَابٍ لِيُنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ فَخَرَهُمْ بِرَجَالٍ أَوْ
لِيَكُونَنَّ أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْجَعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتْنَ.

“সকল মানুষ আদমের সন্তান আর আদম সৃজিত মাটি থেকে। সকল কণ্ঠ যেন পূর্বপুরুষদের নিয়ে অহংকার করা থেকে বিরত হয় নতুবা আল্লাহর কাছে তারা হবে ওই কীটের চেয়েও হীন, যা নাক দ্বারা গান্ধেগী দূর করে।” -মুসনাদে আহমাদ ২/৩৬১, হাদীস ৮৭৩৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০১৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৯৫৫, ৩৯৫৬

এই অমর ঘোষণায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎখাত করেছেন সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা এবং ইত্তিহাদ-বিরোধী সকল চিন্তা-ভাবনা। আর কুরআন মজীদে উদ্ধৃতিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, মর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড হল তাকওয়া।

তাকওয়া এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা তাওয়াযু ও বিনয় সৃষ্টি করে এবং কিব্র ও অহঙ্কার দূর করে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, বিবাদ-বিভক্তির মূলে হল কিব্র ও অহঙ্কার। পক্ষান্তরে ইত্তিহাদ-ঐক্যের সবচেয়ে বড় সহায়ক হল তাওয়াযু ও বিনয়।

প্রীতি ও অনুরাগ মুমিনের স্বভাবধর্ম

মুমিন তার হৃদয়ে ধারণ করে প্রীতি ও বন্ধুত্ব। কারণ ঝগড়া-বিবাদের মূল কারণ হাসাদ, কিব্র ও নিফাক। মুমিনের অন্তর তো এসব থেকে পাকসাঁফ থাকবে। এটাই তার মুমিন নামের ও ঈমানী ছিফাতের দাবি। কারণ ঈমান ও নিফাক তো কখনো একত্র হতে পারে না। আর ভেতর যখন পাকসাঁফ তখন বাইরে কেন থাকবে ঝগড়া-বিবাদ?

সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা.) বর্ণনা করেন—

الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُوْلَفُ.

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন সকলের আপন। পক্ষান্তরে ওই ব্যক্তি কল্যাণ-বঞ্চিত যে আপন হয় না এবং যাকে আপন বানানোও যায় না।” -মুসনাদে আহমাদ ২/৪০০, হাদীস ৯১৯৮

হাদীসের কিতাব থেকে বোঝা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বিভিন্নভাবে বলেছেন এবং বারবার বলেছেন। এজন্য আরো কয়েকজন

সাহাবী থেকেও কাছাকাছি শব্দে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, মুসনাদে আহমদ ১৫/১০৬-১০৭, ৩৭/৪৯২-৪৯৩

কাযী ইয়ায (রহ.) বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের আলোকে যথার্থই বলেছেন যে-
الألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شامل للإسلام.

“মহব্বত ও অনুরাগ হল দ্বীন-শরীয়তের অন্যতম ফরয রোকন। এর দ্বারাই ইসলামের সকল অংশকে সমন্বিত করা যায়।” -ইকমালুল মুলিম শরহ সহীহ মুসলিম ১/২৭৬; শরহে মুসলিম, নববী ২/১১

সহীহ বুখারী (৪৮১) ও সহীহ মুসলিম (২৫৮৫)এ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি খুবই প্রসিদ্ধ-

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنِيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

“মুমিনগণ যেন একটি দেয়াল, যার একাংশ অন্য অংশকে শক্তি যোগায়। এরপর তিনি দু হাতের আঙ্গুল একে অপরের মাঝে প্রবেশ করালেন।”

নুমান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে-

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى.

“প্রীতি ও সহানুভূতিতে সকল মুমিন যেন এক দেহ, যার এক অঙ্গে ব্যথা হলে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে।” -সহীহ মুসলিম ২৫৮৬

بِتَلَايَ دُرِّ كُوْنِيْ جِسْمٍ هُوَ رُوْتِيْ هِيَ آ نَكْهٌ ☆ كَسْ قَدْرٍ هُمُ دُرِّ سَارِيْ جِسْمِيْ كِيْ هُوْتِيْ هِيَ آ نَكْهٌ.

“দেহের বেদনায় চোখের অশ্রু ঝরে। দেখ বন্ধু, চোখ দেহের কত আপন।”

হজ্জের সফরে প্রীতি ও মহব্বত অতি প্রয়োজন

হজ্জের সফরে কথায় ও কাজে মহব্বতের প্রকাশ খুব জরুরি। কারণ হজ্জ একটি ইবাদত, আর ইবাদতের হালতে আল্লাহর বান্দাদের ভাই ভাই হয়ে থাকা অপরিহার্য। তাছাড়া এই সফরটিই এমন যে, বিভিন্ন কারণে ঝগড়া-বিবাদে পরিণতি তৈরি হতে পারে। এজন্য আল্লাহ তাআলা সাবধান করে বলেছেন-

الْحَجُّ اشْهَرُ مَعْلُومَتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ.

“হজ্জের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস আছে। যে ব্যক্তি সেসব মাসে (ইহরাম বেঁধে) নিজের উপর হজ্জ অবধারিত করে নেয় সে হজ্জের সময় কোনো অশ্লীল কথা বলবে না, কোনো গোনাহ করবে না এবং ঝগড়াও করবে না।” –সূরা বাকারা ১৯৭

এই আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হজ্জের সফরে ঝগড়া-বিবাদ যেন নামাযে নিয়ত বেঁধে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া।

অপ্রীতিকর আচরণের মৌলিক কারণ

এ ধরনের আচরণ কেন প্রকাশিত হয় সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে মৌলিক কারণগুলো চিহ্নিত করা উচিত। এরপর তা সংশোধন করা এবং হজ্জের হাকীকত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিচয় দেওয়া কর্তব্য। নিম্নে কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

১. স্বভাবের বিপরীত কোনো কিছু সহ্য হয় না

অনেক সময় গীবত-শেকায়েত ও ঝগড়া-বিবাদ শুধু এজন্য হয়ে থাকে যে, নিজ স্বভাবের বিপরীত কোনো কিছু সহ্য হয় না। অথচ আল্লাহ তাআলা মানুষের ভাষা ও বর্ণের মতো রুচি ও স্বভাবও বিভিন্ন রকম বানিয়েছেন। এক ঘরের দুই ব্যক্তির স্বভাব একরকম হয় না। তাহলে যেখানে লক্ষ লোকের সমাবেশ সেখানে তা কীভাবে আশা করা যায়?

শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয নয় এমন কোনো বিষয়ের উপর শুধু আমার কাছে ভালো লাগে না বলে আপত্তি করার অধিকার আমার নেই। তাহলে এ কারণে গীবত-শেকায়েত ও ঝগড়া-বিবাদের তো প্রশ্নই আসে না। চিন্তা করা দরকার, যেসব কাজ সাধারণভাবে ও সবসময় নাজায়েয তা বিনা কারণে ও হজ্জের সফরে কেমন নাজায়েয হবে?

নফসকে বোঝানো উচিত যে, স্বভাবের প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি করে আল্লাহ তাআলা আমাদের পরীক্ষা করছেন। আল্লাহ তাআলা হালীম, তিনি হিলম ও সহনশীলতা পছন্দ করেন। বান্দা যখন সবর করে এবং সহনশীলতার পরিচয় দেয় তখন আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। আর আমাদের সফরের উদ্দেশ্যই তো নফসের তরবিয়াত ও আল্লাহর রেযামন্দি।

যে নবীয়ে পাকের উম্মত আমরা তাঁর আখলাক দেখুন! আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, “আমি দশ বছর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

খেদমতে ছিলাম (বলাবাহুল্য, সকল কাজ তাঁর মানশা মোতাবেক হত না) কিন্তু কখনো তিনি 'উফ' শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। তেমনি একথাও বলেননি যে, এটা কেন করেছ? বা এটা কেন করনি? ঘরের কেউ কিছু বলতে চাইলে তিনি বাধা দিয়ে বলতেন, বাদ দাও, যা হওয়ার ছিল, হয়েছে।" -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৭৬৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩০৯; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১১৯৮৮, ১৩০২১, ১৩০৩৪

২. সফরসঙ্গীদের বে-উসুলী বা না-মুনাসিব আচরণে অধৈর্য হওয়া

আল্লাহ তাআলা সবাইকে আকল-বুদ্ধি সমান দেননি। তেমনি ভালো পরিবেশে লালিত-পালিত হওয়ার সুযোগও সবার হয়নি। আদাবুল মুআশারা সম্পর্কে সহীহ সমঝ আমাদের কয়জনের আছে? আদব-আখলাকের তরবিয়াতইবা কয়জন হাসিল করেছি? আর সমঝদার ও আকলমন্দ মানুষেরও তো ভুল-ত্রুটি হয় তাহলে যেখানে অসংখ্য লোকের সমাবেশ, যাদের অধিকাংশই নতুন, সেখানে তো বুঝে না-বুঝে ভুল-ত্রুটি হতেই পারে এবং তাকলীফের কারণও ঘটতে পারে। এই জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকা চাই।

প্রত্যেক সাথীর চেষ্টা করা উচিত, আমার দ্বারা যেন কারো তাকলীফ না হয়, অনিচ্ছায় কখনো কিছু হয়ে গেলে সাথে সাথে মার্ফ চেয়ে নেব এবং যথাসম্ভব তা পূরণ করার চেষ্টা করব। পক্ষান্তরে অন্য কারো কথা বা কাজে কষ্ট পেলে উত্তেজিত হব না; বরং সবর করব এবং মনে মনে বলব, আল্লাহ যা চান তা-ই হয়, আল্লাহ যা চান না তা হয় না। কোনো সাথী যদি বেশি অনভিজ্ঞ বা বেশি বেপরোয়া হয় তাহলে কাফেলার আমীর তাকে হেকমতের সাথে বোঝাবেন এবং যা কিছু বলার নরমির সাথে বলবেন। কারো না-মুনাসিব আচরণের সংশোধন না-মুনাসিব তরীকায় হওয়া উচিত নয়। নরমি ও হেকমতের সাথে হওয়া উচিত।

আমরা তো ওই নবীর উম্মত, যিনি আ'রাবী ও বুদ্ধদের সকল না-মুনাসিব আচরণ হাসিমুখে সহ্য করতেন। তরবিয়াতের প্রয়োজন হলে এমনভাবে করতেন যে, কওমের কাছে ফিরে গিয়ে বলত, এমন উস্তাদ জীবনে কখনো দেখিনি।

আমাদের সাথীদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে নামায়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে, কিংবা মসজিদে পেশাব করে? দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এমন কাজেও ছুঁত ও কঠোরতার এজায়ত দেননি।

যে আ'রাবী নামায়ে কথা বলেছিলেন তার সাক্ষ্য এই যে—

فَبَابِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا قَهَرْنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي . قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يَضِلُّحُ

فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْوِيْنُ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ.

“আমার পিতা-মাতা তাঁর উপর কুরবান হোক! তাঁর চেয়ে উত্তমরূপে শিক্ষাদানকারী কোনো শিক্ষক আমি কখনো দেখিনি। খোদার কসম! তিনি আমাকে ধমক দেননি, প্রহার করেননি, এমনকি কোনো কটুকথাও বলেননি। তিনি শুধু বলেছেন, এই যে নামায, এতে সাধারণ কথাবার্তা বলা যায় না। এ তো শুধু তাসবীহ, তাকবীর ও কিরাআতুল কুরআন।” -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৩৭, বাব তাহরীমিল কালামি ফিস সালাহ ...; মুসনাদে আহমদ ৫/৪৪৮

তেমনি যে লোক মসজিদে পেশাব করে দিয়েছিল যখন তার দ্বীনের বুঝ হল তখন তিনি নিজের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন-

فَقَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤْنَبْنِي وَلَمْ يَسْبَنِي
وَقَالَ: إِنَّمَا هَذَا الْمَسْجِدُ لَذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَلَا يُبَالُ فِيهِ.

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন। কোনো ধমক দিলেন না এবং কটুকথা বললেন না। শুধু বললেন, এই মসজিদ তো বানানো হয়েছে আল্লাহর যিকির ও নামাযের জন্য, এখানে পেশাব করা যায় না।” -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১৪০২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৫২৯

অবশ্যই সকল সাথীকে সতর্ক হয়ে চলা উচিত, যেন আমার কোনো আচরণে অন্য কারো কষ্ট না হয় এবং আমার কোনো কথার দ্বারা-খোদা নাখাস্তা-ঝগড়া-বিবাদ শুরু না হয়। কিন্তু এরপরও সকল সতর্কতা সত্ত্বেও আমার নিজেরও তো ভুলত্রুটি হতে পারে। তাই অন্যের না-মুনাসিব আচরণের ক্ষেত্রে সীরাতে নবীর অনুসরণ ছাড়া ইজতিমায়ী যিন্দেগী, বিশেষত এ ধরনের সফর শান্তিপূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

৩। সৌদি সরকারের অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার কারণে বিরক্তি

সৌদি সরকার ইসলামী সরকার নয়। আর যে উপাধী- ‘খাদিমুল হারামাইনিশ শারীফাইন’ তারা নিজেদের জন্য গ্রহণ করেছে তার দাবিও তাদের দ্বারা পূরণ হয় না। কিন্তু অতি না-শোকরি হবে যদি আমরা তাদের বিভিন্ন রকমের খেদমত ও অন্যান্য গুণাবলি স্বীকার না করি। নিঃসন্দেহে বহু জায়গায় তাদের অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা চোখে পড়ে, কিন্তু প্রথম কথা হল, দোষ না দেখে গুণ দেখার

দ্বারা শোকরের তাওফীক হয়, আর এটাই ইজতিমায়ী যিন্দেগীর নিয়ম ও উসূল। এখানেও এই উসূল মোতাবেক আমল করা চাই। তা না হলে গীবত-শেকায়েত ও ঝগড়া-বিবাদ ছাড়া কোনো লাভ হবে না। যদি গঠনমূলক কোনো পরামর্শের ইচ্ছা থাকে তাহলে সঙ্গী-সাথীদের সাথে সমালোচনা না করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ ও পরামর্শ পৌঁছে দেই। মসজিদে হারামের বারান্দায় লেখা আছে যে, কারো কোনো অভিযোগ থাকলে অমুক নম্বরে ফ্যাক্স করে জানিয়ে দিন।

এটা তো হল নিয়মের কথা, কিন্তু আহলে দিল মানুষের নজর তো অনেক সূক্ষ্ম ও গভীর হয়ে থাকে। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিই ভিন্ন। একজন হাজী সাহেবকে তার বিভিন্ন অভিযোগের জবাবে মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম শুধু একটি বাক্যই বলেছিলেন, মাশাআল্লাহ ওই হাজী সাহেব এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের উপর এর ভালো আছর হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, “ভাই আপনি কি সৌদি-সরকারের মেহমান, না আল্লাহর মেহমান?”

অর্থাৎ আপনি যদি সরকারের মেহমান হয়ে থাকেন তাহলে সমালোচনা করতে থাকুন! আর যদি আল্লাহর মেহমান হয়ে থাকেন তাহলে বোঝা উচিত যে, হাজীগণ শুধু আল্লাহর মেহমানই নন, আর আল্লাহও শুধু মেয়বান নন, তিনি আমাদের রব আমরা তাঁর বান্দা। তাই আমাদের ঈমানী তরবিয়াতের জন্য তাঁর মেহমানদারীর বিভিন্ন ধরন হতে পারে। এই সফরের সকল অবস্থাকে মেহমান নাওয়াযী ও বান্দা-নাওয়াযীর অংশ বলেই মনে করা উচিত। আর বাস্তবেও বিষয়টি এমনই।

এই রায়-রহস্য যদি আমাদের বুঝে এসে যায় তাহলে সর্বহালতে আল্লাহর দিকেই রুজু করব এবং বান্দা-নাওয়াযীর শান ও আনদায় দেখে পুলকিত হব। কারো উপর আমাদের কোনো শেকায়েত ও অভিযোগ থাকবে না।

৪. কাফেলার আমীর ও এজেন্সিওয়ালাদের আচরণে অসন্তুষ্টি

এই অভিযোগ খুব ব্যাপক। তবে একে কেন্দ্র করে মনোমালিন্য ও ঝগড়া-বিবাদের পেছনে অন্য কারণও থাকে। যেমন— (ক) চুক্তি সম্পাদনের সময় পূর্ণ চুক্তি বা তার অংশবিশেষ অস্পষ্ট রেখে দেওয়া।

এটা দু পক্ষের যে কারো থেকেই হতে পারে। আমার মতে অধিকাংশ ঝগড়াঝাটি এই কারণেই হয়। এর সমাধান হল, উভয় পক্ষ চুক্তির সময়ই প্রত্যেকটি বিষয় স্পষ্ট করে চুক্তি সম্পাদন করবে। যদি কোনো বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট রাখা হয় কিংবা বে-খেয়ালির কারণে অস্পষ্ট থেকে যায় আর পরবর্তী সময়ে কারো চাহিদার বিপরীত হয় তখন তো সবর ছাড়া উপায় নেই।

(খ) কাফেলার আমীর ও এজেন্সিওয়ালাদের এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়াদি

কিছু বিষয় এমনও থাকে যেখানে কাফেলা তো দূরের কথা, এজেন্সি-ওয়ালাদেরও কিছু করার থাকে না। যেমন- মিনা থেকে মক্কায় পৌঁছানো, মিনায় অবস্থান, মিনা থেকে আরাফায় যাওয়া, আরাফা থেকে মুযদালিফায় আসা এবং মুযদালিফায় অবস্থানের পর দশ তারিখের অন্যান্য আমল। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হওয়ার কারণে এসব ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সমাধানের কোনো সূরত নেই তা নয়, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এসব সমস্যার সমাধান আসলেই আমীর ও এজেন্সিওয়ালাদের এখতিয়ারের বাইরে। কিন্তু দেখা যায়, তাদের সাথে এসব বিষয় নিয়ে ঝগড়া চলতেই থাকে, যা মোটেই উচিত নয়। কারণ এখানে তারাও আমাদের মতোই অসহায়। অতএব এর একমাত্র সমাধান হল সবর ও দুআ।

কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহর বান্দাদের অনেকের মাঝেই এই রোগ আছে, অথচ তাদের পরনেও থাকে ইহরামের লেবাস। আল্লাহ তাদের হেদায়াত দিন। এই সমস্যা সমাধানের সঠিক পন্থা হল, বিনয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে চুক্তির কথা স্বরণ করিয়ে দিন। এরপর নীরব থাকুন। যদি সুন্দর কোনো সমাধান পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহর শোকর, অন্যথায় সবরের পথ তো খোলাই আছে। হজ্ব সবরের এত বড় ক্ষেত্র যে, হাদীস শরীফে হজ্বকে ‘জিহাদ’ পর্যন্ত বলা হয়েছে।

আমি এ কথা বলি না যে, আপনার পাওনা হক ছেড়ে দিন। যদিও এটা সওয়াবের কাজ; কিন্তু সে জন্য তো বড় হিম্মতের প্রয়োজন। আমি শুধু এটুকু বলব, আপনার হকের দাবি সংঘের সাথে করুন এবং মুখ ও মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখুন; অন্যের অজ্ঞতা ও জুলুমের কারণে কি আপনি নীচে নেমে আসবেন? আপনি তো এখন মামুলি মানুষ নন, আপনি আল্লাহর দাওয়াতী মেহমান। সাধারণ কোনো অবস্থাতেও আপনি নেই, আপনি রয়েছেন ইহরামের হালতে। যেন আপনি নামাযে দাঁড়িয়েছেন। আপনি যেনতেন কোনো জায়গায় নয়; বরং মাশআরে হারাম ও পবিত্রতম স্থানে রয়েছেন।

যদি ঝগড়া-বিবাদ করেই হক উসূল করতে হয় তাহলে তো দেশে ফিরেও অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। সময় ও স্থানের মর্যাদা রক্ষা করে, ইহরামের হালতের শরায়ত ও লাক্বাইকা আল্লাহুমা লাক্বাইক-এর সম্মানের দিকে তাকিয়ে এসব ঝগড়া-বিবাদকে মূলতবী করুন। ইনশাআল্লাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। আল্লাহ তাআলা এর কী বিনিময় দেন তা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। দুনিয়াতেও দেখতে পাবেন, আখেরাতেও দেখতে পাবেন।

আল্লাহ তাআলা সূরা যুমার আয়াত ১০-এ ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“ধৈর্যশীলগণ অগণিত প্রতিদান লাভ করবেন।”

৫. মাসায়েলের ইখতিলাফ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হওয়া

আল্লাহ তাআলা মাফ করুন, হজ্বের সফরে এটাও কলহ-বিবাদের বড় কারণ। এ কারণে তর্ক-বিতর্ক থেকে ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত হয়ে যায়। আমাদের হালত থেকে মনে হয় কিব্র ও অহংকার যেন আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। কেউই একথা মানতে প্রস্তুত নই যে, আমার জানাটাও ভুল বা অসম্পূর্ণ হতে পারে। সম্ভবত আমাদের অনেকেরই জানা নেই যে, মাসআলার বহু বিষয় এমন আছে যেখানে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতেই ইমামগণের মাঝে ইখতিলাফ ও মতভেদ হয়েছে। এ কারণে আলাদা দুই মাযহাবের মাঝেই শুধু নয়, এক মাযহাবের আলেমদের মাঝেও ইখতিলাফ হতে পারে। কিছু কিছু বিষয়ে হয়েছেও। দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে হওয়া এই ইখতিলাফ আকীদা-বিশ্বাসের ইখতিলাফ নয়, যাকে নিন্দিত মতভেদ ও মাযমূম ইখতিলাফ বলা যায়। বরং এ ইখতিলাফ শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধু মার্জানীয়ই নয়, স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্যও বটে। এসব ক্ষেত্রেও আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াব পাওয়া যাবে।

আর এমন মাসআলার সংখ্যাও কম নয়, যেগুলোকে মনে করা হয় ইখতিলাফী মাসআলা অথচ বাস্তবে তা নয়; বরং প্রত্যেকটি আলাদা সুন্নত এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রমাণিত। এ বিষয়ে আলকাউসারের পেছনের কয়েক সংখ্যায় ‘সুন্নাহসম্মত নামায : কিছু মৌলিক কথা’ শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে আমি শুধু এটুকু আরজ করব যে, আমরা যদি নিম্নোক্ত নীতি ও উসূলের উপর আমল করি তাহলে ইনশাআল্লাহ মাসআলার কারণে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীতে পড়তে হবে না এবং ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কেরও সম্মুখীন হতে হবে না।

(ক) আমরা যারা সাধারণ মানুষ, যারা কারো নিকট থেকে শুনে বা বাংলা গাইড-নির্দেশিকা জাতীয় পুস্তিকা পড়ে মাসায়েল শিখি, তাদের মনে রাখা উচিত যে, এই শেখাটা প্রাথমিক পর্যায়ের। এর আলোকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমল করা যায়, কিন্তু অন্য কারোর, বিশেষত কোনো আলেমের মোকাবেলা করা যায় না। কারণ আমার জানা অসম্পূর্ণ বা ভুলও হতে পারে। তেমনি মাসআলাটি ইখতিলাফী বা মতভেদপূর্ণও হতে পারে, যার শুধু একটি মত আমি জানি, অন্য ভাই যা

বলছেন তা অন্য কোনো আলেমের মত। এজন্য আমার নীরব থাকা উচিত। এতে দোষের বা অসম্মানের কিছু নেই। আমি সেভাবেই আমল করব যেভাবে আমার বিশ্বস্ত আলেম বলেছেন। কিন্তু এই জানার উপর ভিত্তি করে অন্যের আমলকে ভুল সাব্যস্ত করব না।

আমাদের অবস্থা এমন হওয়া উচিত নয় যে, নিজের শায়খ ছাড়া অন্য কোনো শায়খের কথা, নিজের পছন্দের আলেম ছাড়া অন্য আলেমের ফতোয়া, নিজের ইমাম ছাড়া অন্য ইমামের মাযহাব পছন্দই হয় না। আমি উসূল মোতাবেক কোনো একটি সহীহ তরীকা বেছে নিতে পারি, কিন্তু নিজের বিচার ও নির্বাচনকে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। অন্যের শরীয়তসম্মত হক কেড়ে নেওয়ার অধিকার তো আমার নেই।

(খ) আমরা যারা মাদরাসার একটি ‘নেসাব’ সমাপ্ত করে বের হয়েছি, যাদেরকে পরিভাষায় ‘আলেম’ বলা হয়, তাদেরও মনে রাখা উচিত যে, ইলম এক অথৈ সমুদ্র। প্রত্যেক আলেমের উপর রয়েছে আরো বড় আহলে ইলম-এ তো একটি মুসাল্লাম কায়েদা ও স্বীকৃত নীতি। এজন্য ইখতিলাফী মাসায়েলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে হিলম ও তাহাম্মুল এবং ধৈর্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হবে। আমার মুতালাআর বাইরেও তো কিতাব থাকতে পারে এবং আমার জানাশোনার বাইরেও তো দলীল-প্রমাণ থাকতে পারে।

আর যেসব আহলে ইলম, আল্লাহর রহমতে, দলীল-প্রমাণের পর্যালোচনার যোগ্যতার অধিকারী তাদেরকে তো একথা বলাও প্রয়োজন নেই যে, ইখতিলাফী মাসআলা শুধু একান্ত ও খাস মজলিসে আলোচনা করা যায়, এগুলো সাধারণ ও আম মানুষের মজলিসে আলোচনার বিষয় নয়। তেমনি এগুলো ঝগড়া-বিবাদেও বিষয় হতে পারে না।

(গ) সাধারণ মানুষের জন্য মাসআলা নিয়ে আলেমদের সাথে তর্ক করা কোনোভাবেই উচিত নয়। তেমনি কোনো আলেমেরও উচিত নয়, ইখতিলাফী মাসআলায় অন্য কোনো আলেম বা সাধারণ মানুষের সাথে বাদানুবাদ করা। কারণ এই লোকটিও তো কোনো আলেমের কাছ থেকে মাসআলা জেনেই আমল করছে। হ্যাঁ, যদি জানা যায় যে, ওই ব্যক্তি কোনো আলেমের কাছ থেকে মাসআলা না জেনেই আমল করছে তখন তাকে মাসআলা বলে দিতে অসুবিধা নেই।

(ঘ) যদি একই কাফেলায় কয়েকজন আলেম থাকেন তখন ভালো হয়, পরস্পর মশওয়ারা করে মাসআলা বললে যেন একই কাফেলায় দু ধরনের ফতোয়া

না আসে। এমনও হতে পারে যে, কাফেলার আমীর একজনকে নির্দিষ্ট করে দেবেন, তিনিই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মাসআলা বলবেন।

(ঙ) এক তাঁবুতে কয়েক কাফেলার লোক একত্র হয়ে গেলে প্রথম কর্তব্য হল, কাফেলার সাধারণ লোকজন মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে নিজেদের মতামত পেশ করবে না। এটা ছেড়ে দেবে আলেমদের উপর। আর একই তাঁবুতে ইখতিলাফী মাসআলায় ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণকারী কয়েকজন আলেম একত্র হয়ে গেলে তাঁদের কর্তব্য, বড় আলেমের কথায় একমত হয়ে যাওয়া।

হযরত উসমান (রা.)এর সাথে মিনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)এর ইখতিলাফ হয়ে গেল যে, এখানে নামায চার রাকাত পড়া হবে, না দু রাকাত? ইবনে মাসউদ (রা.)এর সিদ্ধান্ত ছিল দু রাকাত, কিন্তু যখন নামাযের সময় হল তখন তিনি হযরত উসমান (রা.)এর পেছনে চার রাকাত নামায আদায় করলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ‘আলখিলাফু শাররুন’ অর্থাৎ ইখতিলাফী মাসআলার কারণে বিবাদ করা নিন্দনীয়। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৯৫৫

যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে কোনো বাদানুবাদ ছাড়া নীরবে প্রত্যেক আলেম তাঁর কাফেলাকে নিজের মাসলাক মতে আমল করতে বলবেন। এখানে ঝগড়া তো দূরের কথা, নাহি আনিল মুনকারের উসূলও চলবে না। কারণ উম্মতের ইজমা রয়েছে যে, ইখতিলাফী মাসআলা নাহি আনিল মুনকারের ক্ষেত্র নয়।

আজকের অবসরে আমি কয়েকটি মৌলিক ও উসূলী কথা আরজ করেই শেষ করছি। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দেন তাহলে আগামী শাওয়াল ১৪৩২হি. সংখ্যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল। তখন আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাব যে, আজকাল যে সকল মাসআলাকে কেন্দ্র করে হজ্বের সফরে, বিশেষত মিনা ও আরাফায় ঝগড়া-বিবাদের ময়দান গরম করা হয় সেগুলো তো বাহাস-বিতর্কের বিষয়ই নয়।

সর্বশেষ আরজ এই যে, ইলমী আলোচনার জন্য তো গোটা বছরই পড়ে আছে। হজ্বের এই পাঁচদিনেই তা করতে হবে কেন? এ সময়টুকু তো শুধু যিকির-আযকার ও আল্লাহর দিকে রুজুর মাঝেই কাটানো উচিত। লাক্ষাইকের হালত তো আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার হালত। এ অবস্থায় তো সাধারণ আলোচনা থেকেও বিরত থাকা উচিত। তাহলে বহস-বিতর্কের অবকাশ কীভাবে থাকে? আর ঝগড়া-বিবাদের তো প্রশ্নই অবান্তর।#

হজ্জের সফরনামা : কিছু অনুভব-অনুভূতি

الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد

আল্লাহর তাআলার মেহেরবানী যে, হজ্জের বরকতপূর্ণ সফরনামা ‘বাইতুল্লাহর মুসাফির’ ধারাবাহিকভাবে আলকাউসারে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য পাঠকের মতো অধ্যয়ন নিজেও সাধ্য অনুযায়ী তা থেকে ফায়দা লাভের চেষ্টা করেছি এবং ভেবেছি, সফরনামা থেকে আমি যা কিছু পেয়েছি এবং অন্যদের যে অনুভব-অনুভূতির কথা জানতে পেরেছি তা সংক্ষিপ্তভাবে সবার সামনে পেশ করব। অবশেষে সফরনামাটির শুভসমাপ্তির পর এখন কলম নিয়ে বসার তাওফীক হল। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহর।

সফর হচ্ছে অন্যান্য জাতির মাঝে মুসলিম উম্মাহর জাতীয় বৈশিষ্ট্য, বিশেষত আমাদের পূর্ববর্তীগণ এক্ষেত্রে অনেক অগ্রগামী ছিলেন। কেননা, স্বভাব ও প্রয়োজন- এ দুই প্রেরণা ছাড়াও তাঁদের মধ্যে ছিলো ঈমানী প্রেরণা, যা অন্য যে কোন প্রেরণার চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। ‘সীরা ফিল আরদি ফানযুরু’ (সায়র করো যমিনে এবং দেখো কেমন ছিলো পরিণতি তাদের যারা ...) এতো স্বয়ং আলকোরআনের নির্দেশ। তাই মুসলিম উম্মাহর উল্লেখযোগ্য ইতিহাস হচ্ছে শুধু সফরের ইতিহাস, কখনো হিজরতের জন্য, কখনো জিহাদের জন্য, কখনো ইলমের জন্য, কখনো দাওয়াতের জন্য। স্থান ও সময়ের আয়তনে সেসব সফর হতো এত দীর্ঘ এবং এত কষ্টপূর্ণ যার নথির অন্য জাতির ইতিহাসে খুব একটা নেই। এর মাঝে আবার রয়েছে স্বতন্ত্র ও মৌলিক ইবাদত হিসাবে হজ্জের দীর্ঘ দীর্ঘ সফর, যার কথা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘য়া’তুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন ‘আমীক্ক’ এই শিরোনামে। সুতরাং সফরের ব্যাপ্তিতে ও প্রাপ্তিতে কোন জাতি মুসলিম উম্মাহর সমকক্ষ বা কাছাকাছি হতে পারে কীভাবে!

একথা সত্য যে, স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে ওই সব সফরের ইতিহাস ও বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়নি, তবে একথাও সত্য, ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থের বিশাল ভাণ্ডারে

ছড়িয়ে থাকা আমাদের পূর্ববর্তীদের সফরের ঘটনাগুলো যদি সংকলন করা হয় তবে শতখণ্ডের বিশাল বিশ্বকোষ তৈরি হতে পারে।

‘আররিহলা’ বা ‘সফরনামা’ শিরোনামে বিভিন্ন ভাষায় এ পর্যন্ত যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, অতিশয়োক্তি ছাড়াই বলা যায়, তা হাজারের ঘর পার হয়ে গেছে বহু আগে। শুধু হজ্জের সফরনামা এবং আল্লাহর ঘরের মুসাফিরদের সফরের বিবরণই রয়েছে শত শত।

সফরনামা হচ্ছে সমসাময়িক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলীল, যাতে সংরক্ষিত রয়েছে যুগ ও জাতি এবং সময় ও সমাজের বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তাতে যেমন রয়েছে দ্বীনী ও ইলমী বহু প্রসঙ্গ তেমনি রয়েছে সামাজিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রসঙ্গ।

জীবনী ও ভ্রমণকাহিনী বাহ্যদর্শীদের নিকট হতে পারে শুধু ইতিহাসের বিষয়, কিন্তু অন্তর্দর্শীদের নিকট তা আরো গভীর তাৎপর্য বহন করে। তারা এখান থেকে গ্রহণ করেন আদব ও আখলাকের পুঁজি এবং কলব ও রুহের গিয়া।

জোনায়েদ বাগদাদী (রহ.) বলেন—

الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أولياءه.

“ঘটনাবলি হচ্ছে আল্লাহর সৈনিক, যার দ্বারা আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের অন্তরকে সুসংহত করেন।”

এ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন—

وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَثَبْتَ بِهِ فُؤَادَكَ

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন—

الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنه آداب القوم

وأخلاقهم.

“আলেমদের বৈশিষ্ট্য ও কর্ম-কীর্তির আলোচনা আমার কাছে বহু ফিকহী আলোচনার চেয়েও প্রিয়। কেননা তাতে রয়েছে সালাফের জীবন-সৌন্দর্য ও চরিত্র-মাধুর্য।”

এর স্বপক্ষে তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন—

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ.

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই হযরতুল উস্তায শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ (রহ.) (১৩৩৬-১৪২০হি.) নীচের রিসালাহগুলো রচনা করেছেন—

(ক) ‘রিসালাতুল মুস্তারশিদীন’-এর ভূমিকায় তাঁদের অনেক বাণী বরাতসহ উল্লেখ করেছেন। (খ) ‘ছাফাহাত মিন ছাবরিল উলামা, আলা শাদাইদিল ইলমি ওয়াত তাহসীল’, (গ) ‘কীমাতুয যামান ‘ইনদাল উলামা’ এবং (ঘ) ‘নামাযিজু মিন রাসাইলিল আইম্মিতি ওয়া আদাবিহিমুল ইলমী’।

উদ্যমী ব্যক্তিদের জন্য এ বিষয়ে করার মতো কাজ এখনও অনেক রয়েছে।

মোটকথা, জীবনী ও সফরনামার সফল গ্রন্থসমগ্র তথ্য ও ইতিহাসের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে রয়েছে জীবন গঠনের উপাদান ও দিকনির্দেশনা। সচেতন মানুষ তা থেকে সমষ্টিগত জীবনের নিয়মনীতি, চিন্তার বিশুদ্ধতা, আত্মার পরিশুদ্ধি ও হৃদয়ের উত্তাপ গ্রহণ করতে পারেন। আর এসকল উপাদান সবচে’ বেশি পাওয়া যায় বাইতুল্লাহর মুসাফিরদের হজ্জের সফরনামায়। বিশেষত সেই মুসাফির যদি হন যিন্দা কলব ও যিন্দা কলমের অধিকারী তাহলে তো তা অতি উদাসীনকেও জাগিয়ে তোলে। তখন তাদের মৃত হৃদয়েও জাগে জীবনের স্পন্দন এবং প্রাণের উত্তাপ বহু বছরের শুকনো চোখও তখন সিক্ত হয় অশ্রুর উষ্ণ স্পর্শে।

বাইতুল্লাহর মুসাফির নামে আলকাউসারে প্রকাশিত সফরনামাটি যে উপরোক্ত সকল বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল তা মোটেই বলার অপেক্ষা রাখে না। পাঠকমাত্রই তা অনুভব করেছেন এবং আপ্ত হয়েছেন। তবে একটি বিষয়ের মাধ্যমে আমি আমার ভিতরের অনুভব প্রকাশ করতে পারি। হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.) মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.)এর ‘সফরে হিজায’ সম্পর্কে লিখেছেন—

“আমার দৃষ্টিতে এ সফরনামার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য দুটি, প্রথমত ভাষার সরল-সৌন্দর্যের সর্বোত্তম প্রকাশ। সহজ শব্দ ও নির্জটিল বাক্য; সেই সাথে উপমা ও কল্পনার কাব্যিকতা। তাই সাহিত্যগত দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

দ্বিতীয়ত ভাব ও ভাবনা এবং আবেগ ও অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। যেন ‘ছাহিবে দিল’ লেখক তার দিলের সবটুকু দরদ কিতাবের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। এটাকে আমি ‘সফরে হিজাযে’রই বরকত মনে করি যে, কলম এখানে কলবের তরজুম্যানি করেছে এবং তাঁর আত্মার আকুতি ভাষার অবয়বে এমনই মূর্ত হয়ে উঠেছে যে, যা কিছু সুপ্ত ও গুপ্ত তাও যেন এখানে সুপ্রকাশিত এবং যা কিছু অদৃশ্য তাও যেন এখানে দৃশ্যমান ...

এ সফরনামার মাধ্যমে তিনি ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস এবং তায়কিয়া ও ইহসান সকল বিষয়েই তার কলমের দান ও অবদান সকলের জন্য অব্যাহত করেছেন। ভেতর ও বাইরের, শব্দ ও মর্মের, ভাষা ও ভাবের এবং দেহ ও আত্মার বিভিন্ন বিষয় এমনই অপূর্ব কুশলতার সাথে তিনি পরিবেশন করেছেন যে, রুচি ও চিন্তার বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকলেই তা থেকে উপকৃত হতে পারবেন।”

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) লিখেছেন—

“যদুর মনে পড়ে, এটি ছিল মাওলানার প্রথম গ্রন্থ, যা আমি অত্যন্ত শওকের সাথে আগাগোড়া পড়েছি এবং একদিকে যেমন তার সাহিত্য-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি তেমনি অন্যদিকে হৃদয়ের গভীরে ভাবের তরঙ্গে আন্দোলিত হয়েছি।”

হযরত দরয়াবাদীর ‘সফরে হিজায়’ সম্পর্কে স্বয়ং আদীব হযুর তাঁর সফরনামায় লিখেছেন—

“এ কিতাব নিছক কোন সফরনামা ছিলো না, ছিলো আল্লাহর ঘরে আল্লাহর এক প্রেমিক বান্দার জীবন্ত সফর, জীবন্ত হজ্ব এবং জীবন্ত যিয়ারত। অবশ্যই এ কিতাব ছিলো একটি জাদু, তবে অন্যদের মত আমি বলবো না, কলমের জাদু। এটি ছিলো প্রেম ও ভালোবাসার জাদু এবং ইশক ও মুহাব্বাতের কারিশমা। এটি ছিলো ভাব ও আবেগের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস এবং হৃদয় ও আত্মার আলোক-উদ্ভাস। কলম শুধু কালি ঝরিয়েছে এবং আলো ছড়িয়েছে, আর হৃদয় থেকে হৃদয় সে আলো গ্রহণ করেছে, আল্লাহ যাকে যদুর তাওফীক দান করেছেন। হযরত আলী নদভী (রহ.) তাঁর জীবনের প্রথম হজ্বের সফরে এ সফরনামা সঙ্গে রেখেছিলেন ভাব ও আবেগের উত্তাপে হৃদয়কে উত্তপ্ত এবং ইশক ও মুহাব্বাতের তড়পে কলবকে বে-তাব রাখার জন্য।”

হযরত দরয়াবাদীর সফরে হিজায় সম্পর্কে উপরে যে তিনটি মন্তব্য উল্লেখ করা হলো তা ‘বাইতুল্লাহর মুসাফির’ সম্পর্কেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পার্থক্য এই যে, যুগের অবক্ষয়ের কারণে ‘সফরে হিজায়ে’র মতো ‘সমঝদার ও দিলদার’ পাঠক পাওয়া এখন কঠিন। আমার নিজের না আছে ভাব, না আছে ভাষা, তাই বাইতুল্লাহর মুসাফির সম্পর্কে নিজের অনুভব-অনুভূতি প্রকাশের জন্য উপরের তিনটি মন্তব্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। তবে একজন বিদগ্ধ লেখক ও আলেম আমাকে বলেছেন, “এ সফরনামায় ‘আদবিয়াত’ ও ‘রুহানিয়াতের’ অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে।”

একজন আদনা পাঠক হিসাবে আমার মনে হয়, আলোচ্য সফরনামার রুহানিয়াতের একটি স্পষ্ট আলামত এই যে, এর প্রতিটি বাক্য অন্তরে রেখাপাত

করে এবং চোখকে অশ্রুসজল করে, যেন ‘হার চে আয দিল খীযাদ বর দিল রীযাদ’এর রৌশন মেছাল। কিতাবের সাহিত্যমান সম্পর্কে সাহিত্যের লোকেরাই ভালো বলতে পারবেন এবং ইতিমধ্যে তারা এর উচ্চ প্রশংসাও করেছেন। ভিন্ন ধারার একাধিক লেখকের প্রশংসা আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি। বেশ কজন লেখক-সাহিত্যিক মন্তব্য করেছেন, “এর দ্বারা সফরনামা বিষয়ে বাংলাভাষার একটি শূন্যতা পূরণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলার শোকর, এই শূন্যতা একজন আলেমের কলম দ্বারা পূরণ হয়েছে, যখন সাধারণভাবে আলেমদেরকে এ অঙ্গনে নিতান্ত অপরিচিত মনে করা হয়।”

এটা তো হচ্ছে ভাষা ও সাহিত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুভূতি। আমার নিজের অনুভূতি শুধু এটুকু যে, আমি আরবী ভাষায় ‘মুখতারাত’ শিরোনামে বেশ কিছু গ্রন্থ দেখেছি। সে হিসাবে আমার মনে হয়, কেউ যদি শুধু এই সফরনামা থেকে উত্তম সাহিত্যের নমুনা চয়ন করতে চায় তবে এখান থেকেই বাংলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ‘চয়নিকা’ হতে পারে।

‘বাইতুল্লাহর মুসাফির’ গ্রন্থটিতে সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতার যে শুভসম্মিলনের কথা উপরে বলা হয়েছে তার মূল রহস্য এই যে, এর লেখকের মাঝেও কলম ও কলবের উত্তম সম্মিলন ঘটেছে। তিনি নিজেই কোন এক প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“কলমের যা কিছু দান তা রাব্বুল কলমের ইহসান। কারণ মানুষকে তিনি শিক্ষা দান করেছেন কলমের মাধ্যমে। সুতরাং কলমের দান পেতে হলে তোমাকে যেতে হবে রাব্বুল কলমের দুয়ারে এবং চাইতে হবে দুহাত পেতে। শোনো বন্ধু! তুমি যদি শুধু কলম চালনা করো তাহলে কলম তোমাকে পরিচালনা করবে, কখনো এদিকে, কখনো সেদিকে; কখনো ঠিক পথে, কখনো ভুল পথে। কলমের অনুশীলনে তুমি শুধু লেখক হতে পারো, সাহিত্যের সাধক হতে পারো না। এ জন্য প্রয়োজন কলমের সঙ্গে কলবের বন্ধন। কলম ও কলব, এ দুয়ের শুভ মিলনেরই নাম সাহিত্যের সাধনা। তুমি যদি হতে পারো এ দুয়ের মিলনক্ষেত্র তাহলে তুমি পেয়ে গেলে মহাসত্যের আলোক-রেখা। তোমাকে করতে হবে না আর পথের সন্ধান। পথ নিজে ডাকবে তোমাকে। তুমি শুধু চলবে সামনে, আরো সামনে এবং পৌঁছে যাবে আলোর ঝর্ণাধারার নিকটে। তোমার কলম থেকে ঝরবে আলোর শব্দ এবং শব্দের আলো। কারণ লেখা তো কিছু না, শুধু রেখা, তাতে তুমি পাবে না সত্যের দেখা। জীবনসফরে কলমের পথে যদি সত্যের দেখা পেতে চাও তাহলে কলমের আগে রাব্বুল কলমের নৈকট্য অর্জন করো। হৃদয় যদি স্রষ্টার ডাকে সাড়া দিতে পারে, হৃদয় যদি সৃষ্টির সৌন্দর্যের বাণী শ্রবণ করতে পারে, তাহলে তোমার

সামনে পরম সত্যের প্রকাশ এবং সুপ্ত রহস্যের উদ্ভাস ঘটবে। তখন তোমার কলম জীবন্ত হবে, সৃজনশীল হবে। সাহিত্যের সাধনায় তুমি সফল হবে। তোমার সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের এবং শুভ ও কল্যাণের ধারক হবে।”

যিনি সাহিত্যকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন তার রচনার সাহিত্যমান কেমন হবে এবং তাতে আধ্যাত্মিকতা ও হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতির কেমন সম্মিলন ঘটবে তা তো বলাই বাহুল্য।

অন্যান্য প্রসঙ্গ

আমাদের আলোচ্য সফরনামা ‘বাইতুল্লাহর মুসাফির’ সম্পর্কে ‘আদবিয়াত ও রুহানিয়াত’-এর উত্তম সম্মিলনের যে বিরাট বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হলো, সেটা ছাড়াও এতে আরো অনেক মূল্যবান বিষয় রয়েছে।

১. হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)এর হজ্ব ও যিয়ারতের ‘দিলকাশ ও রুহআফযা’ বয়ান। বাহ্যত এটা লেখকের হজ্বসফরনামা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এবং সে সময়ের আরো কয়েকজন আকাবিরের হজ্ব-সফরনামা। হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)এর জীবনী রচনার কাজ এখনো ঠিক তেমনি অবহেলিত যেমন স্বয়ং হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) তাঁর জীবদ্দশায় অবহেলিত ছিলেন। আল্লাহর শোকর, এ সফরনামায় তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছে।

বিশেষভাবে হযরত (রহ.)এর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও প্রকাশিত হয়ে সামনে এসেছে।

২. খেলাফত আন্দোলনের ইতিহাস

হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)এর খেলাফত আন্দোলন বা তাওবার রাজনীতি, যা এ অঞ্চলের ইসলামী দাওয়াত ও রাজনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, তার সঠিক ইতিহাস আজ পর্যন্ত সংকলিত হয়নি। এ সফরনামায় এর কিছু অংশ পেন্সাপট ও কার্যকারণসহ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অতি পরিমিত বাক্যে সংরক্ষিত হয়েছে।

৩. সফরনামায় উল্লেখিত দেশগুলোর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু অংশ, বিশেষত ইরাক ও প্রেসিডেন্ট সাদামের জীবনের কিছু বিস্তৃত অধ্যায় পরিস্ফুটিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি, দল বা দেশ সম্পর্কে যে পর্যবেক্ষণ বা প্রতিক্রিয়া উল্লেখিত হয়েছে সে সম্পর্কে লেখকের রুচি, পর্যবেক্ষণ ও দ্ব্যর্থহীনতা আমার মতে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)এর সাথে তুলনীয়। আর

সেটাই স্বাভাবিক। কেননা, লেখক যে বুয়ুর্গ মনীষীদের চিন্তা ও হৃদয়ের উত্তরাধিকারী তাঁদের মধ্যে হযরত আলী মিয়া (রহ.) রয়েছেন তালিকার প্রথম দিকে।

হযরত আলী মিয়া (রহ.) তাঁর ‘মধ্যপ্রাচ্যের সফরনামা’ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—

“আমি যা দেখেছি, শুনেছি এবং বুঝেছি সে সম্পর্কে আমার চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও অনুভব-অনুভূতি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছি। কোনো অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থতার আশ্রয় গ্রহণ করিনি। কারণ এটা হচ্ছে একজন জীবন্ত মানুষের অনুভব-অনুভূতির চিত্রাঙ্কন, যার বুকে রয়েছে একটি স্পন্দিত হৃদয় এবং যার কিছু নীতি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ রয়েছে; সর্বোপরি এই দেশগুলোর সাথে যার রয়েছে ভালবাসার সম্পর্ক এবং এই ভূখণ্ডের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যার নিজের জীবনেরই অংশ। পরিবারের সদস্যের মতই যে ওই সকল দেশ ও দেশবাসীর আনন্দ-বেদনা ও সফলতা-ব্যর্থতা, সকল বিষয়েই শরীকদার। আর যার বিশ্বাস এই যে, ইসলামই সবকিছুর মানদণ্ড। কর্ম ও চরিত্র এবং ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব সবকিছু এ মানদণ্ডেই বিচার করা উচিত। এটি এই গ্রন্থের এমন এক বৈশিষ্ট্য, যার জন্য লেখক হিসাবে আমার কোন সংকোচ নেই।

যখন যেখানে গিয়েছি বিদায়ের আগে আমি নির্মোহ দৃষ্টিতে সবকিছু দেখেছি। আমার কাছে যা ভালো লেগেছে তা যেমন উল্লেখ করেছি, যা কিছু আমাকে ব্যথিত করেছে তাও সোজা ভাষায় তুলে ধরেছি। আশা ও আশঙ্কা সবই পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে প্রকাশ করেছি। একবারও ভাবিনি, এটা বন্ধুদের ভালো লাগবে, না তাদের কষ্টের কারণ হবে।” —শারকে আওসাত কী ডায়েরী পৃ. ২৩

‘বাইতুল্লাহর মুসাফির’ সম্পর্কে আমার নাকিস খেয়াল এই যে, এখানেও উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সমুজ্জ্বলভাবে। তিনিও যা দেখেছেন, শুনেছেন এবং যা বুঝেছেন অকপটে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন। দরদী হৃদয় যা অনুভব করেছে নির্দিধায় তিনি তা কাগজের পাতায় তুলে ধরেছেন। কোন কিছু বলতে গিয়ে প্রশংসা বা নিন্দার চিন্তা তাকে বিচলিত করতে পারেনি, তবে প্রায় সর্বত্র মাত্রা ও পরিমিতি রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। কোন বিষয়ে কেউ মত হয়ত প্রকাশ করতে পারেন তবে লেখকের দরদ ও আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার অবকাশ নেই।

৪. প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়

‘মাদরাসাতুল মদীনা’য় অনুষ্ঠিত আদীব হযূরের পাক্ষিক মজলিসগুলো সম্পর্কে

আমি একবার আরজ করেছিলাম, ‘এর সুফল হচ্ছে তাহযীবুল আখলাক, তাহযীবুল আফকার ও তাহযীবুল লিসান।’ (অর্থাৎ ভাষা, চিন্তা ও আচরণের সংশোধন।) পরে যখন ‘সফরনামা’ শুরু হল তখন দেখলাম, তাতে উপরোক্ত তিন বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। চতুর্থ যে বিষয়টি এখানে রয়েছে তা হলো ‘ঈকাযুল হিমাম ওয়া তাশহীযুল জিনান।’ (অর্থাৎ উচ্চ মনোবল জাগ্রত করা এবং হৃদয়ে উত্তাপ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।) আর এটা এজন্যই হতে পেরেছে যে, লেখক নিজে ‘দিলে দরদমন্দ, ফিকরে আরজুমন্দ ও যবানে হুশমন্দ’ (অর্থাৎ দরদী হৃদয়, সমুন্নত চিন্তা ও সুপ্রাজ্ঞ ভাষার) অধিকারী।

মাদরাসার কোনো তালেবে ইলম যদি এ সফরনামা মনোযোগের সাথে পাঠ করে তবে তা থেকে ‘আদাবুল ইলম’ ও ‘আদাবুল মুতাআল্লিমীন’ বিষয়ে এমন মূল্যবান পাথেয় আহরণ করতে পারবে যা বর্তমান সময়ে হয় একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিংবা হয়ে পড়েছে দুস্প্রাপ্য।

সমাজের কোনো মানুষ যদি শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তা পাঠ করে তবে ‘আদাবুল মুআশারা’ ও ‘আদাবে ইনসানিয়াতে’র এমন অনেক দিক তার সামনে উন্মোচিত হবে, যেগুলো সম্পর্কে আমাদের সমাজে চরম অবহেলা বিরাজমান।

কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি তা থেকে সমুন্নত চিন্তা অর্জন করতে চায় তবে সে বিষয়েও তাতে সুপ্রচুর উপাদান রয়েছে। পক্ষান্তরে ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় যারা নিয়োজিত তারা যদি তা থেকে ভাষা ও সাহিত্যের পুঁজি সংগ্রহ করতে চায় তবে তো আমি বলবো, শুরু থেকে শেষ, এগ্রন্থ তো একটি আদর্শ সাহিত্যগ্রন্থ।

কলবের তায়কিয়া ও হৃদয়ের পরিশুদ্ধি অর্জনেরও বহু উপাদান এতে বিদ্যমান রয়েছে। বস্তুত ‘রুহানিয়াত’ই হচ্ছে এই সফরনামার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

আদাবে ইনসানিয়াত বিষয়ে কিতাবের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে মানুষের ভেতরের বিভিন্ন সুকুমার বৃত্তি, বিশেষত ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, কৃতজ্ঞতা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রেরণা জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে যা মানুষের সমাজে মানুষ হিসাবে পরিচয় লাভের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সংশোধন ও উৎকর্ষ অর্জনের বিষয়ে এখানে যেমন রয়েছে ঈমান, তাওহীদ ও তাওয়াক্কুলের অন্তর-স্পর্শী বহু আলোচনা, তেমনি রয়েছে তাফবীয ও রিয়া বিল কাযা (আল্লাহর ইচ্ছাতে পূর্ণ আত্মনিবেদন) ইশক ও মুহাব্বাত এবং আবদিয়াত ও বন্দেগির অসংখ্য নমুনা ও উদাহরণ।

চিন্তাগত ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, নীতিনিষ্ঠা ও সচেতনতা এবং বিত্তশালী

ও ক্ষমতাশালীদের সাথে সম্পর্কের রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে রয়েছে বহু মূল্যবান দিকনির্দেশনা।

আদাবুল মুআশারা প্রসঙ্গে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী আচরণ করা এবং প্রত্যেককে তার প্রাপ্য হক প্রদান করা, শালীনতা, সুশীলতা এবং বিনয়, প্রজ্ঞা ও সতর্কতা অবলম্বন করার বহু উদাহরণ এসেছে কিতাবের বিভিন্ন স্থানে।

বুলন্দ হিম্মতির ক্ষেত্রে এই সফরনামা থেকে ‘জিহাদের জয়বা’ অর্জন করা হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমার ইচ্ছা ছিল উপরোক্ত সকল বিষয়ে কিছু দৃষ্টান্তও সফরনামা থেকে তুলে দেই, কিন্তু শুধু এজন্য তা থেকে বিরত থাকছি যে, প্রত্যেক বিষয়েই এত অধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, অতপর চয়ন ও নির্বাচন করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। যার পুরোটাই সারবস্তু তা থেকে চয়ন করা কীভাবে সম্ভব!

হজ্জের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়

হজ্জ ও যিয়ারত তো হলো সফরনামার মূল বিষয়। তো যে রচনায় প্রাসঙ্গিক বিষয়ই এত ব্যাপক ও বিস্তৃত সেখানে মূল বিষয়ই কেমন হবে তা তো বলাই বাহুল্য। সংক্ষেপে বলা যায়, হজ্জ ও যিয়ারতের ইসলামী ফালসাফা এবং এর প্রতিটি আমলের রহস্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা কিছু লিখিত হয়েছে তার উত্তম অংশ এবং আরো কিছু ইলহামী সংযোজন এতে এসে গেছে। পার্থক্য এই যে, অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তত্ত্ব ও তাৎপর্য, আর এখানে পরিবেশিত হয়েছে বাস্তব অবলোকন ও জীবন্ত অভিজ্ঞতা। এ দিক থেকে এ সফরনামা সত্যিই আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত যে, এর মাধ্যমে হজ্জের মতো বুনিয়াদী আমলে রুহ পয়দা করার, খুশু-খুযু এবং ইহসান ও ইহতিসাব পয়দা করার প্রচুর উপাদান অত্যন্ত সহজভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। সেই সাথে প্রসঙ্গত নামায, যিকির ও দুআর মতো আমলসমূহেও অনুরূপ অনুভব-অনুভূতি ও চিন্তাফিকির পয়দা করার বাস্তব দৃষ্টান্ত সামনে এসে গেছে। এদিক থেকে আমি একে একটি আসমানী তোহফা মনে করি, যা আল্লাহ তাআলা বাংলা ভাষাভাষীদেরকে লেখকের মাধ্যমে দান করেছেন।

এ প্রসঙ্গে গোটা সফরনামায় কিছু বিষয় বারবার এসেছে। যথা—

এক, সকল আমলের তাৎপর্য অনুধাবন করা উচিত এবং তা স্মৃতিতে জাগরুক রাখা উচিত।

দুই, হজ্জ ও হজ্জের বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হয়ে নিজেকে দূর অতীতে বিলীন

করে দেওয়া, অন্তত তার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কারণ এভাবেই হজ্বের আমলে নূর ও নূরানিয়াত পয়দা হতে পারে।

তিন, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর ভাব ও ভাবনা এবং আবেগ ও অনুভূতির মাঝে নিমগ্ন থাকা।

বলাবাহুল্য, এই তিনটি বিষয় হচ্ছে হজ্বের মধ্যে রূহ ও রূহানিয়াত পয়দা করা, খুশু-খুযু এবং ইহসান ও ইহতিসাবের হালত পয়দা করা এবং হজ্বের ঈমানী ও বাতেনী সুফল অর্জন করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী উপায়।

আজকাল যেহেতু ইবাদতকে জীবন্ত ও জানদার এবং সজীব ও তরুতাজা করার চিন্তা মানুষের দিল থেকে বিলকুল গায়েব হয়ে গেছে, তাই হজ্ব ও অন্যান্য ইবাদতের রূহ ও রূহানিয়াত সম্পর্কে আলোচনা ও চর্চা-অনুশীলন এখন আমাদের মাঝে ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে। আমাদের সালাফে-ছালেহীন ও মহান পূর্ববর্তীদের জীবনে হজ্ব ও ইবাদতের প্রাণ ও প্রকৃতি কী ছিলো, তাদের মাঝে কী হালাত ও কাইফিয়াত পয়দা হতো এবং এ সম্পর্কে কত অসংখ্য ঘটনা কিতাবে বর্ণিত রয়েছে তা আমাদের জানাও নেই। এজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে আমার মতো শুষ্ক তালেবে ইলমের মনে হতে পারে যে, এসব আলোচনা ‘তাকাল্লুফ’ ছাড়া আর কিছু নয়; বিশেষত যখন সাধারণ অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, ইবাদতকে আমরা ফিকহের জায়েয-নাজায়েযের সীমায় আবদ্ধ করে রেখেছি। আমরা ভেবে থাকি যে, খুশু-খুযু, ইহসান ও ইহতিসাব কিংবা আবেগ-অনুভূতিকে অন্তরে জাগ্রত রাখা যখন নামাযেই মুস্তাহাবমাত্র তখন হজ্বের ক্ষেত্রে মুস্তাহাবের চেয়ে বেশী আর কী হবে? অথচ ফিকহের দৃষ্টিতে এগুলো মুস্তাহাব হলেও ইবাদতে রূহ ও রূহানিয়াত পয়দা করার জন্য এগুলো ফরযের মতো জরুরি। ফিকহের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব হওয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। যাই হোক যদি কোনো তালেবে ইলম শুধু আবুল বাকা ইবনুয-যিয়া আলমক্কী (৮৫৪হি.)এর ‘আলবাহরুল আমীক ফী মানাসিকিল মু‘তামিরি ওয়াল হাজ্জি ইলা বাইতিল্লাহিল আতীক’ (যা তিন বছর আগে পাঁচটি বৃহৎ খণ্ডে শানদারভাবে প্রকাশিত হয়েছে)-এর দ্বিতীয় অধ্যায়টি পাঠ করেন তাহলে দেখবেন যে, হজ্বের আমলসমূহে সালাফে ছালেহীন ভাব ও অনুভবের সাগরে কেমন নিমজ্জিত থাকতেন।

‘তাবাকাতে ইবনে সা‘দ’ ও ‘হিলয়াতুল আওলিয়া’ গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)এর ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রা.) একবার বে-খেয়াল অবস্থায় তাওয়াফের হালাতে হযরত ইবনে ওমর (রা.)কে একটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। তাতে উরওয়া পেরেশান

হলেন। পরবর্তী সাক্ষাতে ইবনে ওমর (রা.) তাকে বললেন, কথাটা তুমি বলেছিলে যখন আমি তাওয়াফের হালাতে ছিলাম, এরপরের বাক্যটি এই—

وَنَحْنُ فِي الطَّوَافِ، نَتَخَايَلُ اللَّهَ بَيْنَ أَعْيُنِنَا، وَكُنْتُ قَادِرًا عَلَى أَنْ تَلْقَانِي فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْطِنِ.

“আর তাওয়াফের সময় আমরা সম্মুখে আল্লাহকে কল্পনা করে থাকি। তুমি কথাটি অন্য স্থানে বলতে পারতে।”

হিলয়াতুল আওলিয়া গ্রন্থেই নাফে (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে—

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يَقُولُ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ يَشْنِيهَا، وَيَقُولُ: لَعَلَّ خَفَا يَقَعُ عَلَى خَفٍّ، يَعْنِي خَفَّ رَاحِلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“মক্কার পথে ইবনে ওমর (রা.) তাঁর বাহনের মাথা ঘুরিয়ে দিতেন, যেন তা আঁকা-বাঁকা হয়ে পা ফেলে। তিনি বলতেন, হয়ত এর পা ওইখানে পড়বে যেখানে নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহনের পা পড়েছিলো!”

হজ্জের আসওয়াদে চুম্বনকালে কবি ইবনে নুবাতাহ (৭৬৮হি)এর অনুভূতি দেখুন—

اقبله لعل فمي يلاقي = مكانا فاز بالهادي البشير

محمد الذي ساد البرايا = واخجل طلعة القمر المنير

“আমি তাতে চুম্বন করছি, যাতে আমার ঠোঁট ধন্য হয় ওই স্থানের স্পর্শে যা ধন্য হয়েছে মানবতার পথপ্রদর্শক মুহাম্মাদের চুম্বন-স্পর্শে, যিনি সবার মাঝে ছিলেন বরণীয় এবং যিনি উজ্জ্বল চাঁদকেও লজ্জা দিয়েছেন আপন সৌন্দর্য দ্বারা।”

উস্তাদ উমার আমীরী (১৪১২হি.)এর অনুভূতি এই—

قبلت ما قبله ثغره النا = طق بالوحي ابتغاء الصلاة

“ওহী উচ্চারণকারী পাক যবান যে স্থানকে চুম্বন করেছে আমিও তা চুম্বন করেছি শুধু তার চুম্বন-স্পর্শে ধন্য হওয়ার আশায়।” (ফযলুল হাজরিল আসওয়াদ ওয়া মাকামি ইবরাহীম আ., সাইদ বাকদাশ ৪৮, ৪৯)

দেখুন, এ ক’টি ঘটনাতেই ওই সববিষয় কী সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে, যা সফরনামায় বারবার এসেছে। লেখাটি দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না হলে আমি শরীয়তের দলীল থেকে বাইতুল্লাহর মুসাফিরে বর্ণিত বিষয়গুলোর সূত্র উপস্থাপন

করে দিতাম, কিন্তু আসল কথা হলো, এগুলো তো দলীল-প্রমাণের বিষয় নয়, অনুভব ও অনুভূতির বিষয়। আহা! মেহেরবান আল্লাহ যদি আমাদেরও তা থেকে এক ফোটা দান করতেন। আল্লাহ্মা আমীন।

হজ্জের আমলসমূহের তত্ত্ব ও তাৎপর্য এবং দর্শন ও রহস্য বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরাই হচ্ছে এ সফরনামার এমন এক বৈশিষ্ট্য, যার কারণে তা হজ্জের মধ্যে রূহানিয়াত পয়দা করতে আগ্রহী প্রত্যেক হাজীর সঙ্গে হওয়ার অধিকার রাখে। এজন্য যখন তা ধারাবাহিকভাবে আলকাউসারে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন অনেকে পত্রিকার সংখ্যাগুলো হজ্ব ও ওমরার সফরে সঙ্গে রেখেছেন এবং আলকাউসারে তা পাঠ করে অনেক পাঠক প্রথম হজ্ব বা পরবর্তী হজ্জের সংকল্প করেছেন। মসজিদে হারাম ও অন্যান্য স্থানে একাধিক ব্যক্তিকে আমি তাদের উপরোক্ত অনুভূতি লেখকের নিকট প্রকাশ করতে দেখেছি। কোনো হজ্ব-সফরনামার কবুলিয়াত ও মকবুলিয়াতের এর চেয়ে বড় দলীল আর কী হতে পারে?

আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত একে সাদাকায়ে জারিয়া বানিয়ে দিন এবং এর ফুয়ূয ব্যাপক ও পরিপূর্ণ করে দিন। আমীন।

সফরনামার লেখককে আল্লাহ তাআলা হায়াতে তাইয়েবা তাবীলাহ দান করুন এবং তাঁর সকল মনোবাঞ্ছা গায়েব থেকে পূরণ করে দিন।

মোটকথা, এই সফরনামার অসংখ্য উপকারিতার মধ্যে আমার ধারণায় সবচেয়ে বড় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে এমন এক আদর্শ সফরসঙ্গী প্রস্তুত হয়েছে যে ইনশাআল্লাহ অতি গাফেল মানুষের হজ্জের মাঝেও নূরানিয়াত ও রূহানিয়াত পয়দা করতে অবদান রাখবে।

দ্বিতীয় বড় উপকারিতা এই যে, এর পাঠকের গাফলত থেকে মুক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। বর্ণনা এতই আকর্ষণীয় যে, তা পাঠককে ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়। হৃদয়ে উত্তাপ ও যন্ত্রণা সৃষ্টি করে এবং চোখকে অশ্রুসজল করে। এর দ্বারা পাঠক যদি সামান্য সময়ের জন্যও একান্ত নির্জনতায় রবের সান্নিধ্য অনুভব করার সুযোগ পান তবে তা এক মহানেয়ামত, যার তুলনায় গোটা বিশ্বজগত নিতান্তই তুচ্ছ।

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় ছেড়ে দিলেও শুধু এই একটি বিষয়েই যদি চিন্তা করা হয় তাহলেও এ সফরনামা এমন এক নেয়ামত যা আমরা একেবারে বিনা মেহনতে পেয়ে গেছি।

সফরনামার ভাষা ও সাহিত্যমান তো এ বিষয়ের পারদর্শী ব্যক্তিরাই বলতে পারবেন। আমার অবস্থা তো এই যে, আমার যাবতীয় লেখা অনুবাদ হয়ে পাঠকের

সামনে আসে। সাধারণত এই খেদমত আজ্জাম দেন আমার খাস দোস্ত মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম জাযা দান করুন এবং তাফাককুহ ফিদ-দীন, রুসুখ ফিল-ইলম, তাকওয়া-তহারাত এবং ইখলাস ও উদ্যমের সঙ্গে বেশি থেকে বেশি দ্বীনের খেদমতের তাওফীক দান করুন। আমীন।

কয়েকটি নিবেদন

১. এই সফরনামা তৈরি হওয়ার পেছনে বড় অবদান উস্তাযুল আসাতিয়া হযরত মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী দামাত বারাকাতুল্হম-এর। দীর্ঘ দিন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ; বরং শয্যাশায়ী। আমাদের আন্তরিক দরখাস্ত, পাঠকবর্গ যেন তাঁর পূর্ণ সুস্থতা ও দীর্ঘ হায়াতে তাইয়েবার জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করেন।

২. এ সফরনামার নূরানিয়াত ও তাছীরের একটি বাতেনী কারণ এই যে, এর পূর্ণ ‘মুসাওয়াদা’ অ্যুর হালতে মসজিদে ‘ইতিকাফরত অবস্থায় সমাপ্ত হয়েছে। বিষয়টি যেহেতু আমার জানা ছিল তাই তা উল্লেখ করে দিলাম, যেন ইলমী কাজে আমরা তা থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

৩. হজুর (বাইতুল্লাহর মুসাফির হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুল্হম)এর সাধারণ নিয়ম হল, তিনি বারবার সম্পাদনার মাধ্যমে লেখার দীর্ঘ পরিচর্যা ছাড়া তা প্রকাশ করতে প্রস্তুত হন না। এজন্য তিনি পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে লিখতে রাজি হন না। কোন লেখা প্রকাশিত হওয়ার আগে কখনো কখনো তা দশবারেরও অধিক সম্পাদনা হয়ে থাকে এবং প্রকাশিত হওয়ার পরও সম্পাদনা অব্যাহত থাকে। এই সাধারণ নিয়মের বিপরীতে বারংবার অনুরোধ করে তার পূর্ণ স্বস্তির আগেই সফরনামাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এতে আনন্দের বিষয় তো এই যে, কাজটি তাড়াতাড়ি সমাপ্ত হয়ে সামনে এসে গেছে। কিন্তু একই সঙ্গে আফসোসও হচ্ছে যে, নীতির বিষয়ে অটল মানুষকে তার যথার্থ নীতি থেকে (কিছুটা হলেও) সরে আসতে অনুরোধ করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করুন এবং এতে যদি কোন অকল্যাণ থাকে তাহলে তা থেকে আমাদের সবাইকে নিরাপদ রাখুন।

যখন হজুর জানলেন যে, আলকাউসারে আমি আমার কিছু অনুভূতি ভাঙ্গাচোরা ভাষায় পেশ করছি তখন তিনি বললেন, সফরনামা যখন গ্রন্থাকারে আসবে তখন তা কিতাবে যুক্ত করা হবে। আমি খুবই বিব্রত বোধ করলেও, আমার প্রতি তাঁর ‘যাররা নাওয়াযি’ (অণুতোষণ)এর এত অধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমার জন্য তো এটা বিরাট সৌভাগ্য যে, সামান্য লেখা এখন অসামান্য

হয়ে গেল, কিন্তু আফসোস এই যে, এটা তো রেশমী চাদরে চটের তালি'র মতো হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলাই আপন অনুগ্রহে সকল দোষত্রুটি গোপন করতে পারেন।

দুআ করি এবং পাঠকবর্গের কাছেও দুআ চাই যে, আল্লাহ তাআলা এই সফরনামাকে 'মাদরাসাতুল মদীনাহ' ও আলকলম (পুষ্প) পত্রিকার জন্য এবং মারকাযুদ দাওয়াহ ও 'আলকাউসারে'র জন্য কবুলিয়াত ও মাকবুলিয়াতের ওসীলা বানান। আমীন। এই সফরনামাকে যেন আমাদের ঈমান তাযা করার উপায় এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মানোত্তীর্ণ ও অমর কীর্তি বানিয়ে দিন। আমীন।

هذا وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

১৮ রমযানুল মুবারক ১৪৩০ হিজরী

৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী

মঙ্গলবার রাত সাড়ে তিনটা

[অক্টোবর '০৯ঈ.]

সফরনামার জন্য মুবারকবাদ

হজ্জের সফরনামার জগতে একটি কল্যাণকর বিপ্লব সৃষ্টিকারী সফরনামা 'বাইতুল্লাহর মুসাফির'-এর প্রকাশনার জন্য দারুল কলম, আশরাফাবাদ, ঢাকা-কে আন্তরিক মুবারকবাদ ও শোকরানা পেশ করছি। ইসলামী সাহিত্যের প্রকাশনা-অঙ্গনে সত্যি এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সুতরাং সমস্ত হামদ ও প্রশংসা এবং শোকর ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি লেখকের কলম ও কলব থেকে এই কিতাব বের করেছেন এবং দারুল কলমকে তা প্রকাশ করার তাওফীক দান করেছেন। আসল কথা হলো, 'ঈ সা'আদাত বাযো.রে বাযু নীস্ত/ তা. নাবাখশাদ খোদা.য়ে বাখশেন্দাহ' (এ সৌভাগ্য নয় শক্তির জোরে/ দাতা যদি না দেন দয়া করে।)

অনবদ্য রচনাশৈলী এবং কলমের 'সহরবয়ান' ও যাদুময়তার আদর্শ উদাহরণ এই সফরনামা সম্পর্কে আমার অনুভব-অনুভূতি ইতিপূর্বে অতিসংক্ষেপে আমি আলকাউসারে লিখেছি এবং আল্লাহ তাআলার শোকর এখন তা সফরনামার 'উদ্বোধনিকা' হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। সত্য কথা এই যে, আমার যা কিছু বলার ছিলো তার খুব সামান্য অংশই আমি বলতে পেরেছি, প্রথমত যোগ্যতার অভাবে, দ্বিতীয়ত সময়ের অভাবে এবং তৃতীয়ত স্থানের অভাবে। আল্লাহ যদি তাওফীক দান করেন, এ বিষয়ে অনেক কিছু বলার আছে এবং অনেক কিছু করার আছে, যাতে কিতাবটির ফায়েদা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে পারে। এখন এখানে আমি সফরনামার একটি নতুন বিষয় তুলে ধরতে চাই, যার গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। কিতাবকে কারো নামে 'উৎসর্গ' করার প্রচলন সালাফ থেকেই চলে এসেছে। সুতরাং ধারণা ছিলো, বাইতুল্লাহর মুসাফিরও তাঁর সফরনামা কারো না কারো নামে উৎসর্গ করবেন। কিতাবটি হাতে আসার পর দেখলাম যথারীতি তিনি তা উৎসর্গ করেছেন, তবে আমি অবাক হলাম এবং আত্মিক আনন্দ লাভ করলাম এটা দেখে যে, এ বরকতপূর্ণ কিতাবটির ছাওয়াব তিনি হাদিয়া করেছেন

তাঁর বড় মেয়ের জন্য। তিনি লিখেছেন, ‘আমার বড় মেয়েকে, যে আমার জন্য বাইতুল্লাহর যিয়ারতের সৌভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলো বলে আমি বিশ্বাস করি। ...।’

অবাক হয়েছি এজন্য যে, বিশেষ করে আমাদের ইলমী মহলে এটি অভাবিতপূর্ব একটি কাজ। আর আনন্দ লাভ করেছি এজন্য যে, এর দ্বারা তিনি আমাদের সামনে চিন্তা-ফিকিরের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। বস্তুত এ ‘কালিমাতুল ইহদা’ হচ্ছে সুপ্রাজ্ঞ লেখকের সুগভীর অন্তর্জ্ঞান, অনুকরণীয় পিতৃত্ব ও মমত্বের অনুপম প্রকাশ এবং শোকরগুয়ারি ও ‘হকশিনাসি’-এর আদর্শ নমুনা।

যেহেতু বড় মেয়ের জন্মগ্রহণের পরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে যিয়ারতে বাইতুল্লাহ নছীব করেছেন সেহেতু এটিকে তিনি ‘কন্যাভাগ্য’ বলে গ্রহণ করেছেন, তবে পরম দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে এটিকে তিনি নিজের ধারণা ও বিশ্বাসের পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, কারণ গায়েবের ইলম তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে। শরীয়তের পরিভাষায় এটিকে ‘তাফাউল’ বা নেক ফাল বলে, যার বৈধতা দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

আইয়ামে জাহিলিয়াতে আরবদেশে (আসলে শুধু আরবদেশে নয়, বরং সারা পৃথিবীতে) কন্যাসন্তানের কী করুণ অবস্থা ছিলো, তা আমরা সবাই জানি, তবে অনেকেই যা জানি না তা এই যে, ইসলাম কন্যাসন্তানকে কী অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে। যারা জানি তারাও নিজেদের জীবনে খুব কমই তা পালন করি। তাই তো বর্তমান যুগেও অমুসলিম সমাজের মত মুসলিম সমাজেও কন্যাসন্তান বিভিন্নভাবে চরম নিগ্রহ, লাঞ্ছনা ও বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। এমনকি যদি সত্য কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে বলতে হবে যে, আহলে ইলমও -সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদে- এ বিষয়ে সমাজের সামনে দ্বীন ও শরীয়তের শিক্ষা ও আদর্শ পুরোপুরি তুলে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছেন। অথচ আমরা জানি, এই উম্মতের পেয়ারা নবী বিভিন্ন হাদীছে কন্যাসন্তানকে মুহাব্বাতের সঙ্গে উত্তম প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কী মহাপুরস্কারের খোশখবরি দান করেছেন! কন্যাসন্তানকে তিনি মাতা-পিতা ও জাহান্নামের মাঝে আড়াল সাব্যস্ত করেছেন। ‘কালিমাতুল ইহদা’ পড়ে আমার মনে হয়েছে, প্রাজ্ঞ লেখক একদিকে যেমন আদর্শ পিতারূপে কন্যাসন্তানের প্রতি অন্তরের মমত্ব প্রকাশ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে আমাদের সামনে উপরে বর্ণিত আবেগ ও জাযবা এবং চিন্তা ও চেতনা তুলে ধরেছেন। আর এটাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে দিন-রাতের শত ব্যস্ততার মাঝেও কিছু কথা আরয় করতে। আল্লাহ তাআলা যেন কবুল করেন, আমীন।

যেহেতু এখন এমনকি মুসলমানদের সমাজেও নারী-উন্নয়ন ও নারী-অধিকারের শোরগোল জোরেশোরে চলছে, সেহেতু এই সুযোগে সফরনামার আলোকে কিছু কথা পেশ করা মুনাসিব মনে হচ্ছে।

পুরুষজাতি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বান্দা, আর নারীজাতি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বান্দী। উভয় জাতির খালিক ও মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। নারী ও পুরুষকে ভিন্নরূপে সৃষ্টি করার হিকমত ও রহস্য তিনিই শুধু জানেন এবং তিনিই শুধু উভয়ের দায়-দায়িত্ব এবং হক ও অধিকার নির্ধারণ করে দিতে পারেন।

সুতরাং আলইসলাম নামে তিনি যে চিরন্তন দ্বীন ও শরীয়ত নাযিল করেছেন সেখানেই শুধু পাওয়া যেতে পারে নারীর প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা, আর সুন্নাতে নববীতে রয়েছে সেই শিক্ষার বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ নমুনা। কিন্তু আফসোস, দ্বীন ও শরীয়ত এবং সুন্নাতে নবী সম্পর্কে বে-খবর মুসলমানরা আজ অন্যদের শ্লোগানে বিভ্রান্ত হয়ে নারী-অধিকার ও নারী-উন্নয়ন তালাশ করছে অন্যজাতি, অন্যসভ্যতা ও অন্যমতবাদের কাছে। এভাবে নারী হচ্ছে আরো লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও প্রতারণিত। স্বাধীনতা, মুক্তি ও প্রগতির নামে তাদের উপর চালানো হচ্ছে আরো বেশি জুলুম, আরো বেশি অত্যাচার। অন্যদিকে যাদের কাছে রয়েছে দ্বীন ও শরীয়তের এই নেয়ামত তাদের অধিকাংশ উদাসীনতা ও অবহেলার কারণে নারীজাতিকে তাদের সেই সব মর্যাদা ও অধিকার প্রদান থেকে বহু দূরে সরে আছে, যা ইসলাম ও শরীয়তে মুহাম্মাদীর মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

আলহামদু লিল্লাহ, এই সফরনামার অসংখ্য কল্যাণ ও উপকারিতার মাঝে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ ও ফায়েদা এই যে, লেখক বিভিন্ন ঘটনা এবং বিভিন্ন উপলক্ষকে আশ্রয় করে নারীজাতির বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ তুলে ধরেছেন, খুবই সূক্ষ্মভাবে, তবে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শরূপে। যদি হৃদয় ও মস্তিষ্ক একত্র করে তা পড়া হয় এবং যথাযোগ্য ফায়েদা হাছিল করার নিয়তে পড়া হয় তাহলে মা-বোন ও স্ত্রী-কন্যা সফলরূপেই নারীজাতির মর্যাদা ও অধিকার এবং হুকুম ও আদাব সম্পর্কে ইসলামের সঠিক শিক্ষার ছহীহ ইলম হাছিল করতে পারবে এবং দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো বাস্তবায়নের নেক জায়বা দিলের মধ্যে পয়দা হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং প্রত্যেক পাঠককে যেন এই সৌভাগ্য দান করেন, আমীন।

আমার ইচ্ছা আছে, শিক্ষামূলক বিভিন্ন জরুরী বিষয়ের শিরোনামে সফরনামা থেকে একটি সংকলন আগামী কোন এক ফুরসতে পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

ফযীলতপূর্ণ দিবস-রজনী ও ফযীলতবিষয়ক হাদীস সতর্কতা ও সচেতনতা খুবই প্রয়োজন

ফযীলতপূর্ণ সময় বান্দার জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত। এ সময় সুন্নত অনুযায়ী সামান্য নেক আমল করে অসামান্য সওয়াব হাসিল করা যায়। এ দিক থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, ফযীলতপূর্ণ সময় কাজে লাগানো সেসব সহজ নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত, যাতে কষ্ট কম সওয়াব বেশি।

যেসব সহজ ও ছোট ছোট আমলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনে অথবা সহীহ হাদীসে অধিক প্রতিদান ও সওয়াবের অঙ্গীকার রয়েছে এবং যেসবের প্রচুর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, সেসব আমল সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মারাত্মক পর্যায়ে কিছু বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির প্রবণতা রয়েছে; যা সংশোধন করা অত্যন্ত জরুরি। যেমন—

(ক) কেউ কেউ সেসব আমলকে সহজ ও তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং অবহেলা প্রদর্শন করে। এভাবে তারা প্রতিদান ও সওয়াবের অনেক বড় অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু তা-ই নয় এভাবে আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের মূল্য না দিয়ে অকৃতজ্ঞতার বোঝা নিজেদের মাথায় চাপায় অথচ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَآءَ أَعْمَالُهُمْ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

“সে দিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। এরপর কেউ অণু-পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু-পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।” —সূরা যিলযাল ৬-৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ.

“কোনো সৎকাজকে কখনিকালেও তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তা হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহায়ায় সাক্ষাৎ করা।” -সহীহ মুসলিম ২/৩২৯

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন-

عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنْاءِ الْمُسْتَسْقَى، وَتُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهَكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ.

“আল্লাহকে ভয় কর এবং কখনো কোনো সৎকাজকে তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তা হয় তোমার বালতি থেকে কিছু পানি অন্যের পাত্রে ঢেলে দেওয়া এবং তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহায়ায় কথোপকথন করা।” -মুসনাদে আহমদ ৫/৬৩

আরো ইরশাদ করেছেন-

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِكْلِمَةً طَيِّبَةً.

“একটি খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। যদি তা-ও সম্ভব না হয়, তাহলে একটি উত্তম কথা দ্বারা।” -সহীহ বুখারী ২/৯৬৮

সুতরাং কোনোভাবেই শয়তানের এই ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয় যে, আমরা যখন ইসলামের বড় বড় কাজ করছি না তখন এই ছোট ছোট নেক আমল দ্বারা কী হবে? বরং যখন যে নেক আমলের তাওফীক হয় মহাপ্রাপ্তি মনে করে তা করে নেওয়া উচিত। দ্বীনের বড় বড় কাজ করা থেকে বঞ্চিত থাকা নিঃসন্দেহে অনেক বড় ক্ষতি এবং আমাদেরকে সেসব কাজের ব্যাপারে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। কেননা সেগুলো আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু এটা কেমন কথা যে, বড় কাজগুলো যখন হয় না তখন সহজ নেক আমলগুলোও করব না! বস্তুত এটা শয়তানের একটি ধোঁকা, যার উদ্দেশ্য হল মানুষকে চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা।

ছোট ছোট নেক আমলের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার একটি বড় উপকার এই যে, এর মাধ্যমে বড় বড় নেক আমলের আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। আমলনামায় নেক কাজের পরিমাণ বেশি হওয়ার যথাযথ মর্যাদা ও মূল্য আজ আমাদের জানা নেই; কিন্তু যেদিন এই চোখ বন্ধ হবে, মানুষ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে এবং হিসাব-কিতাব সামনে আসবে সেদিন বুঝে আসবে একটি ছোট নেক আমলেরও কী মূল্য! আখেরাতের মুদ্রা টাকা-পয়সা নয়; সেখানে সোনা-রূপা কাজে আসবে না; আখেরাতের মুদ্রা হচ্ছে নেক আমল। সেখানে প্রশ্ন-ই হবে যে, নিজের সঙ্গে

কী পরিমাণ নেক আমল নিয়ে এসেছ? তখন আঁচল যদি শূন্য হয় তাহলে সীমাহীন আক্ষেপ হবে যে, দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় আমলনামা কেন নেক আমল দ্বারা পূর্ণ করলাম না? কিন্তু সেদিন আর আমলের সময় থাকবে না। তাই সেই আক্ষেপেরও কোনো ফল হবে না।

সাহাবায়ে কেরামের ওই সব নেক আমলের মর্যাদা ও মূল্য জানা ছিল, তাই তাঁরা সেসব নেক আমলের প্রতি ছিলেন অতি অনুরাগী। কোনো আমল সম্পর্কে যদি অবহিত হতেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন, তৎক্ষণাৎ এর উপর আমল শুরু করে দিতেন। পক্ষান্তরে কোনো আমলের সওয়াব জানতে বিলম্ব হলে তারা আক্ষেপ প্রকাশ করতেন যে, যদি আমাদের আগে থেকে জানা থাকত তাহলে আগে থেকেই এই নেক আমলকে অভ্যাসে পরিণত করতাম।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)কে হাদীস শোনালেন যে, “যে ব্যক্তি জানাযার নামায় পড়ে তার এক ‘কীরাত’ সওয়াব হয়। আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত জানাযার পেছনে থাকে সে দুই ‘কীরাত’ সওয়াব লাভ করে। আর প্রতিটি কীরাত পাহাড় সমতুল্য। এ কথা শুনে হযরত ইবনে উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, আহা! আমি তো অনেক কীরাত অকারণে নষ্ট করে ফেলেছি।” -জামে তিরমিযী ১/২০১

মোটকথা, যেসব নেক আমল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়, তা অত্যন্ত মূল্যবান। দুনিয়াতে অবস্থানকালেই এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। আর বিশেষভাবে যেসব নেক আমলে কোন কষ্ট হয় না, সেগুলোকে শুধু অমনোযোগিতা ও উদাসীনতার কারণে বর্জন করা তো এতই লোকসানের ব্যাপার যে, আখেরাতে এর জন্য সীমাহীন আক্ষেপ করা হবে।” -আসান নেকিয়া ৩-৪

(খ) পক্ষান্তরে কিছু লোক এমন আছে যারা ফযীলতপূর্ণ সময়গুলোতে নেক আমল ও ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বটে এবং সেসব সহজ নেক আমলের প্রতি কম-বেশি মনোযোগীও হয়; কিন্তু তাদের একটি মারাত্মক রোগ এই যে, তারা ফরয ও ওয়াজিবকে গুরুত্ব দেয় না এবং গোনাহ বর্জন করার চেষ্টা করে না। তাদের ধারণা, ফযীলতপূর্ণ সময়গুলোতে নেক আমল করা এবং সহজ সহজ নেক আমল আদায় করাই আমাদের যাবতীয় দুর্বলতা ও গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। সেসব সময়ের আমলে যত সওয়াব হয়েছে তা কি কম?

কেউ কেউ তো পরিষ্কার এ কথাও বলে থাকে যে, এখন যা ইচ্ছে কর, অমুক রাতে ইবাদত করে সবকিছু ধুয়ে ফেলব।

স্মরণ রাখবেন, এধরনের মানসিকতা এর পূর্বে উল্লেখিত ভুল থেকেও

নিকৃষ্টতম এবং অধিক ভয়াবহ। ভালো করে মনে রাখবেন, শরীয়তের পক্ষ থেকে বিশেষ সময়ের ফযীলতের ঘোষণা এবং বিশেষ আমলের উপর প্রতিদান ও সওয়াবের উৎসাহ প্রদানের হেকমত এই যে, আমরা যেন সেসব সময়ের যথাযথ মূল্য দেই এবং ওই আমলগুলোকে গুরুত্ব দেই। এর উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও এই নয় যে, একে আমরা অন্যান্য সময়ের ফরয ও ওয়াজিবের প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শনের ছুঁতো বানাব কিংবা জেনে-শুনে অন্যান্য আমল বিশেষত তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহে ত্রুটি করব। যদি এমন করি তাহলে মূলত আমরা শরীয়তকে বিকৃত করলাম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী ভুল বুঝার একটি খুব মন্দ দৃষ্টান্ত পেশ করলাম এবং প্রবল আশংকা রয়েছে; বরং নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এই বিকৃতি ও ইচ্ছাকৃত ভুল বুঝার পরিণামে সেসব সময়ের মর্যাদা রক্ষা এবং সেসব বরকত থেকেও বঞ্চিত হতে হবে। নাউযুবিল্লাহ!

অধিক প্রতিদান ও সওয়াববিশিষ্ট কোনো আমলের তাওফীক হলে শয়তান এই ধোঁকা দেয় যে, আমলনামায় তো শুধু এই এক আমল দ্বারাই বহু সওয়াব সঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং এখন মেহনত করার কী দরকার? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বের শয়তানের ধোঁকার জাল ছিন্ন করে দিয়েছেন। তিনি অজু ও নামাযের সওয়াব (যা অনেক বেশি) বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন, ‘ওয়ালা তাগুতাররু’ তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। অর্থাৎ শুধু এই দুই আমলে এত অধিক সওয়াবের কথা শুনে মনে করো না যে, এখন আর অন্য আমলের প্রয়োজন নেই অথবা এখন কোনো গোনাহ-ই ক্ষতিকর নয়। কারণ সওয়াব তো ওই আমলের হয় যা আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয়। এখন কারো কাছে কী দলীল আছে যে, তার আমল অবশ্যই কবুলিয়াতের স্তরে পৌঁছে গেছে। কবুল হওয়া যখন নিশ্চিত নয় তখন কীভাবে শুধু দু একটি নেক আমলকে যথেষ্ট মনে করা যায় এবং কীভাবে এর ভিত্তিতে গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়?

তাছাড়া কিছু গোনাহ এমনও রয়েছে যার কারণে সমস্ত নেক আমলের সওয়াব বরবাদ হয়ে যায়। তাহলে কীভাবে বলা যায় (আল্লাহ না করুন) কখন কী গোনাহর কারণে অজান্তেই সমস্ত সওয়াব ধ্বংস হয়ে যায়নি বা ভবিষ্যতে ধ্বংস হয়ে যাবে না?

তাই প্রত্যেক মুমিনের জন্যে ফরয, সর্বদা আল্লাহ তাআলার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা। আল্লাহ তাআলার রহমতের আশাও থাকবে এবং আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির ভয়ও থাকবে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يَهْلِكَنَّ، كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ، الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ، وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا فَأَجْبُرُوا نَارًا وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا.

“সেসব গোনাহের ব্যাপারে সাবধান থেকে যেগুলোকে সাধারণ মনে করা হয়। কারণ তা একত্র হয়ে ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন কোনো কাফেলা কোনো মরুভূমিতে অবতরণ করল আর তাদের খাবারের সময় ঘনিয়ে এল। তারা বিভিন্ন দিক থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করতে লাগল। প্রত্যেকে ছোট ছোট লাকড়ির টুকরো জমা করতে লাগল। ফলে লাকড়ির বড় একটি স্তুপ জমা হয়ে গেল এবং তা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করল।” -মুসনাদে আহমদ ১/৪০৩, হাদীস ৩৮১৮

এই উপমা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন যে, সেই লাকড়ির স্তুপের মত ছোট ছোট গোনাহের কাজ একত্র হয়ে মানুষকে জাহান্নামী বানিয়ে ফেলে। তাই কোনো গোনাহকেই সাধারণ মনে করা যাবে না।

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا.

“সেসব গোনাহের ব্যাপারে সতর্ক থেকে যেগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। কারণ আল্লাহ তাআলার দরবারে এসব গোনাহ সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে।” -সহীহ ইবনে হিব্বান ১২/৩৭৯, হাদীস ৫৫৬৮

সুতরাং সহজ থেকে সহজতর নেক আমলের, ছোট থেকে ছোট গোনাহের ব্যাপারেও অসতর্ক হওয়া যাবে না। নেক আমলকে মর্যাদা দেওয়ার মত গোনাহকে ভয় করার ক্ষেত্রেও সাহায্যে কেরামকে আমাদের আদর্শ বানানো উচিত। হযরত আনাস (রা.) বলেন-

إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُؤِبَّاتِ.

“তোমরা অবশ্যই এমন অনেক আমল কর যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও হালকা, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আমরা সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক গোনাহসমূহের মধ্যে গণ্য করতাম।” -সহীহ বুখারী ২/৯৬১, হাদীস ৬৪৯২

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)এর নিম্নোক্ত উক্তি প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক মুমিনের সামনে থাকা উচিত। তিনি বলেন-

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَيُثَوِّقُ بِهَا وَيَنْسَى الْمُحَقَّرَاتِ فَيَلْقَى اللَّهَ وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ السَّيِّئَةَ فَلَا يَزَالُ مِنْهَا مُشْفِقًا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ آمِنًا.

“মানুষ নেক আমল করে এর উপর আস্থাশীল হয়ে যায় এবং (তার থেকে প্রকাশিত) সেসব গোনাহকে ভুলে যায়, যেগুলোকে তুচ্ছ ও সাধারণ মনে করা হয়। এরপর আল্লাহ তাআলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, সেসকল গোনাহ তাকে বেষ্টন করে রয়েছে। পক্ষান্তরে কেউ মন্দ কাজ করে কিন্তু এর ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। এরপর আল্লাহ তাআলার সাথে নিরাপদ অবস্থায় সাক্ষাৎ করে।” -ফাতহুল বারী ১১/৩৩৭

যদি উপরোক্ত সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ নেক আমলের সঠিক গুরুত্ব যদিও তা সহজ হয় এবং গোনাহের প্রকৃত ভয় যদিও তা ছোট হয়, একজন মুমিনের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং প্রতি মুহূর্তে স্মরণ থাকে, তাহলে সে উভয় ধরনের প্রাপ্তিকতা অর্থাৎ বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা থেকে মুক্ত থাকবে এবং সর্বদা আশা ও ভয়ের মধ্যে থাকবে। আল্লাহ তাআলার রহমত ও সন্তুষ্টি লাভের আশাও তার অন্তরে থাকবে এবং তাঁর শাস্তি ও ক্রোধের ভয়ও থাকবে। আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে তার আকীদা-বিশ্বাস তা-ই থাকবে যা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নিজেই শিক্ষা দিয়েছেন-

نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

“আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু এবং আমার শাস্তিই হল যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” -সূরা হিজর ৪৯-৫০

এই আকীদা স্মরণ রাখাই হল একজন মুমিনের সফলতার চাবি।

(গ) কারো কারো মধ্যে এ রোগও দেখা যায় যে, তারা যখন কোনো সহজ নেক আমল সম্পর্কে অনেক বেশি প্রতিদান ও সওয়াবের কথা শুনে তখন একে অস্বীকার করে বসে এবং বলে যে, এটুকু আমলের এত অধিক সওয়াব! অথচ পবিত্র কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা কোনো আমলের সওয়াব প্রমাণিত হওয়ার পর একে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা এবং আল্লাহ তাআলার নেয়ামত মনে করে একে মূল্য দেওয়াই একজন মুমিনের কর্তব্য। একটু চিন্তা করা উচিত, বিশ্বাস ও

সমর্পণ এবং কৃতজ্ঞতা ও যথাযথ মূল্যায়নের পরিবর্তে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা কত বড় গোনাহ এবং কত বড় অকৃতজ্ঞতা! হ্যাঁ, যদি কোনো মূর্খ ওয়ায়েজ কোনো বাতিল বা ভিত্তিহীন বর্ণনার উদ্ধৃতিতে কোনো আমলের সওয়াব বর্ণনা করে তাহলে আলেমদের এর প্রতিবাদ করা এবং উক্ত বর্ণনার স্বরূপ প্রকাশ করা জরুরি।

২. বিভিন্ন ফযীলতপূর্ণ সময়ের ফযীলত সম্পর্কে বিশেষভাবে এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে এমন কিছু ফযীলতের হাদীসের ব্যাপারে সাধারণভাবে, অনেক ওয়ায়েজ ও বক্তার মধ্যে দু'ধরনের শিথিলতা লক্ষ করা যায়। এক, তারা 'হাদীস' নামে যেখানেই যা কিছু পড়েন কিংবা যার কাছেই যা কিছু শুনে, তা বর্ণনা করা শুরু করেন অথচ অনেক সময় বর্ণনাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হয়ে থাকে যা আদৌ হাদীস নয় অথবা সনদ ও সূত্রের দিক থেকে এতই দুর্বল যে, উক্ত বর্ণনা বিদ্যমান থাকা ও না-থাকা সমান। সুতরাং কোনো হাদীস জনসাধারণের সামনে পেশ করার আগে বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে জেনে নেওয়া একজন আলেমের দ্বীনী দায়িত্ব।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

كُفِيَ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“কারো গোনাহগার হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা-ই বর্ণনা করে।” -সুনানে আবু দাউদ ২/৬৮১; সহীহ মুসলিম ১/৮

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ

“আমার সঙ্গে সঙ্গ করুন হাদীস বর্ণনা করার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর। শুধু এমন হাদীসই বর্ণনা করবে যার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে তোমাদের জানা আছে।” -জামে তিরমিযী ২/১২৩

সুতরাং প্রত্যেক দাঈ ও মুবাল্লিগ, উস্তাদ ও পীর, ওয়ায়েজ ও বক্তার উপর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে সতর্কতা রক্ষা করা ফরয। বর্ণনাযোগ্য কি না তা যাচাই করা ছাড়া শুধু কোনো কিতাব বা পুস্তকে দেখে অথবা কারো কাছে শুনে কোনোভাবেই হাদীস বর্ণনা করা যাবে না। অন্যথায় নিজের অজান্তেই বহু মুনকার, বাতিল, জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনাকে হাদীসে নব্বী হিসাবে বর্ণনা করা হবে; যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসাবে প্রমাণিত নয়।

দ্বিতীয় শিথিলতা এই যে, ফযীলতের হাদীস এত অধিক পরিমাণে বর্ণনা করা

হয় যে, ফরয ও ওয়াজিব নিয়ে আলোচনা করার সুযোগই তারা পান না। মসনূন তরীকা হল, ফাযায়েলের আগে ফরয নিয়ে আলোচনা করা এবং উৎসাহ বৃদ্ধিকারী রহমতের হাদীসসমূহের সাথে সাথে ভীতিপ্রদর্শনকারী শাস্তির হাদীসসমূহও বর্ণনা করা। শুধুই ফযীলত ও আগ্রহ প্রদানের হাদীস বর্ণনায় ব্যস্ত থাকা দাওয়াতের নববী-পন্থার পরিপন্থী।

তেমনি ফযীলতের যে সকল হাদীসের এমন বিশেষ মর্ম থাকে যা শুধু শাস্তিক অর্থ দ্বারা সাধারণ মানুষ অনুধাবন করতে পারে না, সে সকল হাদীসকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া বর্ণনা করতে থাকা অত্যন্ত ভুল পদ্ধতি; যার ব্যাপারে হাদীস শরীফে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কারণ এর দ্বারা মানুষের মধ্যে করণীয় আমলসমূহের ব্যাপারে শিথিলতা এবং গোনাহের ব্যাপারে উদাসীনতা সৃষ্টি হয়।

দাঈ ও ওয়ায়েজদের এই দু ধরনের শিথিলতার সংশোধনের লক্ষ্যে ইমাম ইবনুল জাওয়ী (রহ.) ‘তুহফাতুল ওয়ায়েজীন’ কিতাবে লেখেন, “অনেক ওয়ায়েজ ভিত্তিহীন হাদীস দ্বারা মাহফিল গরম করে। উদাহরণস্বরূপ, রজব মাসের প্রথম জুমার রাতের ও শবে বরাতের বিশেষ নামায ইত্যাদি বিষয়ে বানোয়াট বর্ণনা মানুষকে শোনায অথচ ফরয ও ওয়াজিববিষয়ক হাদীসসমূহ বর্ণনা করে না।

কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা ভীতিপ্রদর্শনকারী বানোয়াট বর্ণনা এত অধিক পরিমাণে বর্ণনা করে যে, মানুষ আল্লাহ তাআলার রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়। (অথচ নিয়ম হল ভীতি প্রদর্শনের নির্ভরযোগ্য বর্ণনার পাশাপাশি রহমত ও উৎসাহ দানকারী হাদীসসমূহও বর্ণনা করা।) পক্ষান্তরে কিছু মানুষের অভ্যাস হল তারা উৎসাহ দানকারী বানোয়াট বর্ণনা কিংবা এমন সহীহ হাদীস বর্ণনা করে যার বিশেষ মর্ম থাকে।” -তুহফাতুল ওয়ায়েজীন#

[অক্টোবর-নভেম্বর '০৬ঈ.]

মহররম ও নববর্ষ : শিক্ষা ও নির্দেশনা

চান্দ্রবর্ষের সূচনা : মহররম থেকে একটি নতুন চান্দ্রবর্ষের সূচনা হতে যাচ্ছে। আজকাল সাধারণত নববর্ষ ও বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে অনেক ধরনের সভা-সেমিনারের আয়োজন থাকে। অনেকে এ উপলক্ষে বিভিন্ন মনগড়া রসম-রেওয়াজও পালন করে। ইসলামে এধরনের নববর্ষ ও বর্ষপূর্তি উদযাপন করার, এমনিভাবে জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কোনো বিধান নেই।

বস্তুত ইসলামে রসম-রেওয়াজ বা অন্ধ অনুকরণের কোনোই সুযোগ নেই। ইসলামের প্রতিটি শিক্ষাই অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামের নিজস্ব নিয়মনীতি ও স্বতন্ত্র আদর্শ রয়েছে। তা পরিহার করে বিজাতির অনুকরণ ইসলামে সমর্থিত নয়। কিন্তু আজ যখন মুসলমানরা চলে গেছেন কবরে আর মুসলমানিত্ব রয়ে গেছে কিতাবে তখন ইসলামের কালেমায় দীক্ষিত ব্যক্তিদেরকেই তাদের আচার-অনুষ্ঠানে বিজাতীয় রীতি-নীতি অবলম্বন করতে দেখা যায়।

বর্ষপূর্তি বা নববর্ষ উদযাপনের উদ্দেশ্য যদি হয় নিজ কর্ম ও অবস্থার উন্নতি-অবনতির হিসাব নেওয়া তবে তা বছরে একবার কেন দৈনিক হওয়া চাই। ইরশাদ হচ্ছে—

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا،
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا.

“তিনি মহামান্বিত যিনি আকাশে বড় বড় তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে একটি প্রদীপ (সূর্য) ও আলোকময় চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন সত্তা যিনি রাতদিনকে পরস্পরের পশ্চাৎগামী বানিয়েছেন ওই ব্যক্তির জন্য যে বুঝতে চায় বা শোকর করার ইচ্ছা রাখে।” —সূরা ফুরকান ৬১-৬২

রাতদিনের আবর্তনের বড় একটি হেকমত হল কুলমাখলুকের খালেক ও

মালেককে স্মরণ করা এবং তাঁর শোকর করা। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “পবিত্রতা ঈমানের অংশ। ‘আলহামদুলিল্লাহ’ আমলের পাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ’ আসমান জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে দেয়। নামায হল নূর আর সদকা হল প্রমাণ। সবার হল আলো আর কুরআন হয় তোমার পক্ষে দলীল হবে কিংবা তোমার বিপক্ষে। সকল মানুষই সকালে উপনীত হয় তার পর সে নিজেকে বিক্রি করে; হয় আল্লাহর কাছে বিক্রি করে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নতুবা শয়তানের কাছে বিক্রি করে নিজেকে ধ্বংস করে।” –সহীহ মুসলিম ৩/১০০

এজন্য প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় নিজ আমলের হিসাব নেওয়া উচিত। কোনো ব্যবসায়ী কি এমন আছে যে বছরে শুধু একবার বা দুবার তার হিসাবের খাতা খোলে? কেউ যদি এমন করে তবে সে সবার কাছে নির্বোধ সাব্যস্ত হবে। প্রত্যেক ব্যবসায়ী দৈনিক তার লাভ-লোকসানের হিসাব করে। একজন মুমিন সে তো সর্বাবস্থায়ই আখেরাতের ব্যবসায়ী। ব্যবসার হিসাব মিলিয়ে রাখা তার সার্বক্ষণিক কর্তব্য। এখানে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেওয়ার অর্থ হল নিজের নির্বুদ্ধিতা প্রমাণ করা। একথাই হাদীস শরীফে এভাবে বলা হয়েছে—

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ.

“বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি যে নিজের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। নির্বোধ ওই ব্যক্তি যে নিজেকে প্রবৃত্তির অনুগামী করে আর আল্লাহর কাছে বিভিন্ন অমূলক আশা পোষণ করে।”

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) কতই না সুন্দর বলেছেন—

إِذَا أُمْسِيَتْ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، فَإِنَّكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَدْرِي مَا أَسُوكَ غَدًا.

“তুমি যদি সন্ধ্যায় উপনীত হও তাহলে সকালের অপেক্ষা করো না। আর সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। সুস্থতার সময়ে অসুস্থ সময়ের জন্য প্রস্তুতি নাও এবং জীবন থেকে মৃত্যুর পাথেয় সংগ্রহ কর। হে আব্দুল্লাহ, তুমি তো জান না কাল তোমাকে কী নামে ডাকা হবে।” –জামে তিরমিযী ৪/৫৬৮

চান্দ্রমাস ও চান্দ্রবর্ষের চর্চার প্রয়োজনীয়তা

চান্দ্রমাস ও চান্দ্রবর্ষের সাথে রোযা, হজ্জ, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও যাকাতসহ বহু ইবাদত ও শরয়ী বিধান সম্পৃক্ত। তাই এই হিসাবের চর্চা ও সংরক্ষণ ফরযে কেফায়া। অন্যদের কথা না হয় বাদই দেওয়া হল, অধিকাংশ দ্বীনদারদের মাঝেও আজকাল দৈনন্দিনের হিসাব-কিতাব এমনকি ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেও চান্দ্রমাস ও হিজরী তারিখের ব্যবহার দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে। এটা অত্যন্ত আফসোসের বিষয় এবং অবশ্যই তা সংশোধন হওয়া উচিত। হিসাব-কিতাব, চিঠিপত্র ও অন্যান্য জায়গায় হিজরী তারিখের ব্যবহার অবশ্যই জরুরি। বিষয়টি যেহেতু মুসলমানদের শিআর (জাতীয় নিদর্শন) তাই এ বিষয়ে সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি। কারণ এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন দ্বীন হেফায়তের প্রেরণা এবং জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধের সংকট বা বিলুপ্তিরই নামান্তর।

মহররম ও আশুরার গর্হিত কার্যকলাপ

মহররম মাসের ফযীলত ও এর ইতিহাস-ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত। তদ্রূপ একে কেন্দ্র করে কাহিনীকারদের বানোয়াট কিস্সা-কাহিনী এবং রসম-পূজারীদের নানান গর্হিত রসম-রেওয়াজেরও কমতি নেই। আলকাউসারের ১ম উদ্বোধনী সংখ্যায় এ ব্যাপারে একটি সংক্ষিপ্ত তবে তাৎপর্যপূর্ণ ও সারগর্ভ আলোচনা রয়েছে। তাতে এ মাসের করণীয়-বর্জনীয় সবগুলোর উপরই মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা আছে।

সকলেরই জানা আছে যে, আশুরার রোযা অত্যন্ত বরকতময় আমল। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আগের এক বছর ও আগামী এক বছরের সগীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। অবশ্য ইসলামী স্বকীয়তা রক্ষা এবং বিজাতির সাদৃশ্য থেকে বাঁচার জন্য আশুরার সাথে ৯ বা ১১ তারিখেও রোযা রাখার বিধান রয়েছে।

শিয়াদের অনুসরণে কোনো কোনো মুসলমানও অজ্ঞতাবশত এ দিন বিভিন্ন গর্হিত ও শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র বিশিষ্ট সাহাবী সায্যিদুনা হযরত হোসাইন (রা.) এর শাহাদতকে কেন্দ্র করে ইসলামী আদর্শ, নবীজীর সুন্নত ও আহলে বাইতের শিক্ষা পরিহার করে শিয়ারা এ দিন মাতমের জুলুশ বের করে, বিভিন্ন হারাম কাজে লিপ্ত হয়, এমনকি এর সাথে তাযিয়ার মতো শিরকী কাজ পর্যন্ত সংযোজন করে থাকে। আফসোসের বিষয় এই যে, এসবই করা হয় আহলে বাইতের মহব্বতের নামে; অথচ খোদ শিয়াদের কিতাবাদিও সাক্ষ্য দেয় যে, এ সবই আহলে বাইতের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

হযরত হোসাইন (রা.)এর শাহাদত এজন্যই হয়েছিল যে, তিনি হকের ঝাঞ্জা বুলন্দ করতে চেয়েছিলেন, আমর বিল-মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে চেয়েছিলেন এবং শায়খাইন হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) প্রমুখ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের মতো নববী পদ্ধতির খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, যা ইয়াযীদ কর্তৃক পদদলিত হচ্ছিল। এ কথা সুস্পষ্ট যে, শিয়াদের না নববী পদ্ধতির খেলাফতের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে, না শায়খাইন বা হযরত উসমান (রা.)এর সাথে কোনো সম্পর্ক আছে। আর আহলে বাইতের নাম তো তারা সম্পূর্ণ প্রতারণার জন্যই ব্যবহার করে। কারণ আহলে বাইতের সকল ইমামই শিয়াদের আকীদা ও কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত ছিলেন এবং যখন থেকে শিয়া মতবাদ অস্তিত্ব লাভ করেছে তখন থেকেই তাঁরা শিয়াদের সবকিছু থেকে নিজেদের মুক্ত থাকার কথা ঘোষণা করেছেন। তাই হোসাইন (রা.)এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে তাদের মাতামের জুলুশ বের করাও একটি প্রতারণা। অবশ্য অজ্ঞ শিয়াদের ব্যাপারে একথা ভাবা যেতে পারে যে, তারা হয়ত পূর্বপুরুষদের অনুসরণে এটাকে (নাউযুবিল্লাহ) ইবাদত হিসেবেই করে থাকে। ঘটনা যাই হোক প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল, যে নববী শিক্ষার উপর সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইত অটল-অবিচল ছিলেন তা-ই অনুসরণ করা। মাতম, শোক পালন, জামা ছিঁড়ে, গাল চাপড়িয়ে অধৈর্য প্রকাশ ইত্যাদি যা কিছু মাতম জুলুশে করা হয়— সবই অত্যন্ত গর্হিত কাজ। হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট ভাষায় এগুলো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তারা যে তায়িয়া করে থাকে তা তো তাওহীদে বিশ্বাসী কালেমা পাঠকারী কোনো মুসলমান থেকে সংঘটিত হওয়া সম্ভবই নয়। একটু ভেবে দেখুন, তায়িয়া পূজা এবং মূর্তিপূজার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি?

প্রতারণার নতুন রূপ

স্মরণ রাখবেন, শিয়াদের প্রতারণার একটি নতুন সংস্করণ বের করেছেন বর্তমানের দেওয়ানবাগী সাহেব। তিনি কুরআন হাদীস ও দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ আকীদাকে বিকৃত করার মাধ্যমে ইলহাদ (মুনাফেকী ও ধর্মবিকৃতি)-এর নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন এবং একে ‘মোহাম্মাদী ইসলাম’ নাম দিয়ে সকল মুসলমান যারা কুরআন সুন্নাহ ও সঠিক ইসলামী আকীদার উপর ঈমান রাখে তাদের উপর এ অপবাদ আরোপ করেছেন যে, তারা সবাই ইয়াযীদী মুসলমান! আমরা এ অপবাদের জবাবে দেওয়ানবাগীকে একথাও বলতে পারি না যে, আমরা নই তোমরাই হলে

ইয়াযীদী মুসলমান। কারণ ইয়াযীদ অনেক বড় বড় গুনাহ ও অপরাধের শিকার হলেও সে একজন মুসলমান ছিল। কুরআন হাদীসের উপর তার ঈমান ছিল। ইসলামী আকীদা সে পোষণ করত। দেওয়ানবাগীর কুফর-শিরকের অস্তিত্ব সে যুগে ছিল না। সুতরাং যার কুফর ও নেফাক মক্কার কাফের ও মদীনার মুনাফিকদের চেয়েও জঘন্যতম তাকে কীভাবে ইয়াযীদের ন্যায় মুসলমান বাদশাহ (যদিও সে অপরাধী)-এর মতো বা তার অনুসারী বলা যায়?

দেওয়ানবাগীর আবিষ্কার 'মোহাম্মাদী ইসলাম'এর নীলনকশা যদি দেখতে চান তাহলে আমার বই 'তাসাওউফ (পীরমুরীদী) তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ (২৪৭-২৯২ পৃ.) পড়ুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের শাসনকর্তাদেরকে হোসাইন (রা.)এর মতো দ্বীন কায়েমের স্পৃহা এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের প্রেরণা দান করুন। আর তাঁর নাম ব্যবহার করে মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্টকারী নতুন পুরাতন সকল গোমরাহ ও মুনাফেককে আল্লাহ তাআলা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান করুন। আমীন। #

[ফেব্রুয়ারি '০৬ঈ.]

সফর মাস : প্রচলিত কুসংস্কার ও সময়ের শুভ-অশুভ

দিন-রাতের আবর্তন ও মৌসুমের পরিবর্তন হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কুদরতের একটি বড় নিদর্শন এবং বান্দার প্রতি তাঁর অনেক বড় অনুগ্রহ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ ارَادَ اَنۡ يُّذَكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا.

“আর তিনি এমন সত্তা, যিনি রাত ও দিনকে একে অন্যের পশ্চাতে গমনকারী বানিয়েছেন, সেই ব্যক্তির জন্য, যে বুঝতে চায় অথবা শোকর আদায় করার ইচ্ছা করে।” -সূরা ফুরকান ৬২

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা কিছু মাস, দিন ও রাতকে অন্যান্য মাস, দিন ও রাতের চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ বানিয়েছেন। সে সময় ভালো কাজের বরকত অনেক বেশি। কিন্তু কোনো মাস, দিন, রাত বা কোনো সময়কে অশুভ বানাননি। সময় আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও করুণা। উত্তম ও সঠিক কাজের মাধ্যমে মানুষ যে কোনো সময়কেই ফলপ্রসূ ও বরকতময় করতে সক্ষম।

কোনো মাস, দিন বা রাতকে অশুভ মনে করা কিংবা বিশেষ কোনো সময়কে বিশেষ কাজের জন্য অশুভ ও অলক্ষুণে মনে করা জাহেলিয়াতের কুসংস্কার। যেমন ইসলামপূর্ব যুগে কারো কারো এই ধারণা ছিল যে, বিবাহ-শাদির জন্য শাওয়াল মাস অশুভ ও অকল্যাণকর। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এই ভিত্তিহীন ধারণা এই বলে খণ্ডন করেছেন যে—

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ. فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي.

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসেই বিবাহ করেছেন এবং শাওয়াল মাসেই বিবাহ-রজনী উদযাপন করেছেন। অথচ তাঁর

অনুগ্রহ লাভে আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আর কে আছে?” -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪২৩

বর্তমানে কেউ কেউ মহররম মাসের ব্যাপারে এজাতীয় ধারণা পোষণ করে। তারা এ মাসকে বিবাহ-শাদির জন্য অশুভ মনে করে। এই ভ্রান্ত ধারণার পেছনে সম্ভবত এ মাসে হযরত হোসাইন (রা.)এর শাহাদতবরণের বিষয় কার্যকর। অথচ সময় কখনো অশুভ হয় না। বিশেষ করে মহররম তো ‘আশহুরে হুর্রুম’ তথা মর্যাদাপূর্ণ চার মাসের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ। রমযানের পর এ মাসের গুরুত্ব ও ফযীলতই সবচেয়ে বেশি। হযরত হোসাইন (রা.)এর শাহাদতের কারণে এ মাস কীভাবে অশুভ হতে পারে? অশুভ ও অকল্যাণ তো ওই সব লোকের বদআমলের মধ্যে নিহিত, যারা তাঁকে অন্যায়ভাবে শহীদ করেছে। বছরের কোন্ মাসটি এমন আছে, যাতে কোনো মহান ব্যক্তির শাহাদতের ঘটনা ঘটেনি? তবে কি বছরের সকল মাসই অশুভ ও অকল্যাণকর?

সফর মাসের ব্যাপারেও জাহেলি যুগে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, এ মাসটি অশুভ। নাউযুবিল্লাহ! এ জাতীয় ধারণা নিঃসন্দেহে কুসংস্কার, যাকে ইসলাম বাতিল ঘোষণা করেছে এবং এভাবে মানুষকে এক বিরাট বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে শান্তি ও স্বস্থির পথ সুগম করেছে।

কুসংস্কার অর্থ হচ্ছে, শুধু ধারণার ভিত্তিতে প্রমাণহীন কোনো বিশ্বাস পোষণ করা এবং কর্মক্ষেত্রে এর প্রভাব গ্রহণ করা। এ এমন এক মারাত্মক ব্যাধি, যা মানুষের মনকে নানা ধরনের কাল্পনিক বিষয়ের আখড়া বানিয়ে ছাড়ে; মানুষকে হতাশা ও দৃষ্টিভ্রান্তে নিমজ্জিত করে এবং বিভিন্ন ধরনের অর্থহীন রীতি ও রেওয়াজের দুর্বহ বোঝা তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়, অকারণে দৃষ্টিভ্রান্ত ও ভয়-ভীতির অসংখ্য ছিদ্রপথ উন্মুক্ত করে; বরং সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এই ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণার অনুসরণ শিরকের মত মহা অপরাধেরও মূল; কত অসংখ্য শিরকী বিশ্বাস ও কর্ম এবং বেদআতী কার্যকলাপ যে এ থেকে জন্ম নেয়, তা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

অশুভময়তায় বিশ্বাস ও কুলক্ষণ গ্রহণের প্রবণতাও একটি নিকৃষ্টতম কুসংস্কার, যা মানুষের জীবন-যাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। যেহেতু এর ভিত্তিই হল নানা কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা, তাই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর যে কত রূপ ও ধরন হতে পারে তা কল্পনারও অতীত।

কোথাও অমাবস্যার রাতকে বা রাতের বিশেষ অংশকে অশুভ মনে করা হয়, কোথাও বেজোড় রাতকে, কোথাও বা বিশেষ দিনকে, আবার কোথাও বিশেষ

স্থানকে অশুভ মনে করা হয়। একেকজন একেক বিষয়কে অশুভ কিংবা অমঙ্গলের লক্ষণ মনে করে। অনেকে বিশেষ দিন বা রাতকে বিশেষ কোনো কাজের জন্য অশুভ বলে মনে করে। এসবই মূলত আরব পৌত্তলিক ও ভারতীয় মূর্তিপূজারীদের অন্ধ অনুসরণ। কেননা তারা গ্রহ-নক্ষত্রের কাল্পনিক প্রভাব বা নানা অলীক ধারণার ভিত্তিতে এজাতীয় অর্থহীন বিষয় উদ্ভাবন করেছিল।

এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত মারাত্মক একটি কুসংস্কার এই যে, আজও অনেক মানুষ ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের মতো কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করাকে কুলক্ষণ বলে মনে করে। অন্তত প্রথম সন্তান কন্যা হওয়া যে অশুভ এতো অনেকেরই বিশ্বাস। দুঃখের ব্যাপার এই যে, অনেক ‘মা’ও কন্যা সন্তানকে অপয়া মনে করে। নাউযুবিল্লাহ!

ইসলামের একটি বড় অবদান এই যে, ইসলাম প্রমাণহীন কোনো ধারণা পোষণকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এমন স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন তাওহীদের বিশ্বাস দান করেছে, যাতে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের কোনোই স্থান নেই। বিশেষ করে কুলক্ষণ গ্রহণের মানসিকতা অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে ইসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ.

“রোগ লেগে যাওয়া”, ‘কুলক্ষণ’, ‘পেঁচা’ ও ‘সফর’ এসব হল অলীক কল্পনা। এসবের কোনো বাস্তবতা নেই।” —সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৭৪৩

এই হাদীসে কয়েকটি কুসংস্কারের অপনোদন করা হয়েছে :

ক. রোগ-ব্যাধি একজন থেকে অপরজনের সাথে লেগে যাওয়ার ধারণা। অর্থাৎ রোগব্যাধি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে একজনের শরীর থেকে উড়ে এসে অপরজনের শরীরে লেগে যেতে পারে, এই ধারণা শিরক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلِ — ‘তবে প্রথম রোগীর শরীরে কোথা থেকে রোগ এল?’ বলে এ ভ্রান্তবিশ্বাসের শিকড় কেটে দিয়েছেন। হ্যাঁ, যেসব রোগব্যাধির ব্যাপারে দলীল দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মেলামেশার ফলে তা সংক্রমিত হয়, সেক্ষেত্রে তাওহীদের বিশ্বাসের পাশাপাশি উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে দোষ নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শরীয়ত এর আদেশও করেছে। শরীয়তে যে বিষয়টি বাতিল ও ভ্রান্ত তা হল, কোনো ব্যাধিকে এমন মনে করা যে, তা নিজে নিজেই সংক্রমিত হতে পারে। অথচ উপকার ও অপকারের একমাত্র

মালিক আল্লাহ তাআলা। হায়াত-মওত, সুস্থতা-অসুস্থতা সবই তাঁর হুকুমে হয়।

দ্বিতীয় যে বিষয় এই হাদীসে ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হল, কুলক্ষণ গ্রহণ করা। হাদীসে এর জন্য طيرة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দের মূল হচ্ছে طير অর্থাৎ পাখি। আরব দেশে শুভাশুভ নির্ণয়ের অধিক প্রচলিত পন্থা এই ছিল যে, তারা কোনো কাজের সংকল্প করলে পাখি উড়িয়ে দিত। ডান দিকে উড়ে গেলে শুভ লক্ষণ, আর বাম দিকে গেলে অশুভ লক্ষণ মনে করত এবং সে হিসাবেই তারা কাজে অগ্রসর হত কিংবা কাজ থেকে বিরত থাকত। এরপর যে কোনো কুলক্ষণ গ্রহণই طيرة নামে আখ্যায়িত হয়েছে। তার পদ্ধতি যাই হোক না কেন।

ইসলাম এসব কাল্পনিক বিষয়কে ভিত্তিহীন ঘোষণা করেছে এবং স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, কুলক্ষণ গ্রহণ শিরকেরই একটি প্রকার। -মুসনাদে আহমাদ ১/৩৮৯; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৬১৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৯১০, ৩৯০৭

যে ব্যক্তি তাকদীরে বিশ্বাস করে এবং যার তাওহীদের বিশ্বাস স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন, যে একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই সকল কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক মনে করে, সে কেন সুলক্ষণ-কুলক্ষণের পেছনে পড়বে। এসব তো এমন লোকদের কাজ, যারা নানা ধরনের কাল্পনিক বিষয়কে আকীদারূপে গ্রহণ করে এবং কোনোরূপ দলীল ছাড়াই একটি বিষয়কে অমঙ্গলের চিহ্ন সাব্যস্ত করে বিপদ-আপদে এর প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। এজাতীয় বিশ্বাস শিরক ছাড়া আর কী হতে পারে?

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাহেলি যুগে আমরা পাখি উড়িয়ে শুভাশুভ নির্ণয় করতাম। তিনি ইরশাদ করলেন, “এ হল নফসের ওয়াসওয়াসা (অলীক কল্পনা)। অতএব এ কারণে উদ্ভিষ্ট কাজ থেকে বিরত হয়ো না।” -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৭৬৭

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “যদি অন্তরে এজাতীয় ওয়াসওয়াসা বা কল্পনা আসে তখন এই দুআ পড়ে কাজ আরম্ভ করবে-

اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

“হে আল্লাহ! একমাত্র তুমিই কল্যাণ দাও এবং তুমিই অকল্যাণ থেকে রক্ষা কর। আর কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ থেকে মুক্তি পাওয়ার শক্তিও তুমিই দিয়ে থাক।” -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৯১৯

অন্য এক হাদীসে এসেছে যে-

من رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوا: وَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

“যাকে কোনো অশুভ লক্ষণ উদ্দিষ্ট কর্ম থেকে বিরত রাখে সে (যেন) শিরক করল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, এর কাফফারা কী? ইরশাদ হল, একথা বল (ও কাজ শুরু কর।) “اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ” হে আল্লাহ মঙ্গল তোমার পক্ষ থেকেই আসে এবং অমঙ্গলও তোমার আদেশেই হয়। আর তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।” -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৭০৪৫

বস্তুত তাওহীদ এমনই সমুন্নত আকীদা যে, যার অন্তরে তা স্থান গ্রহণ করে, আল্লাহ ছাড়া সে ভয় করে না কাউকে। তার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হন একমাত্র আল্লাহ। এটিই তাওহীদের প্রাণ। যে অন্তরে এই প্রাণরস নেই, তাতে শিরকের ওই সমস্ত আগাছা বের হতে থাকবে, যা আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি।

তৃতীয় যে বিষয়টি এই হাদীসে বাতিল সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হল, পেঁচার ব্যাপারে জাহেলি কুসংস্কার। যেমন তাদের ধারণা ছিল যে, কোনো বাড়ির ছাদে বা গাছে পেঁচা বসলে সেখানে কোনো মানুষের মৃত্যু হবে বা কোনো বিপদ ঘটবে। অথচ হায়াত-মওত, বিপদ-আপদ সব কিছুই নির্ধারিত এবং সব কিছুই ঘটবে আল্লাহ তাআলার আদেশে নির্ধারিত সময়ে। পেঁচা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে এর কী সম্পর্ক? সব কিছুর খালেক, মালেক যাঁর আদেশেই সব কিছু ঘটে, তিনি কি পেঁচাকে বিপদ-আপদের নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন? এই ধারণাকে আকীদা হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে কোন দলীল আছে কি?

হ্যাঁ, বিপদ-আপদ সাধারণত গুনাহের কারণে ঘটে থাকে। এজন্য তওবা ও ইস্তেগফারের দরজা খোলা রয়েছে। তদ্রূপ কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকটে দুআ ও আশ্রয় প্রার্থনার দরজাও সর্বদাই খোলা। এসব জিনিসের প্রতিই গুরুত্ব সহকারে যত্নবান হওয়া উচিত।

চতুর্থ যে বিষয়টি হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে তা হল ‘সফর’। এর ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। একটি মত এই যে, জাহেলি যুগে সফর মাসকে অশুভ মনে করা হত। ইসলাম এই ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করেছে এবং একে অবাস্তব ও ভিত্তিহীন কুসংস্কার বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম জানিয়ে

দিয়েছে যে, অলক্ষুণে বা অপয়া হওয়ার ধারণা ইসলামে নেই। এগুলো হচ্ছে কুসংস্কার এবং মানব-মনের অলীক কল্পনা। সবচেয়ে বড় অশুভ বিষয় হল মানুষের বদআমল ও পাপাচার, যা আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও লানতকে ডেকে আনে। অতএব তা থেকে বিরত থাকা উচিত।

কোনো মাস, দিন বা রাতে কোনো অকল্যাণ নেই। সময় মাত্রই আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। অতএব তাকে কাজে লাগানো উচিত এবং নেক আমলের মাধ্যমে তাকে ফলপ্রসূ বানানো উচিত। এটাই কল্যাণ ও বরকত লাভের পথ। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন এবং সব ধরনের ওয়াসওয়াসা ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন।

এ সংক্রান্ত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য আগামী সংখ্যায় পড়ুন 'সময়ের শুভ-অশুভ : একটি পর্যবেক্ষণ'।#

[মার্চ '০৫ঈ.]

সময়ের শুভ-অশুভ : একটি পর্যবেক্ষণ

সুলক্ষণ ও কুলক্ষণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—

كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ وَيَكْرَهُ الطَّيْرَةَ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুলক্ষণ পছন্দ করতেন আর কুলক্ষণ গ্রহণ করা অপছন্দ করতেন। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৫৩৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৮২৪

গত সংখ্যায় (মার্চ '০৫ঈ.) 'সফর মাস : প্রচলিত কুসংস্কার ও সময়ের শুভ-অশুভ' শিরোনামে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, কোনো কিছু থেকে কুলক্ষণ গ্রহণ করা অতি নিন্দনীয় একটি প্রথা এবং অনেক ক্ষতি ও অকল্যাণের মূল। এর ভিত্তিতে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা এক ধরনের শিরক। যেহেতু সেই আলোচনায় 'সুলক্ষণ'-এর ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব হয়নি তাই সেখানে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, আগামী সংখ্যায় (বর্তমান সংখ্যা) 'সময়ের শুভ-অশুভ : একটি পর্যবেক্ষণ' শিরোনামে আরো কিছু আলোচনা করা হবে। সে হিসেবে বর্তমান লেখাটি পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করছি। তবে একটি বিশেষ বিবেচনায় এর মূল শিরোনাম নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে।

উপরোক্ত হাদীসে সুলক্ষণ ও কুলক্ষণের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুলক্ষণ পছন্দ করতেন কিন্তু কুলক্ষণ গ্রহণ করা পছন্দ করতেন না, অপছন্দ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা পছন্দ করতেন তার ব্যাখ্যা হাদীস শরীফেই রয়েছে। যার সারমর্ম হল, কোনো ভালো শব্দ শুনে আনন্দিত হওয়া এবং উদ্দিষ্ট কর্মে সফল হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া অথবা কোনো মানুষ বা স্থানের ভালো নাম শুনে

খুশি হওয়া। যেমন, কেউ রোগ শয্যায় রয়েছে। হঠাৎ এক ব্যক্তি সালাম নামক কাউকে ‘ও সালাম’ বলে ডাকল এবং অসুস্থ ব্যক্তির কানে এই আওয়াজ পৌঁছল। সে এই নাম থেকে সুলক্ষণ গ্রহণ করল যে, আল্লাহ আমাকে ‘সালামতী’ (সুস্থতা) দান করবেন অথবা কোন ব্যক্তি ঘর থেকে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, ঘটনাক্রমে রাস্তায় কেউ ‘নাজীহ’ নামক কোনো ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তি ‘হে নাজীহ’ শব্দে আহ্বান করল। এ থেকে তার মনে এই ধারণা সৃষ্টি হল যে, আল্লাহ আমাকে ‘নাজাহ’ (সফলতা) দান করবেন। অথবা যেমন একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আগতুককে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কোন গোত্রের লোক? লোকটি উত্তরে বলল, আসলাম গোত্রের। ‘আসলাম’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল, ‘অধিক নিরাপত্তার অধিকারী’। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা.)এর দিকে তাকিয়ে হুটচিটে বললেন— سلمنا ‘আমাদের নিরাপত্তা মিলেছে।’ এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, আসলাম গোত্রের কোন শাখার লোক তুমি?’ সে উত্তরে বলল, ‘বনু সাহ্ম শাখার।’ ‘সাহ্ম’ শব্দের এক অর্থ ভাগ্য। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কে পুনরায় বললেন, ‘আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে।’ —সহীহ মুসলিম (শরহুল উববী-সহ) ৬/৪২

এই হল সুলক্ষণের হাকীকত। ইমাম ইবনে কুতাইবা (রহ.) বলেন, “এই এতটুকু বিষয়ের সাথে আরবে সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ গ্রহণের যে প্রথা ছিল তার কোনো মিল নেই। কোনো ভালো বিষয় ভালো মনে হওয়া আর মন্দ জিনিস মন্দবোধ হওয়া মানুষের স্বভাবেরই অংশ। যথা অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থতার কথা বা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তিকে খুশির কথা আনন্দ দান করে। অথচ এটাও সত্য যে, এখানে যে বলছে আর যে শুনছে তাদের কারোরই এই বিশ্বাস থাকে না যে, এই সব শব্দের মাধ্যমে তাকদীর পরিবর্তন হয়। তেমনি কোনো ভালো জিনিস থেকে মনে আনন্দ আসা আর মন্দ জিনিস থেকে নিরানন্দিত হওয়াও মানুষের স্বভাবজাত। সুগন্ধি ফুল, সুন্দর বাগান প্রবহমান পানির ধারা সবার কাছেই পছন্দনীয়; অপর দিকে এর বিপরীত বিষয়গুলো সবারই অপছন্দের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভালো নাম শুনে খুশি হতেন এবং মন্দ নাম শুনে অখুশি হতেন তা এই স্বভাবরীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। —তাবীলু মুখতালিফিল হাদীস ১০১-১০২

সুলক্ষণ গ্রহণের মধ্যে আরো একটি ভালো দিক রয়েছে। তা এই যে, মানুষের মন আশান্বিত হয়, কর্মের প্রেরণা বৃদ্ধি পায় এবং হতাশা দূর হয়, যা সব সময়ই কাম্য। অতএব খুশির সামান্য কোনো উপলক্ষের দ্বারা যদি মনে আল্লাহ তাআলার

রহমত ও অনুগ্রহের আশা সজীব হয় তবে তা মন্দ কিছু নয় বরং এমনটি হওয়াই কাম্য। এজন্য ইসলামী শরীয়ত কোনো কৃত্রিম পন্থায় নয়; বরং ঘটনাচক্রে সংঘটিত হওয়া কোনো বিষয় থেকে এধরনের সুলক্ষণ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছে।

অপর দিকে কুলক্ষণ গ্রহণ করা একটি কুসংস্কার ও কল্পনাপ্রসূত বিষয় হওয়ার গাশাপাশি এতে মানুষের মনে হতাশা ও কর্মবিমুখতা সৃষ্টি হয় যা কখনো কাম্য নয়। কুলক্ষণ গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার এটাও অন্যতম বড় হেফজত।

কুরআন থেকে শুভ-অশুভ নির্ণয় করা

এখানে এ বিষয়টিও মনে রাখা উচিত যে, কারো কারো কুরআন মজীদ বা অন্য কোনো কিতাব থেকে শুভ-অশুভ নির্ণয়ের অভ্যাস আছে। কোনো কাজের ইচ্ছা হলে তা উচিত কি অনুচিত জানার জন্য কুরআন মাজীদ খোলে এবং খুলতেই প্রথম লাইনের প্রথম বাক্য থেকে কাজের শুভ-অশুভ নির্ণয়ের প্রয়াস পায়। এরপর সে কাজে অগ্রগামী হয় বা তা পরিত্যাগ করে। কেউ কেউ তো চরম মূর্খতার কারণে এই সিদ্ধান্তকে আল্লাহ তাআলার হুকুম মনে করে বসে। মনে রাখতে হবে, এভাবে কুরআন মাজীদ থেকে শুভ-অশুভ নির্ণয়ের চেষ্টা করা গোনাহের কাজ আর একে আল্লাহর হুকুম মনে করা তো চরম নির্বুদ্ধিতা এবং অনেক বড় কবীরা গোনাহ। হাদীসে সুলক্ষণ গ্রহণের যে বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে তার সাথে এর সামান্যতম সম্পর্কও নেই।

এ বিষয়ে হিন্দুস্তানের সাবেক প্রধান মুফতী, হযরত মাওলানা কেফায়েতুল্লাহ সাহেব লেখেন, ‘কুরআন মজীদ থেকে শুভ-অশুভ নির্ণয় করা নাজায়েয। তদ্রূপ অন্য কোনো কিতাব থেকে (যথা দেওয়ানে হাফেয, গুলিস্তা ইত্যাদি) শুভ-অশুভ নির্ণয় করা এবং তাতে বিশ্বাস করা জায়েয নয়। কিন্তু কুরআন মজীদ থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াস মারাত্মক গোনাহ। কেননা এতে অনেক সময় কুরআন মজীদের অসম্মান এবং কুরআনের ব্যাপারে অনাস্তা সৃষ্টি হয়। –কিফায়াতুল মুফতী ৯/২২১; আরো দেখুন, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৪০০

মোটকথা, শরীয়তে কোনো কিছু অশুভ হওয়ার বিশ্বাস পোষণ, কোনো কিছু থেকে কুলক্ষণ গ্রহণের কোনো অবকাশ নেই এবং কোনো কৃত্রিম পন্থায় শুভ-অশুভ নির্ণয় করাও বৈধ নয়। শুধু ঘটনাচক্রে সংঘটিত কোনো ভালো বিষয় দ্বারা মন আনন্দিত হওয়া বা কল্যাণের ব্যাপারে আশাবাদী হওয়ার বৈধতা রয়েছে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ঘটনাচক্রে সামনে আসা কোনো মন্দ ব্যাপার দেখে

কুলক্ষণ গ্রহণ করা জায়েয নয়। অন্তরে যদি এ ধরনের কোনো ওয়াছওয়াছা আসে তবে ওই দুআ পড়ে উদ্দিষ্ট কাজে অগ্রসর হতে হবে যা আগের প্রবন্ধে (পৃষ্ঠা ৭৯) লেখা হয়েছে।

প্রকৃত অকল্যাণ কোথায়

সবশেষে একটি বিষয় আরজ করছি। তা এই যে, আজকের সমাজে অনেক মানুষ শুধু কুসংস্কারের কারণে কুলক্ষণ গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন বস্তু, সময় ও স্থানকে অশুভ বলে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। অথচ বাস্তবে যে সব বিষয়ে অকল্যাণ রয়েছে তা থেকে বেঁচে থাকার ফিকির করে না। সূরা ইয়াসীন আয়াত ১৯ এবং আরো বিভিন্ন আয়াত থেকে প্রমাণিত যে, বদআমল, আল্লাহ তাআলার অবাধ্যাচরণ, শিরক, বেদআত এবং কুফর ও ইনাদ ইত্যাদিই অকল্যাণের মূল। এসব বিষয়ই আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও লা'নতকে ডেকে আনে। এজন্য এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত, যাতে আমাদের মন্দ কর্মের অশুভময়তা দ্বারা সমাজ ও পরিবেশ বিষাক্ত না হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করেন। আমীন।#

[এপ্রিল '০৫ঈ.]

রজব, মেরাজ ও শবে মেরাজ : কিছু কথা

মাহে রজব

৬২৭ হিজরী সালের ৬ রজব হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী (রহ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। এটাকে ভিত্তি করে প্রতি বছর এ মাসেই আজমীরে তাঁর কবরে ‘উরস’ হয়ে থাকে। যা এখন অসংখ্য অসভ্য ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড এবং নানা ধরনের শিরক ও বেদআতে পরিপূর্ণ থাকে। ‘উরস’ যদি সব ধরনের নাজায়েয কাজ, অশ্লীলতা, পর্দাহীনতা ও শিরকী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্তও হয় তবুও তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قُبُورِي عيدا، وصلُّوا عليَّ فإنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. رواه أبو داود، قال ابن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد نقله في «عون المعبود» ٦ : ٢٤

‘তোমরা নিজেদের ঘরকে কবর বানিয়ে না। (কবরের মত ইবাদত— নামায, তেলাওয়াত ও যিকির ইত্যাদিবিহীন রেখো না) এবং আমার কবরে উৎসব করো না। (বার্ষিক, মাসিক বা সাপ্তাহিক কোন আসরের আয়োজন করো না।) তবে আমার উপর দরুদ পাঠ কর। নিশ্চয় তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে থাকে। (আল্লাহ তাআলার ফেরেশতারা পৌঁছিয়ে থাকেন)।’—সুনানে আবু দাউদ ২০৪০

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ রওজা মুবারকে উৎসব পালন করতে বারণ করেছেন। তাহলে আর কে এমন আছে যার কবরে তা বৈধ হবে?

আল্লামা মুনাভী (রহ.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ‘এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, সাধারণ মানুষ যারা বছরের কোন নির্দিষ্ট মাসে বা দিনে (উরসের

নামে) ওলী-বুয়ুর্গের মাযারে একত্র হয় এবং বলে, আজ পীর সাহেবের জন্মবার্ষিকী (বা মৃত্যুবার্ষিকী) সেখানে তারা পানাহারের আয়োজন করে এবং নাচ-গানের ব্যবস্থা করে-এসবই শরীয়ত পরিপন্থী ও গর্হিত কাজ। প্রশাসনের কর্তব্য এসব কাজ প্রতিরোধ করা।' -আওনুল মাবুদ ৬/২৩

উরসের বিষয়টি শুধু এ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকলে তাকে একটি নাজায়েয কাজ বলা হত, কিন্তু বর্তমানে উরসের নামে যা কিছু করা হয় তা আরো অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। এখন উরস মানেই হল পর্দাহীনতা, অশ্লীলতা, নাচ-বাদ্য এবং নানা ধরনের বেদআত ও শিরকী কর্মকাণ্ড। এ অবস্থায় একে শুধু 'নাজায়েয' বলা যথেষ্ট নয়। এটা এখন শিরক, বেদআত ও অশ্লীলতার এক উন্মুক্ত প্রদর্শনী।

আরো ব্যাপার হল, হাজার মাইল দূরে আজমীরে 'উরস' হবে তার জন্য লালশালুতে মোড়ানো ডেগ লাগানো হয় এখানে, বাংলাদেশের রাস্তার ধারে, গলির মুখে। কেন? এতে মানুষের পয়সা ফেলার জন্য? এই পয়সা আসলে কোথায় যায়? সে প্রশ্নের উত্তর তো সবারই জানা। তবে এখানে যে বিষয়টি খুব ভালভাবে জেনে নেওয়া দরকার তা হল, মাযার বা মাযারওয়ালার নামে মানুষত করা নির্ভেজাল শিরক। মানুষত শুধু আল্লাহর নামেই হয়। গাইরুল্লাহর নামে মানুষত করার অর্থ হল তাকে হাজত-রাওয়া-প্রয়োজন পূরণকারী, মুশকিল-কুশা-বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী এবং মুখতারে-কুল-সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বাস করা। মনে রাখতে হবে, এই বিশ্বাস হল শিরক।

সে ডেগগুলোতে পয়সা ফেলার আরেকটি উদ্দেশ্য হতে পারে এর মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ রজব মাসের গান-বাদ্য ইত্যাদির আসরে ব্যয় করা। এ ধরনের আসরের আয়োজন সাধারণত একশ্রেণীর বে-শরা দরবেশ হযরত খাজা (রহ.)এর নাম বিক্রি করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যেই করে থাকে। এরা 'তাসাওউফ'এর নামে শরীয়তকে অস্বীকার করে; যার ছোট একটি দৃষ্টান্ত হল, গান-বাজনার মত হারাম বিষয়কে এরা হালাল বলে। উপরন্তু এদের গানের কথাগুলোও হল শিরকী কথাবার্তা।

এ ধরনের আসরে এক পয়সা দিয়েও যদি সাহায্য করা হয় তবে একটি হারাম কাজ করা হবে। আর যদি তাদের সেই সব নাজায়েয কর্মকাণ্ড ও কুফরী-শিরকী মতবাদকে সমর্থন জানানো হয় তবে সে ব্যক্তি ঈমান হারা হয়ে যাবে।

এসব গর্হিত কাজের পেছনে যে ভ্রান্তবিশ্বাসগুলো কাজ করে তার প্রতি মুসলিম ভাইয়েরা লক্ষ্য করেন না। তারা এই বিষয়গুলোকে খাজা সাহেবের স্মৃতিচারণ মনে করে থাকেন। এ জন্য এসব বিষয়ে কথা ও কাজ উভয় দিক থেকেই শিথিলতা

প্রদর্শন করা হয়। মনে রাখবেন, মুসলিমকে অন্তত দ্বীন ও ঈমানের ব্যাপারে এতটা বেখবর ও সরলমনা হওয়া উচিত নয়। মুমিনের গুণ হল সচেতনতা। প্রতারণা না করা যেমন মুমিনের পরিচয়, তেমনি প্রতারণিত না হওয়াও মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

এটা কত আফসোসের ব্যাপার যে, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) এবং তাঁর খলীফাগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে; তাওহীদের প্রচার পেয়েছে; সুন্নতের প্রসার ঘটেছে; সমাজ থেকে শিরক ও বেদআত বিলুপ্ত হয়েছে; যাদের জীবনের সাধনাই ছিল আল্লাহ তাআলার বান্দাদের কপাল সকল দরবার থেকে উঠিয়ে এক দরবারে আনত করার শিক্ষা দেওয়া এবং গাইরুল্লাহর সাথে যুক্ত অন্তরকে সেখান থেকে সরিয়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে যুক্ত করা অথচ সময়ের বিবর্তনে মূর্খ লোকেরা তাঁদেরকেই নিজেদের মাকসূদ বানিয়ে নিয়েছে এবং তাঁদের দরবারকেই সেজদার লক্ষ্য বানিয়েছে!

আরেকটি তিক্ত বাস্তবতা হল, এদেশের যত বেদ্বীন, শরীয়ত অস্বীকারকারী এবং শিরক-বেদআতের ধ্বজাধারী ভ্রষ্ট ‘পীর’ আছে ওরা নিজেদেরকে চিশতী পরিচয় দিতে এবং চিশতী সিলসিলার নাম ব্যবহার করে সাধারণ মুসলমানদেরকে ঈমানহারা করতে একদম উদগ্রীব হয়ে থাকে। দেওয়ানবাগী, চন্দ্রপাড়া, এনায়েতপুরী, সুরেশ্বরী, আটরশী ও মাইজভাণ্ডারী ইত্যাদি সবাইকে দেখবেন, চিশতী শাজারা দেখিয়ে নিজেদেরকে চিশতী বৈশিষ্ট্যের ধারক দাবি করে থাকে অথচ চিশতী সিলসিলা ও এ সিলসিলার গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সাথে এদের সামান্যতম সংযোগ নেই।

এটা তো খুব সহজেই বোধগম্য যে, শরীয়ত অস্বীকারকারী, দ্বীনের আকায়েদ বিকৃতকারী, শিরক ও বেদআতের প্রচার দানকারী ব্যক্তির কোনভাবেই চিশতী হতে পারে না। কেননা, চিশতী সিলসিলার বুয়ুর্গগণ তাওহীদ ও সুন্নতের ঝাঙকাবাহী ছিলেন এবং শরীয়তের ইত্তেবা-ই তাঁদের তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধির একমাত্র পথ ছিল। এজন্য কোন লোককে চিশতী সিলসিলার নাম নিতে দেখলেই তাকে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)এর অনুসারী মনে করা ঠিক নয়। কেননা চিশতী পরিচয় ধারণ করে অনেক বেদ্বীন এতদাঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণের দ্বীন ও ঈমান লুট করার কাজে লিপ্ত রয়েছে।

اے بسا ابلیس آدم روئے هست

پس بھر دست نباید داد دست واللہ حسیبہم وهو لهم بالمرصاد

মনে রাখবেন, বর্তমানে এতদাঞ্চলে চিশতী বুয়ুর্গানের উত্তরসূরি শুধু তাঁরাই যারা হয় দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত, এর চিন্তা ও রুচির সাথে একমত

বা এর পথ ও পদ্ধতি অনুযায়ী কর্মব্যস্ত ব্যক্তিবর্গকে তাওহীদ ও সুন্নতের ঝাঞ্ঝাবাহী মনে করেন। যারা দারুল উলুম দেওবন্দ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের উপর বেদআতী বা গোমরাহ হওয়ার অপবাদ আরোপ করে তারা হয় শিরক ও বেদআত উভয়ের মধ্যেই নিমজ্জিত বা কোন না কোন বেদআতে লিপ্ত। অন্যথায় দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষের কোন কারণ থাকতে পারে না।

সুতরাং শিরক ও বেদআতের সাথে যাদের ‘আশনাই’ রয়েছে তারা কখনো চিশতী বুয়ুর্গানের উত্তরসূরি হতে পারে না। কেননা চিশতী সিলসিলার মূল কথাই হল, শরীয়তের অনুসরণ, খালেস তাওহীদের বিশ্বাস এবং সুন্নতের অনুসরণ।

ইসরা ও মেরাজ

মেরাজের তাৎপর্য বিষয়ে একটি কথা

মেরাজের ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কুরআন হাকীমে সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা নাজম-এ রয়েছে এবং সীরাত, তাফসীর ও তারীখের প্রসিদ্ধ কিতাবাদি ছাড়াও খোদ হাদীসের গ্রন্থাদিতেও এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ মহাসফরের তাৎপর্য কী, এতে কী কী তত্ত্ব ও ইশারা রয়েছে এবং এর শিক্ষা ও নির্দেশনাই বা কী-এসব বিষয়ও কুরআন হাদীসে কিছু স্পষ্টভাবে আর কিছু ইঙ্গিতময়তার সাথে উল্লেখিত হয়েছে। গত বছর আলকাউসার রজব সংখ্যায় ‘মেরাজ : কিছু তত্ত্ব, কিছু শিক্ষা, কিছু ভুল ধারণার সংশোধন’ শিরোনামে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছিল। সেই আলোচনা থেকে এ প্রসঙ্গে কিছু মৌলিক ও বুনিয়াদি কথা জানা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আজকের আলোচনায় যে বিষয়টি বলতে চাই তা হল, কিছু অতিউৎসাহী মানুষ মেরাজের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে এক আশ্চর্য কথা বলে থাকেন। তাদের বক্তব্য হল মেরাজের সফর ছিল একটি রাজনৈতিক সফর। এর উদ্দেশ্য ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ। কেননা, কিছু দিন পরেই ছিল হিজরতের পর্ব এবং তারপরই মদীনায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আসছিল। তাই হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজ করানো হয়েছিল এবং সেখানে সূরা বনী ইসরাঈল ২২ থেকে ৩৯ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে উল্লেখিত নির্দেশনাগুলো প্রদান করা হয়েছিল তাঁর আগামী হুকুমতের সংবিধানরূপে!

আসল কথা হল, আমাদের চিন্তাবিদদের একটি শ্রেণী যাদের চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা চিন্তা ও রুচির ধারাটির সাথে

সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং যাদের কুরআন হাদীস ও দ্বীনী শাস্ত্রাদিতে বুৎপত্তির মকাম নেই, তারা একটি বিশেষ রঙের চশমার পেছন থেকে দৃষ্টিপাত করে থাকেন। ফলে দ্বীনের বিষয়াদি, পরিভাষা ও বিধানাবলি এক কথা দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়ের তাৎপর্য ও দর্শন সম্পর্কে যখন তারা ভাবেন তখন তাদের সামনে সেই রঙটিই প্রকাশ পেতে থাকে।

এ শ্রেণীর চিন্তাবিদদের মধ্যে কিছু আছে যারা হুকুমত ও রাজনীতির চশমা ঝুঁটে রেখেছেন। ফলে দ্বীনের সকল বিষয়েই তাদের দৃষ্টিতে শুধু রাজনীতিই ভেসে ওঠে। তাওহীদ ও ইবাদত থেকে শুরু করে আদব ও আখলাক, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা পর্যন্ত সকল বিভাগেই শুধু রাজনীতিই দৃষ্টিগোচর হয়। একই কারণে এই বন্ধুরা মেরাজের ঘটনাটিকেও একটি রাজনৈতিক সফর বানিয়ে দিয়েছেন। এ না হলে মেরাজের মুজেরার সাথে রাজনীতির ও হুকুমতের কী সম্পর্ক?

ইসরা ও মেরাজের তাৎপর্য কুরআন হাকীম নিজেই বর্ণনা করেছে। তা হল- *لنريه من آياتنا* 'যাতে আমি তাকে আমার (কুদরতের) কিছু নিদর্শন দেখাই।' সূরা নাজম-এ কিছু নিদর্শন উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে- *لقد رأى من آيات ربه الكبرى* 'তিনি তাঁর পালনকর্তার কিছু বড় বড় নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন।'।

কুরআনে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, আখিয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করানোর উদ্দেশ্য তাদেরকে প্রত্যক্ষ দর্শনের বিশ্বাস এবং অন্তরের সর্বোচ্চ প্রশান্তির মকামে পৌঁছানো।

মেরাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসব ঐশী নিদর্শন প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে, তার উল্লেখ কুরআনে থাকুক বা হাদীসে, তার প্রত্যেকটির উপর বারবার চিন্তা করুন। কোনটির সাথেই কি রাজনীতি ও হুকুমত-এর সামান্যতম সম্পর্ক আছে?

মেরাজে যে তিনটি বিষয় হাসিল হওয়ার কথা হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে এসেছে সেখানে কি হুকুমত সম্পর্কে একটি শব্দও আছে? সেই তিনটি বিষয় হল- (১) নামায, যা মুমিনের মেরাজ ও ঈমানের অঙ্গ। (২) সূরা বাকারার শেষ কটি আয়াত, যেখানে ঈমান-আনুগত্য এবং দুআ উল্লেখিত হয়েছে। (৩) শিরক থেকে বেঁচে থাকার তাকিদ এবং এর বিনিময়ে মাগফেরাত লাভের সুসংবাদ। এসবের মধ্যে হুকুমতের কোন্ মূলনীতিটি উল্লেখিত হয়েছে?

তবে যারা -আল্লাহর পানাহ- নামাযকেও রাজনৈতিক ট্রেনিং মনে করেন তারা তো নামায ফরয হওয়ার বিধানের সাথে হুকুমত ও রাজনীতির নিগূঢ় সম্পর্কই

দেখতে পাবেন। সত্যি বলতে কি, দৃষ্টিভঙ্গিই যদি বাঁকা হয় তখন সকল উপদেশই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

যদি এই বন্ধুরা একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে ভাবতেন যে, যাদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল তারা পৃথিবীতে বাস করেন এবং পৃথিবীতেই বিচরণ করেন তাহলে এই প্রজা-শাসনের প্রশিক্ষণের জন্য উর্ধ্বজগৎ ও সেখানকার বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করানোর কী অর্থ হতে পারে? উর্ধ্বজগতের পরিচালনা-বিধি যে ভূজগতের পরিচালনা-বিধি থেকে ভিন্নতর তা তো বলাই বাহুল্য। একজন সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিও একথা বোঝেন যে, ইসলামী রাজ্য চালনা আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত শরীয়তি আইন-কানূনের ভিত্তিতে হয় আর উর্ধ্বজগতের পরিচালনা হয় রাক্বুল আলামীনের তাকব্বীনী বিধান দ্বারা।

আপনি রাজ্য-চালনার প্রত্যক্ষ বিধিবিধান কুরআন হাদীস থেকে এক এক করে পড়ুন এবং মনোযোগের সাথে বারবার পড়ুন। এই বিধানগুলো ইসলামী রাজ্য-পরিচালনা বিষয়ক গ্রন্থাদিতেও সন্নিবেশিত আছে। এরপর বলুন, এই বিধানগুলোর কোনটি মেরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয়েছিল! বাস্তব প্রশিক্ষণের বিষয়টি তো আরো দূরের কথা।

২. খুবই দুঃখজনক একটি বিকৃতি

সেই চিন্তাবিদদের মধ্যে কেউ কেউ তো বিকৃতির চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। তাদের বক্তব্য থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তারা পাশ্চাত্যের রাজনীতিকেই ইসলামী ‘সিয়াসত’ মনে করেন। খন্দকার প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত দরসে কুরআন সিরিজ-১০ ‘মেরাজে তাৎপর্য’ নামের পুস্তিকাটির ১১-১২ পৃষ্ঠায় মেরাজের তাৎপর্য আলোচনা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে, ‘... আল্লাহ পাক আগেই বলেছিলেন, কাফের-মুশরিকরা চাইবে না খোদায়ী জীবন-ব্যবস্থা সমাজে পুরোপুরি কায়েম হোক। শেষ পর্যন্ত ঘটলও তাই। কাফের-মুশরিকরা ভীষণভাবে বিরোধিতা করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রতিরোধ করলেন। এ জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবন-মরণ জিহাদ করতে হল। জিহাদ করার জন্য আল্লাহ কড়া হুকুম নাযিল করলেন। শুধু জিহাদের উদ্দেশ্যে নাযিল হল সূরা আহযাব, সূরা আনফাল, সূরা তওবা ও অন্যান্য সূরার মধ্যে কিছু কিছু আয়াত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন যে-

إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلِّ الشَّيْوَفِ

‘অবশ্যই বেহেশত তরবারির ছায়াতলে।’ -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৮১৮

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পছন্দমত সমাজ কায়েম না করলে তাঁর রেজামন্দি হাসিল করা যায় না। আল্লাহ তাআলার রেজামন্দি হাসিল করতে না পারলে বেহেশত পাওয়া যায় না। তাই আল্লাহর নবী অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথাই বললেন, ‘তরবারির ছায়াতলেই বেহেশত।’

‘এ যুগে যা আন্দোলন, দাবি উত্থাপন ও ভোটের মাধ্যমে সম্ভব সে যুগে তা ছিল তরবারির মাধ্যমে সম্ভব। তাহলে সে যুগে তরবারি বলতে এ যুগের ইসলামী আন্দোলন, দাবি উত্থাপন ও দাবি মোতাবেক সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে ভোট প্রদানই বুঝতে হবে। ওই হাদীসের অর্থ এখন এরূপ করা ঠিক হবে না যে, এখন তরবারি ধরতেই হবে। এখানে দেখতে হবে, সে যুগে যে উদ্দেশ্যে তরবারি ধরা হয়েছিল এখন সেই উদ্দেশ্য কিসের মাধ্যমে হাসিল হয়। যার মাধ্যমে সেটা হাসিল হয় তাই এ যুগের তরবারি। আর তারই ছায়াতলে বেহেশত। একথাই বুঝতে হবে উপরোক্ত হাদীস থেকে।’

দেখলেন, কীভাবে পাশ্চাত্যের রাজনীতিকে ইসলামী জিহাদ আখ্যা দেওয়া হল এবং কীভাবে হাদীসের অপব্যাক্ষা করে জিহাদের মত একটি শাস্ত্রত বিধানকে অস্বীকার করা হল। বোঝা যায় এ শ্রেণীর চিন্তাবিদগণ যখন মেরাজকে রাজনৈতিক সফররূপে উপস্থাপন করেন তখন তাদের কথায় সম্ভবত পাশ্চাত্য প্রকৃতির রাজনীতিই উদ্দেশ্য হয়। আল্লাহ তাআলা এদের হেদায়েত দান করুন; যাতে তারা দরসে কুরআনের নামে ইসলামী বিধান আকীদা ও পরিভাষাসমূহকে বিকৃত করা থেকে নিরাপদ থাকতে সক্ষম হন।

মেরাজে অর্জিত চৌদ্দটি নির্দেশনা!

কিছু চিন্তাবিদকে দেখা যায় তারা সূরা বনী ইসরাঈলের ২২ আয়াত থেকে ৩৯ আয়াত-এ উল্লেখিত বিধানগুলোর ব্যাপারে কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই দ্বিধাহীন ভাষায় বলে দেন যে, এগুলো মেরাজ রজনীতে অবতীর্ণ আয়াত ও আহকাম। মাওলানা শিবলী মরহুম ‘সীরাতুননাবী’তে শুধু সম্ভাবনার আঙ্গিকে লিখেছেন যে, ‘আমার ধারণা হয় এই আয়াত ও আহকাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজের রাতেই দেওয়া হয়েছিল।’ কিন্তু পরবর্তী সময়ে অনেক ব্যক্তিকে দেখা গেছে যে, তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে একটি প্রমাণসিদ্ধ বাস্তবতার মত করে একে লেখা ও বলায় নিয়ে আসেন। আরো বলেন যে, ‘এই নীতিগুলো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজ রজনীতে দেওয়া হয়েছিল তা শুধু কিছু নৈতিক বৈশিষ্ট্যরূপেই দান করা হয়নি। বস্তুত এগুলো ছিল ইসলামের

‘মেনিফেস্টো’ এবং ওই সব প্রোগ্রাম যার ভিত্তিতে আগামী সময়ে সমাজ বিনির্মাণের দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তাচ্ছিল। এই নির্দেশনাগুলো তাঁকে সে সময় দেওয়া হয়েছিল যখন তাঁর আন্দোলন ‘দাওয়াত’এর পর্যায় থেকে ‘হুকুমত’ ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠার পর্যায়ে পদার্পণ করতে যাচ্ছিল...।’ -মেরাজ কী রাত, সাইয়েদ আবু আ'লা মওদুদী-মাওলানা ওয়াহিদুদ্দীন খান কৃত ইসলাম কী সিয়াসী তাবীর ৩৮

তাদের এই কর্মনীতি (শুধু অনুমানের ভিত্তিতেই একটি ধারণাকে প্রমাণসিদ্ধ বাস্তবতা বানিয়ে দেওয়ার নীতিটি)এর ব্যাপারে আমরা শুধু এটুকুই বলি যে, উপরোক্ত আয়াতগুলোর একটিতে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত তাকিদে সাথে বলেছেন-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

এই আয়াতে তাকিদে সাথে বলা হয়েছে যে, দলীল ছাড়া শুধু ধারণার ভিত্তিতে কোন কিছুর অনুবর্তী হয়ো না। অন্যথায় আখেরাতে জবাবদিহিতার বিষয়টিও পরিষ্কারভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সুস্পষ্ট বিধান থাকা অবস্থায়, বিশেষত ওই আয়াতে যা তাদের আলোচ্য আয়াতসমূহেরই একটি, শুধু ধারণা ও আন্দাজের ভিত্তিতে কীভাবে তারা বলে দিচ্ছেন যে, এই আয়াতগুলো মেরাজ রজনীতেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা পুনরায় তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

‘আর যে বিষয়ে তোমার ইলম নেই তার অনুগামী হয়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তঃকরণ-এসবের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।’ -সূরা বনী ইসরাঈল ৩৬

৪. মেরাজে কত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে

কুরআন কারীম ও একাধিক সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইসরার ঘটনা এক রাতে সংঘটিত হয়েছিল এবং তাতে পুরো রাত ব্যয় হয়নি। হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, এই সফরের সূচনা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর। জিব্রীল (আ.) এসে তাঁকে জাগিয়েছেন, সীনা চাক হয়েছে; এরপর সফরের সূচনা হয়েছে। এরপর ভোর হওয়ার আগেই পূর্ণ সফর সমাপ্ত হয়েছে এবং তিনি মক্কা মুকাররমায় ফিরে এসেছেন।

এটা হল কুরআন হাদীসে উল্লেখিত সত্য ঘটনা; যে ব্যাপারে কোন মুমিনের সামান্যতমও সন্দেহ থাকতে পারে না। মেরাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের কাজ ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁর শক্তি ও কুদরতের

মাধ্যমে মক্কা থেকে মেরাজে নিয়ে গেছেন এবং সব কিছু প্রত্যক্ষ করিয়ে আবার মক্কা মুকাররমায় পৌঁছে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলার কুদরতে এরচেয়েও কম সময়ে এরচেয়েও দীর্ঘ সফর সমাপ্ত হওয়া সম্ভব। আর মেরাজ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মুজেযা। এখানে অস্বাভাবিক ঘটনাবলিই সংঘটিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল, কিছু বন্ধু এতে পরিতুষ্ট হতে পারেন না। তারা তালাশ করতে থাকেন মেরাজের ঘটনায় কত বছর অতিবাহিত হয়েছে। এরপর কিছু মানুষ শুধু ধারণার ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে বলতে থাকেন যে, সে সময় সূর্যের গতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সময় থেমে গিয়েছিল। এ অবস্থায় যদি বছরের পর বছরও অতিবাহিত হয়ে যায় তো অসম্ভব কিছু নয়; কিন্তু অতিউৎসাহী কিছু মানুষ বিনাদ্বিধায় ২৬/২৭ বছর অতিবাহিত হওয়ার কথা বলে দেন। অর্থাৎ সাধারণ সময়ের হিসাবে মেরাজ রজনীতে নাকি এই পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়েছিল! এ জাতীয় প্রমাণহীন কথাবার্তার ব্যাপারেও শুধু এটুকু বলে দেওয়াই যথেষ্ট—‘আর যে বিষয়ে তোমার ইলম নেই তার অনুগামী হয়ো না।’—সূরা বনী ইসরাঈল ৩৬

قل هاتوا برهانكم ان كنتم صدقين

‘বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত কর।’—সূরা বাকারা ১১১

৫. ইসরা-মেরাজের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অঙ্গ

বাইতুল মাকদিস (মসজিদে আকসা) পর্যন্ত সফরের উল্লেখ হয়েছে কুরআন হাকীমে সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতে এবং উর্ধ্বজগতের সফরের কথাটি সূরা নাজমের ১৩ থেকে ১৮ আয়াতে। আর ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ, যা মেরাজেরই অংশ, সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

একটি কথা খুব ভালভাবে মনে রাখা দরকার। তা হল, মেরাজের হাদীস সনদের বিবেচনায় ‘মুতাওয়াতির’ এবং তা ‘সহীহ’ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। এর বিষয়বস্তু একটি ইসলামী আকীদা হিসাবে গোটা উম্মাহর কাছে ‘মুতালাক্কা বিল-কবুল’ অর্থাৎ অবিসংবাদিত। তাই মেরাজের ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে ঈমান রাখা ফরয এবং তা ইসলামের অকাট্য আকীদাসমূহের একটি। তেমনি এই সফর স্বপ্নে বা শুধু রূহানীভাবে হয়নি, বরং জাযত অবস্থায় সশরীরে হয়েছিল—এ বিষয়টিও অকাট্য এবং ঈমানের অংশ।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ.)এর ভাষায়—

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই রাতের সফর ও তাতে সংঘটিত ঘটনাবলি-এসবই হল ঈমানের পরীক্ষা এবং কাফের-মুমিনের পার্থক্য নির্ণায়ক এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতের একটি নিদর্শন। এতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষার উপকরণ এবং যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর কর্মের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছে তাদের জন্য এতে রয়েছে হেদায়েত, রহমত ও দৃঢ়তা। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় নিয়ে গেছেন, যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেছেন, তাঁকে তাঁর পালনকর্তার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। ফলে তিনি আল্লাহ তাআলার শান ও অসীম কুদরতের অনেক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর কুদরতের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেছেন।” -সীরাতে ইবনে হিশাম ৩/৩৯৫-৩৯৬

ইমাম আবুল খাত্তাব ইবনে দিহয়াহ-এর ভাষায়-

حديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون، يريدون
ليطفنوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.

“ইসরার হাদীসের ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে এবং বেদ্বীন ও মূলহিদরা তা থেকে বিমুখ হয়েছে। তারা চায় ফুৎকারে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে। আর আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণ করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।” -আলইবতিহাজ ফী আদাদিসিল মিরাজ ৫৯

এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কিছু কিছু বক্তাকে গবেষণার ভাষায় বলতে শোনা যায়, বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত যে সফর হয়েছিল তা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত আর অন্য বিষয়গুলো এসেছে শুধু হাদীসে ...। তারা একথাটি এমন ভঙ্গিতে বলেন, যেন যে বিষয়গুলো শুধু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় তা দুর্বল কিসিমের কথা। এগুলো অস্বীকার করলে তেমন কোন অসুবিধা নেই। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক! খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে, এমন ধরনের উপস্থাপনা খুবই ভয়াবহ এবং ঈমানের জন্য খুবই মারাত্মক। হাদীস শরীফ শরীয়তের একটি স্বতন্ত্র দলীল। হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত অসংখ্য বিধান ও আকায়েদ ঠিক কুরআন দ্বারা প্রমাণিত আহকাম ও আকায়েদের মতই অকাট্য। কেননা, হাদীসের একটি বড় অংশ তাওয়াতুর-এর সাথে বর্ণিত এবং আরেকটি বড় অংশ ‘তালাক্বি বিল-কবূল’ ও ইজমা দ্বারা সমর্থিত। এ ধরনের বর্ণনাগুলো শাস্ত্র ও বাস্তবতার নিরিখে অকাট্য। তাছাড়া যে হাদীসগুলো ‘আখবারে আহাদে সহীহা’- একক সহীহ সূত্রের ভিত্তিতে প্রমাণিত তা-ও হাদীসেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলোকে অস্বীকার করা বা অযথার্থ ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই।

এ জন্য বক্তাদের কর্তব্য হল, খুব ভেবে-চিন্তে অগ্রসর হওয়া। এমন কথা ও উপস্থাপনা থেকে সচেতনভাবে বেঁচে থাকা উচিত, যাতে সাধারণ মানুষের মনে হাদীসের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অন্যথায় তাদের বক্তৃতা অন্যের হেদায়েতের স্থলে গোমরাহির কারণ হবে এবং বক্তৃতাদাতা *ضَلُّوا وَأَضَلُّوا* 'নিজেও গোমরাহ, অন্যকেও গোমরাহ করে' এই হাদীসের আওতায় পড়ে যাবেন।

উপরে বলা হয়েছে, মেরাজের হাদীসটি মুতাওয়াতির এবং এর সাথে ইজমা ও 'তালাক্কি বিল-কবূল' এর বৈশিষ্ট্যও যুক্ত আছে। তাই এটি বর্ণনাধারা ও মর্ম উভয় দিক থেকে অকাট্য ও সংশয়হীনভাবে প্রমাণিত।

আরেকটি বিষয়েও আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি। তা হল, মুসলিমমাত্রই বিশ্বাস করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজের ঘটনাটি জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে হয়েছিল। এটিই মুসলিম উম্মাহর ইজমাবিশিষ্ট অকাট্য আকীদা। কিন্তু আজকাল যেহেতু নির্বিচারে সব ধরনের কিতাবাদিই অনুদিত হচ্ছে এবং অনুবাদকগণ আপত্তিজনক ও অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাসমূহ যাচাই-বাছাই না করে সব ধরনের বিবরণ বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, তাই আলোচ্য বিষয়েও যে আশঙ্কা মনে জাগছে তা হল, কিছু মানুষ বলে বসতে পারেন, ভাই, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, মেরাজ রজনীতে নবীজীর শরীর মোবারক বিছানা থেকে অনুপস্থিত ছিল না এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেছেন, মেরাজের ঘটনা একটি সত্য স্বপ্ন ছিল। দুই সাহাবী থেকে এই দুটি বর্ণনা কিতাবে পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে কীভাবে বলা যায় যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মেরাজ হওয়া গোটা মুসলিম উম্মাহর ইজমায়ী তথা অবিসংবাদিত ও অকাট্য আকীদা?

এই বন্ধুদের খেদমতে আরয় করি, এই প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য আগে দেখতে হবে উপরোক্ত বর্ণনা দুটি বিশুদ্ধ কি না এবং কোন নির্ভরযোগ্য সনদে উক্তি দুটি বর্ণিত হয়েছে কি না?

জ্ঞানী ব্যক্তিগণের কাছে এর উত্তর স্পষ্ট। অর্থাৎ উপরোক্ত উক্তি দুটি কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়নি। হযরত আয়েশা (রা.) এর সঙ্গে যে কথাটি যুক্ত হয়েছে তার সনদে একজন 'মাজহুল' রাবী রয়েছে এবং সনদে 'ইনকিতা-বিচ্ছিন্নতা' রয়েছে। এ ছাড়া অন্য আরো কিছু দলীলের মাধ্যমে এর ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত।

এখান থেকে ইমাম আবুল আব্বাস ইবনে সুরাইজ-এর উক্তির যথার্থতাই প্রমাণ হয়। তিনি বলেছেন, 'উক্তিটি হযরত আয়েশা (রা.) এর উপর আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি বলেননি, কিন্তু তাঁর নামে বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল

এই ছুতোয় এ বিষয়ক সহীহ হাদীসগুলো প্রত্যাখ্যান করার রাস্তা সুগম করা।
-শরহুল মাওয়াহিব, যুরকানী ৮/৭

তেমনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)এর সাথে যে কথাটি যুক্ত হয়েছে তাও তিনি বলেছেন বলে প্রমাণিত নয়। যে সনদে উক্তিটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে সুস্পষ্ট 'ইনকিতা'-বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। দেখুন, মাকালাতুল কাউসারী ৪১৯

তাছাড়া এটিও অত্যন্ত সরলকথা যে, কুরআন হাকীম ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে যে বিষয়টি প্রমাণিত এবং যে বিষয়ের প্রতি সর্বযুগের মুসলমানদের ইজমা সম্পন্ন হয়েছে তা কি তারা অস্বীকার করতে পারেন? বাস্তব কথা হল, তারাও অন্য সব সাহাবীর মত মেরাজের ঘটনাটিকে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত একটি মুজেযা মনে করেন। এর বিপরীত দাবি করতে হলে উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে হবে।

৬. দুটি ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত

মেরাজের ঘটনা সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলা হল যে, এর প্রতি ঈমান রাখা জরুরি এবং ইসলামী আকীদার একটি অংশ, তা থেকে উদ্দেশ্য সেই ঘটনাটিই যার বিবরণ কুরআন হাকীম এবং সহীহ হাদীস ও গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। এ ছাড়া মেরাজের বিবরণের অজুহাতে যেসব ভিত্তিহীন ও আজেবাজে কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা হয় তার কোনই মূল্য নেই। এগুলো মেরাজের ঘটনার অংশ নয়। এখানে এই ধরনের দুটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করছি। এ দুটি উল্লেখ করার কারণ হল, এগুলো সম্পর্কে আমার কাছে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রশ্ন এসেছে।

প্রথম রেওয়ায়েত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমার নিকট জিব্রীল (আ.) এসেছিলেন এবং আমার পরওয়ারদেগারের মহান দরবারের সফরে আমার সঙ্গী ছিলেন। তিনি একস্থানে গিয়ে থেমে যান। আমি বললাম, হে জিব্রীল, এমন স্থানে এসে বন্ধু কি বন্ধুকে পরিত্যাগ করে? জিব্রীল উত্তর দিলেন, যদি আমি আর একটু অগ্রসর হই তবে আমার পাখাগুলো জ্বলে ছাই হয়ে যাবে।'

'এরপর আমাকে নূরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল এবং সত্তর হাজার পর্দা পার করানো হল। যার একটি পর্দার সঙ্গে অন্য পর্দার কোন মিল ছিল না। আমার সাথে মানব ও ফেরেশতাকুলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ওই সময় আমার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হলে এক ঘোষণাকারী আবু বকরের কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন যে, থামুন! আপনার প্রভু সালাতে নিয়োজিত রয়েছেন। আমি আবেদন করলাম, দুটি বিষয় আমার কাছে বড় আশ্চর্যজনক মনে হল। একটি হচ্ছে, আবু বকর কি আমার

চেয়েও অগ্রগামী রয়েছেন? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আমার পরওয়ারদেগার তো সালাতের মুখাপেক্ষী নন। তখন ইরশাদ হল, হে মুহাম্মাদ, এই আয়াত পাঠ করুন—

هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور
وكان بالمؤمنين رحيما

সুতরাং আমার সালাতের অর্থ হল আপনার ও আপনার উম্মতের প্রতি রহমত। আর আবু বকরের কণ্ঠস্বরের ঘটনা হল আমি একজন ফেরেশতা আবু বকরের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি, যে আপনাকে আবু বকরের কণ্ঠস্বরে ডাকবে। তাহলে আপনার অস্বস্তি দূর হবে এবং আপনি এতটা ভীত হবেন না, যা আসল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়।’

দ্বিতীয় বর্ণনাটি সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নরূপ :

‘সত্তরটি পর্দা যার প্রতিটির ব্যাস ছিল পাঁচশ বছরের রাস্তা। পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করার পর একটি রফরফ তথা সবুজ রঙের মসনদ আমার জন্য আনা হল এবং আমাকে তাতে বসানো হল। এরপর আমাকে উপরে ওঠানো হল। শেষ পর্যন্ত আমি আরশ পর্যন্ত পৌঁছলাম। সেখানে আমি এমন মহান বিষয় দেখেছি যার বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

এই বর্ণনা দুটি আরো দীর্ঘ। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। রেওয়ায়েত দুটির ব্যাপারে (মুহাদ্দিস) শামী (রহ.) বলেছেন— وهو كذب بلا شك ‘এগুলো নিঃসন্দেহে মিথ্যা।’ -শরহুল মাওয়াহিব, যুরকানী ৮/২০০

আল্লামা যুরকানী শরহুল মাওয়াহিব ৮/২০০-এ এক গ্রন্থকারের উপর আশ্চর্য প্রকাশ করে বলেছেন, ‘তিনি এমন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিবরণ কীভাবে তার কিতাবে স্থান দিলেন।’

প্রসঙ্গত এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া অসমীচীন হবে না যে, উপরোক্ত রেওয়ায়েত দুটি হাকীমুল উম্মত খানভী (রহ.) কৃত ‘নাশরুত তীব’ কিতাবেও রয়েছে। কিন্তু তিনি এই দুটি রেওয়ায়েতের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি, বরং রেওয়ায়েত দুটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন—

مواهب میں ابن غالب کے حوالے سے ان روایات کو شفاء الصدور سے نقل کر کے لکھا ہے ”والعبدۃ
علیہ...“ نشر الطیب ص ۶۱۔

এই বক্তব্যের অর্থ হল, এই দুটি রেওয়ায়েত ইবনে গালেব বর্ণনা করেছেন, এই দায়িত্ব তার। আমাদের জানা নেই তিনি সहीহ বর্ণনা করেছেন, না ভুল।

এ স্থলে এ কথাটি বলে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল, যারা তাহকীক করতে সক্ষম তারা তাহকীক করে নেবেন, রেওয়ায়েতগুলো সহীহ কি ভিত্তিহীন। শুধু ইবনে গালেবের উপর নির্ভর করে একে সহীহ মেনে নেবেন না। তাহলে নাশরুত তীব-এর অনুবাদকদের করণীয় ছিল শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মাধ্যমে রেওয়ায়েতগুলোর মান নির্ণয় করে টীকায় উল্লেখ করে দেওয়া। কিন্তু আমাদের বাংলা অনুবাদকগণ এ কাজটি তো করেনইনি, উপরন্তু থানভী (রহ.) যে কথাটির মাধ্যমে রেওয়ায়েত দুটি দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তাও তারা ছেঁটে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, এতে যারা মূল নাশরুত তীব পড়বেন না এবং বিষয়টি অনুধাবন করবেন না তারা বিভ্রান্তিতে পড়বেন। এ জন্যই উলামায়ে কেরাম বলেন, শুধু তরজমাভিত্তিক জ্ঞান নিরাপদ নয়।

শবে মেরাজ

কোন কোন পুস্তক-পুস্তিকায় স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে এবং সাধারণ জনগণের মাঝে তা প্রসিদ্ধ যে, মেরাজের ঘটনা রজব মাসের ২৭ তারিখে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরি যে, এ কথাটি জনগণের মাঝে শুধু একটি ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যার সনদ সহীহ নয়। অন্যথায় এটি কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস দ্বারাও প্রমাণিত নয়, হাদীস শরীফ বা কোন সাহাবীর উক্তি দ্বারা তো নয়ই। নির্ভরযোগ্য সূত্রে শুধু এতটুকুই পাওয়া যায় যে, মেরাজের ঘটনা হিজরতের এক বা দেড় বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু মাস, দিন, তারিখের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নেই।

অনেক আলেম বলেছেন, মেরাজের রাত নিঃসন্দেহে একটি বরকতময় রাত ছিল, কিন্তু এই রাতে যেহেতু বিশেষ কোন আমল বা ইবাদত উম্মতের জন্য বিধিবদ্ধ হয়নি, তাই এর দিন তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে সংরক্ষিত থাকেনি। -আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ ও শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়াহ ৮/১৮-১৯; আলবিদায়াহ ওয়াননিহায়া, ইমাম ইবনে কাসীর ২/৪৭১; লাতাইফুল মাআরিফ, ইমাম ইবনে রজব ১৩৪; ইসলাহী খুতুবাতে, আল্লামা তাকী উসমানী ১/৪৬-৪৮

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মেরাজের শিক্ষাগুলোর মূল্যায়ন করার তাওফীক দান করুন, বিশেষত পাঁচ ওয়াক্ত নামায যা মেরাজের বিশেষ তোহফা এবং যা মুমিনের জন্য আত্মিক মেরাজস্বরূপ, তাকে সুন্নত, আদব ও খুশু-খুযূর সাথে জামাতে উপস্থিত হয়ে আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।#

[আগস্ট '০৬ঈ.]

বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শাবান ও শবে বরাত

এতদিন পর্যন্ত শবে বরাতকে কেন্দ্র করে একশ্রেণীর মানুষ বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ছিল। তারা এ রাতকে উপলক্ষ বানিয়ে নানা অনুচিত কাজকর্ম ও রসম-রেওয়াজে লিপ্ত হচ্ছিল। উলামায়ে কেরাম সবসময়ই এসবের প্রতিবাদ করেছেন এবং এখনো করছেন। ইদানীং আবার একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ছাড়াছাড়ির প্রবণতা। তাদের দাবি হল, 'ইসলামে শবে বরাত বলে কিছু নেই। এ বিষয়ে যত রেওয়াজাত আছে সব মওয়ূ বা যয়ীফ। তাই এ সব রেওয়াজাত অনুযায়ী আমল করা এবং শবে বরাতকে বিশেষ ফযীলতপূর্ণ রাত মনে করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়।' তারা এসব বক্তব্য সম্বলিত ছোট ছোট পুস্তিকা ও লিফলেট তৈরি করে মানুষের মধ্যে বিলি করে থাকে।

বাস্তব কথা এই যে, আগের সেই বাড়াবাড়িও যেমন সঠিক ছিল না, তেমনি এখনকার এই ছাড়াছাড়ি সঠিক নয়। ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ দীন এবং এর সকল শিক্ষা সরল ও প্রান্তিকতা মুক্ত।

শবে বরাত সম্পর্কে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হল, এ রাতের ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মিলিত কোনো রূপ না দিয়ে এবং এই রাত উদযাপনের বিশেষ কোনো পন্থা উদ্ভাবন না করে বেশি ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য রেওয়াজাত দ্বারা প্রমাণিত। এই রাতকে অন্য সব সাধারণ রাতের মতো মনে করা এবং এ রাতের ফযীলত সম্পর্কে যত হাদীস এসেছে সবগুলোকে 'মওয়ূ' বা 'যয়ীফ' মনে করা যেমন ভুল, তেমনি এ রাতকে শবে কদরের মতো বা তার চেয়েও বেশি ফযীলতপূর্ণ মনে করাও একটি ভিত্তিহীন ধারণা।

এখানে শবে বরাতের (পনের শাবানের রাত) ফযীলত ও করণীয় বিষয়ক কিছু হাদীস যথাযথ উদ্ধৃতি ও সনদের নির্ভরযোগ্যতার বিবরণসহ উল্লেখ করা হল।

১ম হাদীস

عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.

رواه ابن حبان وغيره، ورجاله ثقات، وإسناده متصل على مذهب مسلم الذي هو مذهب الجمهور في المعنعن، ولم يجزم الذهبي بأن مكحولاً لم يلق مالك بن يخامر كما زعم، وإنما قاله على سبيل الحسان. راجع «سير أعلام النبلاء» ج ٥ ص ١٥٦.

মুআয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে (শাবানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে) সৃষ্টির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বৈষ পোষণকারী ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন।”

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, এ রাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফেরাতের দ্বার ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত হয়। কিন্তু শিরকী কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি এবং অন্যের ব্যাপারে হিংসা-বিদ্বৈষ পোষণকারী ব্যক্তি এই ব্যাপক রহমত ও সাধারণ ক্ষমা থেকেও বঞ্চিত থাকে।

যখন কোনো বিশেষ সময়ের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফেরাতের ঘোষণা হয় তখন তার অর্থই এই হয় যে, এই সময়ে এমন সব নেক আমলের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে, যার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাতের উপযুক্ত হওয়া যায় আর ওই সব গোনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে, যার কারণে মানুষ আল্লাহ তাআলার রহমত ও মাগফেরাত থেকে বঞ্চিত হয়।

যেহেতু উপরোক্ত হাদীস এবং অন্যান্য হাদীসে অর্ধ-শাবানের রাতে ব্যাপক মাগফেরাতের ঘোষণা আছে, তাই এ রাতটি অনেক আগে থেকেই শবে বরাত তথা ‘মুক্তির রজনী’ নামে প্রসিদ্ধ। কেননা, এ রাতে গোনাহ থেকে ও গোনাহর অশুভ পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

যদি শবে বরাতের ফযীলতের বিষয়ে দ্বিতীয় কোনো হাদীস না থাকত, তবে এই হাদীসটিই এ রাতের ফযীলত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এবং এ রাতে মাগফেরাতের উপযোগী নেক আমলের গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হত। অথচ হাদীসের কিতাবসমূহে নির্ভরযোগ্য সনদে আরো একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটির সনদবিষয়ক আলোচনা

উপরোক্ত হাদীসটি অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান তাঁর 'কিতাবুস সহীহ'এ, যা সহীহ ইবনে হিব্বান নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ (১৩/৪৮১) এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। এটি এই কিতাবের ৫৬৬৫ নং হাদীস। এছাড়া ইমাম বায়হাকী (রহ.) 'শুআবুল ইমান' গ্রন্থে (৩/৩৮২, হাদীস ৩৮৩৩); ইমাম তবরানী 'আলমু'জামুল কাবীর' ও 'আলমু'জামুল আওসাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া আরো বহু হাদীসের ইমাম নিজ নিজ কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটির সনদ সহীহ। এজন্যই ইমাম ইবনে হিব্বান একে 'কিতাবুস সহীহ'এ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ হাদীসটিকে পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'হাসান' বলেছেন; কিন্তু হাসান হাদীস সহীহ তথা নির্ভরযোগ্য হাদীসেরই একটি প্রকার।

ইমাম মুনিযীরী, ইবনে রজব, নূরুদ্দীন হাইসামী, কাস্তাল্লানী, যুরকানী এবং অন্যান্য হাদীস-বিশারদ এই হাদীসটিকে আমলযোগ্য বলেছেন। দেখুন, আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ২/১১৮; ৩/৪৫৯; লাতাইফুল মাআরিফ ১৫১; মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৬৫; শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া ১০/৫৬১

বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) সিলসিলাতুল আহাদীসিস্ সহীহা (৩/১৩৫-১৩৯)এ এই হাদীসের সমর্থনে আরো আটটি হাদীস উল্লেখ করার পর লেখেন—

وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب،
والصحة تثبت بأقل منها عددا، مادامت سالمة من الضعف الشديد،
كما هو الشأن في هذا الحديث.

“এসব রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই হাদীস নিঃসন্দেহে সহীহ।”

এরপর শায়খ আলবানী (রহ.) ওই সব লোকের বক্তব্য খণ্ডন করেন, যারা কোনো ধরনের খোঁজখবর ছাড়াই বলে দেন যে, শবে বরাতের ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই।

ইদানীং আমাদের কিছু সালাফী বা গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুকে দেখা যায়, তারা বিভিন্ন ধরনের লিফলেট বিলি করেন। তাতে লেখা থাকে যে, ‘শবে বরাত (লাইলাতুন নিস্‌ফি মিন শাবান)এর কোনো ফযীলতই হাদীস শরীফে নেই।’ ওই

সব বন্ধুরা শায়খ আলবানী (রহ.)এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। কেননা, তাদেরকে শায়খ আলবানীর বড় ভক্ত মনে হয় এবং তাঁর কিতাবাদি অনুবাদ করে প্রচার করতে দেখা যায়। আমি ওই সব ভাইদের কাছে বিনীতভাবে আরয় করতে চাই যে, আপনারা যদি শায়খ ইবনে বাযের অনুসরণে বা নিজেদের তাহকীক মতে এই রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করতে পারেন, তাহলে যারা উপরোক্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের অনুসরণে উল্লিখিত হাদীসটির ভিত্তিতে এই রাতের ফযীলতের বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সব ধরনের বেদআত ও রসম-রেওয়াজ পরিহার করে নেক আমলে মগ্ন থাকার চেষ্টা করেন, তারা এমন কী অপরাধ করে বসলেন যে, আপনাদেরকে তাদের পেছনে লেগে থাকতে হবে? এবং এখানকার উলামায়ে কেরামের দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য একটি মত যা **يُخْطِئُ وَيُصِيبُ** তথা ভুলের আশঙ্কার উর্ধ্বে নয়, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে আলেম-উলামার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আস্থাহীন করা এবং বাতিলপন্থীদের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা দেওয়া কি সত্যি খুব প্রয়োজন?

এতে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, আপনারা আপনাদের মতটিকে খুব বেশি হলে একটি ইজতেহাদী, ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনায়ুক্ত মতই মনে করেন এবং নিশ্চয়ই একে ওহীর মত সকল ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে মনে করেন না। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করুন, এরপর আপনাদের এই অবস্থানের যৌক্তিক কোনো ব্যাখ্যা থাকে কি?

আপনাদের প্রতি আমার সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, দয়া করে এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ. ৭২৮হি.)এর ইক্তিয়াউস সিরাতিল মুস্তাকীম (৬৩১-৬৪১) এবং ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজব (রহ. ৭৯৫হি.)এর লাতাইফুল মাআরিফ (১৫১-১৫৭) পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাঁদের এই দলীলনির্ভর তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না শায়খ ইবনে বায (রহ.)এর একটি আবেগপ্রসূত মতামত? যা হয়ত তিনি শবে বরাত নিয়ে জাহেল লোকদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার হিসাবেই ব্যক্ত করেছেন। তবে একথা স্পষ্ট যে, বাড়াবাড়ির প্রতিকার বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করে নয়; বরং তার যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

এই রাতের আমল

উল্লিখিত হাদীস শরীফে এ রাতের কী কী আমলের নির্দেশনা-ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। নিম্নে এ বিষয়ে আরেকটি হাদীস পেশ করছি—

“হযরত আলা ইবনুল হারিস (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামাযে দাঁড়ালেন এবং এত দীর্ঘ সেজদা করলেন যে, আমার ধারণা হল, তিনি হয়ত ইন্তেকাল করেছেন। আমি তখন উঠে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন, তখন আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে আয়েশা অথবা বলেছেন, ও হুমায়রা, তোমার কি এই আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার আশংকা হয়েছিল, আপনি ইন্তেকাল করেছেন কি না। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন—

هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم.

“এটা হল অর্ধ-শাবানের রাত। (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত।) আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তাঁর বান্দার প্রতি মনোযোগ দেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের আপন অবস্থায়।” -শুআবুল ঈমান, বাইহাকী ৩/ ৩৮২-৩৮৬;

ইমাম বাইহাকী (রহ.) হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বলেছেন— هذا مرسل جيد

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ রাতে দীর্ঘ সেজদায় দীর্ঘ নফল নামায পড়া, শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য। তবে মনে রাখতে হবে যে, অনেক অনির্ভরযোগ্য ওযীফার বই-পুস্তকে নামাযের যে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন লেখা আছে অর্থাৎ এত রাকাত হতে হবে, প্রতি রাকাতে এই এই সূরা এতবার পড়তে হবে— এগুলো ঠিক নয়, হাদীস শরীফে এসব নেই; এগুলো বিভিন্ন মনগড়া পন্থা। সঠিক পদ্ধতি হল, নফল নামাযের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দুই রাকাত করে যত রাকাত সম্ভব এবং যে সূরা দিয়ে সম্ভব পড়তে থাকা; কুরআন কারীম তেলাওয়াত করা, দরুদ শরীফ পড়া, ইস্তেগ্ফার করা, দুআ করা এবং ঘুমানোর প্রয়োজন হলে ঘুমানো। এমন যেন না হয় যে, সারা রাতের দীর্ঘ ইবাদতের ক্লান্তিতে ফজরের নামায জামাতাতের সাথে পড়া সম্ভব হল না।

পরের দিন রোযা রাখা

সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لَغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مَنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلَا مُسْتَرْزَقٍ فَأَرْزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلًى فَأَعَافِيَهُ، أَلَا كَذَّاءً، أَلَا كَذَّاءً، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “পনের শাবানের রাত (চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত) যখন আসে তখন তোমরা তা ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোযা রাখ। কেননা, এ রাতে সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমায়ে আসেন এবং বলেন, কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোনো রিযিক প্রার্থী? আমি তাকে রিযিক দেব। এভাবে সুব্হে সাদিক পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রয়োজনের কথা বলে তাদের ডাকতে থাকেন।” —সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস ১৩৮৪

এই বর্ণনাটির সনদ যয়ীফ; কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে ‘যয়ীফ হাদীস’ গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া শাবান মাসে বেশি বেশি নফল রোযা রাখার কথা সহীহ হাদীসে এসেছে এবং ‘আয়্যামে বীয’এ (প্রতি চান্দ মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে) রোযা রাখার বিষয়টিও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

বলাবাহুল্য, পনেরো শাবানের দিনটি শাবান মাসেরই একটি দিন এবং তা ‘আয়্যামে বীয’এর অন্তর্ভুক্ত। এজন্য ফিক্হের একাধিক কিতাবে এদিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব লেখা হয়েছে। আবার অনেকে বিশেষভাবে এদিনের রোযাকে মুস্তাহাব বা মাসনূন বলতে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর ইসলাহী খুতুবাতে বলেন, “আরো একটি বিষয় হচ্ছে শবে বরাতের পরবর্তী দিনে অর্থাৎ শাবানের পনেরো তারিখে রোযা রাখা। গভীরভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। হাদীসে রাসূলের বিশাল ভাণ্ডার হতে একটিমাত্র হাদীস এর সমর্থনে পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, ‘শবে বরাতের পরবর্তী দিনে রোযা রাখ।’ সনদ ও বর্ণনাসূত্রের দিক থেকে হাদীসটি দুর্বল। তাই এ দিনের রোযাকে এই একটিমাত্র দুর্বল হাদীসের ভিত্তিতে সুন্নত বা

মুস্তাহাব বলা অনেক আলেমের দৃষ্টিতেই অনুচিত। তবে হ্যাঁ, শাবানের গোটা মাসে রোযা রাখার কথা বহু হাদীসে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১ শাবান থেকে ২৭ শাবান পর্যন্ত রোযা রাখার যথেষ্ট ফযীলত রয়েছে। কিন্তু ২৮ ও ২৯ তারিখে রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বারণ করেছেন। ইরশাদ করেন, 'রমযানের দুএক দিন আগে রোযা রেখো না।' যাতে রমযানের জন্য পূর্ণ স্বস্থির সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়; কিন্তু ২৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিনের রোযাই অত্যন্ত বরকতপূর্ণ।

একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, শাবানের ১৫ তারিখ 'আইয়ামে বীয'এর অন্তর্ভুক্ত। আর নবীজী প্রতি মাসের 'আইয়ামে বীয'এ রোযা রাখতেন। সুতরাং কেউ যদি এই দুটি কারণকে সামনে রেখে শাবানের ১৫ তারিখে রোযা রাখে, যা 'আইয়ামে বীযের' অন্তর্ভুক্ত, পাশাপাশি শাবানেরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন, তবে ইনশাআল্লাহ নিশ্চয় সে প্রতিদান লাভ করবে। তবে শুধু ১৫ শাবানের কারণে এ রোযাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে সুন্নত বলা অনেক আলেমের মতেই সঠিক নয়। আর সে কারণেই অধিকাংশ ফকীহ মুস্তাহাব রোযার তালিকায় মুহাররমের ১০ তারিখ ও 'ইয়াওমে আরাফা' (যিলহজ্জের ৯ তারিখ)এর কথা উল্লেখ করলেও শাবানের ১৫ তারিখের কথা পৃথকভাবে কেউই উল্লেখ করেননি। বরং তাঁরা বলেছেন, শাবানের যেকোনো দিনই রোযা রাখা উত্তম। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে কেউ যদি রোযা রাখে তবে ইনশাআল্লাহ সে সওয়াব পাবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এ মাসের নির্দিষ্ট কোনো দিনের আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

এ রাতের নফল আমল সম্মিলিত নয়, ব্যক্তিগত

এ বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে, এ রাতের নফল আমলসমূহ, বিশুদ্ধ মতানুসারে একাকীভাবে করণীয়। ফরয নামায তো মসজিদেই আদায় করতে হবে। এরপর যা কিছু নফল পড়ার তা নিজ নিজ ঘরে একাকী পড়বে। এসব নফল আমলের জন্য দলে দলে মসজিদে এসে সমবেত হওয়ার প্রমাণ হাদীস শরীফেও নেই আর সাহাবায়ে কেরামের যুগেও এর রেওয়াজ ছিল না। -ইকতিয়াউস্ সিরাতিল মুস্তাকীম ২/৬৩১-৬৪১; মারাকিল ফালাহ ২১৯

তবে কোনো আহ্বান ও ঘোষণা ছাড়া এমনিই কিছু লোক যদি মসজিদে এসে যায় তাহলে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমলে মশগুল থাকবে, একে অন্যের আমলে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ হবে না।

কোথাও কোথাও এই রেওয়াজ আছে যে, এ রাতে মাগরিব বা ইশার পর

থেকেই ওয়াজ-নসীহত শুরু হয়। আবার কোথাও ওয়াজের পর মীলাদ-মাহ্ফিল হয়। কোথাও তো সারা রাত 'খতমে-শবীনা' হতে থাকে। উপরন্তু এ-সব করা হয় মাইকে এবং বাইরের মাইকও ছেড়ে দেওয়া হয়।

মনে রাখতে হবে, এ সব কিছুই ভুল রেওয়াজ। শবে বরাতের ফাযায়েল ও মাসায়েল আগেই আলোচনা করা যায়। এ রাতে মাইক ছেড়ে দিয়ে বজ্রতা-ওয়াজের আয়োজন করা ঠিক নয়। এতে না ইবাদতে আগ্রহী মানুষের পক্ষে ঘরে বসে একাগ্রতার সাথে ইবাদত করা সম্ভব হয়, আর না মসজিদে। অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় বিশ্রামেও মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ সব ভুল কাজকর্ম পরিহার করার তাওফীক দিন।

এ রাতের আপত্তিকর কাজকর্ম

খিচুরি বা হালুয়া-রুটির প্রথা, মসজিদ, ঘর-বাড়ি বা দোকান-পাটে আলোক-সজ্জা, পটকা ফুটানো, আতশবাজি, কবরস্তান ও মাজারসমূহে ভিড় করা, ওইসব স্থানে আলোক-সজ্জা করা, মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়া, বিশেষ করে বেপর্দা হয়ে দোকানপাট, মাযার ইত্যাদি স্থানে ভিড় করা-এসব কিছুই এ রাতের আপত্তিকর কাজ। কিছু কাজ তো অন্য সময়েও হারাম। আর কিছু কাজ সাধারণ অবস্থায় জায়েয থাকলেও (যেমন খিচুরি পাক করে গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করা) এগুলোকে শবে বরাতের কাজ মনে করা বা জরুরি মনে করা এবং এসবের পেছনে পড়ে এ রাতের মূল কাজ তওবা, ইস্তেগ্ফার, নফল ইবাদত ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত থাকা কীভাবে বৈধ হতে পারে?

এ সব শয়তানের ধোঁকা। মানুষকে মূল কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যই শয়তান এসব কাজকর্মে মানুষকে ব্যস্ত করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে শাবান মাসে সকল গোনাহ ও পাপরাশি থেকে পবিত্র হয়ে যথাযথভাবে রমযান মাসকে বরণ করার তাওফীক দান করুন।
আমীন।#

[সেপ্টেম্বর '০৫ঈ.]

শবে বরাত : কিছু ভ্রান্তি নিরসন

শবে বরাত সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলকাউসারে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শাবান ১৪২৬ হি. (সেপ্টেম্বর '০৫ ঈ.) সংখ্যায় 'বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শাবান ও শবে বরাত' শিরোনামে, শাবান ১৪২৭ হি. (সেপ্টেম্বর '০৬ ঈ.) সংখ্যায় 'উলামায়ে সালাফের উক্তির আলোকে শাবান শবে-বরাত' এবং রজব ১৪২৮ হি. (আগস্ট '০৭ ঈ.) সংখ্যায় 'অজ্ঞতা ও রসম-রেওয়াজের কবলে শাবান-শবে বরাত : নববী নির্দেশনাই মুক্তির উপায়' শিরোনামে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় কথা পাঠকের সামনে এসে গেছে। ওয়াল হামদু লিল্লাহি তাআলা আলা যালিকা হামদান কাছীরা।

বর্তমান প্রবন্ধে শুধু কিছু ভুল ধারণা চিহ্নিত করে দিতে চাই। কেননা এগুলো সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন এসে থাকে।

প্রশ্ন ১ : আমি এক কিতাবে পড়েছি যে, শবে বরাতবিষয়ক সকল হাদীস 'মওযু'। ইবনে দিহ্যার উদ্ধৃতিতে কথাটা লেখা হয়েছে।

উত্তর : এটা ভুল কথা। ইবনে দিহ্যার কখনো এমন কথা বলতে পারেন না। যিনি তার উদ্ধৃতিতে এ কথা লিখেছেন তিনি ভুল লিখেছেন। ইবনে দিহ্যার শুধু এটুকু বলেছেন যে, শবে বরাতে বিশেষ নিয়মের নামায এবং সে নামাযের বিশেষ ফযীলত যা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত, তা মওযু বা প্রক্ষিপ্ত। তাঁর মূল আরবী বক্তব্য তুলে দিচ্ছি : أحاديث صلاة البراءة موضوعة

“শবে বরাতের বিশেষ নামায সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো মওযু।”^১ -তায়কিরাতুল মওযুআত, মুহাম্মাদ তাহের পাটনী ৪৫

১-পরবর্তী সময়ে ইবনে দিহ্যার-এর বক্তব্য সরাসরি দেখার সুযোগ হয়েছে। শাবান সম্পর্কে তাঁর রিসালা এখন ছেপে এসেছে। মূল কিতাবে দেখার পর জানা গেল যে,

আল্লামা লাখনৌবী (রহ.) 'আলআছারুল মারফুআ ফিল আখবারিল মওয়ূআ' কিতাবে (পৃ. ৮০-৮৫) পরিষ্কার লিখেছেন যে, 'শবে বরাতে রাত জেগে ইবাদত করা এবং যেকোনো নফল আমল, যাতে আত্মা বোধ হয়, আদায় করা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। এ রাতে মানুষ যত রাকাআত ইচ্ছা নামায পড়তে পারে। তবে এ ধারণা ভুল যে, এ রাতের বিশেষ নামায রয়েছে এবং তার বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। যেসব বর্ণনায় এ ধরনের কথা পাওয়া যায় সেগুলো 'মওয়ূ'। তবে এটি একটি ফযীলতপূর্ণ রজনী এবং এ রজনীতে ইবাদত-বন্দেগী করা মুস্তাহাব-তা সহীহ হাদীস থেকেও প্রমাণিত। মোটকথা, এ রাতের ফযীলত অস্বীকার করা যেমন ভুল, তেমনি মনগড়া কথাবার্তায় বিশ্বাসী হওয়াও ভুল।'

আল্লামা শাওকানীও 'আলফাওয়াইদুল মাজমূআ' (পৃ. ৫১)তে এই ভুল ধারণা সংশোধন করেছেন।

প্রশ্ন ২ : একজন আলেমের কাছে শুনেছি যে, শবে বরাতে কবরস্থানে যাওয়া 'মাসনূন' নয়। আর আজকাল যেভাবে এ রাতে কবরস্থানে মেলা বসানো হয় এবং মহিলারাও বেপর্দা হয়ে সেখানে গিয়ে ভিড় করে, তা তো একেবারেই নাজায়েয।

প্রশ্ন এই যে, যতটুকু নাজায়েয তা তো অবশ্যই নাজায়েয, কিন্তু যদি মহিলারা বেপর্দা না হয় এবং সেখানে কোনো গুনাহর কাজও না হয় তবুও কি এ রাতে কবর যিয়ারত মাসনূন বলা যাবে না? হাকীমুল উম্মত 'ইসলাহুর রুহূম' কিতাবে একে 'মাসনূন' লিখেছেন।

উত্তর : মহিলাদের জন্য যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়া এমনিতেও নিষেধ। এরপর যদি পর্দাহীনতা ও অন্যান্য আপত্তিকর বিষয় এর সাথে যুক্ত হয় তবে তা আরো কঠিন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কবরস্থান যদি নিকটবর্তী হয় এবং মাযার না হয় আর সেখানে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কাজকর্ম না হয় তাহলে পুরুষের জন্য এ রাতে সেখানে গিয়ে যিয়ারত করার বিধান কী? এ প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মত (রহ.) প্রথমে মাসনূন লিখেছিলেন। পরে আরো চিন্তা-ভাবনা ও উলামায়ে কেরামের সঙ্গে মত বিনিময়ের পর ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন এবং লেখেন যে, আমি কবরস্থানে যেতে নিষেধ করাকেই অধিক সতর্কতার বিষয় মনে করি। -ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২৮

'তায়কিরাতুল মওয়ূআত' কিতাবের বর্ণনার ক্ষেত্রে ত্রুটি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দেন, তাহলে আগামী কোন শাবানে ইবনে দিহ্মা-এর রিসালা পর্যালোচনা করে একটি প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা আছে, ইনশাআল্লাহ।

শরীয়তের নীতিমালার আলোকে হযরত থানভী (রহ.)এর দ্বিতীয় মতই অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন ৩ : সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে (হাদীস ১৩৮৮) পনেরো শাবান রাত সম্পর্কে এই হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে—

قَوْمُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا

“এ রাত জেগে ইবাদত কর এবং দিনে (অর্থাৎ পনেরো শাবান) রোযা রাখ।”

এই হাদীসটি থানভী (রহ.) ‘খুতবাতুল আহকাম’-এ উল্লেখ করেছেন এবং ‘ইসলাহুর রুসুম’-এ পনেরো শাবানের রোযাকে মাসনুন বলেছেন। কিন্তু এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, শায়খ আলবানী এই হাদীসটিকে মওযু বলেছেন। এরপর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তকী উছমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর ‘ইসলাহী খুতবাত’ কিতাবে দেখলাম যে, সেখানে এই হাদীসটিকে ‘যয়ীফ’ লেখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এই রোযাকে ‘সুনুত’ মনে করা ভুল। প্রকৃত বিষয়টি বুঝে আসছে না। আশা করি সাহায্য করবেন।

উত্তর : ইবনে মাজাহ-এর উপরোক্ত হাদীসটি ‘মওযু’ তো কখনোই নয়। তবে তা সনদের দিক থেকে ‘যয়ীফ’। যেহেতু ফাযায়েলের ক্ষেত্রে ‘যয়ীফ’ গ্রহণযোগ্য তাই আলেমগণ শবে বরাতের ফযীলত বিষয়ে এ হাদীস বয়ান করে থাকেন।

শায়খ আলবানী ‘সিলসিলাতুয যয়ীফা’ (৫/১৫৪)-তে এই বর্ণনাকে ‘মওযুউস সনদ’ লিখেছেন। অর্থাৎ এর ‘সনদ’ মওযু। যেহেতু অন্যান্য ‘সহীহ’ বর্ণনা এর বক্তব্যকে সমর্থন করে সন্তুভত এজন্যই শায়খ আলবানী সরাসরি ‘মওযু’ না বলে ‘মওযুউস সনদ’ বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তথাপি শায়খের এই ধারণা ঠিক নয়। সঠিক কথা এই যে, এই বর্ণনা ‘মওযু’ নয়, শুধু ‘যয়ীফ’। ইবনে রজব (রহ.) প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের এই মত আলবানী সাহেব নিজেও বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন তা এই যে, এ বর্ণনার সনদে ‘ইবনে আবী ছাবুরা’ নামক একজন রাবী রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাদীস জাল করার অভিযোগ রয়েছে। অতএব এই বর্ণনা ‘মওযু’ হওয়া উচিত। তবে এই ধারণা এ জন্য সঠিক নয় যে, ইবনে আবী ছাবুরা সম্পর্কে উপরোক্ত অভিযোগ ঠিক নয়। তার সম্পর্কে খুব বেশি হলে এটুকু বলা যায় যে, যয়ীফ রাবীদের মতো তার স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা ছিল। রিজাল শাস্ত্রের ইমাম আল্লামা যাহাবী (রহ.) পরিষ্কার লিখেছেন যে, ‘স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণেই তাকে যয়ীফ বলা হয়েছে।’ -সিয়াকু আলামিন নুবালা ৭/২৫০

সারকথা এই যে, উপরোক্ত বর্ণনা মওযু নয়, শুধু যয়ীফ।

পনেরো শাবানের রোযা সম্পর্কে থানভী (রহ.) যে ‘মাসনূন’ বলেছেন তার অর্থ হল মুস্তাহাব। আর ইসলামী খুতবাতের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে পড়া হলে দেখা যাবে যে, তা এ কথার বিপরীত নয়। সেখানে ‘যয়ীফ’ হাদীসের ওপর আমল করার পন্থা সম্পর্কে একটি ইলমী বিষয় আলোচিত হয়েছে। হযরত মাওলানা পনেরো তারিখের রোযা রাখতে নিষেধ করেননি। তিনি শুধু এটুকু বলেছেন যে, একে ‘শবে বরাতের রোযা’ বলা উচিত নয়। শেষের দুই দিন ছাড়া গোটা শাবান মাসেই রোযা রাখা মুস্তাহাব। তাছাড়া প্রতি মাসের ‘আয়্যামে বীজ’ (চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) রোযা রাখা মুস্তাহাব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ দিনের রোযা রাখা হলে ইনশাআল্লাহ সওয়াব পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন ৪ : আমি একটি পুস্তিকায় পড়েছি যে, শবে বরাত সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত পাওয়া যায় তার মধ্যে সনদের বিবেচনায় সর্বোত্তম রেওয়ায়েতটিই হল ‘যয়ীফ’। তাহলে অন্যগুলোর কথা তো বলাই বাহুল্য। এ কথা কি সঠিক?

উত্তর : এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। শবে বরাত সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে একটি হাদীস ‘সহীহ’, কিছু হাদীস ‘হাসান’ আর কিছু ‘যয়ীফ’। এজন্য শবে বরাতের ফযীলতবিষয়ক সকল হাদীস জয়ীফ, একথা ঠিক নয়।

সনদের বিচারে সর্বোত্তম বর্ণনা হল যা ইবনে হিব্বান ‘কিতাবুস সহীহ’তে (হাদীস ৫৬৬৫) বর্ণনা করেছেন—

عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.

“হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অর্ধ-শাবানের রাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। শিরককারী ও বিদ্বেষপোষণকারী ছাড়া তার সমগ্র সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন।”

আরো একাধিক হাদীসে এ বিষয়টি এসেছে, যেগুলোর সনদ ‘হাসান লিয়াতিহী’ বা ‘হাসান লিগায়রিহী’। যথা মুসনাদে আহমদ-এর ৬৬৪২ নং হাদীস এবং মুসনাদুল বাযযার (২০৪৫)-এ আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস।

এছাড়া এ রাতের আমল সম্পর্কে ‘আবুল ইমান’ বাইহাকীর নিম্নোক্ত হাদীসটি লক্ষণীয়।

আলা ইবনুল হারিছ (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ালেন এবং এত দীর্ঘ সেজদা করলেন যে, আমার আশঙ্কা হল তিনি হয়ত মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন তখন আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে আয়েশা, অথবা বলেছেন, ও হুমায়রা, তোমার কি এই আশঙ্কা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার আশঙ্কা হয়েছিল যে, আপনার কি ইন্তেকাল হয়ে গেল। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান এটা কোন্ রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন—

هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم.

“এটা হল অর্ধ-শাবানের রাত। (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত।) আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি দেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন আর বিদ্রোহ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই।” -শুআবুল ঈমান, বায়হাকী ৩/৩৮২-৩৮৩

ইমাম বায়হাকী (রহ.) এই হাদীসটি বর্ণনার পর এর সনদ সম্পর্কে বলেছেন—

هذا مرسل جيد

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ রাতে দীর্ঘ নফল নামায পড়া এবং তাতে দীর্ঘ সেজদা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য।

মোটকথা এধরনের বেশ কয়েকটি সহীহ ও হাসান হাদীস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কীভাবে বলা যায় যে, এ বিষয়ে সর্বোত্তম হাদীসটি সনদের বিচারে যযীফ! ভালোভাবে না জেনে কথা বলা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফায়ত করুন।

প্রশ্ন ৫ : লোকেরা বলে, এ রাতের ফযীলত শবে কদরের সমান। কুরআন মজীদে ‘লায়লাতিন মুবারাকা’ বলে শবে বরাত বোঝানো হয়েছে। এ কথা কি সঠিক?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত দুটো কথাই ভুল। শবে বরাতকে শবে কদরের সমান মনে করা কিংবা সূরা দুখানে ‘লাইলাতিন মুবারাকা’ বলে শবে বরাতকে বোঝানো হয়েছে মনে করা, কোনোটাই ঠিক নয়। কুরআন-হাদীসে শবে কদরের যত ফযীলত এসেছে শবে বরাত সম্পর্কে আসেনি। বিশেষত কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার মত বরকতময় ঘটনা শবে কদরেই সংঘটিত হয়েছে। এই ফযীলত অন্য কোনো রজনীতে নেই।

আর ‘লাইলাতিন মুবারাকা’ বলে শবে কদরকেই বোঝানো হয়েছে, যা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সূরা কদরে। এজন্য এখানে শবে বরাত উদ্দেশ্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সব ধরনের প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক অবস্থানে দৃঢ়পদ থাকার তাওফীক দান করুন।

এ রাতের করণীয় সম্পর্কে ইমাম ইবনে রজব (রহ). বলেন- “মুমিনের কর্তব্য এই যে, এ রাতে খালেস দিলে তওবা করে যিকির, দুআ ও ইস্তেগফারের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। যত্নের সাথে নফল নামায পড়বে এবং সওয়াবের আশা নিয়ে পনেরো তারিখের রোযাও রাখবে। কেননা কখন মৃত্যু এসে যায় বলা যায় না। তাই কল্যাণের মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই তা কাজে লাগানো উচিত। তবে অত্যন্ত জরুরি বিষয় হল, ওই সব গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা, যেগুলো এ রাতের সাধারণ ক্ষমা ও দুআ কবুল হওয়া থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে দেয়। যথা : শিরক, হত্যা, হিংসা-বিদ্বেষ। এগুলোর সবগুলোই কবীরা গোনাহ। আর হিংসা-বিদ্বেষ তো এতই ভয়াবহ যে, তা অধিকাংশ সময়ই মানুষকে আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

যে কোনো মুসলমান সম্পর্কেই বিদ্বেষ পোষণ করা অত্যন্ত মন্দ প্রবণতা। তবে সাহাবায়ে কেলাম ও সালাফে সালাহীন সম্পর্কে অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত ভয়াবহ ও গর্হিত অপরাধ। এজন্য মুসলমানদের কর্তব্য হল সর্বদা অন্তরকে পরিষ্কার রাখা এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পাক-পবিত্র রাখা। বিশেষত উম্মাহর পূর্বসূরী ব্যক্তিদের সম্পর্কে অন্তর পুরোপুরি পরিষ্কার থাকা অপরিহার্য, যাতে রহমত ও মাগফেরাতের সাধারণ সময়গুলোতে বঞ্চিত না হতে হয়।” -লাতায়িফুল মাআরিফ ১৫৫-১৫৬ #

[আগস্ট '০৮ঈ.]

উলামায়ে সালাফের উক্তির আলোকে শবে বরাত

মাসিক আলকাউসার শাবান '২৬হি. (সেপ্টেম্বর '০৫ঈ.) সংখ্যায় 'বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শাবান ও শবে বরাত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছিল যে, এ বিষয়ে সঠিক চিন্তা ও করণীয় কী। চলতি সংখ্যায় কয়েকজন বরণ্য আকাবিরের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করা সম্ভব মনে করছি। এ প্রবন্ধে তাঁদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হচ্ছে। হুবহু বক্তব্য উদ্ধৃত কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে।

১. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আব্দুল হালীম ৭২৮ হি.)

শাইখ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, “পনেরো শাবানের রাতের ফযীলত সম্পর্কে একাধিক ‘মরফু’ হাদীস ও ‘আসারে সাহাবা’ রয়েছে। যার দ্বারা এ রাতের ফযীলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। সলফে সালাহীনের কেউ কেউ এ রাতের নফল নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতেন। আর শাবানের রোযার ব্যাপারে তো সহীহ হাদীসসমূহই রয়েছে।

“কোন কোন আলেম যদিও এই রাতের ফযীলত অস্বীকার করেন; কিন্তু হাসলী ও অহাসলী অধিকাংশ আলেম তা স্বীকার করে থাকেন। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতও তাই। কেননা এ রজনীর ফযীলত সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এগুলোর সমর্থনে সলফ (সাহাবা ও তাবয়ীনের)-এর ‘আসার’ও বিদ্যমান আছে। ‘সুনান’ ও ‘মুসনাদ’ শিরোনামে সংকলিত হাদীসের কিতাবে (বরং ‘সহীহ’ শিরোনামের কিছু কিতাবেও যেমন সহীহ ইবনে খুযাইমা (কিতাবুত তাওহীদ) সহীহ ইবনে হিব্বান প্রভৃতিতে) তা পাওয়া যাবে।

অবশ্য শুধু পনেরো তারিখের দিনে রোযা রাখা মাকরুহ। (এটি ইবনে

তাইমিয়া (রহ.)এর মত। তাঁর মতে পনেরো তারিখের সাথে দু' একদিন মিলিয়ে নেওয়া উত্তম।) আর এই দিন বা রাতে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা, সাজ-সজ্জার আয়োজন করা বেদআত ও ভিত্তিহীন। তেমনি এই রাতে 'সালাতে আলফিয়া' নামের মনগড়া পদ্ধতির নামাযের জন্যে সমবেত হওয়াও বেদআত।" -ইকতিয়াউস সিরাতিল মুস্তাকীম ২/৬৩১-৬৩২

ইবনে তাইমিয়া (রহ.)এর যুগে 'সালাতে আলফিয়া'এর রেওয়াজ ছিল। লোকেরা একটি জাল রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে মনে করত যে, শবে বরাতে ১০০ রাকাআত নফল নামায পড়া উচিত, যার প্রতি রাকাআতে ১০বার করে সূরা ইখলাস পড়া হবে।

উক্ত রেওয়ায়াতটি সম্পূর্ণই জাল। -আললাআলিল মাসনূআ, ইমাম সুযূতী ২/৫৮-৬০; আলফাওয়ায়িদুল মাজমূআ, ইমাম শাওকানী ১/৭৬

আমার জানা মতে আজ কোথাও এ রেওয়াজ নেই। তবে এর স্থলে 'মকসূদুল মুমিনীন'-এর কল্যাণে একটি মনগড়া পদ্ধতির নামায কিছু লোকের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। ওই বিশেষ পদ্ধতির নামায ও এর রেওয়ায়াতসমূহ সবই ভিত্তিহীন। (দেখুন, চলতি সংখ্যার প্রচলিত ভুল বিভাগ) তাই এসব পরিহার করে এই রাতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাধারণ নিয়মে নফল নামায পড়া উচিত। হাদীস দ্বারা শুধু এতটুকুই প্রমাণিত যে, এই রাতের নফল দীর্ঘ হবে এবং দীর্ঘ সেজদা-বিশিষ্ট হবে। দু রাকাআত করে যত ইচ্ছা পড়া যাবে; নির্দিষ্ট সূরা ও নির্ধারিত রাকাআত-সংখ্যার কোনো নিয়ম নেই। -আলআসারুল মারফূআ, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী ৮০-৮৫; মারাকিল ফালাহ শরহে নূরুল ইয়াহ ২১৯

২. ইমাম যাইনুদ্দীন ইবনে রজব দামেস্কী (৭৯৫ হি.)

ইমাম ইবনে রজব (রহ.) 'লাতায়িফুল মাআরিফ ফীমা লিমাওয়াসিমিল 'আমি মিনাল ওয়াযায়েফ' গ্রন্থে শবে বরাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে-

"শাবান মাসের পনেরো তারিখে রোযা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা ওই দিন 'আইয়ামে বীজ' (চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর প্রতি মাসেই আইয়ামে বীজ-এ রোযা রাখা মুস্তাহাব। তাছাড়া ১৫ শাবানের রোযা সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র হাদীসও রয়েছে; যদিও এর 'সনদ' দুর্বল। সুনানে ইবনে মাজাহ-এ হযরত আলী (রা.)এর সূত্রে বর্ণিত, "যখন ১৫ শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে নামায পড় এবং পরের দিন রোযা রাখ ...।"

এরপর শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে একাধিক হাদীস উল্লেখ করার পর তিনি লেখেন, “সঠিক কথা হচ্ছে এই রাতের ইবাদত ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত। এ রাতে নফল নামাযের জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া বা মাহ্‌ফিল করা মাকরুহ।”

তিনি আরো বলেন, “মুমিনের করণীয় এই যে, এ রাতে যিকির ও দুআর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হবে। প্রথমে খাঁটি মনে তওবা করবে; এরপর মাগফেরাত কামনা করবে; বিপদাপদ দূর হওয়ার জন্য দুআ করবে এবং নফল নামায পড়বে। যেসব গোনাহ ওই রাতের বিশেষ ফযীলত (ব্যাপক ক্ষমা) থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে সবসময় তা থেকে বিরত থাকবে। যেমন শিরক, হত্যা, যিনা, হিংসা ইত্যাদি।”

তিনি আরো বলেন, “(ওই রাতের ফযীলত স্বীকৃত তবে) একথা সঠিক নয় যে, সূরা দুখান-এ ‘লায়লাতুম মুবারকা’ শব্দে শবে বরাত বোঝানো হয়েছে। কেননা সঠিক মত এই যে, এর দ্বারা শবে কদর উদ্দেশ্য।” -লাতায়িফুল মাআরিফ ১৫১/১৫৭

৩. ইমাম ইবনুল হাজ্ব (আলমাদখাল গ্রন্থকার ৭৩৭হি.)

শাইখ ইবনুল হাজ্ব (রহ.), যাঁর গ্রন্থ ‘আলমাদখাল’ রসম-রেওয়াজ ও বেদআতের খণ্ডনে এবং সুন্নতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, তিনি তাতে শবে বরাতের গুরুত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন এবং অত্যন্ত দরদের সাথে ওই সব বেদআত ও কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্ক করেছেন; যেগুলোতে শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ লিপ্ত হয়েছে, এই রাতের ফযীলত লাভের বৈধ পদ্ধতি ছেড়ে।

তিনি বলেন, “এ রাত যদিও শবে কদরের মত নয়; কিন্তু এর অনেক বরকত ও ফযীলত রয়েছে। আমাদের পূর্বসূরিগণ এই রাতের যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন এবং এর যথাযথ হক আদায় করতেন। কিন্তু আজ লোকেরা বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উল্টো করে ফেলেছে। তারা রসম-রেওয়াজ ও কুসংস্কারের পেছনে পড়ে (নিজের অজান্তেই) এর খায়ের-বরকত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এক দিকে এ রাতে আলোকসজ্জার নিকৃষ্টতম রসম আবিষ্কার করা হয়েছে, যা অগ্নিপূজকদের নিদর্শন; অন্যদিকে মসজিদসমূহে সমবেত হয়ে শোরগোল করে পবিত্র পরিবেশকে নষ্ট করছে। তাছাড়া মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া, উপরন্তু বেপর্দা অবস্থায়, পাশাপাশি পুরুষদেরও কবর যিয়ারতের নামে সমবেত হওয়া-এ সব কিছুই নব-আবিষ্কৃত বেদআত এবং নববী সুন্নত ও সলফে সালাহীনের তরীকার পরিপন্থী।”

-আলমাদখাল ১/২৯৯-৩১৩

৪. শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ. ১০৫২ হি.)

‘মা সাবাতা বিস্‌সুনাহ ফী আইয়ামিস সানাহ’ গ্রন্থে (যার উর্দু অনুবাদ ‘মুমিন কে মাহ ও সাল’ নামে করাচি থেকে মূল আরবীসহ প্রকাশিত হয়েছে) তিনি এই রাতের ফযীলত তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি এই রাত সম্পর্কে কাহিনীকারদের বানানো বিভিন্ন মিথ্যা ও বাতিল বিষয় খণ্ডন করেছেন এবং পরবর্তী যুগের লোকদের আবিষ্কৃত গর্হিত বিষয়াদি সম্পর্কেও সাবধান করেছেন।

তিনি বলেন, “এই রাতের নিকৃষ্টতম বেদআতসমূহের মাঝে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত—

ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট আলোকসজ্জা করা, হৈচৈ ও আতশবাজির উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া ইত্যাদি। এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এগুলোর স্বপক্ষে কোনো জাল রেওয়ায়াতও পাওয়া যায় না। সম্ভবত হিন্দুদের ‘দেওয়ালী’ প্রথা থেকে তা গ্রহণ করা হয়েছে।” —মা সাবাতা বিস্‌সুনাহ ৩৫৩/৩৬৩

শবে বরাত সম্পর্কে পূর্বসূরীদের বহু উক্তি রয়েছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো গভীর মনোযোগের সাথে পড়লে যেমন এই রাতের ফযীলত, এ রাতে ব্যক্তিগত ইবাদত যথা নফল নামায, যিকির ও দুআ, তওবা ও ইস্তেগফার, দরুদ শরীফের অযীফা ও কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতির গুরুত্ব জানা যাবে; ওই সব রসম-রেওয়াজ ও কুসংস্কার সম্পর্কেও জানা যাবে, যেগুলো মূলত লোকদের এই রাতের প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে শয়তানের ধোঁকা ও প্ররোচনায় আবিষ্কৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কল্যাণের তাওফীক দান করুন এবং সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে নিরাপদ রাখুন; আমীন।#

[সেপ্টেম্বর '০৬ঈ.]

যিলহজ্ব, হজ্ব ও কুরবানী

বর্তমান প্রবন্ধে কুরআন হাদীস থেকে কুরবানীর দলীলসমূহ কিছুটা বিস্তারিতভাবে পেশ করা হয়েছে। কুরবানীর মত একটি স্বতঃসিদ্ধ ওয়াজিব আমল, যা শাআয়েরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত-এর ব্যাপারে গবেষণাধর্মী আলোচনার প্রয়োজন কেন দেখা দিয়েছে, তার উত্তর প্রবন্ধের শেষ দিকে পাওয়া যাবে।

যিলহজ্ব শব্দটির আরবী উচ্চারণ ذوالحجّة যুলহিজ্জাহ। বাংলায় ‘যিলহজ্ব’ উচ্চারণে প্রসিদ্ধ। এই মাস ‘আশহুরে হুরুম’ তথা সম্মানিত চার মাসের অন্তর্ভুক্ত। এই পূর্ণ মাস, বিশেষত প্রথম দশ দিন অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দুটি আমল হজ্ব ও কুরবানী এ মাসেই আদায় করা হয়। হজ্ব হচ্ছে ইসলামের অন্যতম রোকন। তেমনি কুরবানীও ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। এ থেকেও এ মাসের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

আলকাউসারের যিলহজ্ব ১৪২৬ হিজরী, জানুয়ারি ২০০৬ঈ. সংখ্যায় ‘যিলহজ্ব মাস : ফযীলত ও করণীয়’ শিরোনামে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কিছু লিখছি না। শুধু এটুকু আরও করছি যে, অন্তত হজ্ব ও কুরবানীর এই মাসে আমাদের হৃদয় বাইতুল্লাহ ও মিনা-আরাফার স্মরণে উদ্বেলিত হওয়া উচিত। দূর দেশে অবস্থানের যন্ত্রণা নিয়ে দুআ করা উচিত যে, ইয়া আল্লাহ! যে ভাইদের হজ্জে যাওয়ার তাওফীক হয়েছে তাদেরকে হজ্জে মাবরুর নসীব করুন, তাদের সকল কাজ সহজ করে দিন এবং তাদেরকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন। আর আমরা যারা বাইতুল্লাহ থেকে দূরে, তাদেরকে সেখানে যাওয়ার তাওফীক দান করুন এবং বার বার উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

আরাফার দিন আল্লাহর রহমতের সাগরে জোয়ার আসে এবং সেদিন তিনি হাজীদের ক্ষমা করেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরওয়ানা দান করেন। সেদিন

তাদের ওসীলায় অন্য অনেক সৌভাগ্যবানও মাগফেরাতের নেয়ামত লাভ করেন। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই এই তামান্না থাকা উচিত যে, সেই সৌভাগ্যবানদের তালিকায় আমার নামটিও যেন এসে যায়। পাশাপাশি এই চিন্তাও সদাজাগ্রত রাখা উচিত যে, এখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফেরাতের বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে। অতএব সতর্ক থাকা চাই এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকা চাই। আল্লাহ না করুন, রহমত ও মাগফেরাতের এই মৌসুমেও উদাসীনতার কারণে যদি বঞ্চিত থাকা হয় তবে তা হবে অতি দুর্ভাগ্যের বিষয়।

বাইতুল্লাহর হজ্ব

হজ্জের বিধান ও তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক লেখা হয়েছে। ইতিপূর্বে আলকাউসারেও একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে আমি শুধু হজ্জের তালবিয়া সম্পর্কে একটি কথা আরয় করব।

হজ্জের মধ্যে হাজীদের সার্বক্ষণিক অযীফা হল—

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ.

নিয়ত ও তালবিয়া-পাঠের মাধ্যমে ইহরামের সূচনা হয়। তালবিয়ার মর্ম নিয়ে সামান্য চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এতে ঈমান, ইহসান, তাওহীদ, তাফবীয, শোকর, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি সব-কিছুই বিদ্যমান রয়েছে। ঈমানের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায় হল ‘তাফবীয ও ইহসান’ অর্থাৎ নিজেকে ও নিজের সকল বিষয়কে আল্লাহ তাআলার হাওয়ালা করে দেওয়া এবং এই অনুভূতির সাথে জীবনযাপন করা যে, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর সামনে উপস্থিত। এটাই তালবিয়ার মর্মবাণী এবং তালবিয়ার দ্বারা বান্দা আনুগত্য ও সমর্পণ ঘোষণা করে। ঈমানের এই অবস্থা সৃষ্টি করা এবং এই পর্যায়ে উপনীত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আমাদের কর্তব্য। শুধু হাজী সাহেবানের কর্তব্য নয়, সবার কর্তব্য। শুধু হজ্ব-মৌসুমের কর্তব্য নয়, সারা জীবনের কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দিন। আমীন।

কুরবানী

কুরবানী ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং বিশেষ ধরনের ইবাদত। কুরবানীর একটি ইসলামী ধারণা এবং একটি জাহেলি ধারণা রয়েছে। জাহেলি ধারণা হল,

কোন মূর্তি বা দেব-দেবীর সত্ত্বষ্টি লাভের জন্য কিংবা জিন-শয়তান বা কোন অশুভ শক্তির কাল্পনিক ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের উদ্দেশ্যে কোন কিছু উৎসর্গ করা। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কুসংস্কার। তাওহীদের ধর্ম ইসলামে এর কোনো অবকাশ নেই। সম্পূর্ণ শিরক ও হারাম।

পক্ষান্তরে ইসলামে কুরবানীর অর্থ- আল্লাহ তাআলার সত্ত্বষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের জন্য শরীয়ত-নির্দেশিত পন্থায় শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রিয় বস্তু আল্লাহর দরবারে পেশ করা এবং শরীয়ত-নির্দেশিত পন্থায় তা ব্যবহার করা।

এই কুরবানী আদম (আ.)-এর যুগ থেকে বিদ্যমান রয়েছে। সূরা মায়েদায় (আয়াত ২৭-৩১) আদম (আ.)-এর দু' সন্তানের কুরবানীর কথা এসেছে। তবে প্রত্যেক নবীর শরীয়তে কুরবানীর পন্থা এক ছিল না। সবশেষে সকল জাতি ও ভূখণ্ডের জন্য এবং কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য যে নবী প্রেরিত হয়েছেন অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে সর্বশেষ ও চিরন্তন শরীয়ত, কুরআন ও সুন্নাহর শরীয়ত। এ শরীয়তে কুরবানীর যে পন্থা ও পদ্ধতি নির্দেশিত হয়েছে তার মূল সূত্র 'মিল্লাতে ইবরাহীমী'তে বিদ্যমান ছিল। কুরআন মজীদ ও সহীহ হাদীস থেকে তা স্পষ্ট জানা যায়। এজন্য কুরবানীকে 'সুন্নাতে ইবরাহীমী' নামে অভিহিত করা হয়।

ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় 'কুরবানী' শব্দটি আরবী 'কুরবান' শব্দের স্থলে ব্যবহৃত হয়। 'কুরবান' শব্দটি ب ر و মূলধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে নৈকট্য। তাই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য শরীয়তসম্মত পন্থায় সম্পাদিত বান্দার যেকোন আমলকে আভিধানিক দিক থেকে 'কুরবান' বলা যেতে পারে। তবে শরীয়তের পরিভাষায় 'কুরবান' শব্দের মর্ম তা-ই, যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। ইসলামী শরীয়তে এই পারিভাষিক অর্থে দু' ধরনের কুরবানী রয়েছে।

১. যা হজ্বের মৌসুমে নির্ধারিত স্থানে (মক্কা ও মিনায়) হজ্ব ও উমরা আদায়কারীগণ আদায় করে থাকেন। তা 'কিরান' বা তামাত্তু হজ্ব আদায়কারীর ওয়াজিব কুরবানী হতে পারে কিংবা 'ইফরাদ' হজ্বকারীর নফল কুরবানী। হাজ্জী সাথে করে নিয়ে আসা 'হাদি' হতে পারে কিংবা হজ্ব আদায়ে অক্ষম হওয়ার বা কোন নিষিদ্ধ কর্মের জরিমানারূপে অপরিহার্য কুরবানী। তেমনি মানুষের কুরবানী হতে পারে কিংবা দশ যিলহজ্বের সাধারণ কুরবানী। এ কুরবানীর বিধান মৌলিকভাবে এসেছে সূরা হজ্ব ২৭-৩৭, সূরা বাকারা ১৯৬, সূরা মায়েদা ২, ৯৫-৯৭, সূরা ফাতহ ২৫-এ। আর হাদীস শরীফে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

২. সাধারণ কুরবানী, যা হজ্জ-উমরার সাথে সম্পৃক্ত নয় এবং এ কুরবানীর স্থানও নির্ধারিত নয়। তবে সময় নির্ধারিত। যে তারিখে হজ্জ আদায়কারীগণ মিনা-মক্কায় কুরবানী করে থাকেন, সে তারিখে অর্থাৎ যিলহজ্জের দশ, এগারো ও বারো তারিখে এ কুরবানী হয়ে থাকে। পৃথিবীর সকল মুসলিম পরিবারের জন্য; বরং প্রত্যেক মুকাল্লাফ মুসলমানের জন্য এই কুরবানীর বিধান রয়েছে। কারো জন্য ওয়াজিব, কারো জন্য নফল।

এ কুরবানীর উল্লেখ এসেছে সূরা আনআমের ১৬১-১৬৩ আয়াতে এবং সূরা কাউসারের ২ আয়াতে। আর বিস্তারিত বিধি-বিধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহতে বিদ্যমান রয়েছে।

৪. সূরা আনআমে এসেছে—

قُلْ أَنِنِي هِدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قُلْ إِنْ صَلَوَتِي وَنَسْكَي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.

“আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে পরিচালিত করেছেন সরল পথের দিকে, এক বিশুদ্ধ দ্বীনের দিকে। অর্থাৎ একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাত (তরীকা) আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আপনি বলুন, নিঃসন্দেহে আমার সালাত, আমার নুসুক এবং আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু— সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর ওই বিষয়েই আমাকে আদেশ করা হয়েছে। সুতরাং আমি হলাম আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম।”
—সূরা আনআম ১৬১-১৬৩

এ আয়াতে نُسْكُ শব্দটি বিশেষ মনোযোগের দাবিদার। এটি نَسِيكَةٌ শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হল আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য আল্লাহর নামে জবাইকৃত পশু। এজন্য আরবী ভাষায় এবং শরীয়তের পরিভাষায়ও কুরবানীর স্থানকে نُسْكُ বলা হয়। আরবী ভাষার ছোট, বড় নতুন-পুরাতন যেকোন অভিধানে এবং লুগাতুল কুরআন, লুগাতুল হাদীস, লুগাতুল ফিকহের যেকোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে نُسْكُ শব্দের উপরোক্ত অর্থ পাওয়া যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিচ্ছি— ‘আসসিহাহ’ ৪/১৬১২; লিসানুল আরব ১৪/১২৭-১২৮; তাজুল আরকস ৭/২৮৭; আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন ৮০২; আননিহায়া ফী গারীবিল হাদীসি ওয়াল আহার ৫/৪৮; মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার ৪/৭১৪-৭১৫; আলমিসবাহুল মুনীর ফাইয়ুমী ৩১১; আলমুগরিব, মুতাররিযী ২/৩০০

সূরা বাকারার ১৯৬ আয়াতেও نُسْكُ শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতের অর্থ পরিষ্কার। হযরত ইবরাহীম (আ.)কে যে খালেছ তাওহীদ ও সিরাতে মুস্তাকীমের প্রত্যাদেশ আল্লাহ তাআলা করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও তা নাযিল করেছেন এবং তাঁকে আদেশ করেছেন যে, বল, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সব আল্লাহর জন্য।

উল্লেখ্য, আরবী ভাষায় نُسْكُ শব্দটি ইবাদতের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এজন্য ইবাদতকারীকে ناسك ও ইবাদতের পদ্ধতিকে مَنْسَك বলা হয়। সূরা আনআমের উক্ত আয়াতে যদি 'নুসুক' শব্দের অর্থ ইবাদত করা হয়, তবুও তাতে কুরবানী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদীসে ঈদুল আযহার কুরবানীকে 'নুসুক' বলেছেন। কুরবানীর পশু জবাই করার সময় যে দুআ পড়ার কথা হাদীসে এসেছে, তাতেও ওই আয়াত রয়েছে। পূর্ণ হাদীস লক্ষ্য করুন—

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন দু'টি দুম্বা জবাই করেছেন। তিনি যখন সেগুলোকে কেবলামুখী করে শায়িত করলেন তখন বললেন—

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ.

—সুনানে আবু দাউদ ৩/৯৫, হাদীস ২৭৯৫; মুসনাদে আহমদ ৩/৩৭৫, হাদীস ১৫০২২; واللفظ منهما جميعا সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ২৮৯৯

কুরবানীর শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আয়াত ও দুআ পড়া থেকে একদিকে যেমন প্রমাণিত হয় যে, কুরবানী খালেছ ইবাদত, তেমনি একথাও প্রমাণিত হয় যে, সূরা আনআমের ১৬২ আয়াতে نُسْكُ শব্দের অর্থ ঈদুল আযহার কুরবানী কিংবা ওই শব্দে কুরবানীও शामिल রয়েছে।

অপর যে আয়াতে সাধারণ কুরবানীর উল্লেখ রয়েছে তা হল সূরা কাউসারের দ্বিতীয় আয়াত। ইরশাদ হয়েছে—

انا اعطيتك الكوثر فصل لربك وانحر

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর মাধ্যমে গোটা উম্মতকে সালাত (নামায) ও নাহর (কুরবানীর) আদেশ দেওয়া হয়েছে।

نَحْر শব্দের মূল ব্যবহার উটের ক্ষেত্রে হলেও সাধারণত যেকোন পশু জবাই করাকেই نَحْر বলে। আয়াতে এমন জবাই উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তাআলার জন্য ইবাদত হিসাবে করা হয়। সেটা হচ্ছে হজ্ব ও উমরার কুরবানী এবং ঈদুল আযহার সাধারণ কুরবানী।

এ কুরবানীর সময় যদিও তিন দিন, অর্থাৎ যিলহজ্জের দশ, এগারো ও বারো তারিখ, তবে উত্তম দিন হল দশ তারিখ। সাধারণত এ তারিখেই অধিকাংশ কুরবানী হয়ে থাকে। এজন্য দশ যিলহজ্জের ইসলামী নাম হল 'ইয়াওমুন নাহর'।
-সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৫৫০

আয়াতে নামাযের যে আদেশ, তাতে ঈদের নামাযও शामिल রয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহর মাধ্যমে এ আয়াতে নাযিল হওয়া ইলাহী নির্দেশের অনুসরণ-পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। একটি হাদীস লক্ষ করুন।

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বহু সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহার দিন নামায পরবর্তী খুতবায় বলেছেন, এই দিনের প্রথম করণীয় হল সালাত আদায় করা। এরপর নহর (কুরবানী) করা। যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পর 'নুসুক' (কুরবানী) করল তার 'নুসুক' পূর্ণ হল এবং সে মুসলিমদের পন্থা অনুসরণ করল। আর যে সালাতের আগে জবাই করল সেটা তার গোশতের প্রয়োজন পূরণ করবে; কিন্তু তা 'নুসুক' হিসাবে গণ্য হবে না।”

এই হাদীস বহু সহীহ সনদে বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। কোথাও বিস্তারিতভাবে, কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে। কিছু হাওয়ালা উল্লেখ করছি— সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৫১, ৯৫৫, ৯৬৫, ৯৬৮, ৫৫৪৫, ৫৫৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৬১, ৪, ৬, ৭; মুসনাদে আহমদ ৪/২৮১-২৮২, ৩০৩; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫০৮; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৩৯৪-৪৩৯৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৯০৭, ৫৯১০, ৫৯১১

এই হাদীসে সূরাতুল কাউসারের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল থেকে পাওয়া গেল। সূরাতুল কাউসারে বলা হয়েছে— فصل لربك وانحر সুতরাং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে জানা

গেল যে, ‘সালাত আদায় করুন’ শব্দে ঈদের নামায এবং ‘কুরবানী করুন’ শব্দে ঈদুল আযহার কুরবানীও অন্তর্ভুক্ত। তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও ইরশাদ থেকে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঈদুল আযহার কুরবানী হচ্ছে ওই ‘নুসুক’ যা সূরা আনআমের ১৬২ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। তা আল্লাহ তাআলার ইবাদত হিসাবে আদায় করা হয়। এর উদ্দেশ্য গোশত খাওয়া বা গোশতের প্রয়োজন পূরণ করা নয়। তবে কুরবানী হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা সে পশুর গোশত কুরবানীদাতার জন্য হালাল করেছেন এবং দশ যিলহজ্জ থেকে মোট চার দিন রোযা রাখতে নিষেধ করে যেন তাঁর মেহমানদারী কবুল করার আদেশ দিয়েছেন।

ঈদুল আযহার দিবস মুসলমানদের জন্য খুশির দিবস। তবে এই খুশির তাৎপর্য হচ্ছে আরাফা-দিবসের ব্যাপক মাগফেরাত, আল্লাহর দরবারে কুরবানী পেশ করার সৌভাগ্য এবং আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়া কুরবানী থেকে মেহমানদারী লাভ। বলাবাহুল্য, এই তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য অন্তরে ঈমানের মিষ্টতা এবং খালিক ও মালিকের মহব্বত ও ভালবাসা থাকতে হবে। বস্তুবাদী ও যুক্তিপূজারী অন্তর দুঃখজনকভাবে এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত।

সুন্নাহর আলোকে কুরবানী

এ পর্যন্ত শুধু কুরআন মজীদ থেকে আলোচনা করা হল। যদি এ বিষয়ের ‘সহীহ’ ও ‘হাসান’ হাদীসগুলো একত্র করা হয় তবে একটি বৃহৎ গ্রন্থ তৈরি হবে। শুধু সহীহ ইবনে হিব্বানের ‘কিতাবুল উয্হিয়া’ বা কুরবানীর অধ্যায়টি হাদীসের ধারাবাহিক ক্রমিক নং অনুসারে ৫৮৯৭ থেকে ৫৯৩৩ পর্যন্ত বিস্তৃত। এগুলোতে সামান্য কিছু হাদীসের পুনরুল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে এ কিতাবের বাইরেও আরো সহীহ হাদীস অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

উপরের হাদীসগুলো ছাড়া আরো কয়েকটি হাদীস পেশ করছি।

১. উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কুরবানীর ইরাদাকারী যিলহজ্জের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর যেন তার নখ, চুল না কাটে কুরবানী করা পর্যন্ত।” –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৭৭/৩৯-৪২; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫২৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৭৯১; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৩৬২-৪৩৬৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৮৯৭, ৫৯১৬, ৫৯১৭

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে এসেছে যে,

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দ্বীন সম্পর্কে জানতে এসেছিল। ফিরে যাওয়ার সময় নবীজী তাকে আবার ডাকলেন এবং বললেন—

أَمَرْتُ بَيْنَ الْأَضْحَى جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ

“আমাকে ‘ইয়াওমুল আযহার’ আদেশ করা হয়েছে। (অর্থাৎ এ দিবসে কুরবানী করার আদেশ করা হয়েছে।) এ দিবসকে আল্লাহ এ উম্মতের জন্য ঈদ বানিয়েছেন। লোকটি বলল, আমার কাছে যদি শুধু পুত্রের দেওয়া একটি দুধের পশু থাকে আমি কি তা-ই কুরবানী করব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, না, বরং তুমি সেদিন তোমার মাথার চুল কাটবে (মুণ্ডাবে বা ছোট করবে) নখ কাটবে, মোচ কাটবে এবং নাভির নিচের চুল পরিষ্কার করবে। এটাই আল্লাহর নিকট তোমার পূর্ণ কুরবানী বলে গণ্য হবে।” —মুসনাদে আহমদ ২/১৬৯; হাদীস ৬৫৭৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭৩, ৫৯১৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৭৮৯; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৩৬৫

৩. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না (অর্থাৎ তার কুরবানী করার সংকল্প নেই) সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে।” —মুসনাদে আহমদ ২/৩২১; মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/২৩১, হাদীস ৭৬৩৯ مشكلة في تخريج وحسنه الألباني في ১০.২ وقد أصاب

৪. আলী (রা.) বলেন—

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذْنَ وَأَنْ لَا نَضْحَى بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مَدَابِرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ.

“আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন, আমরা যেন (কুরবানী পশুর) চোখ ও কান ভাল করে দেখে নিই এবং কান-কাটা, কান-চেরা বা কানে গোলাকার ছিদ্র করা পশু দ্বারা কুরবানী না করি।” —মুসনাদে আহমদ ১/৮০, ১০৮, ১৪৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ২৯১৪-২৯১৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৮০৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৩৭৩-৪৩৭৪

৫. বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

أَرْبَعٌ لَا يَضْحَى بِهِنَّ، الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقِي.

“চার ধরনের পশু দ্বারা কুরবানী করা যায় না- যে পশুর চোখের জ্যোতি ক্ষতিগ্রস্ত, যে পশু অতি রোগা, যে পশু খোঁড়া আর যে পশু অত্যধিক শীর্ণকায়।” -মুয়াত্তা মালেক ২/৪৮২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৯১৯; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৩৭০-৪৩৭১; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৪৯৭ واللفظ لابن حبان

কুরবানী সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস ও আছার আছে। এখানে তা সংকলন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি।

আম্মাজান আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী করার জন্য শিংবিশিষ্ট একটি দুগ্ধা আনতে বললেন। যার পা কালো, পেটের চামড়া কালো এবং চোখ কালো। দুগ্ধা আনা হলে নবীজী বললেন, আয়েশা, আমাকে ছুরি দাও। এরপর বললেন, একটি পাথরে ঘষে ধারালো করে দাও। তিনি ধারালো করে দিলেন। এরপর তিনি ছুরি হাতে নিলেন এবং দুগ্ধাটি মাটিতে শোয়ালেন। এরপর বিসমিল্লাহ বলে জবাই করলেন এবং বললেন-

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ

“ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে, মুহাম্মাদের পরিবারের পক্ষ থেকে এবং মুহাম্মাদের উম্মতের পক্ষ থেকে কবুল করুন।” -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৬৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৯১৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৭৯২

অন্য হাদীসে আছে, কুরবানীর পশু জবাই করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুআ পড়েছেন-

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ

“আল্লাহর নামে; ইয়া আল্লাহ! তোমার নিকট থেকে এবং তোমার উদ্দেশ্যে; ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন।” -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ১১৩২৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/২১

মোটকথা, পূর্ণ তাওহীদ ও ইখলাসের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতিতে আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার আশা নিয়ে কুরবানী করা উচিত। আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন করে কবুল হওয়ার প্রত্যাশা এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মেহমানদারীর সৌভাগ্য লাভের অনুভূতি বান্দার মধ্যে আনন্দও সৃষ্টি করে। আর এটাই হচ্ছে ঈদুল আযহার মর্মবাণী। কুরবানীর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ “ইয়া

আল্লাহ! তোমার নিকট থেকে এবং তোমারই উদ্দেশ্যে” সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে খুব সহজেই বোঝা যায়, কুরবানীর হাকীকত কী। আল্লাহ-প্রদত্ত রিযিক ও আল্লাহর নেয়ামত আমরা লাভ করেছি, আর আল্লাহর হুকুমে তা কুরবানীরূপে তাঁর দরবারে পেশ করার সৌভাগ্য হয়েছে। অতপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মেহমানদারী হিসাবে তা গ্রহণ করার নির্দেশনা পেয়েছি।

বলাবাহুল্য, কুরবানী নামায রোযার মতো ফরয আমল নয়, তবে এটি অন্যান্য সুনতে মুয়াক্কাদার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব আমল। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত কুরবানী করেছেন, কোন বছর বাদ দেননি। (আলইস্তিযকার, ইবনে আদিল বার ১৫/১৬৩-১৬৪) তেমনি কখনো কখনো কুরবানী করার জন্য সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করেছেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৫৫৫

আর হযরত আলী (রা.)কে আদেশ করেছেন (ইন্তেকালের পরেও) তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করতে। তাই তিনি প্রতি বছর নিজের কুরবানীর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকেও কুরবানী করতেন। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৮৪৩, ১২৭৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৭৮৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উম্মতের মধ্যে এই ইবাদত ‘তাওয়ারুছ’ ও ‘তাওয়াতুর’এর সাথে চলমান রয়েছে এবং প্রতিবছর ‘শিয়ার’রূপে (ইসলামের একটি প্রকাশ্য ও সম্মিলিতভাবে আদায়যোগ্য ইবাদত হিসাবে) তা আদায় করা হয়েছে। অতএব কেউ যদি মনে করে, কুরবানী ইবাদত নয় এবং ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে সে শরীয়ত অস্বীকারকারী।

নয়া যমানার তাহরীফী ফেতনা

কেউ হয়ত ভাবতে পারেন, কুরবানীর মত সর্বজনবিদিত বিধান সম্পর্কে এত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন কী? কুরবানীর ফযীলত ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলা উল্লেখ করা হলেই তো প্রয়োজন মিটে যায়? কুরবানী যে শরীয়তের একটি বিধান-এ বিষয়ে দলীল-প্রমাণের আলোচনার প্রয়োজন আসলে কী?

আসলেই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এ সময়টা হচ্ছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার ও নীতিহীনতার যুগ। কোন বিষয়ের প্রকৃত রূপ বিকৃত করে অভিনব কিছু প্রকাশ করাই যেন এ সময়ের ‘গবেষক’দের কীর্তি! পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত একটি শ্রেণী অজ্ঞতা ও উন্মাদিকতার সাথে যে বিষয়কে

তাদের নির্যাতনের টার্গেট বানিয়েছে তা হল ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধান। ভারত-পাকিস্তানের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, মুনকিরে হাদীস ও মুলহিদ-মুনাফিক দীর্ঘদিন পর্যন্ত কুরবানীর মত ইসলামী বিধানকে ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক প্রমাণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তাদের এদেশীয় কিছু প্রতিনিধি এবং কিছু অপরিণামদর্শী লোক ওই আলোচনাগুলো নকল করে থাকে। তাদের একটি প্রবন্ধ-সংকলন আমাকে এক বন্ধু এনে দিয়েছিলেন। আমি তা দেখে আশ্চর্য হয়েছি।

তাদের ‘জ্ঞান-গরিমা’র একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। সূরা ছাফ্যাত-এ, যেখানে ইবরাহীম (আ.)-এর কুরবানীর ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে সেখানে আছে যে, আল্লাহ তাআলা পুত্র (ইসমাইল আ.)কে জবাই করার আদেশ দিয়ে ইবরাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা ইসমাইল (আ.)কে রক্ষা করে তার পরিবর্তে একটি পশু প্রেরণ করেন। এখানে কুরআন মজীদে শব্দ হল- ‘যিবছন’ অথচ তারা একে বানিয়েছে ‘যাবছন’। প্রথমটির অর্থ হচ্ছে জবাইয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত পশু আর দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে জবাই করা। সেই প্রবন্ধ থেকে অনুমিত হয় যে, তারা ‘যিবছন’ ও ‘যাবছন’ এই দুই শব্দের পার্থক্য না বোঝার মত মূর্খ নয়। ভাবতে যতই কষ্ট হোক সত্য কথা এটাই মনে হয় যে, তাদের পক্ষে মিল্লাতে ইবরাহীমীর অন্যতম ও ইবাদত হিসাবে কুরবানীকে সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে এই তাহরীফ বা বিকৃতি ঘটিয়েছে। উদ্দেশ্য হল ইসমাইল (আ.)-এর স্থলে কোন পশু কুরবানী করা হয়েছিল তা অস্বীকার করা। অথচ **وفدینه بذبح عظیم** (৩৭ : ১০৭) আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইসমাইল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি পশু আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন। আর তা-ই জবাই করা হয়েছিল।

পশুটি কী ছিল তা হাদীস শরীফে এসেছে। তা ছিল একটি দুগ্ধ। মু’জামে কাবীর তবারানীতে নির্ভরযোগ্য সনদে এসেছে, নু’মান ইবনে আবু ফাতেমা বলেন, তিনি একটি শিংওয়ালা ও বড় চোখবিশিষ্ট দুগ্ধা ক্রয় করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে বললেন, এটা তো ছবছ ওই দুগ্ধার মতই মনে হচ্ছে, যা ইবরাহীম (আ.) জবাই করেছিলেন। একথা শুনে এক আনসারী সাহাবী ওই রকম একটি দুগ্ধা কিনে আনলেন এবং নবীজী তা কুরবানী করলেন।

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات ৪/২৩

মুসনাদে আহমদ ৪/৬৮, হাদীস ১৬৫৯৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২০২৭; মুসনানাফে আব্দুর রায়যাক ৫/৮৬-৮৮ এবং ইমাম আবুল ওয়ালিদ আলআযরাকী

(মৃত্যু ২৪৭ হিজরীর পর) কৃত ‘তারীখু মক্কা’ হাদীস ২২৩-২২৪-এ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় একথাও আছে যে, “ইসমাইল (আ.)-এর পরিবর্তে যে দুম্বা জবাই করা হয়েছিল তার দু’টি শিং দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাবা শরীফের দেয়ালে ঝোলানো ছিল। এক অগ্নিকাণ্ডে কাবা শরীফের অন্যান্য বস্তুর সাথে শিংদুটিও বিনষ্ট হয়ে যায়।”

বস্তুত এ সকল বিষয়কে অস্বীকার করার জন্য কুরআনের ‘যিবহ্নন আযীম’ শব্দকে ‘যাবহ্নন আযীম’ শব্দে পরিবর্তন করা হয়েছে। নাউয়িব্লাহ!

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিজেদের অজ্ঞতা অনুধাবন করার পরিবর্তে তারা অন্যদের ওপর এই অভিযোগ দায়ের করেছে যে, তারা ‘আযীম’ শব্দের অনুবাদ করেছেন দুম্বা! বলাবাহুল্য, এ দাবি সত্য নয়। কেননা, কোন আলেম তো দূরের কথা, মাদরাসার একজন তালেবে ইলমও এই তরজমা করতে পারে না। সবারই জানা আছে যে, ‘আযীম’ অর্থ বড়, মহান ইত্যাদি; কিন্তু ‘যিবহ্নন’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘জবাইয়ের পশু’ আর হাদীস শরীফে এসেছে যে, তা ছিল দুম্বা।

এরপর তাদের আরেক অভিনব দাবি এই যে, ‘কুরবান’ শব্দ কোথাও ‘পশু-জবাই’ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। একথাও সম্পূর্ণ ভুল। জুমার দিন আগেআগে মসজিদে যাওয়ার ফযীলতসম্বলিত হাদীসটি অনেক সাধারণ মানুষেরও জানা আছে। ওই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জুমার দিন যারা প্রথমে আসে তারা যেন উট কুরবানী করল, এরপর যারা আসে তারা যেন গরু কুরবানী করল ...।” -সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৮১

উপরোক্ত হাদীসের সংশ্লিষ্ট আরবী বাক্যগুলো এই-

فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، ... فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ...

মুসনাদে আহমদে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত হয়েছে-

الْمُهَجَّرُ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ كَمُقَرَّبِ الْقُرْبَانِ، فَمُقَرَّبٌ جَزُورًا، وَمُقَرَّبٌ بَقَرَةً، وَمُقَرَّبٌ شَاةً وَمُقَرَّبٌ دَجَاجَةً، وَمُقَرَّبٌ بَيْضَةً.

উল্লেখ্য, উট, গরু ও বকরীর ‘কুরবান’ হয় জবাই করার মাধ্যমে, আর মুরগি ও ডিমের ‘কুরবান’ সৎকার মাধ্যমে। কেননা এ সওয়াবের কথাই অন্য হাদীসে এভাবে এসেছে- “উট জবাইকারীর মত, গরু জবাইকারীর মত।” -সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস ১০৯৩: الزوائد في الوانده
إسناده صحيح

তাই ‘কুরবান’ শব্দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে পশু জবাইয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি—একথা বাস্তবসম্মত নয়।

আরেকটি বড় ইলমী খেয়ানত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

“মুসলিম সমাজে তথাকথিত ‘কুরবানীর ঈদ’ অর্থাৎ পশু জবাইয়ের আনন্দ ধ্যানে রেখেই এই বিনোদন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার হুকুম থাকলে এ বিনোদনের সুযোগ থাকত না। তারপরও ‘ইয়াওমুল আদহা’ বা ঈদুল আদহা অর্থাৎ বলি বা উৎসর্গ দিবস বা উৎসর্গের আনন্দ বলে মুসলিম-সমাজে একটি পর্বরীতি চালু আছে। এ দিবসে মুসলিমরা দিনের প্রথম ভাগে সকালের দিকে দু’রাকাত নামায পড়ে, এরপর পশু জবাই করে অংশবিশেষ দান করে বাকিটা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ধুম-ধামের সাথে আনন্দ উপভোগ করে। রাসূলের সময় থেকে দেখা যায়, এদিবসে প্রত্যেকেই সাধ্যমত নতুন পোশাক পরিধান করে; ... নানা রকম বিনোদনের মধ্য দিয়ে দিবস যাপন করে। এ উৎসব চলে তিন দিনব্যাপী। রাসূল এ উৎসবটি চালু করেন। তিনি অন্য সমাজের দেখাদেখি এটি চালু করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক জাতি-সম্প্রদায়েরই কিছু কিছু আনন্দের দিবস আছে; আর এটি হল আমাদের আনন্দের দিন। এ দিনে আমরা নামায পড়ব; এরপর পশু জবাই করব। রাসূলের কোন বাণীতেই এ দিবসটি ত্যাগের দিবস বা কুরবানির দিবস বলে উল্লেখ নেই।

বস্তুত এ একটি যৌথ সামাজিক আনন্দ অনুষ্ঠান। আনন্দ করে পশু জবাই করার অনুষ্ঠান নয়। তবে, অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে পশু জবাই করা নয়। যৌথ সামাজিক আনন্দ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে যথাপ্রয়োজন পশু জবাই করার অনুমোদন মাত্র। এটা কোন বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠান নয়।” (পশু কোরবানী একটি বিকল্প প্রস্তাব পৃ. ১৭-১৮) (নাউয়িবিল্লাহ! ছুম্মা নাউয়িবিল্লাহ!!)

এখানেও কুরবানীবিষয়ক কুরআনী আয়াত ও দ্বীনী ধারণাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. তাদের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যদি কুরবানীর আদেশ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসত তাহলে কোন আপত্তি ছিল না এবং নতুন কোন প্রস্তাব পেশ করারও প্রয়োজন হত না, কিন্তু যেহেতু বিষয়টি শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এসেছে তাই তা সংশোধনযোগ্য! আর এ কারণেই তারা কুরবানীর বিভিন্ন বিকল্প পেশ করতে শুরু করেছে।

মনে রাখতে হবে যে, এটা মুনকিরে হাদীস (হাদীস অস্বীকারকারী) ফের্কার ধারণা, যারা উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলিম-উম্মাহ থেকে খারিজ। কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে- “আর যে রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহর অনুগত হল।” -সূরা নিসা ৮০

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- “আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার নিকট হেদায়াত প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথের অনুসরণ করে, আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেব যেদিকে সে ফিরে গেল এবং তাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করব। আর তা কতই না মন্দ নিবাস!” -সূরা নিসা ১১৫

আরও ইরশাদ হয়েছে- “না, তোমার রবের শপথ, তারা মুমিন হবে না যে পর্যন্ত তাদের মধ্যকার বিসংবাদিত বিষয়ে তোমাকে ফয়সালাদাতা হিসাবে গ্রহণ না করে। এরপর তোমার ফয়সালায় কোনরূপ কুণ্ঠা অনুভব না করে আর পূর্ণরূপে সমর্পিত না হয়।” -সূরা নিসা ৬৫

অতএব এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে, ঈদুল আযহার কুরবানীর হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি। কেননা, প্রথমত যে বিধান সহীহ হাদীসে এসেছে তা পরোক্ষভাবে আল্লাহ তাআলারই হুকুম এবং ওহীর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে, তা এই যে, ঈদুল আযহার কুরবানীর বিধান কুরআন মজীদে অস্তিত্ব দুই আয়াতে এসেছে।

২. ঈদুল আযহা ইসলামের একটি পরিভাষা, যার অর্থ হচ্ছে ওই ঈদ যাতে আল্লাহ তাআলার হুকুমে তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁর দেওয়া পশু থেকে রাসূলের নির্দেশিত তরীকায় জবাই করা হয়। কুরবানী হয়ে যাওয়ার পর তাঁরই আদেশে সে পশুর গোশত নিজেরাও খাওয়া হয়, আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দেওয়া হয় এবং গরীব-মিসকীনকে সদকা করা হয়।

أضحى ‘আযহা’ শব্দটি হচ্ছে أضحية শব্দের বহুবচন। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য ‘নুসুক’ হিসাবে যে পশু জবাই করা হয় তাকে আরবী ভাষায় ‘আযহা’ বলে। অতএব ‘আযহা’ অর্থ কুরবানী। ‘ইয়াওমুল আযহা’ অর্থ কুরবানীর দিন এবং ‘ঈদুল আযহা’ অর্থ যে ঈদে কুরবানী করা হয়।

এই মর্যাদাপূর্ণ দ্বীনী পরিভাষার অমর্যাদা করে তারা তাকে হিন্দুদের ‘বলি উৎসবে’র সাথে তুলনা করেছে, অথচ বলি হচ্ছে সম্পূর্ণ শিরকী কাজ আর কুরবানী হচ্ছে তাওহীদের শিক্ষা অবলম্বনকারীদের আল্লাহর আদেশ পালন, যা সম্পূর্ণরূপে ইখলাস ও তাওহীদের উপর নির্ভরশীল।

৩. এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ যে, তিনি ঈদুল আযহার বিধান অন্যদের দেখাদেখি জারি করেছেন। নাউযুবিল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের বিষয় ওহী থেকে গ্রহণ করতেন, অন্য কোন জাতির অনুকরণ থেকে নয়। অন্যদের দেখাদেখি যদি শরীয়ত প্রণয়ন সম্ভব হত তাহলে আর রাসূলের কী প্রয়োজন ছিল, বুদ্ধিজীবীরাই তা করে ফেলতে পারতেন!

ঈদ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে যে, জাহেলি যুগের লোকদের বছরে দু'টি দিন ছিল, যে দিনগুলোতে তারা ক্রীড়া-কৌতুক করত। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাশরীফ আনলেন তখন বললেন—

قَدْ أَبْدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأُضْحَى.

“আল্লাহ তোমাদেরকে এ দু'দিনের পরিবর্তে উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন। তা হচ্ছে ‘ইয়াওমুল ফিতর’ ও ‘ইয়াওমুল আযহা।’ -সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১৫৬১; মুসনাদে আহমদ ৩/১৭৮, হাদীস ১২৮২৭, ৩/১০৩, হাদীস ১২০০৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১১৩১

আগের আলোচনায় বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী উল্লেখ করা হয়েছে—

أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأُضْحَى جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ

“আমাকে ইয়াওমুল আযহাতে কুরবানী করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এ দিনকে আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের জন্য ঈদ সাব্যস্ত করেছেন।”

এই সুস্পষ্ট ঘোষণার পর কোন ঈমানদার কি বলতে পারে যে, নবীজী এই বিধান অন্যদের দেখাদেখি জারি করেছেন? নাউযুবিল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আল্লাহ তাআলার উদ্ধৃতি ছাড়াও এ বিধান জারি করতেন তবুও তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হত। কেননা, তিনি দ্বীন ও শরীয়ত আল্লাহ তাআলার নিকট থেকেই ওহীর মাধ্যমে গ্রহণ করতেন।

৪. এ কথাও আপত্তিকর যে, ‘রাসূলের কোন বাণীতেই এ দিবস ত্যাগের দিবস’ বা ‘কুরবানীর দিবস’ বলে উল্লেখিত হয়নি।’

মুসলিমরা তো একে ত্যাগের দিবস বলেন না। অতএব এর সূত্র খোঁজারও প্রয়োজন নেই। আর ‘কুরবানীর দিবস’ শব্দেরই বা কী প্রয়োজন? হাদীস শরীফে এর সমার্থক বা নিকটবর্তী অর্থবোধক শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। হাদীস শরীফে এ

দিনকে সাধারণভাবে ‘ইয়াওমুন নাহর’ বলা হয়েছে। ‘ইয়াওমুয যাব্বহ’ শব্দও এসেছে। তেমনি এ দিনের বিশেষ আমলকে ‘নুসুক’ ও ‘তায়হিয়া’ বলা হয়েছে। তবে এর তৃতীয় নাম ‘কুরবান’ বা কুরবানী আমাদের মাঝে সাধারণভাবে পরিচিত। এই নামও হাদীস শরীফে এসেছে, যা ইতোপূর্বে সহীহ বুখারী ও মুসনাদে আহমদের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখান থেকেই এ দিবস কুরবানীর দিবস হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ নামের সাথে কারো দ্বিমত থাকলে তিনি আরবী নাম ‘ইয়াওমুল আযহা’ ব্যবহার করতে পারেন; কিন্তু তাতে কি মূল বিষয়ে কোন পরিবর্তন হবে?

৫. একথাও সম্পূর্ণরূপে দ্বীনের তাহরীফ বা বিকৃতিসাধন। এ কথা বলা যে, ‘আইয়ামে নাহরে’ (১০-১২ যিলহজ্ব) কুরবানীর বিধান এসেছে মূলত উৎসবের প্রয়োজনে। নির্ধারিত ইবাদত হিসাবে নয়!

যদি উৎসবের প্রয়োজনেই কুরবানী বিধিবদ্ধ হত তাহলে তো এত নিয়ম-কানুন, এত মাসআলা-মাসায়েলের প্রয়োজন হত না। কুরবানীর জন্য এমন পশু হতে হবে, এই এই ক্রটি থাকলে সে পশু দিয়ে কুরবানী সঠিক হবে না, শুধু গৃহপালিত পশু দ্বারাই কুরবানী করা যাবে, অন্য পশু দ্বারা করা যাবে না। এত বয়সের পশু হতে হবে, এর চেয়ে কম বয়সী পশু দ্বারা কুরবানী হবে না, ঈদের নামাযের আগে জবাই করলে কুরবানী হবে না, শুধু ১০ থেকে ১২ যিলহজ্ব পর্যন্ত কুরবানী করা যাবে, এর পরে করা যাবে না, ইত্যাদি শর্ত-শারায়তের প্রয়োজন হত না। যদি শুধু গোশতের উদ্দেশ্যেই কুরবানী হত তবে তো যেকোন হালাল পশু যেকোন দিন যেকোন সময় জবাই করার সুযোগ থাকত।

সালাতুল ঈদের আগে জবাইকৃত পশু সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার বলেছেন—“এটা হচ্ছে শাতু লাহমিন’ অর্থাৎ গোশতের ছাগল।” এর মাধ্যমে নুসুক আদায় হবে না। কুরবানী যদি গোশতের জন্যই হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর কোন অর্থ থাকে না।

তেমনি কুরবানী গোশতের প্রয়োজন পূরণের জন্য হলে এর জন্য ইখলাস শর্ত হত না। শরীয়তে এই মাসআলাও থাকত না যে, কোন শরীক যদি গোশতের নিয়তে কুরবানীতে শরীক হয় তাহলে কারো কুরবানী হবে না, না তার, না অন্যদের।

মোটকথা, কুরবানী একটি ইবাদত। একে নিছক পশু-জবাই বলে সাব্যস্ত করা কিংবা গোশতের প্রয়োজন পূরণের উপায় বলে ব্যাখ্যা করা হয় জাহালাত ও মূর্থতা

বা পরিকল্পিত তাহরীফ ও শরীয়ত-বিকৃতির অপচেষ্টা।

৬. একথা বলা যে, ঈদুল আযহার আনন্দ হচ্ছে পশু-জবাইয়ের আনন্দ কিংবা শুধু আনন্দের জন্য পশু ধরে ধরে জবাই করা-এটাও নিতান্ত মূর্থতা কিংবা শরীয়ত বিকৃতির অপচেষ্টা।

ঈদুল আযহার আনন্দ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ পালনের আনন্দ। আল্লাহ তাআলা এ আনন্দ উদযাপনের আদেশ করেছেন। এ আনন্দ আরাফা-দিবসের সাধারণ ক্ষমার আনন্দ, হাজীদের জন্য হজ্ব আদায়ের আনন্দ। সবার জন্য আল্লাহর দরবারে কুরবানী পেশ করার সৌভাগ্য লাভের আনন্দ। এরপর আল্লাহর দরবারে মকবুল হওয়া বস্তু দ্বারা আল্লাহ তাআলার মেহমানদারিতে शामिल হওয়ার আনন্দ। কেননা, ইখলাসের সাথে কুরবানী আদায়কারী প্রত্যেক মুমিনের অন্তরের প্রত্যাশা এই যে, আল্লাহ তার কুরবানী কবুল করেছেন। পশু জবাইয়ের 'দর্শন-সুখে'(!) কোন মুমিন কি সুখী হয়? তাঁদের সুখ তো আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর নৈকট্য অর্জনে।

বস্তুত ইসলামী ঈদকে যখন লোকেরা অন্যান্য জাতির উৎসবের মতো মনে করে তখনই এ ধরনের অদ্ভুত কথাবার্তা বলে অথচ ইসলামের ঈদ স্বরূপ ও তাৎপর্য এবং বিধান ও সম্পাদন-পদ্ধতি সকল দিক থেকে অন্যদের পর্ব-উৎসব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ বিষয়ে আলকাউসারের রমযান-শাওয়াল ১৪২৭ হি. সংখ্যায় কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

আলোচিত বইটিতে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি, অপব্যখ্যা ও অপপ্রচারের যেসব দৃষ্টান্ত রয়েছে তার তালিকা অনেক দীর্ঘ। আমি শুধু ভূমিকার দুএকটি কথার পর্যালোচনা করলাম, সম্পূর্ণ বইয়ের উপর আলোচনা এক প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়, এর জন্য স্বতন্ত্র রচনা প্রয়োজন।

আল্লাহ তাআলা প্রতি যুগের বেদ্বীন, বেইলম ও বেআমল 'গবেষক'দের অপপ্রচারের ফেতনা থেকে উন্মতকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে পূর্ণ তাওহীদ ও ইখলাসের সাথে সুনত্ন মোতাবেক এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রসঙ্গত পাঠকদের কাছে অনুরোধ থাকবে, তারা যেন এ সংখ্যার 'মাসায়েলে কুরবানী' শীর্ষক প্রবন্ধটিও মনোযোগের সাথে পড়েন, যেন আমাদের এই আমল সকল রকম ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকে এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয়। #

দ্বীনী দাওয়াতের মতো সবার জন্য দ্বীনী তালীমের ব্যবস্থা করাও অপরিহার্য ব্যাপক দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা

দ্বীনের অনুসারীদের নিকট দ্বীনের অন্যতম প্রধান দাবি এই যে, তারা যেন সর্বস্তরের মানুষের মাঝে দ্বীনের অনুসরণ ব্যাপকতর করার চেষ্টা করেন এবং দ্বীনের দাওয়াতকে সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণী বা শুধু আগ্রহী ব্যক্তিদের মাঝে সীমাবদ্ধ না রাখেন। মুসলমানদের মনে মুসলমানিত্বের অনুভূতি জাগ্রত করার এবং দ্বীনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ দাবি। মুসলমানদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে যে, দ্বীন ও ঈমান হচ্ছে শিক্ষা করার বিষয়। শেখা ছাড়া এমনি এমনি তা অর্জিত হয় না। আর তা শিক্ষা করা অন্যান্য বিদ্যা ও পেশা শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। বর্তমানে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ব্যাধি দ্বীনের বিষয়ে অনাগ্রহ ও উদাসীনতা। এটা কীভাবে দূর হয় এবং তাদের মাঝে দ্বীনকে জানার এবং দ্বীন ও ঈমান শেখার প্রেরণা জাগ্রত হয়-এই প্রচেষ্টাই হচ্ছে দাওয়াতের ব্যাপক বিস্তারের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও ফলপ্রসূ পদ্ধতি।

বিগত শতাব্দীর অন্যতম মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)এর প্রচেষ্টায় দিল্লীর নিয়ামুদ্দীন থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের যে কর্মপন্থা প্রচলিত হয়েছে তা এ পদ্ধতির একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। আল্‌হাম্দুলিল্লাহ, এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ কল্পনাতে উপকার পেয়েছে এবং এখনও পাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হবে।

দ্বীনী ইলমের ব্যাপকতার গুরুত্ব

যদিও দাওয়াত ও তাবলীগের এই পদ্ধতি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকে মানুষের ঈমানী জাগরণ এবং দ্বীন শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের মেহনত এবং এর মূল

কর্মপন্থাও ছিল সর্বসাধারণের দ্বীনী ইলম অর্জনের একটি উত্তম উপায়, কিন্তু সে সময়ই হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলে গেছেন যে, “আলেমগণের নিকট আরয, তাবলীগ-জামাআতের চলাফেরা এবং মেহনত ও কোশেশ দ্বারা সর্বসাধারণের মাঝে শুধু দ্বীনের আগ্রহ ও দ্বীনের মূল্য বোঝার যোগ্যতাই সৃষ্টি করা যাবে এবং তাদেরকে দ্বীন শেখার জন্য প্রস্তুত করা যাবে। এরপর তাদেরকে দ্বীন শেখানো এবং দ্বীনী তরবিয়তের কাজ উল্যামায়ে কেরাম ও হক্কানী বুয়ুর্গানে দ্বীনের মনোযোগ ও চেষ্টার মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে। তাই এদিকে আপনাদের সদয় দৃষ্টিরও বড় প্রয়োজন।” -মালফূযাত, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.) সংকলনে মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নুমানী (রহ.) ১৪২, মালফূয নং ২১২

তিনি আরো বলেছেন, “তাবলীগ-জামাআতের শিক্ষা-সিলেবাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ‘তাজবীদ’। কেননা কুরআন কারীম সহীহ-শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে শেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু তাজবীদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন জামাআতে তা পাওয়া যায় না। এজন্য এই সময় শুধু চেষ্টা করতে হবে যেন, মানুষের মনে এর প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং এর সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সম্পর্ক তৈরি হয়। এরপর বিষয়টি শেখার জন্য যেন আলাদা সময় বের করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।” -মালফূযাত ১৩৮, মালফূয নং ২০২

বাস্তব কথা এই যে, ফরযে কেফায়া তো অনেক উপরের বিষয় ফরযে আইন ইলমের পরিমাণও কম নয়। কুরআন, হাদীস, সীরাতে রাসূল, আকায়েদ, ইবাদত, লেনদেন, ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, আত্মার জগৎ ইত্যাদি সকল মৌলিক ও প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয়ের ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের উপর ফরয, তা তিনি যে শ্রেণীরই হোন না কেন।

তেমনি বাস্তবতা এই যে, বর্তমান ফেতনার যুগে বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সমাজ ও জগতের ব্যাপারে সচেতন ব্যক্তিদের জন্য দ্বীনীয়াতের প্রাথমিক কিছু জ্ঞান মোটেও যথেষ্ট নয়। হযরত থানভী (রহ.)এর ভাষায়, “তাদেরকে আকায়েদ ও আহ্কােমের ইলম মোটামুটি বুঝে-গুনে অর্জন করতে হবে এবং ইসলামের সৌন্দর্য, নিগুঢ় তত্ত্ব ও রহস্য এবং ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশনার সর্বজনীনতা ও চিরন্তনতার মজবুত ও সুদৃঢ় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যাতে শরীয়তের মাহাত্ম্য অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস মনমস্তিস্কে এমনভাবে দৃঢ়মূল হয় যে, ইসলামের শত্রুদের নানামুখী অপপ্রচারের মুখে বিপর্যস্ত হওয়ার আশংকা না থাকে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, সাধারণ মানুষ ও জেনারেল শিক্ষিত ভাইয়েরা দ্বীনীয়াতের

উপরোক্ত জ্ঞান কীভাবে এবং কোথায় অর্জন করবেন এবং দ্বীনী দাওয়াতের মত দ্বীনী শিক্ষাকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করার পন্থা কী?

অনেকের ধারণা, দ্বীনী ইলম শুধু বিশেষ সিলেবাস ও বিশেষ শিক্ষকদের অধীনে আরবী মাদ্রাসার গণ্ডির ভেতরে অবস্থান করে সুদীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমেই হাসিল করা যায়। আর যেহেতু সকলের পক্ষে মাদ্রাসার তালেবে ইলম হওয়া বা মাদ্রাসার চার দেয়ালের ভেতর আট দশ বছর কাটানো সম্ভব নয়, তাই তারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইলমে দ্বীন তাদের কিসমতে নেই। আর বাকি জীবনটুকু জাহালতের মধ্যে কাটানোর ব্যাপারেও তারা সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।

এই ধারণা ও সিদ্ধান্ত দুটোই ভুল। দ্বীনের প্রয়োজনীয় ইলম (যার প্রতি উপরে ইঙ্গিত করা হয়েছে) প্রত্যেক মুসলমান চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দুনিয়াবী অন্যান্য ব্যস্ততার মধ্যেও অর্জন করতে পারে। ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের ইতিহাস এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

আরবী মাদ্রাসার বিশেষ সিলেবাসভুক্ত পড়াশোনা তো দ্বীনী বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত পর্যায়ের ইলম অর্জনের জন্য এবং ‘আলেম’, ‘ফকীহ’, ‘মুহাদ্দিস’, ‘মুফাস্সির’ এবং শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরির উদ্দেশ্যে। সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি অবশ্যই ভিন্ন হবে।

আমাদের পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম এবং বুয়ুর্গানে দ্বীন এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। প্রত্যেক মুসলিম কীভাবে দ্বীনের প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করতে পারে এবং কীভাবে দ্বীনী শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা যায়— এ প্রসঙ্গে তাঁরা অনেক প্রস্তাব রেখে গেছেন। যেমন, হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) ‘হায়াতুল মুসলিমীন’, ‘ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত’ গ্রন্থে এবং দাওয়াত-তাবলীগ-তালীম বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন ওয়াজ-বক্তৃতায় বেশ কিছু পন্থা ও কর্মপদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। হযরতের শেষ জীবনে প্রতিষ্ঠিত ‘মজলিসে দাওয়াতুল হক’ (সেই খসড়া অনুযায়ী যা তিনি তাঁর বিভিন্ন পুস্তিকায় এবং তাঁর খলীফা হযরত মুহিউস্ সুন্নাহ মাওলানা আবরারুল হক হারদুঈ (রহ.) ‘আশরাফুন নিয়াম লিল-ইসলাহিল ‘আমি ওয়াত-তাম’ পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন) দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম-সূচি।

এ প্রসঙ্গে অন্যান্য বুয়ুর্গানে দ্বীনের প্রস্তাবাবলিও বিদ্যমান রয়েছে। তবে যে বিষয়টি এখন প্রয়োজন তা হল, বর্তমান সময়ের নেতৃস্থানীয় আলেমগণের এ

বিষয়ে মনোযোগী হওয়া এবং এসব প্রস্তাব ও নির্দেশনা বাস্তবায়িত করা। কেননা, আজকাল এই রোগের বিস্তার লক্ষ করা যাচ্ছে যে, দ্বীনের বিষয়ে কিছু আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া এবং উলামায়ে কেরাম বা বুয়ুর্গানে দ্বীনের সাহচর্যের মাধ্যমে বাহ্যিক কিছু আমল দুরুস্ত করা কিংবা নিজের মনমত বাজার থেকে কিছু দ্বীনী বই খরিদ করে তা পড়ে নেওয়াকেই অনেকে গোটা দ্বীনের ধারণা অর্জন ও অনুসরণের পক্ষে যথেষ্ট মনে করছেন অথচ তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারভুক্ত অনেকের ফরযে আইন ইলম সম্পর্কেও ধারণা নেই। দুঃখের ব্যাপার হল বিষয়টির অনুভূতিও তাদের নেই।

এই আলোচনায় আমি শুধু দুটি প্রস্তাব পেশ করছি :

১. আরবী মাদ্রাসাগুলোতে ‘বয়স্কদের দ্বীন শিক্ষা’ বিভাগ খোলা এবং এক বা একাধিক সিলেবাস চালু করা। সম্ভব হলে এই বিভাগে ‘দিবা’ ও ‘নৈশ’ উভয় সিফটেরই ব্যবস্থা রাখা, যাতে আগ্রহী ব্যক্তির সুবিধা মত অংশগ্রহণ করতে পারেন।

২. প্রত্যেক মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে কিংবা এক বা একাধিক নামাযের পরে সাধারণ দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

এই আয়োজনটি এক/দুই ঘণ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; কিন্তু নিয়মিত গুরুত্বের সাথে হবে। এখানে কুরআনে কারীম এবং নামায বিশুদ্ধ করা ছাড়াও দ্বীনীয়াতের একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস পড়ানো হবে। প্রতি নামাযের পর যে সময়টুকু বরাদ্দ থাকবে তাতে শুধু একটি দলকেই পড়ানো হবে এমন নয়; বরং আয়োজনটি থাকবে প্রতি নামাযের পরেই। যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ সুবিধা মত যেকোন এক হাল্কা অস্তিত্ব হতে পারেন।

এর সিলেবাস দ্বীনদার ও অভিজ্ঞ আলেমগণের পরামর্শের ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে এবং নামায ও কুরআন বিশুদ্ধকারী ও শিক্ষাদানকারী শিক্ষকও নির্বাচন করতে হবে তাঁদেরই পরামর্শক্রমে।

এই কাজটি জুমার খতীব সাহেবান, ইমাম ও মসজিদ কমিটির সদস্যদের সামান্য মনোযোগের মাধ্যমেই শুরু হতে পারে। শুধু হিম্মত নিয়ে অগ্রসর হওয়া দরকার। ‘সম্পূর্ণ না হলে যতটুকু সম্ভব করি’-এই নীতি অনুসরণ করা হলে কোন কাজটি কঠিন থাকে?

কিছুদিন আগে বগুড়ার একটি মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম। মাদ্রাসাটির নাম ‘দাওয়াতুল হক বহুমুখী আদর্শ মাদ্রাসা ও সমাজসেবা সেন্টার।’ উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বগুড়া জামিল মাদ্রাসার শাইখুল হাদীস হযরত

মাওলানা ইয়াকুব সাহেব এর প্রতিষ্ঠাতা। এই মাদ্রাসার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হল দ্বীনী শিক্ষা বিস্তার। এজন্য তিনি সেখানে 'বয়স্ক শিক্ষা'কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন। সেখানে গিয়ে এটাও জানতে পেরেছি যে, তিনি শহরের অনেক মসজিদে পালাক্রমে দ্বীনী শিক্ষার আয়োজন করে রেখেছেন। এর মাধ্যমে হাজারো মানুষ কুরআনে পাক বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা এবং দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়াদির জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এখনো হচ্ছেন।

শাইখুল হাদীস মাওলানা ইয়াকুব সাহেবের তালীমী হালকায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত দরসে কুরআনের ব্যবস্থা ছিল। এরপর কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.)এর কিতাব 'মালাবুদা মিনহু'এর বাংলা অনুবাদের দরস দিয়েছেন। কিতাবটি বাস্তবিক পক্ষেই দ্বীনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা করার জন্য উপযুক্ত। এরপর সে হালকায় নূরুল ইজাহ-এর দরস হয়েছে। মাওলানা মনযূর নুমানী (রহ.) সংকলিত ও ব্যাখ্যাকৃত 'মাআরেফুল হাদীস' তাঁর দরসাধীন রয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল, এর মাধ্যমে মানুষ একদিকে যেমন দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন করছে, অপরদিকে তাদের আকীদা-বিশ্বাসে দৃঢ়তা এবং আমলের মধ্যে অবিচলতা আসছে। ধীরে ধীরে তাদের মনে দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ রূপটি পরিষ্কার হচ্ছে এবং দ্বীন বোঝার ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ মন-মেজাজ সৃষ্টি হচ্ছে। মাদ্রাসাটির এক দুইজন শিক্ষার্থীর কুরআন তেলাওয়াত শোনার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করছি, তাদের তেলাওয়াত বেশ নির্ভরযোগ্য। তেলাওয়াত শুনে আন্দাজ করা যাচ্ছিল না যে, তা কোন সাধারণ মানুষের তেলাওয়াত। অথচ সাধারণত দেখা যায় রীতিমত মশক করলেও সাধারণ মানুষের তেলাওয়াতে এমন এক ধরনের সুর বা ছাপ পাওয়া যায়, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি মাদ্রাসা পড়ুয়া আলেম নন।

ইলমে দ্বীন শিক্ষার সাধারণ ব্যবস্থা যেসব স্থানে আছে বা থাকা উচিত সেখানে অংশগ্রহণ এবং এই সুযোগ থেকে উপকৃত হওয়ার অধিক হকদার আমাদের ওই সব ভাই, যারা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের মাধ্যমে দ্বীনের গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষভাবে তাদেরকেই অনুরোধ করা হচ্ছে যে, আলেম-উলামার নিকট থেকে দ্বীনী মাসায়েলের ইলম অর্জন করুন। আশা করি তাঁরা নিজেরাও এ বিষয়ে মনোযোগী হবেন এবং অন্যকেও মনোযোগী করার চেষ্টা করবেন।#

[সেপ্টেম্বর '০৫
ডিসেম্বর '০৯ঈ.]

সহীহ তেলাওয়াতের গুরুত্ব এ ব্যাপারে আমাদের কী দায়িত্ব

কুরআনে কারীমের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও ফযীলত বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এটি আল্লাহ পাকের কালাম (বাণী) যা তিনি বান্দার হেদায়াতের জন্য, তাদেরকে নিজের সত্ত্বা-অসত্ত্বার বিষয়াবলি সম্পর্কে অবগত করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

এই কুরআনের উপর ঈমান আনয়নকারী বান্দার প্রতি কুরআনে কারীমের অনেক হক রয়েছে, যেগুলো গুরুত্বের সাথে আদায় করা সকল মুসলমানের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। কুরআনে কারীমের ওইসব হকের ব্যাপারে বেপরোয়া ভাব এবং সেগুলো আদায়ে বিমুখতা প্রকাশ বান্দাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়, যাতে ইরশাদ হয়েছে—

وقال الرسول يَرْبَّ انَّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

“রাসূল বলবেন, হে আমার রব, আমার কওম এই কুরআন পরিত্যাগ করেছে।”
—সূরা ফুরকান ৩০

এখানে আমি কুরআনে কারীমের সেসব হক থেকে শুধু একটি মৌলিক হকের আলোচনা করব। সেটা হল কুরআনে কারীমের সহীহ তেলাওয়াত শেখা; তাজবীদের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী পড়তে শেখা। ভাষা শুদ্ধ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা তো যেকোন ভাষায় এমনিতেই কাম্য। তাছাড়া কালামুল্লাহ সহীহ করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া শরয়ী দায়িত্বও বটে। মুসলিম উম্মাহ এ কথায় একমত যে—

الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم.

‘তাজবীদ শেখা সবার উপর ফরয। তাজবীদ ছাড়া তেলাওয়াকারী গুনাহগার।’

তেলাওয়াত সহীহ করার গুরুত্ব এ থেকেও আপনি অনুমান করতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোদ আল্লাহ তাআলা তেলাওয়াত শিখিয়েছেন এবং উম্মতকে তেলাওয়াত শেখানোর দায়িত্বও তাঁকে অর্পণ করেছেন। নবীজীর রেসালতের দায়িত্বগুলোর মধ্যে يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ (যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনান)কে গুরুত্বের সাথে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তেলাওয়াত শিখেছেন সাহাবায়ে কেরাম; তাঁদের নিকট থেকে তাবেয়ীগণ, তাঁদের থেকে তাবে-তাবেয়ী এবং তাবে-তাবেয়ীগণ থেকে তাঁদের পরবর্তী লোকেরা কুরআন কারীমের তেলাওয়াত শিখেছেন। এভাবেই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াত পদ্ধতি পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্ম— এধারায় আজ পর্যন্ত চলে এসেছে এবং তেলাওয়াতের নিয়ম-কানুনও তাঁদেরই মাধ্যমে পুরোপুরিভাবে গ্রহীত ও সংরক্ষিত হয়েছে।

মোটকথা তেলাওয়াতের বাস্তব অনুশীলন ও এর কায়েদা-কানুন—এ উভয়ভাবেই আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াত-রীতি শিখে নেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন এবং এভাবেই কেয়ামত পর্যন্ত বাকি রাখবেন।

তাজবীদের ব্যাপারে গাফলতি বা সহীহ তেলাওয়াত শেখা থেকে বিরত থাকা এবং এ ব্যাপারে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা শুধু এতটুকুই নয় যে, এটি একটি গুনাহ এবং তেলাওয়াতের ব্যাপারে নববী-তরীকা থেকে বঞ্চিত থাকা বরং এধরনের ব্যক্তির নিজের অজান্তেই বহু ভয়াবহ অপরাধে পতিত হয়, যথা :

১. ‘কালামুল্লাহ’র হক বিনষ্ট করা।

২. ‘কালামুল্লাহ’র শব্দের বিকৃতি ঘটানো বা অজান্তেই অর্থগত বিকৃতি সাধন করা।

৩. আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে মিথ্যারোপ করা। কেননা কুরআন আল্লাহর কালাম এবং কুরআনের কোন আয়াত তেলাওয়াত করার অর্থ হল, বান্দা আল্লাহর কালাম শোনাচ্ছে। এখন যদি এতে তাজবীদের প্রতি লক্ষ রাখা না হয় এবং তেলাওয়াতে ‘লাহনে জলী’ (বড় ধরনের ভুল) করা হয় তবে কুরআনের শব্দাবলি পরিবর্তন করে তেলাওয়াতকারী এমন কথা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে দিল যা আল্লাহ তাআলা নাযেল করেননি, যদিও ব্যাপারটি অজান্তেই ঘটছে।

৪. নিজের নামাযকে বরবাদ করা। কেননা সবাই জানেন নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করা ফরয। সূরায়ে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব এবং তার পরে বিভিন্ন রাকাআতে আরো কিছু পড়া ওয়াজিব। এখন যদি কেউ নামায আদায় হয় পরিমাণও সহীহ তেলাওয়াত না শেখে তবে সে তার নামাযকে বিনষ্ট করল।

এজন্য প্রত্যেকেরই উচিত নিজ নিজ তেলাওয়াতের পরীক্ষা নেওয়া। কোন নির্ভরযোগ্য কারী বা অন্তত শুদ্ধ তেলাওয়াত করে এমন কোন ব্যক্তিকে তেলাওয়াত শুনিতে জেনে নেওয়া উচিত, কার তেলাওয়াতে কতটুকু ত্রুটি আছে এবং কীভাবে এই ত্রুটি দূর করা যাবে। পাশাপাশি ঘরের ছোট-বড় প্রত্যেক সদস্য, এমনকি ঘরের কাজের লোকদেরকেও কুরআন তেলাওয়াত শেখানোর চেষ্টা করা এবং যারা মোটামুটি তেলাওয়াত করতে পারে তাদের তেলাওয়াত পুরোপুরি শুদ্ধ করার চেষ্টা করাও পরিবারের দায়িত্বশীলদের এমন একটি দ্বীনী ও ঈমানী দায়িত্ব, যা পালন করার চিন্তাভাবনা অবিলম্বে আরম্ভ করা উচিত।

বুয়ুর্গানে দ্বীন বলেছেন যে, আমরা দুনিয়াবী প্রয়োজনে কোন পেশার লোকের শরণাপন্ন হওয়াকেই লজ্জার ব্যাপার মনে করি না, তাহলে বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শেখার জন্য অভিজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে লজ্জাবোধ করব কেন? অথচ এক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীজী ঘোষণা দিচ্ছেন—

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

“তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়” এবং যখন দুনিয়াবী সকল প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় কাজে আমরা সময় বের করতে পারি তবে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরযের জন্য কেন সময় বের করতে পারব না?

আমাদের দায়িত্বসমূহ

এ ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়, রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব আছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল, তারা বর্তমান কুরআনী মক্তবসমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং যেখানে যেখানে প্রয়োজন আছে—বিশেষ করে গ্রাম ও পল্লী এলাকায়—মক্তব ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করবে। সকল প্রাইমারী স্কুলে ভাল মুয়াল্লিমের মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা ও দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবে।

সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগ্য মুয়াল্লিমের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন কোন নামাযের পর দশ-পনের মিনিট করে হলেও প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যের জন্য কুরআন শুদ্ধ করা এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক করা।

শিক্ষামন্ত্রণালয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ এজন্য কায়েম করা জরুরি, যে বিভাগ জনসাধারণের অবস্থা যাচাই করে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবাবলি পাশ করবে এবং তা বাস্তবায়িত করবে।

ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কর্তব্য হল, বর্তমান মকতবসমূহে সম্ভাব্য কোন খেদমতের ব্যাপারেই শিথিলতা না করা। মকতবের দায়িত্বশীলদের সাথে নিজেরা সাক্ষাৎ করে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেশ করা তাদেরই দায়িত্ব। নিজেদের সংশ্লিষ্ট ও অধীন ব্যক্তিদের তেলাওয়াত দুরস্ত করা এবং অন্তত দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো জেনে নেওয়া। যেসব প্রতিষ্ঠান ও বোর্ড কুরআনী মকতব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কাজে নিয়োজিত আছে তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় স্থানে মকতব স্থাপন এবং সাহায্যের মাধ্যমে কুরআনের সম্ভাব্য সব খেদমত করা। অনুরূপ কওমী মাদ্রাসাসমূহের পরিচালকদের সাথে যোগাযোগ করে প্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বীন শিক্ষার একটি বিভাগ খোলার আবেদন করে যথাসম্ভব তাতেও সাহায্যের হাত প্রসারিত করা উচিত। মসজিদসমূহের দায়িত্বে যারা আছেন তাদের কর্তব্য হল, মসজিদের সাথে মকতব প্রতিষ্ঠা করা এবং বড়দের দ্বীনী শিক্ষার প্রোগ্রাম চালু করা।

মোটকথা, এভাবে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী নিজনিজ দায়িত্ব বুঝে নিন এবং যে যতটুকু পারেন তা পালন করুন। আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের কর্মপন্থা ছিল—

مَا لَا يَدْرِكُ كُلَّهُ لَا يَتْرَكَ كُلَّهُ

‘পুরো না হলে আধাই সই’এর নীতির উপর কাজ করে যাওয়া। প্রয়োজন হলে অভিজ্ঞ আলেম ও মুয়াল্লিমগণের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে শিশুদের অভিভাবকদের উপর যে দায়িত্বটি বর্তায় তা হল, যে কোনভাবেই হোক এবং যেকোন মূল্যেই হোক সন্তানদের কুরআন ও দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করা। তাদেরকে এই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখা আর তাদের হত্যা করা একই ধরনের গুনাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের নিজনিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার এবং তা পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

[জুন '০৫ঈ.]

স্কুল-কলেজের ইসলামিয়াতের সিলেবাস একটি পর্যালোচনা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। তাওহীদের বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করে তাঁর বন্দেগী ও ফরমাবরদারীর মাধ্যমে মানব জীবন যাপন করবে এই উদ্দেশ্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে মানুষের আবাসস্থল বানিয়েছেন এবং দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ করেছেন। তবে মানুষের জাগতিক প্রয়োজনও রয়েছে। হেকমতের কারণে আল্লাহ তাআলা মানুষকে নানাবিধ প্রয়োজনের মুখাপেক্ষি করেছেন। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য যে জ্ঞান ও বিদ্যা আবশ্যিক তাকেই আমরা বলি জাগতিক বিদ্যা। বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত এই জ্ঞানের উৎস ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা। পক্ষান্তরে যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদত, তাঁর হুকুম-আহকাম পালন এবং আখেরাতের জীবনের প্রস্তুতি ইত্যাদির জন্যও জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জ্ঞানের নাম ইলমুদ্দীন। এর মূল উৎস ওহী যা কুরআন মজীদ ও সুন্নেতে নববীরূপে আমাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। ইলমুদ্দীনেরও অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে।

একটি অবক্ষয়মুক্ত সভ্য সমাজের জন্য দুটোরই প্রয়োজন। দ্বীনী জ্ঞান ও জাগতিক বিদ্যা দুটোই অপরিহার্য। জাগতিক বিদ্যা চর্চা বন্ধ হলে মানুষের দেহ ও মানবজীবনের বাইরের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর ইলমে ওহীর চর্চা বন্ধ হলে আক্ৰান্ত হবে মানুষের হৃদয় ও আত্মা এবং মানবজীবনের ভেতরের অংশ। মানুষের অবয়ব থাকবে কিন্তু মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটবে। ফলে মানুষের মধ্যেই বৃদ্ধি লাভ করবে পশুত্ব। যার একমাত্র প্রবণতা হবে পাশবিক চাহিদা পূর্ণ করা।

দুই

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ এক পরীক্ষা যে, মানুষের স্বভাবের মধ্যেই

পার্থিব প্রয়োজন পূরণের প্রেরণা বিদ্যমান রয়েছে। এই স্বভাবজাত প্রেরণা থেকেই মানুষ জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ করে থাকে। সম্ভবত এ জন্যই জাগতিক বিদ্যাচর্চার বিষয়ে কুরআন সুন্যাহয় সরাসরি তাকিদ করা হয়নি। সাধারণ অবস্থায় একে রাখা হয়েছে 'মুবাহ'এর পর্যায়ে। তবে এ বিষয়ে তাকিদ করা হয়েছে যে, যারা জাগতিক বিদ্যা চর্চায় আত্মনিয়োগ করবে তারা যেন আল্লাহর রেযামন্দির কাজে তা ব্যবহার করে। মানুষের দ্বীনী ও দুনিয়াবী সেবা করে এবং নিজ দায়িত্ব সূচারুপে সম্পন্ন করে।

পক্ষান্তরে ইলমে ওহীর সম্পর্ক হচ্ছে এমন এক জীবনের সাথে, যা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। গায়েব ও আখেরাতের প্রতি ঈমানই এই ইলমের ভিত্তি। তেমনি হৃদয় ও আত্মার পরিপূর্ণতা, চরিত্র ও জীবন গঠন, ব্যক্তি সংশোধন ও সমাজ সংস্কার হচ্ছে এই ইলমের লক্ষ্য উদ্দেশ্য, যা মানব স্বভাবের জন্য অত্যন্ত কঠিন। তেমনি এই ইলমের সম্পর্ক আল্লাহ ও বান্দার যাবতীয় হক আদায়ের সাথে, যা স্বভাবত কঠিন। সম্ভবত এজন্যই কুরআন হাদীসে ইলমে ওহী বা ইলমে দ্বীনের পঠন-পাঠনের ব্যাপারে জোর তাকিদ দেওয়া হয়েছে এবং এর সওয়াব ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

তিন

যদিও উপরোক্ত দুধরনের জ্ঞানই প্রয়োজন, তবে কোনটির প্রয়োজন ও গুরুত্ব অধিক তা অনুধাবন করা চিন্তাশীলদের জন্য কঠিন নয়।

বলাবাহুল্য যে, যে ইলমের সম্পর্ক সৃষ্টির পরিবর্তে স্রষ্টার সাথে, যার ভিত্তি অভিজ্ঞতার স্থলে আসমানী ওহীর উপর, যার লক্ষ্য নশ্বর জগতের স্থলে অবিনশ্বর জগৎ, যার বিষয়বস্তু মানুষের শরীরের স্থলে তার কলব ও হৃদয় এবং যার লক্ষ্য মানুষের অবয়বের স্থলে মনুষ্যত্বের পরিচর্যা সেই ইলমই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম হবে। আর তা হচ্ছে ইলমের দ্বীন, যার ভিত্তি ওহী।

কিন্তু ইলমে দ্বীনের বিস্তার ও গভীরতা সম্পর্কে চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তা এক অথৈ সমুদ্র। তাই প্রত্যেককে পূর্ণ দ্বীনের ইলম অর্জনের আদেশ করা হলে এবং প্রত্যেকের উপর ইলমে দ্বীনের বিশেষজ্ঞ হওয়া অপরিহার্য করা হলে তা পালন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত কিংবা জীবনের শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেত। সম্ভবত এজন্যই শরীয়তে সকল বিষয়ের পূর্ণ ইলম ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন 'ফরযে আইন' করা হয়নি। একে করা হয়েছে 'ফরযে কেফায়া।' অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম জনপদে ইলমে দ্বীনের মাহের ও বিশেষজ্ঞ বিদ্যমান থাকলে সকলেই

দায়মুক্ত হবে। তবে প্রয়োজন পরিমাণ ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এই ফরযে আইন ইলমের মধ্যে রয়েছে ঈমানিয়াত ও আকায়েদের ইলম, ফরয ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলম, হালাল-হারামের ইলম, ঈমানের শাখা-প্রশাখা, দৈনন্দিন প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান, যে যে পেশায় জড়িত তার সাথে সংশ্লিষ্ট মাসায়েল ও আহকাম, কুরআন মজীদেবর সহীহ-শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত (যদিও তা কিছু অংশই হোক) এই পরিমাণ ইলম অর্জন করার পর আরো অধিক ইলম অর্জন করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে তা ফরযে আইন করা হয়নি।

চার

জ্ঞানের বিষয়ে শরীয়তের নীতি এই যে, জাগতিক জ্ঞান ও দ্বীনী ইলম দুটোই প্রয়োজনীয় এবং দুটোরই চর্চা সমাজে থাকতে হবে। তবে জাগতিক জ্ঞানকে দ্বীনী ইলমের অনুগত রাখতে হবে এবং একে ইলমে ওহীর সেবা ও সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত করতে হবে।

ইতিহাস সাক্ষী যে, ইসলামী খেলাফত আমলে খলীফাতুল মুসলিমীনগণ উভয় জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সকল শ্রেণীর নাগরিকের মাঝে ফরযে আইন পর্যায়ের দ্বীনী ইলমের চর্চা ছিল। মুসলিম সমাজে যেমন ইলমে ওহীর বিশেষজ্ঞ বিদ্যমান ছিলেন তেমনি জাগতিক বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিত্বেরও অভাব ছিল না। তবে জাগতিক বিদ্যা চর্চায় মগ্ন থাকার ফলে যদিও তারা ইলমে ওহীর পারদর্শী হতেন না কিন্তু তারা হতেন দীনদার। ফরযে আইন পরিমাণ ইলম ছাড়াও আরো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তাদের ইলমে দ্বীন আত্মসত্ত্ব থাকত।

মোটকথা, শরীয়ত জাগতিক জ্ঞান অর্জনকে নাজায়েয বলে না। নাজায়েয বলে ক্ষতিকর বিদ্যা চর্চাকে। তেমনি জাগতিক বিদ্যায় এ পরিমাণ মগ্নতাকেও শরীয়ত নাজায়েয বলে, যা মানুষকে আল্লাহর পরিচয় ও স্মরণ, তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও আদেশ-নিষেধের বিষয়ে উদাসীন করে দেয়।

শরীয়ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী জ্ঞান অর্জনকে উৎসাহিত করেছে এবং অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর জ্ঞান চর্চা নিষিদ্ধ করেছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে জাগতিক বিদ্যা ও দ্বীনী ইলমের মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই। সংঘর্ষ হল উপকারী ও ক্ষতিকর বিদ্যার মাঝে।

পাঁচ

ব্রিটিশ বেনিয়া শক্তি ভারতীয় মুসলমানদের যে চরম ক্ষতিগুলো করেছে তার মধ্যে অন্যতম এই যে, তারা মুসলিম তরুণদের চিন্তাচেতনায় ধর্মবিমুখতা ও ধর্মদ্রোহীতার বীজ বপন করেছে। তাদের চিন্তা-চেতনায় এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, ইলমে দ্বীন ও জাগতিক বিদ্যার মধ্যে রয়েছে অলঙ্ঘনীয় বৈপরীত্য। ইলমে দ্বীন চর্চার অর্থই হল জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞতার শিকার হওয়া ...!

পক্ষান্তরে জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সম্ভবই নয় যদি না বৈষয়িক ভাবনায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন থাকা হয় এবং আল্লাহকে ও তাঁর ইবাদত-বন্দেগী, ইতাআত ও আনুগত্য পরিহার করা হয়!!

মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য যে, মানবতার দুশমন খোদাদ্রোহী এ সম্প্রদায় তাদের উদ্দেশ্য হাসিলে সফল হয়েছে। তারা জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য যা ছিল একটি প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয় এমন পরিবেশ ও পাঠ্যক্রম উদ্ভাবন করেছে, যাতে আল্লাহর পরিচয় এবং তাঁর মর্যাদা ও মহব্বত অন্তরে সৃষ্টি হওয়ার কোন অবকাশই থাকে না।

একই সঙ্গে বহু ক্ষতিকর বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়ে বিষয়টাকে আরো জটিল করা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় এমন সব উপাদান সন্নিবেশিত হয়েছে, যার দ্বারা মুসলমানের সন্তানেরা শুধু ইসলাম থেকেই দূরে সরে যায় না; বরং তারা ধর্মদ্রোহীতা ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার হয়ে যায়।

ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা ইংরেজদেরকে এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেছি, কিন্তু ইংরেজ দাসত্ব থেকে এখনও আমরা মুক্ত হতে পারিনি। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থায় এখনো আমরা তাদের অন্ধ আনুগত্য বজায় রেখেছি।

ছয়

ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনের সময় এ অঞ্চলের জনগণ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শ্লোগানে দশদিক প্রকম্পিত করেছে। তাদের দাবি এই ছিল যে, মুসলমানদের ভিন্ন আবাসভূমি চাই, যেন আমরা ইসলামের বিধান মোতাবেক জীবনযাপন করতে পারি। এর দাবি তো ছিল এই ভূখণ্ডে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কার্যকর হবে, শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন থাকবে এবং ফরযে আইন পরিমাণ ইলমে দ্বীন; বরং প্রয়োজনীয় আরো কিছু বিষয় সবার জন্য বাধ্যতামূলক

করা হবে। এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রাজুয়েটরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের পাশাপাশি আল্লাহর অনুগত বান্দা হবে এবং খালিক ও মাখলূকের যাবতীয় হক আদায়ে সচেতন ও সচেষ্টিত হবে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই আশা পূর্ণ হয়নি। শত্রুর কূট-কৌশলের কাছে এ অঞ্চলের মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে। ফলে সেই সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থাই বহাল থাকল, উপরন্তু আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজের সংস্কারের পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই ‘পরামর্শ’ দিতে লাগল যে, ‘এই এই বিষয় সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হোক!’

দেশের নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের অপরিহার্য কর্তব্য ছিল, তারা নিজেরাও ইলমে দ্বীনের ব্যাপারে মনোযোগী হবেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও দ্বীনদারী ও ইনসানিয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি করার এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ফরযে আইন পরিমাণ মানসম্মত দ্বীনী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এটা না করে তারা সর্বদা সমাজ ও মানবতার সেবক এই দ্বীনী মাদরাসাসমূহের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রপাগান্ডায় লিপ্ত হলেন!

সাত

তবে এটাও গণীমত যে, তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মাত্র একটি বিষয় ‘ইসলাম শিক্ষা’ নামে রাখা হয়েছে। ‘ইসলাম শিক্ষা’ নামে সাতটি বই রয়েছে, নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য একটি বই রাখা হয়েছে। বেশ কিছু দিন ধরেই আমার ইচ্ছা ছিল যে, এই বইগুলোর ভেতরের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার। কোন কথা সংশোধনের প্রয়োজন হলে সে ব্যাপারে সতর্ক করার। এদিকে কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধু বর্তমান সিলেবাসের এই সাতটি বইয়ের কপি পাঠিয়ে দেন এবং কাজটির জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দেন। এ উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে আমি প্রথমে বইগুলোতে একবার চোখ বুলাই। তাতে এমন কিছু ভাল বিষয় নয়রে এসেছে যা প্রকৃতপক্ষেই প্রশংসাযোগ্য। পাশাপাশি এমন কিছু বিষয় নয়রে এসেছে যেগুলো সংশোধন করা একান্ত জরুরি। নিম্নে এ ব্যাপারে কিছু মৌলিক কথা বলা হল :

১. এ বইগুলোতে দ্বীনের ফরযে আইন বিষয়গুলো পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এমনকি দশম শ্রেণীতেও না।

২. এ বইগুলো পড়ার পর একজন শিক্ষার্থীর দ্বীনে ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সহীহ ধারণা কখনোই হবে না।

৩. আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দ্বীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কথাও তাতে আসেনি। ঈমানের কালেমারও কোন সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা এখানে নেই। সর্বশেষ বইতেও তাওহীদ ও শিরক এবং সুন্নত ও বেদআতের স্পষ্ট কোন পরিচয় দেওয়া হয়নি। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও শরীয়ত যার নিজস্ব তাহযীব তথা সংস্কৃতি রয়েছে। অথচ এ সম্পর্কে কোন আলোচনা এখানে নেই। ঈমানের শাখা-প্রশাখা এবং কবীরা ও সগীরা গোনাহের কোন তালিকাও এখানে দেওয়া হয়নি।

এছাড়া যা কিছু লেখা হয়েছে সেগুলো সহীহভাবে লেখার যথাযথ ইহতিমাম করা হয়নি। কোন হাদীস সম্পূর্ণ সূত্রবিহীন হওয়ার পরও লেখা হয়েছে। দ্বীনী পরিভাষাসমূহের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে বহু ভুল হয়েছে। কোন কোন বুনিয়াদী বিষয়ের পরিচয় খুবই ক্রটিপূর্ণভাবে বা ভুলভাবে করা হয়েছে। যেমন সুদ ও ঘুষের পরিচয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'ইবাদত'-এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা মূলত 'ইতাআত'-এর সংজ্ঞা। 'ইবাদত' যা একটি কুরআনী পরিভাষা, তার কোন শরয়ী পারিভাষিক সংজ্ঞা কোথাও দেওয়া হয়নি। এ রকম আরো ছোট বড় ভুলক্রটি রয়ে গেছে।

এ সমস্যার কারণে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার দ্বীনীয়াত সংক্রান্ত সিলেবাসের বর্তমান এবং পূর্ববর্তী বইগুলো (যা যোগাড় করা সম্ভব হয়) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং সব ধরনের ভুল চিহ্নিত করে সেগুলো সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সাথে সাথে এই বিষয়কে সফল ও মানোত্তীর্ণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা পেশ করা প্রয়োজন। যেন ভবিষ্যতে এ বিষয়টি ক্রটিমুক্ত হতে পারে এবং স্বীয় উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে। আর ইতোপূর্বে যেসব শিক্ষার্থী ওই বইগুলোর ভুল থেকে প্রভাবিত হয়েছেন তারাও যেন সহীহ দিক-নির্দেশনা লাভ করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা এই নেক কাজকে কবুল করুন এবং ইখলাস ও ইতকানের সাথে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার তাওফীক দান করুন।

এই সংখ্যায় শুধু জরুরি ভূমিকার উপরই স্ফান্ত করা হল। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে পাঠকবৃন্দ এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা পাবেন। যাতে কলেজ-ভার্সিটির ইসলাম শিক্ষা বিষয়ক বইগুলোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আলোচনা ও সংশোধনীও থাকবে ইনশাআল্লাহ। # জুন '০৯ঈ.

বিগত সংখ্যায় এ বিষয়ে ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ

করা হয়েছিল। এই আলোচনা বইভিত্তিক না হয়ে বিষয়ভিত্তিক হলে সম্ভবত অধিক সহজ ও উপকারী হবে। তাই সিলেবাসের প্রত্যেকটি বইয়ের উপর আলাদা আলাদা আলোচনা না করে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা অধিক সমীচীন মনে হয়েছে। এই হিসাবে আমরা আমাদের আলোচনাকে নিম্নোক্ত শিরোনামে ভাগ করতে পারি :

১. পরিভাষা ও পরিচিতি

দ্বীন ও শরীয়তের কিংবা দ্বীনী ইলম ও ফনের বিশেষ কোন পরিভাষার, যার নির্ধারিত অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে, ভুল বা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা হলে তার সংশোধন।

২. আকীদা-বিশ্বাস এবং চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের কোন 'আকীদায়ে মুতাওয়াযাছা' (খাইরুল কুরান থেকে স্বীকৃত ও গৃহীত বিশ্বাস) বা 'ফিকরে মুতাওয়াযাছা' (খাইরুল কুরান থেকে স্বীকৃত ও গৃহীত চিন্তা)এর ভুল বা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়ে থাকলে কিংবা তার বিরুদ্ধে কিছু লেখা হলে তার নিরসন।

৩. আহকাম ও মাসায়েল

মাসআলা-মাসায়েল ভুল বা অসম্পূর্ণ উল্লেখ করা হলে তা সংশোধন।

৪. হাদীস ও রেওয়াযাত

হাদীস, সীরাত ও তারীখে ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট মুনকার, মওযু বা ভিত্তিহীন বর্ণনা উল্লেখিত হলে তা চিহ্নিত করা।

৫. আয়াত ও হাদীসের তরজমা

কোথাও শরীয়তের কোন দলীলের পাঠ-তরজমায় ভুল হয়ে থাকলে তা চিহ্নিত করা।

৬. অন্যান্য

বিভিন্ন বিষয়ে যেসব তথ্য উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু তা সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার বিষয়ে লক্ষ করা হয়নি তা চিহ্নিত করা।

৭. মৌলিক কিছু প্রস্তাবনা

'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়ে সিলেবাসের বইপত্র তৈরি এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে কিছু মৌলিক নীতি ও প্রস্তাবনা। তথ্যগত বা ব্যবস্থাপনাগত মৌলিক ত্রুটিসমূহের বিস্তারিত আলোচনা।

পরিভাষা ও পরিচিতি

ইবাদত শব্দের অর্থ

১. এ প্রসঙ্গে ইসলাম শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণী (পৃ. ১৩)-এ বলা হয়েছে, 'ইবাদত কী? আল্লাহর হুকুম মানা, তাঁর কথামতো ও রাসূলের দেখানো পথে চলাকে ইবাদাত বলে ...।'

চতুর্থ শ্রেণীর বইতে (পৃ. ২৩) বলা হয়েছে, 'ইবাদাত মানে বন্দেগী, মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মতো সব কাজ করাকে ইবাদাত বলে। যেমন, নামায পড়া, রোযা রাখা, কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা ইত্যাদি। ভালো কাজ করাও ইবাদাত। যেমন, রোগীর সেবা করা, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা, সত্য কথা বলা, দান-খয়রাত করা ইত্যাদি।'

পঞ্চম শ্রেণীর বইতে (পৃ. ৩০) বলা হয়েছে, 'ইবাদাত আরবী শব্দ। ইবাদাত মানে আল্লাহর হুকুম পালন করা। আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা করা, আর যা নিষেধ করেছেন তা না করাই হল ইবাদাত। আমাদের কাজ হল তাঁর হুকুম মানা। তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী করা। মানুষ তাঁর বান্দাহ। আল্লাহ তাআলা মানুষের একমাত্র মাবুদ। বান্দাহ তার মাবুদের সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু করে সবই ইবাদাত।'

ষষ্ঠ শ্রেণীর বইতে (পৃ. ১০) বলা হয়েছে, 'ইবাদাত আরবি শব্দ। এর অর্থ দাসত্ব ও আনুগত্য। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নামই ইবাদাত।'

নবম ও দশম শ্রেণীর বইতে (পৃ. ৪৭) বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দিয়েছেন অসংখ্য নিআমত। আমরা তাঁর বান্দা। আমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর প্রেরিত নবীর দেখানো পথে যে কাজ করি তাই ইবাদাত। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

অর্থ : 'জিন ও মানুষ জাতিকে আমি আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।' (সূরা আয-যারিআত : ৫১)

ইবাদাত নামে আনুগত্য করা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হল ইবাদাতের মূল লক্ষ্য। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোনো উত্তম কাজই ইবাদাত। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

(স) কর্তৃক নির্দেশিত পথের সমস্ত কাজই ইবাদাত হিসেবে গণ্য।

আমরা কীভাবে ইবাদাত করব সে সমস্ত বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) শিখিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

‘তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যদি তোমরা তা থেকে বিমুখ হও তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না।’ (সূরা আলে-ইমরান : ৩২)

উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) কর্তৃক নির্দেশিত পথই ইবাদাতের মূল। সুতরাং এই নির্দেশিত কাজগুলো আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হব।’

পর্যালোচনা : উপরে ইবাদতের সংজ্ঞায় যা বলা হয়েছে তার দ্বারা ইবাদতের পারিভাষিক বা শরয়ী অর্থ পরিষ্কার হয়নি। যা কিছু বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে ‘ইতাআত’ ও ‘আমলে ছালিহ’এর অর্থ।

‘ইতাআত’ অর্থ আনুগত্য করা, আদেশ পালন করা। আল্লাহর ইতাআত অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মান্য করা, সকল বিষয়ে তাঁর আনুগত্য করা।

‘আমলে ছালিহ’ অর্থ হচ্ছে নেক আমল। এতে দ্বীন-দুনিয়ার সকল কাজই অন্তর্ভুক্ত যদি তা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, শরীয়তের বাতলানো তরীকা মোতাবেক।

মোটকথা, উপরে সিলেবাসের বইগুলো থেকে যে আলোচনা উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে ‘ইতাআত’ ও ‘আমলে ছালিহ’-এর পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু ‘ইবাদত’ শব্দের পারিভাষিক অর্থ মোটেই বলা হয়নি। বিষয়টি সহজে এভাবে বোঝা যায়, ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই হতে পারে এবং তিনিই একমাত্র মাবূদ। যেসব কাজ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত তা যদি আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো জন্য করা হয় তবে তা শিরক হয়ে যায়।

এই সর্বজনবিদিত বিষয়টি সামনে রেখে চিন্তা করা হলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে ইবাদত ও ইতাআতকে সমার্থবোধক করে যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং তাতে সকল নেক আমলকে शामिल করে দেওয়া হয়েছে তা কখনো ইবাদতের পারিভাষিক অর্থ নয়।

যেমন ইতাআত অর্থাৎ আনুগত্য আল্লাহ তাআলা একান্ত নিজের জন্য নির্ধারিত

রাখেননি; বরং বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন তারা যেন রাসূলের নিঃশর্ত আনুগত্য করে। তেমনি অধীনদের আদেশ করা হয়েছে দায়িত্বশীলদের আনুগত্য থাকার, সন্তানকে আদেশ করা হয়েছে পিতামাতার আনুগত্য থাকার এবং স্ত্রীকে আদেশ করা হয়েছে স্বামীর আনুগত্য থাকার। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কারো আনুগত্য গ্রহণযোগ্য নয়। যদি আনুগত্যও 'ইবাদত'-এর অন্তর্ভুক্ত হত তাহলে তো সেটাও আল্লাহর জন্যই একান্তভাবে নির্ধারিত থাকত। অন্য কারো আনুগত্য বৈধ হওয়া তো দূরের কথা, তা শিরক হিসেবে গণ্য হত। এজন্য ইবাদতের পারিভাষিক অর্থ বা শরীয়তের দৃষ্টিতে তার বিশেষ অর্থ পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া কর্তব্য।

আমি এখানে মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নুমানী (রহ.)এর আলোচনা উল্লেখ করছি। তা সহজ ও সর্বজনবোধ্য।

তিনি লেখেন, “ইবাদত হচ্ছে দ্বীন ও শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা। কোন সত্তাকে গায়েবীভাবে ভালমন্দের মালিক এবং সকল হাজত পূরা করার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তাঁর সামনে নিজ অনুরাগ ও অসহায়ত্ব এবং নিতান্ত হীনতা ও মুখাপেক্ষীতা প্রকাশের জন্য, তাকে রাজি-খুশি করার জন্য এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য যেসব উপাসনাদর্মী কাজ করা হয় তাকেই 'ইবাদত' বলে। যেমন, নামায, রোযা, হজ্ব, সদকা, সেজদা, তওয়াফ, দুআ, নযর-মান্নত, কুরবানী ও নাম জপ করা ইত্যাদি।

এই ইবাদত একান্তভাবে আল্লাহ তাআলারই অধিকার। কেউ যদি আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো সাথে এই আচরণ করে তবে সে নিঃসন্দেহে মুশরিক। পৃথিবীর অধিকাংশ মুশরিক কওমের মাঝে এই শিরকই প্রচলিত যে, তারা গায়রুল্লাহকে ভাল-মন্দের মালিক-মুখতার মনে করে থাকে এবং তাদের কৃপা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিভিন্ন উপাসনাদর্মী কাজ করে থাকে। একেই বলা হয় 'শিরক ফিল ইবাদাহ।' আশ্বিয়ায়ে কেরামকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শিরকেরই মোকাবেলা করতে হয়েছে।”

মাওলানা নুমানী (রহ.) আরো বলেন, “জেনে রাখা ভাল যে, আরবী ভাষায় ইবাদতের অন্য অর্থ ইতাআত ও আনুগত্য। তবে এই দুই অর্থের মাঝে একটি স্পষ্ট ও সর্বজনবোধ্য পার্থক্য এই যে, পারিভাষিক অর্থে ইবাদত আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো জন্য হতে পারে না। এটা সর্বাবস্থায় শিরক এবং সবচেয়ে বড় শিরক। পক্ষান্তরে ইতাআত বা আনুগত্য মাখলুকেরও করা যায়; বরং কিছু ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই এর আদেশ করেছেন। যেমন, রাসূলের আনুগত্যের আদেশ করা হয়েছে, দায়িত্বশীল ও পিতামাতার আনুগত্যের আদেশ করা হয়েছে, স্ত্রীর জন্য

স্বামীর সেবা ও আনুগত্যের আদেশ করা হয়েছে।

অতএব যারা পারিভাষিক অর্থে ইবাদত এবং আনুগত্য অর্থে ইবাদতের মাঝে পার্থক্য করে না এবং একটিকে অন্যটির সাথে গুলিয়ে ফেলে তারা দ্বীনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করে ফেলে, যার কারণে তাওহীদ ও শিরকের অর্থই পরিবর্তন হয়ে যায়।” -দ্বীন ও শরীয়ত ৫৩; কালেমায়ে তাইয়েবা কী হাকীকত ৮-৯

প্রত্যেক ধর্মেই ইবাদতের ধারণা আছে। তবে যেভাবে সে ধর্মগুলো বিকৃত হয়ে গেছে তেমনি তাদের ইবাদতও বিকৃতির শিকার হয়েছে। তাতে শিরক ও বেদআত যুক্ত হয়েছে। ইসলাম তাওহীদের ধর্ম এবং এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য-স্বাভাবিকতা। আর কেয়ামত পর্যন্ত তা সংরক্ষিত থাকবে। ইসলামে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইবাদতের বিশুদ্ধতার প্রতি। অর্থাৎ ইবাদত শুধু এবং শুধু আল্লাহর জন্য হবে এবং একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য হবে আর ইবাদতের পদ্ধতি যে কারো উদ্ভাবিত বা মনগড়া হতে পারবে না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা যেভাবে শিখিয়েছেন সে তরীকা অনুযায়ী হতে হবে। মোটকথা, শিরক, রিয়া এবং বেদআত ও ইত্তেবায়ে হাওয়া সকল বিষয় থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে। অতএব বলা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদতের দুটি স্তম্ভ- (১) ইবাদত শুধু আল্লাহরই হবে, অন্য কারো নয়। (২) ইবাদতের যে পন্থা ও পদ্ধতি আল্লাহ তাআলা নির্দেশ করেছেন সে অনুযায়ী হতে হবে। মনগড়া কোন পন্থা গ্রহণযোগ্য নয়।-আলউবুদুদুয়াহ, ইবনে তাইমিয়া ১৭

আলোচিত বইগুলোর লেখক ও সম্পাদকদের আরো আশ্বস্তির জন্য এখানে ফিক্হ ও শরহুল হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি :

১- قال الإمام اللامشي: العبادة عبارة عن الخضوع والتذلل، وحدها: فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى بأمره، بخلاف القرية والطاعة، فإن القرية ما يتقرب به إلى الله تعالى، أو يراد به تعظيم الله تعالى مع إرادة ما وضع له الفعل، كبناء الرباطات، والمساجد، ونحوها، فإنها قرية يراد بها وجه الله تعالى مع إرادة الإحسان للناس وحصول المنفعة لهم، والطاعة ما يجوز لغير الله تعالى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم، والعبادة ما لا يجوز لغير الله تعالى، وحسن الطاعة موافقة الأمر. انتهى.

وحسن العبادة عبارة عن كونها خالصة عن شائبة الريا. أبو السعود (الطحطاوي
على الدر، باب الحج عن الغير)

দেখুন, (১) হাশিয়াতু আহমদ আততাহতাবী আলাদুররিল মুখতার ১/৫৪৬
(২) রদুল মুহতার (ফতোয়া শামী) ইবনে আবিদীন শামী ৭/৩৮৭-৩৮৮ (৩)
ফতহুল মুয়ীন (শরহুল কানয) আবুস সাউদ ১/৫৫৬

২- قال الراغب: العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها، لأنها غاية التذلل،
ولا يستحقها إلا من له غاية لإفضال، وهو الله تعالى، ولهذا قال: ألا تعبدوا إلا إياه.

দেখুন, মুফরাদাতু আলফায়িল কুরআন, আররাগিব আসপাহানী ৫৪২, দারুল
কলম, দামেস্ক ১৪১২হি.

৩- قال ابن تيمية: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب،
فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له، ...،

ومن خضع لإنسان مع بغضه له فلا يكون عابدا، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم
يكن عابدا له، كما قد يحب ولده وصديقه.

ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من
كل شيء، وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا
الله...

فجنس المحبة يكون لله ورسوله، كالطاعة تكون لله ورسوله، والإرضاء لله
ورسوله، «والله ورسوله أحق أن يرضوه»، والإيتاء لله ورسوله «ولو أنهم رضوا ما
آتاهم الله ورسوله».

وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده.

দেখুন, আলউবুদিয়াহ, ইবনে তাইমিয়া পৃ. ৬, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ
৬- قال المناوي: (العبادة) الصادقة بأقصى غاية الخضوع، وتعارف في الشرع

فيما جعل علامة لنهاية الخضوع من صلاة وصوم وجهاد وقراءة.

দেখুন, শরহুল শামাইল, আব্দুর রউফ মুনাভী (১০৩১হি.) ২/৬৪

এ সকল উদ্ধৃতির সারকথা এটাই যে, পূর্ণ মুহব্বতের সাথে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পন্থায় বিশেষ আমলসমূহের মাধ্যমে তাঁর সম্মুখে চূড়ান্ত বিনয় ও হীনতা প্রকাশের নাম ইবাদত। আর এটা শুধু আল্লাহ তাআলারই হক, গায়রুল্লাহর জন্য সম্পূর্ণ অবৈধ।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এ প্রসঙ্গে ‘আলউবূদিয়াহ’ নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। তার এক স্থানে তিনি ইবাদত-এর সাধারণ ও রূপক অর্থ হিসাবে যদিও এ কথা বলেছেন যে, আল্লাহর পছন্দনীয় প্রত্যেক নেক আমলই ইবাদত-*(العبادة)* কিন্তু *اسم جامد لكل من يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة* এরপর তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, উল্লেখিত অর্থটি ইবাদতের পারিভাষিক অর্থ নয়, এর পারিভাষিক অর্থ তা-ই যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যার বিষয়ে আমরা প্রত্যহ কয়েকবার সূরায়ে ফাতেহায় আল্লাহ তাআলার সামনে নিম্নোক্ত বাক্যসমূহ পাঠ করি-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আর এই ইবাদত সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আরো ইরশাদ করেছেন-

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

আশা করি, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা মূল বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। থাকল ওই সমস্ত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আমলসমূহের বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং যা গায়রুল্লাহর জন্য করা হলে শিরক হবে, ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে আগামী সংখ্যায় কিছু লিখতে চেষ্টা করব।# (জুলাই '০৯ঈ.)

১. পরিভাষা ও পরিচিতি

(ক) ইবাদতের অর্থ

রজব ১৪৩০হি. (জুলাই '০৯ঈ.) সংখ্যায় এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল। ‘পরিভাষা ও পরিচিতি’ শিরোনামের অধীনে ‘ইবাদত’-এর অর্থ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। বলা হয়েছিল যে, ‘ইসলাম শিক্ষা’র বইগুলোতে ইবাদতের যে

অর্থ করা হয়েছে তাতে 'ইবাদত' 'ইতাআত'-এর সমার্থক বলে প্রতীয়মান হয়। অথচ 'ইবাদত' ও 'ইতাআত' দুটি ভিন্ন অর্থবোধক আলাদা পরিভাষা।

ইবাদতের অর্থ উল্লেখ করার পর বলা হয়েছিল যে, যে সকল আমল আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য নির্ধারিত করেছেন এবং যা গায়রুল্লাহর জন্য করা হলে শিরক হয় সেসব কর্মগত ও বিশ্বাসগত আমল সম্পর্কে আগামী সংখ্যায় লিখতে চেষ্টা করব।

বর্তমান সংখ্যায় এই ওয়াদা পূরণের ইচ্ছা করেছি। আল্লাহ তাআলা সঠিক কথা সঠিক পন্থায় ও সহীহ নিয়তে লেখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কর্মগত ইবাদত

১. সালাত (নামায)

নামায সর্বোত্তম ইবাদত এবং শুধু আল্লাহরই জন্য তা হতে পারে।

নামাযের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রোকন সেজদা। এটিও একমাত্র আল্লাহরই জন্য। ইবাদতের সেজদা গায়রুল্লাহকে করা শিরকে জলী বা প্রকাশ্য শিরক। তেমনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদাপদ থেকে মুক্তি দানকারী অর্থাৎ সাধারণ উপায়-উপকরণের উর্ধ্বে সাহায্যদানের ক্ষমতাসালী মনে করে সেজদা করলে তা-ও শিরকে জলী বা প্রকাশ্য শিরক। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

“তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়, সেজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদত কর।” -সূরা হা-মীম আসসাজদা ৩৭

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

إِلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْأَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا

تَخْفُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ.

“তারা কেন সেজদা করে না আল্লাহকে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর।” -সূরা নামল ২৫

নিছক অভিবাদন হিসাবে সেজদা করাও হারাম। শরীয়তে অভিবাদনের পস্থা সুনির্ধারিত। তা হচ্ছে সালাম, যা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে প্রত্যেক নবীর শরীয়তে ছিল। কিন্তু আগের উম্মত এই পস্থা ছেড়ে শির নত করে বা ভূমিতে নত হয়ে প্রণাম জানানোর পস্থা আবিষ্কার করেছে। খাতামুনাবিয়্যীন সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিকৃতি সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে সাবধান করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, অভিবাদনের পদ্ধতি হচ্ছে সালাম ও মুছাফাহা এবং আল্লাহর হামদ ও ছানার সাথে পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা।

রুকুও নামাযের গুরুত্বপূর্ণ রোকন। বাতিল উপাস্যের সামনে রুকু করা শিরক। তেমনি ইবাদতের উদ্দেশ্যে কারো সামনে নতশীর হওয়া নিষিদ্ধ ও অবৈধ। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে তার সম্মানে মাথা বুকানো যাবে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না।

নামাযের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন হচ্ছে কিয়াম। মুশরিকরা তাদের মনগড়া উপাস্যদের সামনে জোড়হাতে দণ্ডায়মান হয়ে ভক্তি প্রদর্শন করে।

এ জন্য কোন বাতিল উপাস্য কিংবা কোন শিরক ও কুফরের নিদর্শনের সামনে জোড় হাতে দণ্ডায়মান হওয়া শিরক। নিছক সম্মানার্থে কারো সামনে দাঁড়ানোও নিষিদ্ধ, যা প্রাচীন আজমী রীতি। কেননা এতেও শিরকের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

ইবাদত হিসাবে কিয়াম একমাত্র আল্লাহর জন্য। বান্দা নামাযে হাত বেঁধে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়, হামদ ও ছানা করে এবং তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের মর্যাদা লাভ করে। এই কিয়াম সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে—

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।” -সূরা বাকারা ২৩৮

আরো বলা হয়েছে—

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا

“যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন যামে সেজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে বিনয়াবনত হয়, ...।” -সূরা যুমার ৯

মোটকথা, নামায ও নামাযের বিভিন্ন অবস্থা হচ্ছে সর্বোত্তম কর্মগত ইবাদত। এর বিভিন্ন রোকনও এমন, যা ভিন্নভাবেও গায়রুল্লাহর জন্য করা যায় না। ইরশাদ হয়েছে—

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا...

“এবং সেজদার স্থানসমূহ (অঙ্গসমূহ) আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না। আর যখন আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ইবাদত করতে দাঁড়ায় তখন তারা ভিড় জমায়।” -সূরা জিন ১৮-১৯

২. যাকাত

যাকাত আর্থিক ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম। মানুষের দেহ ও প্রাণ যেমন আল্লাহর তেমনি তার অর্থ ও সম্পদও আল্লাহর। এ জন্য দৈহিক ইবাদতের মতো আর্থিক ইবাদতও একমাত্র আল্লাহরই জন্য। আল্লাহর দেওয়া সম্পদ মানুষ যে কোন বৈধ পথে খরচ করতে পারে। কিন্তু কারো প্রতি ভক্তি প্রকাশ ও তার নৈকট্য অর্জনের জন্য নিজের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধির জন্য কিংবা বালা-মুসীবত দূর হওয়ার জন্য কারো উদ্দেশ্যে বা তার নামে সম্পদ উৎসর্গ করা হচ্ছে ইবাদত। এটা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। যাকাত ও সদকার গূঢ় অর্থ এটাই। আর এজন্যই তা ইবাদত। যাকাত ও সদকা যদিও দেওয়া হয় ফকীর-মিসকীন ও অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে, কিন্তু এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তাঁর নিকট থেকে নিজের দ্বীনী ও দুনিয়াবী হাজতসমূহ পূরণ করা। হাদীস শরীফে আছে, (ইখলাসের সাথে) যে সদকা করা হয় তা ফকীরের হাতে যাওয়ার আগে আল্লাহ তাআলার হাতে পৌঁছে যায়। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

الْم يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ

اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

“তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তো বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং ‘সদকা’ গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” -সূরা তওবা ১০৪

ভাল কাজে সম্পদ ব্যয়ের অনেক পথ রয়েছে। আল্লাহ তাআলার বিধান মোতাবেক হলে তা ‘আমলে ছালিহ’ বা সওয়াবের কাজ। কিন্তু সকল ব্যয় পারিভাষিক অর্থে ‘ইবাদত’এর মধ্যে शामिल হয় না। শুধু যাকাত, সদকা, মান্নত পূরণ ইত্যাদি এতে शामिल হয়।

৩. সিয়াম (রোযা)

নিছক অভুক্ত থাকার নাম রোযা নয়। কেউ যদি রোগবশত পানাহার ত্যাগ করে

কিংবা আল্লাহ মাফ করুন দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য অনশন করে তাহলে তা কখনো ইসলামী রোযা নয়। ইসলামী রোযার ফারায়েয ও আরকান এবং এর কর্মগত, বিশ্বাসগত ও অনুভূতিগত বিভিন্ন আদব-কায়েদা সম্পর্কে যে কোন জ্ঞানী মুসলিমই অবগত। অতএব তারা জানেন যে, রোযা খাঁটি ইবাদত এবং শুধু আল্লাহরই জন্য। হাদীস শরীফে আছে—

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ

“সওম আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেব।”

গায়রুল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য কিংবা কোন গায়েবী শক্তির সন্তুষ্টির দ্বারা মকসূদ হাসিলের উদ্দেশ্যে অনাহার করা হলে তা হবে শিরক। অনশন পালন হচ্ছে রাজনৈতিক বিষয়, যা বেদ্বীনদের রীতি এবং সম্পূর্ণ হারাম। আর স্বাস্থ্যগত কারণে পানাহার ত্যাগ করার বিষয়টি হচ্ছে দৈহিক ও চিকিৎসানৈতিক বিষয় সেটাও রোযা নয়। # (অক্টোবর '০৯ঈ.)

১. পরিভাষা ও পরিচিতি

(ক) ‘ইবাদত’-এর অর্থ

এই শিরোনামের অধীনে ইবাদতের অর্থ বর্ণনা করার পর উপাসনাধর্মী কাজগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছিল, যেগুলোকে শরীয়ত একমাত্র আল্লাহর হক সাব্যস্ত করেছে। সওমের আলোচনা করা হয়েছে। এ ধরনের চতুর্থ আমল হচ্ছে হজ্ব।

৪. হজ্ব

হজ্ব তাওহীদের নিদর্শন এবং এমন একটি উপাসনাধর্মী আমল, যাতে অনেকগুলো ইবাদতের সমাবেশ রয়েছে। এটি একমাত্র আল্লাহরই জন্য, অন্য কারো সাথে এমন আচরণ করা সম্পূর্ণ শিরক।

হজ্বের কার্যাবলির সারকথা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা কিছু স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেখানে তাঁকে স্মরণ করা হবে এবং তাঁর প্রতি ভক্তি ও সম্মান নিবেদন করা হবে। যেমন, কা’বা, আরাফা, মুযদালিফা, মিনা, সাফা-মারওয়া, মাকামে ইবরাহীম, মসজিদে হারাম ও হারাম শরীফ।

আল্লাহ তাআলা বান্দাদের এই সব স্থান যিয়ারতের আদেশ করেছেন, যেন তারা পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে পায়ে হেঁটে বা সওয়ারীতে আরোহন করে বাইতুল্লাহর

যিয়ারতের জন্য ইহরামের হালতে আসে। সফরের সকল কষ্ট সহ্য করে, বিশেষ ধরনের সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করে বিশেষ অবস্থায় সেখানে পৌঁছায় এবং আল্লাহর নামে কুরবানী করে, মান্নতসমূহ পূরণ করে, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে, হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করে, মূলতায়ামে চেহারা ও বুক লাগিয়ে আহাজারি করে, প্রয়োজনসমূহ প্রার্থনা করে, হরমের আদব রক্ষা করে, আরাফা, মুযদালিফা, মিনা ও অন্যান্য বন্দেগীর স্থানসমূহে উপস্থিত হয়ে যিকির, দুআ ও নির্ধারিত আমলসমূহ সম্পন্ন করে। মোটকথা, এই সকল কাজ আল্লাহ তাআলার তাজিম ও বন্দেগী এবং ভক্তি ও উপাসনার জন্য। এজন্য এ সকল কাজ গায়রুল্লাহর তাজিমের জন্য করা হারাম ও শিরক।

হরমে মক্কা ও হরমে মদীনা ছাড়া অন্য কোন স্থানকে হরম সাব্যস্ত করা, কোন মাযার বা দরবারের সাথে হরমের মতো আচরণ করা সম্পূর্ণ হারাম। বাইতুল্লাহর তাওয়াফ হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগীর জন্য। তাই অন্য কোন ঘর, কবর বা ব্যক্তির তাওয়াফ করা শিরক। কোন মাযার বা দরবারে নিজের প্রয়োজন পূরণ বা সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে সফর করা, গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি প্রাণী নিয়ে সফর করা, পীরের নৈকট্য হাসিলের জন্য বা তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা বা মান্নত করা সবই মারাত্মক শিরক।

হজ্ব গুরুই হয় তাওহীদের ঘোষণার মাধ্যমে—

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

(তরজমা) “আমি হাজির, তোমার দুয়ারে। হে আল্লাহ! আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাজির, নিঃসন্দেহে সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও তোমারই তোমার কোন শরীক নেই।”

واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.

(তরজমা) “আর মানুষের মাঝে হজ্বের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে এবং সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রীসমূহের পিঠে। তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানসমূহে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিযিক হিসাবে দান

করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতপর তোমরা তা হতে নিজেরা আহার কর এবং অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। অতপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মান্নত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের (কা'বার)।” -সূরা হজ্ব ২৭-২৯

হাদীস শরীফে এসেছে, “বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাযী, কংকর নিক্ষেপ সবকিছুই আল্লাহ তাআলার যিকিরের জন্য।” -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৮৮৩; জামে তিরমিযী, হাদীস ৯০২

মুশরিকরাও হজ্ব করত। কিন্তু তারা এটাকে তাওহীদের পরিবর্তে শিরকী কাজ বানিয়ে নিয়েছিল। এজন্য তারা তালবিয়াও পরিবর্তন করেছিল। তারা লা-শারীকা লাকা-এর পরে নিজেদের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছিল, ‘ইল্লা শরীকান তামলিকুহু ওয়ামা মালাক’ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার কোন শরীক নেই, তবে এমন শরীক আছে যার সত্তা ও ক্ষমতার তুমিই মালিক।

হজ্বকে শিরকী কাজে পরিণত করার সাথে সাথে তার সকল হুকুম-আহকামও তারা পরিবর্তন করে ফেলেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার হুকুমে এ সব কিছু সংশোধন করেছিলেন। কুরআন মজীদ, হাদীস ও সীরাতে কিতাবে এর বিশদ বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

কটুর বেদআতীরা মাযার ও দরবারসমূহের সাথে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান জুড়ে রেখেছে, বিশেষ করে ওরছের সময় যে সকল কর্মকাণ্ড তারা করে থাকে, চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, বাস্তবে তা হজ্বের মতো ইবাদতে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অন্যকে শরীক করারই একটি রূপ।

হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) ‘তাকবিয়াতুল ঈমান’ কিতাবে ওই জাহেলী ও শিরকী রসমের ইসলাহ করেছেন।#

[(জুন, জুলাই, অক্টোবর) নভেম্বর '০৯ঈ.]

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত মূলত ঈমান ও আমলের জযবা পয়দা করার মেহনত

গত ২৭ জানুয়ারি '০৬ টঙ্গীতে তিনদিন ব্যাপী তাবলীগী জামাআতের বিশ্বইজতেমা চলছিল। সেদিন মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব তাঁর জুমার বয়ানে এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। এটি ছিল তাবলীগী জামাআতের কাজের ধরন-প্রকৃতি ও তত্ত্ব-হাকীকত সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। তাছাড়া এমন কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যাও তিনি এতে তুলে ধরেন যেগুলো সাধারণত দৃষ্টির অগোচরে থাকায় এ কাজের মান ও মর্যাদা বুঝতে অনেকের ভুল হয়ে থাকে। আমরা তাঁর বয়ান সামান্য পরিবর্তন করে আলকাউসার-এর পাঠকদের সামনে পেশ করে দেওয়া দরকার মনে করেছি।

আশা করি এ কাজের গুরুত্ব ও সঠিক অবস্থান উপলব্ধি করতে এ বয়ান যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ। -সম্পাদক

ভূমিকা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া যে, তিনি আমাদের ঈমান ও আমলের দৃঢ়তার জন্য, দাওয়াত ও তাবলীগের পথে অধিক থেকে অধিক মেহনতের জন্য যুগে যুগে তাঁর অনেক নেককার বান্দাকে এ কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। তাদের ফিকির ও ভাবনা, উম্মতের প্রতি তাদের দরদ ও মহব্বত, আল্লাহ তাআলার দ্বীনের প্রতি তাদের আজমত ও শ্রদ্ধার ফলে ঈমান-আমলের মেহনতের নতুন নতুন পদ্ধতি ও ধারা আল্লাহ তাআলা চালু করেন। এমনই একটি মেহনত, যা আজকাল দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের নামে প্রচলিত। এ মেহনত প্রায় সারা বিশ্বে সমান মকবুল ও সমাদৃত। মূল কাজটিও পুরনো, মৌলিক নীতিমালাও পুরনো; তবে শুধু 'ইনতেজামী খাকা' (পদ্ধতিগত কাঠামো)টি নতুন।

দাওয়াত ও তাবলীগের অর্থ

এ কাজটির নাম পড়ে গেছে ‘দাওয়াত ও তাবলীগ।’ তাই অনেকে এটার আসল হাকীকত কী, তা বুঝতে ভুল করে। ‘দাওয়াত’ আর ‘তাবলীগ’- দুটি পারিভাষিক শব্দ। আল্লাহ তাআলার দ্বীনের নুসরত ও খেদমত করতে গেলে যে কাজগুলো করতে হয় সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দুটি- এক, দাওয়াত; দুই তাবলীগ।

দাওয়াত অর্থ হচ্ছে মানুষকে ডাকা, আহ্বান করা। আর তাবলীগ অর্থ হচ্ছে প্রচার করা, প্রসার করা। শরীয়ত ও কুরআন হাদীসের পরিভাষায় দাওয়াত হল, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে মানুষকে আহ্বান করা। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من

المسلمين

(আল্লাহ বলেন) ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা আর কার। অর্থাৎ এরচেয়ে ভালকথা বলার আর কোন লোক নেই, যে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে- আল্লাহর রাস্তায় এসো; যে পথে আসলে আল্লাহ রাজি-খুশি হবেন, সে পথে এসো। তোমার খালিক ও মালিক যে পথে চললে খুশি হবেন সে পথে এসো। এ আহ্বান যে করে তার চেয়ে আর কারো কথা ভাল হতে পারে না। **وَعَمَلٌ صَالِحًا** সাথে সাথে সে নিজেও নেক আমল করে। অপরকে শুধু ডাকে, নিজে আমল করে না, যা সাধারণত মুনাফেকদের অবস্থা; ইরশাদ হচ্ছে- **اتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ** তোমরা মানুষকে তো নেক কাজের আদেশ কর অথচ নিজেদের বেলায় এত অবহেলা! নিজেদেরকে ভুলে থাক। নিজের আমলের ও আত্মশুদ্ধির কোন খবর নেই। সে এমন নয়; বরং ওই দাঁষ্ট যে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিচ্ছে সে নিজেও আমল করছে। **وَقَالَ اِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ** এবং বলে, আমি আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের সকল বিধানের সামনে নিজের মাথা নত করে দিলাম। আমি আত্মসমর্পণ করলাম, আল্লাহ তাআলার দ্বীনের সামনে, শরীয়তের সামনে, এই হল দাওয়াত।

আর তাবলীগ হচ্ছে- যখন আমি আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দিলাম তো আল্লাহর রাস্তা কোন্টা, কোন পথে চললে তিনি রাজি-খুশি হবেন তা আমাকে জানতে হবে। আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর কিছু কাজ ফরয করেছেন, সেগুলো কী কী। আর কিছু কাজ নাজায়েয ও হারাম করেছেন, সেগুলো কী কী। কোন কোন

কাজের দ্বারা তিনি রাজি ও খুশি হন আর কোন্ কোন্ কাজের কারণে নারাজ ও অসন্তুষ্ট হন- এগুলো আমাদের জানতে হবে। আর এসব বিষয় আল্লাহ তাআলা কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন নাযিল করেছেন এবং তাঁকে সুন্নাহর ইলম দান করেছেন। এই কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এটা আমার রেযামন্দির পথ; এ পথে চললে আমি খুশি। আর ওটা আমার নারায়ির পথ; ও পথে চললে আমি অসন্তুষ্ট। এ পথে আসলে তুমি কামিয়াব ও সফলকাম হবে আর ও পথে গেলে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ বিষয়গুলো মানুষের কাছে পৌছাতে হবে, প্রচার-প্রসার করতে হবে। এর নামই হল তাবলীগ। কুরআনের বিধানগুলো, হাদীসের বিধানগুলো, দ্বীনের শিক্ষাগুলো আলোচনা করে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া; মানুষের মধ্যে তা প্রচার করাকেই বলে তাবলীগ। আর এই সিরাতে মুস্তাকীম সহজ-সরল পথ, যে পথে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চলার নির্দেশ দিয়েছেন সে দিকে মানুষকে আহ্বান করার নাম দাওয়াত।

এই কাজের আসল নাম তাহরীকে ঈমান

এখন দাওয়াত ও তাবলীগ নামে যে মেহনত চলছে -যার মূল কেন্দ্র নিজামুদ্দীন, আমাদের কেন্দ্র ঢাকার কাকরাইল এবং যার বিশ্ব ইজতেমা এখন টঙ্গীর ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে- এ মেহনতের মূল কাজ তাবলীগ নয়। তাবলীগ একটি সুকঠিন কাজ, যা সবার পক্ষে সম্ভবও নয়। সবাই কীভাবে দ্বীনী মাসআলা-মাসায়েলের তাবলীগ করবে? প্রথমে তো জানতে হবে, তারপর না সেগুলোর তাবলীগ করবে?

দাওয়াত তো বুঝলাম সংক্ষিপ্ত কথা- ভাই, আল্লাহর রাজি-খুশির পথে এসো। এটা সম্ভব; কিন্তু তাবলীগ কীভাবে সম্ভব! যদি তার নিজেরই মাসআলা-মাসায়েল যথাযথ জানা না থাকে, আয়াত হাদীস যথাযথ জানা না থাকে, তাহলে তাবলীগ করবে কীভাবে? এটা তো তার দ্বারা সম্ভবও নয়। যে কাজকে আমরা দাওয়াত ও তাবলীগ বলি, যারা দ্বীনের এই কাজ শুরু করেছেন তারা কিন্তু এ নাম দেননি। দাওয়াত ও তাবলীগ হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)এর দেওয়া নাম নয়; বরং তিনি বলতেন, আমাদের এ কাজের কোন নাম দিলে 'তাহরীকে ঈমান' দেওয়া যেতে পারে। তিনি এ কাজের নাম দাওয়াত ও তাবলীগ দেননি। পরবর্তী সময়ে মানুষের মুখে মুখে এ নাম এসে গেছে এবং এভাবেই তা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পরে

আর তা পাল্টানো হয়নি।

তাই যে কাজটিকে আমরা তাবলীগ বলি এটি তাবলীগের চেয়ে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যে উদ্দেশ্যে এই কর্মধারা শুরু হয়েছে তা হল ঈমানের পেছনে মেহনত করা। ঈমান দৃঢ় ও মজবুত করা; ঈমান নবায়ন করা এবং ঈমান তাজা করা— এটা কোন ব্যক্তিবিশেষের কাজ নয়; কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর কাজ নয়; কোন শ্রেণীবিশেষের কাজ নয়; বরং কালেমা পাঠকারী প্রত্যেক মুসলমানের কাজ। যখনই আমি কালেমা পড়লাম— لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. তখনই এ কালেমার হক বোঝা এবং এ কালেমার দাবি পূরণ করা আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব আমাকে বুঝতে হবে। সে মোতাবেক নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে এবং সেভাবে নিজেকে পরিচালিত করতে হবে। এই মেহনতের নামই হল ঈমানের মেহনত; আমলের মেহনত। এটি সকল মুসলমানের উপর ফরয; এ মেহনত সবার উপর অপরিহার্য। এটি আপনাকে করতেই হবে। আপনি কোন পদ্ধতিতে করবেন তা ভিন্ন কথা। কিন্তু ঈমানের জন্য মেহনত করতে হবে। আমলের জন্য মেহনত করতে হবে।

আর তাবলীগ জামাআতের কাজ হল এ মেহনতের অত্যন্ত সহজ ও উত্তম একটি পন্থা। অনাগ্রহী সর্বসাধারণের মাঝে দ্বীনের আগ্রহ ও তলব পয়দা করার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির মেহনত এতই সফল যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঈমানের মেহনতকে জরুরি মনে না করার কারণসমূহ

বিভিন্ন ধরনের ভুল বোঝাবুঝির কারণে আমরা যারা কালেমা পড়েছি তারা কালেমার দাবি অর্থাৎ কালেমা আমাদের কাছে কী চায় তা ভাবতে চেষ্টা করি না এবং আমরা যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং যারা ঈমান আনেনি— আমাদের ও তাদের মাঝে পার্থক্য কোথায়— এ নিয়ে ভাবার ও চিন্তা করার সুযোগও আমরা পাই না। কেন পাই না— এর বেশ কিছু কারণ রয়েছে। একটি কারণ এই যে, আমরা দ্বীন ও ঈমানের মেহনতকে বুঝতে ভুল করি। আমাদের ধারণা, দ্বীনদার হতে হলে দুনিয়াদার হওয়া যাবে না আর দুনিয়াদার হলে দ্বীনদার হওয়া যাবে না। এ দুটো সম্পূর্ণ দুই মেরুর বিষয়। যেন জীবন ও মৃত্যু। অর্থাৎ আমি জীবিত অর্থ মৃত নই আর মৃত অর্থ জীবিত নই। একটা হলে আরেকটা হতে পারে না। তেমনি দ্বীন ও দুনিয়া। একটা হলে আরেকটা হবে না।

আমরা তো দুনিয়াদার; আমাদের এই ধাক্কা, সেই ধাক্কা, এই কাজ, সেই কাজ,

ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার কত কিছু, তাহলে আমরা দ্বীনের মেহনত করব কীভাবে, দ্বীন-ঈমান শিখব কীভাবে? এসব ধর্ম-কর্ম তো হল তাদের জন্য, যাদের এসব ধাক্কা নেই। পক্ষান্তরে আমরা যারা ধর্ম-কর্ম নিয়ে আছি তাদের ওই লাইনের দরকার নেই।

এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা

এই ভুল ধারণা অনেকের মধ্যেই আছে। কারো মধ্যে কম কারো মধ্যে বেশি। এটি একেবারেই ভুল ধারণা। ষোল আনাই গলত। কারণ দ্বীন আল্লাহ রাসুল আলামীন দান করেছেন; আবার দুনিয়াও আল্লাহ রাসুল আলামীন বানিয়েছেন। তিনিই আমাদেরকে দ্বীনের উপর চলতে বলেছেন, তিনিই আমাদের এ দুনিয়ায় থাকতে দিয়েছেন; তবে একথা বলে দিয়েছেন যে, দুনিয়াতে তোমরা দ্বীন মোতাবেক চলবে। তাহলে তো দুয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য থাকল না। যদি একটা হলে আরেকটা না হত তাহলে একাজটা আল্লাহ তাআলা করতেন না। সুতরাং বোঝা গেল এ দুয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। ওটা আমাদের ভুল ধারণা।

দ্বীনদার হওয়ার জন্য দুনিয়া ছাড়তে হয় না

আমি দুনিয়ার সবকিছু করেও দ্বীনদার হতে পারি। দ্বীনদার হতে হলে আমাকে দুনিয়া ছাড়তে হবে না। দ্বীন বলে না যে, তুমি দুনিয়া ছাড়। দুনিয়া ছাড়ার আদেশ কোথাও নেই। প্রায় প্রতি জুমাতেই সূর্যে ‘জুমুআ’ তেলাওয়াত করা হয়। এর শেষ দিকের আয়াতগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

এ আয়াতগুলো প্রায় প্রতি জুমার নামাযেই পড়া হয়। এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, হে মুমিনগণ, যখন জুমার দিন জুমার নামাযের আযান দেওয়া হয় فاسعوا (ফাসেওয়া) এখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে যাও; মসজিদের দিকে দৌড়াও; আল্লাহর যিকিরের দিকে যাও; নামাযে যাও; খুতবায় যাও।

وَذُرُوا الْبَيْعَ এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ কর। তাহলে আযানের মাধ্যমে আপনাকে দোকান থেকে মসজিদে আনা হচ্ছে। এখন বেচাকেনা ছেড়ে মসজিদের দিকে ধাবিত হও। এ মুহূর্তে কাজ হল নামায আদায় করা। দেখুন, আল্লাহ আপনাকে ঘর থেকে আনেননি। আল্লাহ তাআলা এ কথা বলেননি যে, ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে এস। বান্দা ঘরে বেকার বসে থাকুক আল্লাহ তাআলা তা কখনোই চান না। আযাতে একথা বলেননি যে, আযান হয়েছে। এখন ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে এস। আল্লাহ তাআলার বান্দারা কর্মরত থাকবে, ঘরে বেকার বসে থাকবে না। তাই বলেছেন, বেচাকেনা বন্ধ করে মসজিদে এস। তাহলে কী বোঝা গেল? আল্লাহ তাআলা চান আপনি দোকানপাটে থাকুন; আপনি মার্কেটে থাকুন; আপনি বাজারে থাকুন; আপনি দুনিয়ার কাজে থাকুন এবং দুনিয়া উপার্জন করুন। কিন্তু যখন আযান হয় তখন মসজিদে আসুন।

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ এটি তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা বোঝ। এটিই তোমাদের জন্য সঠিক রাস্তা, উত্তম রাস্তা।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

যখন নামায শেষ হয়ে গেল তো *فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ* আল্লাহর জমিনে ছড়িয়ে পড়। এই নয় যে, মসজিদে বসে থাক আসর পর্যন্ত। আসর পড়ে বের হও।

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ আল্লাহর 'ফয়ল' ও রিযিক তালাশ কর। তবে এই রিযিক যে অন্বেষণ করতে যাবে- বাজারে যাবে, মার্কেটে যাবে, দুনিয়ার কাজ-কারবারে যাবে, সেখানে গিয়ে আল্লাহকে ভুলবে না। মসজিদে বসে থেকো না, বের হয়ে পড়। আল্লাহর জমিনে যাও এবং মেহনত কর। দুনিয়া অর্জনের জন্য, রিযিক উপার্জনের জন্য মেহনত কর। কিন্তু *وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* যখন দুনিয়ার কাজ-কারবারে থাকবে তখন আল্লাহর স্মরণ থেকে তোমার অন্তর যেন গাফেল না হয়। আল্লাহকে স্মরণ রাখবে। দোকানে বসে আছ, গ্রাহক একজন যায়, একজন আসে। এমনি বসে থাকার দরকার কী, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ পড়তে থাক। আর যখন বেচাকেনা করব তখন খেয়াল রাখব, কাউকে যেন ধোঁকা না দেই; মাপে কম না দেই। আল্লাহ এগুলো নিষেধ করেছেন। এগুলো হারাম। এ সময় পার্থিব কাজে স্মরণ রাখি আল্লাহর কথা; আল্লাহর বিধিবিধানের কথা। আর যখন সুযোগ পেলাম তো

আল্লাহর যিকির করলাম। **لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ** এটি তোমাদের সফলতার রাস্তা।
এভাবে তোমরা সফলকাম হবে।

জুমার দিনেও ব্যবসা বন্ধ রাখা জরুরি নয়

আপনাকে আযানের পর আল্লাহ তাআলা বলেন, দোকান ছেড়ে মসজিদে আস।
নামায হয়ে গেছে এখন বলেন, আবার যাও দোকানে। আল্লাহ তাআলা তো
শুক্রবারেও বলেন না যে, দুনিয়ার কাজ-কর্ম ছাড়। শুক্রবারে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ;
দোকানপাট বন্ধ-এমন তো বলেননি। বন্ধ করা নাজায়েয নয়; দোকান-পাঠ বন্ধ
করতে পারেন। এই দিনকে ছুটির দিন হিসাবে নির্ধারণ করতে পারেন। কিন্তু
আল্লাহ তাআলা তো বলেননি যে, এই দিন ছুটি; আমার দ্বীনের জন্য সপ্তাহে একদিন
ছুটি। এরূপ কী আল্লাহ ফরয করেছেন? করেননি। জুমার দিন জুমার নামাযের মত
গুরুত্বপূর্ণ বিধান আল্লাহ তাআলা এভাবে দিলেন যে, আযান হয়ে গেছে এখন
মসজিদে আস। নামায হয়ে গেছে এখন আবার দোকানে যাও। তবে আল্লাহর কথা
স্মরণ রেখো। আবার আযান হলে মসজিদে এসো।

সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের দুনিয়াদারি

তাহলে আমি কীভাবে বলি, দ্বীনদার হতে হলে দুনিয়াদার হওয়া যাবে না।
দুনিয়াদার হতে হলে দ্বীনদার হওয়া যাবে না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি যারা দেখেছেন এবং
তাঁর উপর ঈমান এনেছেন তাঁদেরকে বলা হয় সাহাবা। সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে
উত্তম কোন জামাআত নেই। কেয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবে কেউ
সাহাবীদের মত বুয়ুর্গ হতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে এই বিশেষত্ব
দিয়েছেন যে, সরাসরি আল্লাহর নবীকে দেখার সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছে। তাঁরা
সরাসরি আল্লাহর নবীর নিকট থেকে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহ
তাআলার কালাম শুনেছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁদের মর্তবা অনেক। সেই
সাহাবায়ে কেরামের জীবনী যদি পড়েন তাহলে দেখবেন যে, আল্লাহ তাআলার
কাছে নবীদের পর সবচেয়ে বড় বুয়ুর্গ ও আল্লাহওয়ালা হলেন হযরত আবু বকর
সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু।

তিনিই প্রথম খলীফাতুর রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
ইন্তেকালের পর সর্বপ্রথম তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছেন; উম্মাহর আমীরুল মুমিনীন
হয়েছেন। সেই আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কী করতেন? তাঁর নিজস্ব ব্যবসা ছিল।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) নবীজীর জীবদ্দশায় সবসময় তাঁর দরবারে বসে থাকতেন না, পালাক্রমে উপস্থিত হতেন। তাঁর এক বন্ধুর সাথে নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে, আজ আমি কাজ করব, তুমি থাকবে মদীনায় রাসূলের দরবারে। কী কী নতুন আয়াত নাযিল হয়, আল্লাহর রাসূল কী নতুন কথা বলেন তা তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং রাতে এসে আমাকে বলবে। পরের দিন তুমি কাজ করবে, আর আমি মসজিদে নববীতে যাব। একদিন বন্ধু মসজিদে নববীতে, তিনি ঘরে, ব্যবসা-বাণিজ্যে। আরেকদিন তিনি মসজিদে নববীতে, বন্ধু ঘরে, ব্যবসা-বাণিজ্যে। সাহাবীদের মাঝে এরূপ পালাবদল চলত। সকল শ্রেণীর মধ্যে। কারো কাজ ছিল ক্ষেত-খামারের। কারো ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। কারো অন্য কোন পেশা। এসব কিছু নিয়েই তাঁরা দ্বীনদার হয়েছেন, আল্লাহওয়ালা হয়েছেন। এত বড় আল্লাহওয়ালা যে, কেয়ামত পর্যন্ত অন্য কেউ এত বড় আল্লাহওয়ালা হতে পারবে না। কিন্তু দ্বীনের শিক্ষা, দ্বীনের চর্চা না থাকার কারণে আমরা বলি, আমি তো দুনিয়াদার, আমার দ্বারা কি দ্বীনের কাজ হবে?

সামান্য সময় বের করে ঈমানের সবকাজ করে নাও

ইলিয়াস (রহ.) দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং পরবর্তী সময়ে যতদিন পর্যন্ত ঈমানের শিক্ষা, ইসলামের শিক্ষা মানুষের মধ্যে ছিল ততদিন মানুষের মধ্যে এই স্বচ্ছ ধারণা ছিল যে, দুনিয়ার সব কাজ-কারবার করেও আমাকে দ্বীনদার, আল্লাহওয়ালা হতে হবে। এই ধারণা পুনরায় মানুষের মাঝে ফিরিয়ে আনা দরকার। মানুষ যেন মনে না করে যে, আমি যতক্ষণ মসজিদে আছি ততক্ষণ আমি আল্লাহওয়ালা, ততক্ষণ আমার উপর শরীয়তের বিধান চলবে। আমি ক্ষেত-খামারে গেলে, ব্যবসা-বাণিজ্যে গেলে, হাটে-বাজারে গেলে, অফিস-আদালতে গেলে, সচিবালয়ে গেলে, সংসদে গেলে, পরস্পরে লেনদেন করলে, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে গেলে আমার উপর শরীয়তের কোন বিধান নেই—এরূপ ধারণা যেন মানুষের মন থেকে চলে যায়; মানুষ যেন উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে আমার আবাসস্থল বানিয়েছেন। দুনিয়ার সকল ঝামেলা নিয়েই আমাকে থাকতে হবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে। আর এটা সম্ভব, খুবই সম্ভব।

হাকীমুল উম্মত (রহ.)এর একটি চমৎকার উক্তি

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহ.) মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)এর অন্যতম মুরুব্বী। তাঁর বেহেশতী জেওর কিতাবটি আপনারা

অনেকেই পড়েছেন, 'তালীমুদ্দীন', 'হায়াতুল মুসলিমীন' এসব কিতাবও খুব গুরুত্বপূর্ণ, পড়ার মত এবং সংগ্রহে রাখার মত। তাঁর একজন আত্মীয় ছিল, দ্বীনের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না, সবসময় দুনিয়ার ফিকিরে থাকত। হাকীমুল উম্মত (রহ.) তাকে বললেন, আমাকে দেখেও কি তোমাদের বুঝে আসে না যে, দুনিয়ার সবকিছু ঠিক রেখেও দ্বীনদার হওয়া যায়। শুধু মানসিকতা ও পদ্ধতির পার্থক্য। তোমার সবকিছু ঠিক থাকবে। সব কাজই তুমি করবে তবে তা করবে শুধু আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতি যদি শিখে নাও আর সে মোতাবেক হিম্মত করে আমল কর তাহলে তোমার সব কিছু সঠিক ও হালাল হবে। আর যদি নিজের ইচ্ছেমত চল তাহলে তা হবে গলত ও হারাম।

পার্থিব দৃষ্টিতে যদি বিচার করেন তাহলে দেখবেন এরাও ব্যবসা করছে; ওরাও করছে। এদেরও ব্যবসায় লাভ হচ্ছে, ওদেরও হচ্ছে। এদেরও বাড়ি-গাড়ি আছে, ওদেরও আছে। কিন্তু একজন বলে আমি দ্বীনদার আরেকজন বলে আমি দুনিয়াদার।

আসল পার্থক্য কোথায়

তাহলে আসল পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে চিন্তা-চেতনা ও পদ্ধতিতে। আল্লাহ তাআলার দেওয়া পদ্ধতি যদি আমি একটু মেহনত করে শিখে নিতাম এবং আমার কাজগুলো সে মোতাবেক করতাম তাহলে আমার রাস্তা ঠিক হত। দুনিয়াও ঠিক, আখেরাতও ঠিক। তো হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) তাঁর সঙ্গীদের লক্ষ করে বললেন, তোমরা দীর্ঘদিন থেকে আমাকে দেখছ -আল্লাহ তাআলা তাঁকে অনেক বছর হায়াত দিয়েছিলেন এবং তাঁর সংস্পর্শে গিয়ে অনেকেই ঈমান-আমল শিখেছে, দ্বীন শিখেছে-সমাজের কত পেশার লোক আমার সাথে সম্পর্ক রাখে-আদালতের জজ, বড় ব্যবসায়ী, কোম্পানির ডাইরেক্টর, সমাজের সকল শ্রেণীর লোক আমার সাথে সম্পর্ক রাখে; আমার কাছে আসার পর তো তাদের কাজ-কারবার ছাড়তে হয়নি। কোন এডভোকেটকে আমি বলি না, আপনি ওকালতি ছেড়ে দিন। কোন ব্যবসায়ীকে বলি না, ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে আমার কাছে এসে পড়। কোন জজকে বলি না, আইন-আদালত ছেড়ে দিন। আমি শুধু রাস্তা দেখিয়ে দেই। এডভোকেট তুমি থাক, তবে এধরনের মামলায় এ রাস্তা অবলম্বন কর, ওই ধরনের মামলায় ওই রাস্তা অবলম্বন কর। এই মামলা গ্রহণ কর, ওই মামলা গ্রহণ করো না। ব্যস, সব ঠিক। সুতরাং কাউকে আমি কোন কিছু ছাড়তে বলি না। যে যে পেশায় নিয়োজিত আমি তাকে তা ছাড়তে বলি না। আমি শুধু রাস্তা বাতলে দেই। তুমি ওখানে থেকে এভাবে দ্বীনের উপর চল; আল্লাহর রাস্তায় চল।

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)এর মূল বক্তব্য

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) একথাটাই সবাইকে বোঝাতে চেয়েছেন, আমরা যে কালেমা পড়ে ঈমান এনেছি, আসুন ওই ঈমানকে মজবুত করি। আর তা করতে হলে কিছু মেহনত লাগবে। দুনিয়ার কোন কাজই যেমন মেহনত ছাড়া হয় না তেমনি এটাও মেহনত ছাড়া হবে না। সে মেহনতের জন্য বলি না, তুমি তোমার দুনিয়া ছেড়ে দাও। বরং একটু সময় বের কর। দু' তিন দিনের জন্য আল্লাহওয়ালাদের কাছে যাও। দোকান বন্ধ করে একটু ফিকির কর। তিন দিন ঈমান নিয়ে ফিকির কর। পরীক্ষামূলকভাবে তিনদিন সময় বের কর। এই সময়টা মসজিদের পরিবেশে থাক। আল্লাহ-বিল্লাহ কর। আল্লাহর কথা শোন। দ্বীনের কথা শোন। তিনদিন পর কর্মস্থলে যাও। দোকান খোল। ব্যবসায় বস।

তিনদিনের আগে ও পরে

দেখ, তোমার দোকানের কোন ক্ষতি হবে না; বরং উন্নতি হবে। পরীক্ষা করে দেখ। এ দু' তিন দিন লাগানোতে আমার লাভ কী হল? আমি মনুষ্যত্বের সবক পেতে শুরু করলাম, আমি যে কালেমা পড়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করেছিলাম, আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিলাম সে কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম, সময় লাগানোর ফলে সবকিছু স্মরণ হল। এতদিন আমার নিয়ম ছিল সকাল নয়টায় দোকানে ঢুকতাম আর ইশার নামাযের পর রাত দশটা-এগারোটায় বের হতাম। মাঝে খাওয়া-দাওয়ার তো ফিকির হত; কিন্তু আযান কখন হল, নামাযের সময় কীভাবে চলে গেল-এসবের কোন খবরই আমার ছিল না। এখন এ তিনদিনের বরকতে যখনই আযান হয় তখন দুজন থাকলে আমি যাই এ মসজিদে সোয়া একটার জামাআতে, আর ওকে পাঠাই ওই মসজিদে দেড়টার জামাআতে। দুজনেরই জামাআতে নামায পড়া হল। একজন এ মসজিদে, অন্যজন ওই মসজিদে। ধারে-কাছে মসজিদ নেই, তাহলে এখানেই জামাআত করে নামায পড়ি। দুজন একসাথে নামায পড়লে গ্রাহক এসে ফিরে যাবে, এখনো যদি এই ক্ষতি স্বীকারের যোগ্যতা না হয় তাহলে জামাআত থাক। আমি আগে পড়ি, তুমি দোকান চালাও। আমার নামায শেষ, এবার তুমি পড়। সবই সহজ। দোকানও বন্ধ হল না, নামাযও হয়ে গেল। এখন আমি নামাযী। এতদিন ছিলাম শুধু দোকানদার; এখন নামাযী দোকানদার।

হাদীস শরীফে ঈমান তাজা করার তাগিদ

ঈমান তাজা করার প্রয়োজন আমরা অনেকেই বুঝি, আবার কিছু মানুষ তা

বুঝে না। হযরত ইলিয়াস (রহ.) বলেন, আমরা যারা বুঝি তারা এই বুঝটা পাকা করি আর যারা বোঝে না তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি। কীভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব? (বুঝতো দেবেন আল্লাহ তাআলা) আমরা একজন আলোচনা করব; যেমন সাহাবীগণ পরস্পরে আলোচনা করতেন। এ মর্মে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.)এর ঘটনা বুখারী শরীফের শুরুতে আছে। যারা আরবী বা বাংলা অনুবাদ পড়েছেন তারা দেখেছেন। তিনি বলেন—

اجلس بنا نؤمن ساعة

অর্থাৎ একটু বস। ঈমানের আলোচনা করি। একটু ঈমান তাজা করি। ঈমান নতুন করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ

(মুসনাদে আহমাদের হাদীস) ঈমান তাজা কর। ঈমান নতুন কর। ঈমানকে মজবুত কর।

জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রাসূলুল্লাহ, ঈমান নতুন করব কীভাবে? বললেন—

أَكثَرُوا قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

যে কালেমা পড়ে ঈমান এনেছ সে কালেমা বেশি বেশি করে পড়। ওই কালেমার বেশি বেশি চর্চা কর। কালেমার অর্থ নিয়ে ভাব। কালেমা তোমার কাছে কী চায় তা বারবার আলোচনা কর। তাহলেই ঈমান তাজা হবে, নতুন হবে, মজবুত হবে। বস্তুত এ বিষয়টি শেখানোর জন্যই এ মেহনত। তাই এ কাজকে তাবলীগ না বলে বলা উচিত ঈমান ও আমলের মেহনত।

সব কাজে ভাগাভাগি চলে না

ইলিয়াস (রহ.) বলতেন, আমরা তো মনে করি দুনিয়া ভাগাভাগি ছাড়া চলে না। সবাই এক কাজে থাকলে কি হবে? অন্যগুলো করবে কে? একেকজন একেক পেশায় থাকতে হবে। কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার; কেউ শিক্ষক, কেউ প্রশাসক। এভাবে বিভিন্নজন বিভিন্ন কাজে থাকলে দুনিয়ার সব বিভাগ ঠিকঠাক মত চলবে। কিন্তু ইলিয়াস (রহ.) বলেন, কর্মবন্টন দরকার; তবে সবক্ষেত্রে বন্টন চলে না। আমরা যদি বলি, ভাই! আমি শুধু খাব, তুমি শুধু পান করবে! আমি শুধু বিশ্রাম করব, তুমি শুধু কাজ করবে, আমি কাপড় পরব, তুমি ... তাহলে চলবে? খাওয়া,

পান করা, কাপড় পরা, বিশ্রাম করা এবং অসুস্থ হলে চিকিৎসা করা— এসবের মধ্যে কি ভাগাভাগি চলে? এসব কাজ সবাইকে করতে হয়। এগুলো সবার প্রয়োজন। তেমনি ঈমান ও আমলের মেহনতের মধ্যেও ভাগাভাগি চলে না। তুমি যদি মানুষ হতে চাও, আল্লাহর বান্দা হতে চাও তাহলে তোমার ঈমান লাগবে; আমল লাগবে। এখানে এই ভাগাভাগি চলবে না যে, কিছু লোক ঈমান আনবে, কিছু লোক আমল করবে আর কিছু লোক এমনি খালি থাকবে। কিছু লোক খাবে আর কিছু লোক না খেয়ে থাকবে। কিছু লোক কাপড় পরবে আর কিছু লোক ...। নাউযুবিল্লাহ।

মোটকথা, মানুষের জীবনে অনু, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো আরও কিছু বিষয় আছে, যেগুলোতে ভাগাভাগি চলে না। যেমন ঈমান। এটি এমন এক জিনিস যা সবার সমান প্রয়োজন। অতএব ঈমান আর আমল নিজের মধ্যে আনার জন্য মেহনতও সবাইকে করতে হবে।

ঈমান ও আমলের মেহনত সবার উপর ফরয

কিন্তু তাবলীগ সবার কাজ নয়। সবার জন্য জরুরিও নয়। আর তা সবার দ্বারা সম্ভবও নয়। পক্ষান্তরে ঈমান ও আমল ঠিক করা, ঈমানের ফিকির অন্তরে আসা, আমলের ফিকির অন্তরে আসা, ভাল হওয়ার ফিকির আসা; খারাপ কাজ থেকে, সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতি থেকে বিরত থাকার ফিকির আসা, খারাপ কাজ হয়ে গেলে অনুশোচনা আসা— এই চিন্তা ও মেহনত সবার মধ্যে থাকতে হবে।

আর তাবলীগ জামাআতে অংশগ্রহণকারী লোকদের প্রথম পদক্ষেপ হল নিজের ঈমান মজবুত করা এবং আমল দুরস্ত করা। সাথে সাথে অন্য ভাইদের মাঝে এ মেহনতের তলব পয়দা করার জন্য এবং নিজের সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ নিয়মে সচেষ্ট থাকা। আর এ কাজেরই ইজতেমা হচ্ছে এখন টঙ্গীতে। এটি বাংলাদেশের গৌরব। প্রায় আশিটি বা ততোধিক রাষ্ট্রের দ্বীনদার মুসলমান, আলেম-উলামা, চিন্তাবিদ ও সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এখানে আসছেন। আমরা কাছে থেকেও যদি উপকৃত না হই তাহলে বড় নাশুকরি হবে। পুরো তিনদিন না পারি—গতকাল থেকেই তো বয়ান শুরু হয়ে গেছে— কোন এক সময় যাই। আজকে আসর পড়ি ওখানে গিয়ে। আসরের পরের বয়ান, মাগরিবের পরের বয়ান শুনি। রাতে থাকতে না পারলে এসে গেলাম। ইশার নামায না হয় বাইরে এসে পড়লাম। পরের দিন আবার গিয়ে ফজর পড়লাম। ফজর পড়তে না পারলে যোহর পড়ি। যোহর থেকে ইশা পর্যন্ত বয়ান শুনি। এরপর রাতে এসে যাই। আংশিক হলেও শরীক হই। কিছু শুনি। অথচ আমরা কী করি, শুধু রবিবার গিয়ে

সব একসাথে ভিড় জমাই। জনসমুদ্র সৃষ্টি করি। এটিও খারাপ না। এত বড় মাজমা। এতে দুআয় শরীক হওয়ার ফিকিরও প্রশংসনীয়। কিন্তু এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল দ্বীনী আলোচনা। ঈমান ও আমল সম্পর্কে, দ্বীনের ফিকির সম্পর্কে, দ্বীনের মেহনত সম্পর্কে যে সব আলোচনা হয় তাতে শরীক হওয়া। কিছু শোনার চেষ্টা করা। এটি দুআয় শরীক হওয়ার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা মনে করি, শেষে গিয়ে দুআয় শরীক হলে আমি সব পেয়ে গেলাম। এ ধারণা ঠিক নয়। দুআ আপনি নিজের জায়গায় বসেও করতে পারেন। হ্যাঁ, মাজমাতে বসে দুআ করলে, সবার সাথে আমীন বললে তার গুরুত্ব বেশি হবে। তবে এরচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওখানে যে আলোচনা হয় তা শুনে নিজের মধ্যে অনুশোচনা সৃষ্টি করা যে, আমারও ফিকির করা দরকার; মেহনত করা দরকার।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন আর ইজতেমার পার্থক্য

গত জুমার আরবী খুতবায় বলেছিলাম, পৃথিবীতে সংঘ-সংগঠনের কোন অভাব নেই- জাতিসংঘ, সার্ক, আরো কত আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক সংগঠন। সেসবের অধীনে কত সম্মেলন হয়! বিভিন্ন দেশের নেতারা বসেন। বিশ্বশান্তির জন্য চিন্তা-ভাবনা করেন। কীভাবে দুর্নীতি দূর হবে, কীভাবে সন্ত্রাস দূর হবে, কীভাবে বিশ্বে সার্বিক উন্নতি আসবে- এসব নিয়ে গবেষণা করেন। কিন্তু ফলাফল আমাদের চোখের সামনে। কীভাবে কলম ঘুরায়, কীভাবে কথা ঘুরায়, কীভাবে সন্ত্রাস দমনের নামে সন্ত্রাসের বিস্তার, দুর্নীতি দমনের নামে দুর্নীতির প্রতিষ্ঠা। এসব তো আমাদের চোখের সামনেই সবকিছু। এসব কেন হচ্ছে? উন্নতির চাবিকাঠি কী?

উন্নতির চাবিকাঠি

উন্নতির চাবিকাঠি কি ধন-সম্পদ বেড়ে যাওয়া? বড় বড় টাওয়ার হয়ে যাওয়া। এর নাম কি উন্নতি? উন্নতির মূল বৈশিষ্ট্য শান্তি। আপনাদের সবার গাড়ি-বাড়ি আছে, ভাল কথা; কিন্তু শান্তি নেই। নিরাপত্তা নেই। সর্বত্রই অশান্তি। অনিরাপত্তা। সন্ত্রাস আর দুর্নীতি। এটা কেমন উন্নতি? আর্থিক উন্নতিকে উন্নতি বলে না, যতক্ষণ না নিরাপত্তা, ন্যায়-বিচার ও নৈতিকতা পাওয়া যাবে। উপার্জন যতই বাড়ুক, আপনার যদি জান-মালের নিরাপত্তা না থাকে, ইজ্জত-আব্রূর নিরাপত্তা না থাকে তাহলে এর নাম উন্নতি নয়। আসবাব ও উপকরণ যতই থাকুক, এর নাম উন্নতি নয়। এজন্য পৃথিবীজুড়ে যত সংঘ ও সংগঠন এবং তাদের অসংখ্য সভা ও সম্মেলন কিছুই

মানবতাকে শান্তি দিতে পারছে না। কারণ উন্নতির চাবিকাঠি তাদের হাতে নেই। সফলতার চাবিকাঠি, সফলতার সংজ্ঞা ওরা বোঝে না কিংবা বুঝেও না বোঝার ভান করে। ওরা তো বাহ্যিক উন্নতির রাস্তা দেখাবে। তারা এমন কোন শিক্ষা দেয় না যার দ্বারা আমি আপনি দুর্নীতিমুক্ত থাকতে পারব; সন্ত্রাসমুক্ত থাকতে পারব; শান্তিতে থাকতে পারব।

সফলতার চাবিকাঠি হচ্ছে সুবিচার ও নিরাপত্তা। আর এগুলো আসবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর যথার্থ ঈমান দ্বারা। আখেরাতে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এই অনুভূতি যদি থাকে তাহলে সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা আসবে। তাই সংগঠন ও সভা-সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার কেন্দ্রবিন্দু যদি হয় ঈমান ও আখেরাত তাহলে কিছুটা সফলতার আশা করা যায়। পরকালে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার মানসিকতা যদি সৃষ্টি হয়, দুনিয়াতে যত ফাঁকিবাজি করি বিভিন্ন উপায়ে তা থেকে বেঁচে গেলেও আখেরাতে আমি বাঁচতে পারব না— এই অনুভূতির ভিত্তিতে যদি তারা গবেষণা করে, পর্যালোচনা করে তাহলে মানবতাকে কিছু দিতে পারবে। এই ফিকিরই হচ্ছে টঙ্গীর ময়দানে। আপনার আমার বুঝে আসবে না। এই যে ঈমান-আমলের মেহনত করতে বলে, لا اله الا الله এর কথা বলে, তিনদিন দশদিনের জন্য বের হতে বলে; মানুষ আজ চাঁদে যাচ্ছে আর এরা বলে গাটি নিয়ে বের হতে—আপনার আমার কাছে বিষয়টা এমনই মনে হবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন— উন্নতি ও সফলতার চাবিকাঠিই হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। যত প্রকারের মেহনত চলছে সেসবের সাথে যদি এটিকে যোগ করে দিতে পারেন তাহলে কামিয়াব। পক্ষান্তরে এটিকে বাদ দিয়ে সকল মেহনত নাকাম; হাজার বুদ্ধিজীবীও যদি একত্র হয় তবুও আপনাকে আমাকে শান্তি দিতে পারবে না। কখনই না।#

[মার্চ '০৬ঈ.]

একটি ব্যতিক্রমী ইজতিমা

বর্তমান পৃথিবীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য সংঘ, সংগঠন এবং সভা-সম্মেলনের কোনো অভাব নেই। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এত বেশি সভা-সমাবেশ নিয়মিত বা তাৎক্ষণিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যার হিসাব রাখাও অসম্ভব। এসব সম্মেলনের উদ্দেশ্য যদি হত অন্তত মানুষের পার্থিব কল্যাণ সাধন, তবুও একটা কথা ছিল। কিন্তু তা নয়। এসবের উদ্দেশ্যই হল শক্তিমানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও শক্তিহীনের ক্ষতি সাধন। যেখানে সম্মেলন ও সংঘবদ্ধতার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দুর্বল ও অসহায়ের সাহায্য এবং কল্যাণের কাজে পরস্পর সহযোগিতা প্রদান, সেখানে এসবের উদ্দেশ্য থাকে সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ শক্তিশালী জালেমকে সমর্থন দেওয়া আর দুর্বল নিপীড়িতদের অসহায়ত্বকে দীর্ঘায়িত করা। আর তা এমনই সূক্ষ্ম কৌশলে যে, মজলুমের 'আহ' করার বা তার প্রতি কৃত অন্যায়েকে অন্যায়ে হিসেবে অনুভব করারও সুযোগ থাকে না।

এটাই বর্তমান সময়ের সংঘ ও সংগঠনগুলোর নীতি। সৌভাগ্যবশত দু'একটি সংগঠন যদি এমন পাওয়া যায়, যারা সেবামূলক মানসিকতা নিয়ে কাজ করে, তবে তাদেরও উদ্দেশ্য শুধু মানুষের পার্থিব উন্নতি, যার সম্পর্ক শুধু মানুষের দেহের সাথে। প্রশ্ন এই যে, রক্ত-মাংসের সাথে দেহটিই কি মানুষ? তাহলে অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্য কী থাকল? মনুষ্যত্বই তো মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। আজ বস্তুবাদী চিন্তা এবং অর্থ ও পদের লালসা এতই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, প্রায় সকলেই বিশেষত ক্ষমতার মসনদে আসীন ব্যক্তির মনুষ্যত্বের বিকাশ ও পরিচর্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে একেবারেই ভুলে গেছে। তাদের সম্পূর্ণ চিন্তা-শক্তি ও কর্মশক্তি এই আসল সমস্যার বাইরেই খরচ হয়ে যায়, অথচ মনুষ্যত্বের অভাবই হল সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এর যথার্থ সমাধান ছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কোনো সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, সামাজিক, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সমস্যার কোনো সমাধানও সম্ভব নয়।

অথচ কিছু সাহসী ও সৎ চিন্তাশীল মানুষ যখন এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন তখন তাদের আহ্বানকে নিতান্ত অপরিচিত মনে করা হয় এবং তাদের উদ্যোগ-ইজতিমাকে অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় ভাবা হয়। এ যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বাণীরই বাস্তব চিত্র—

بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُرُقِي لِلْغُرَبَاءِ وَهُمْ الَّذِينَ أَصْلَحُوا مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ سُنَّتِي مَنْ بَعْدِي.

“ঈমান শুরু হয়েছে অপরিচিত অবস্থায়; পুনরাং সে অবস্থায় ফিরে যাবে। সুসংবাদ ‘অপরিচিতজনদের’ জন্য, যারা আমার পরে লোকদের নষ্ট করা সুন্নত সংশোধন করেছে।” —মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৬৯০

ইনসানিয়াতের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খালেকের মারেফাত অর্জন। কেননা, এ তো সহজ কথা যে, ইনসানকে সবার আগে পেতে হবে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় এবং তাকে হতে হবে সকল সৃষ্টির প্রতি দায়িত্বশীল।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, হৃদয়-জগতের পবিত্রতা। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, চিন্তার বিশুদ্ধতা ও বুদ্ধির পরিপূর্ণতা। যেন সে রক্ষা পায় ক্ষণস্থায়ীর জন্য চিরস্থায়ীকে বিসর্জন দেওয়ার নির্বুদ্ধিতা থেকে। সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন রহস্য উদঘাটনের গর্বে আত্মহারা হওয়ার কিংবা চরম গাফলত ও উদাসীনতায় আত্মবিস্মৃত হওয়ার লজ্জা থেকে এবং চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, তাকে শরাফত, উন্নত চরিত্র ও উত্তম আখলাকের অধিকারী হতে হবে। পঞ্চম বৈশিষ্ট্য, আমানতদারী। খালেক ও মাখলুক প্রত্যেকের আমানত আদায় করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

সকল পেরেশানী, যাকে প্রকৃত পক্ষেই পেরেশানী বলা যায়, তার সমাধান ইনসানকে ইনসানিয়াত শেখানোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অথচ এই সাদাসিধে কথাটি বোঝাও ওইসব মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, যাদের আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর শিক্ষার সাথে জানাশোনাও নেই এবং জানার আগ্রহও নেই। আশ্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম-এর মধ্যে সর্বশেষ যিনি প্রেরিত হয়েছেন, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ব্যাপকভাবে সকল মানুষের প্রতিই প্রেরিত হয়েছেন। স্থান-কাল-গোত্র ইত্যাদি সকল সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে তিনি সবার জন্যই রাসূল। তাঁর আনীত শিক্ষা ও নির্দেশনার সাথে সম্পর্ক হওয়া ছাড়া এই সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। শুধু ঈমানের সম্পদে সম্পদশালীরা এই সত্য উপলব্ধি করবেন এবং ঈমানের মিষ্টতা যিনি যে পরিমাণ লাভ করেছেন তিনি ততটা গভীরভাবে তা উপলব্ধি করবেন। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে, আজ

যারা উন্নতি-অগ্রগতির সবচেয়ে বড় দাবিদার এবং মানবতার শিরোপা যাদের অধিকারে, তারাই সবচেয়ে বেশি মানবতাহীন। তো যে নিজেই রিক্তহস্ত সে অন্যকে কী দিতে পারে? সারকথা এই যে, মনুষ্যত্বের অভাবই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা আর এই বাস্তব সমস্যার একমাত্র সমাধানের ব্যাপারে যদি কিছু চিন্তা-ভাবনা এবং সাধ্যমতো কিছু কাজ হয়ে থাকে তবে ঈমানওয়ালারাই করছে।

একমাত্র ঈমানওয়ালারাই দাওয়াত-তালীম, তাবলীগ, তারবিয়াত-তায়কিয়া, ওয়াজ-নসীহত, দ্বীনী মোযাকারা, সাধ্য অনুযায়ী সীমিত আকারে ‘আমর বিল-মারুফ নাহি আনিল মুনকার’ এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সাধ্যমতো ‘জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ’র মাধ্যমে পৃথিবীতে ইনসানিয়াতের সবক প্রচারে যথাসাধ্য মশগুল রয়েছেন। এটা ভিন্ন কথা যে, ঈমানওয়ালাদের ঈমানী দুর্বলতা তাঁদের খেদমতগুলো মানে ও পরিমাণে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করতে পারছে না। কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিশ্বের মুক্তি ও উন্নতি ঈমানওয়ালাদের ঈমানী তরফীর মধ্যেই নিহিত আছে এবং পৃথিবীর ক্ষতি ও অকল্যাণও হয়েছে ঈমানওয়ালাদের ঈমানী অবনতির কারণে।

এই অবক্ষয়ের যুগেও ব্যাপক দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য খেদমত আল্লাহ তাআলা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ., ১৩০৩-১৩৬৩ হি.)-এর তাবলীগী জামাআতের মাধ্যমে নিচ্ছেন। এই কাজের মূল উদ্দেশ্য এই যে, বর্তমানে কালে-মা পাঠকারী মুসলিমগণও দুনিয়ার মোহ ও বস্তুবাদিতার যে ব্যাধিতে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন সে সম্পর্কে তাদের মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া এবং তা থেকে মুক্তিলাভের প্রেরণা জাগ্রত হওয়া। এটাই এ কাজের রূহ বা প্রাণ। আর এর কর্মপদ্ধতি এমনভাবে বিন্যস্ত যে, আত্মসংশোধনের সাথে সাথে অনুভূতিহীন মানুষের মধ্যেও দ্বীনের প্রয়োজনের অনুভূতি জাগ্রত করার মেহনত চলতে থাকে।

শরীয়ত দাওয়াতের নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং এর মৌলিক বিধান-সমূহও বাতলে দিয়েছে। এই নীতিমালা ও বিধানাবলির অনুসরণ করা প্রত্যেক দাঈ ও দাওয়াতী জামাআতের সার্বক্ষণিক কর্তব্য। এসব নীতি ও বিধানের আওতার মধ্য থেকে দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি স্থান-কাল-পরিবেশ ভেদে বিভিন্ন হতে পারে।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) কুরআন ও হাদীসের অনেক বড় মুহাক্কিক আলেম ছিলেন। তিনি ছিলেন হিন্দুস্তানের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ দুই দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাজাহিরুল উলূম সাহারানপুর মাদরাসার সন্তান। তিনি কিতাব ও সুন্নাহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। সীরাতুননবী ও সাহাবা-জীবনী

বিস্তৃতভাবে অধ্যয়নের পাশাপাশি তাঁদের জীবনের দাওয়াত অংশটি মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছেন। পরবর্তী দাঈ-ইল্লাহদের যুগের দাওয়াতের ইতিহাসও পাঠ করেছেন। বড়দের সঙ্গে মশওয়ারা ও মতবিনিময় করেছেন। এরপর একটি কর্মপদ্ধতি প্রস্তুত করেছেন। কাজ আরম্ভ করে যতই সামনে অগ্রসর হয়েছেন ততই অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কাজের মধ্যে মজবুতি এসেছে। তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের আহাজারি ও আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তাঁর দরদ আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন। ফলে তাঁর কাজ পুষ্পিত ও পল্লবিত হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত লক্ষ-কোটি মানুষ এই মেহনতের মাধ্যমে সীরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান পেয়েছে। এরপর যে ব্যক্তি যে পরিমাণ উসূলের পাবন্দী করেছেন এবং হক্কানী উলামা-মাশায়েখের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেছেন তিনি তত বেশি উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, জেলাভিত্তিক ও দেশভিত্তিক তিন দিনের বার্ষিক ইজতিমা। এই ইজতিমাগুলোতে তাজদীদে ঈমান তথা ঈমান পুনর্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সীরাতে নববী ও হায়াতে সাহাবার ঘটনাবলি শোনানো হয় এবং এ বিষয়ে জোর দেওয়া হয় যে, কিছু সময় দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে মসজিদে নেককারদের সঙ্গে কাটিয়ে ঈমান ও আমলের সবকিছু তাজা করা উচিত, যাতে দুনিয়ার ব্যস্ততার মাঝেও আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে গাফেল না হওয়ার অনুশীলন হয়ে যায়। সময় বের করার জন্য তাশকীল করা হয়, যা এই কাজের প্রাণ।

এ ধরনের একটি ইজতিমা আমাদের দেশেও হয়ে থাকে, যা প্রতি বছর যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি এখন দেশভিত্তিক ইজতিমা নয়; বরং বিশ্ব ইজতিমার রূপ গ্রহণ করেছে। এই ইজতিমাগুলো এবং এ ধরনের অন্যান্য দ্বীনী ইজতিমা-তা ইলম, আমল, দাওয়াত কিংবা ওয়াজ ও মোযাকারা যে শ্রেণীরই হোক না কেন, সবগুলোর লক্ষ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই শিক্ষার অনুসরণ, যা মুয়ায (রা.)-এর নিম্নোক্ত কথায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি তাঁর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বলতেন- اجلس بنا نُؤْمِن سَاعَةً “বসুন, কিছুক্ষণ আমরা ঈমান তাজা করি।।” -সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ১ম বাব

এসব ইজতিমায় অংশ গ্রহণকারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন-

ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر
اللولؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، قال: فجاء أعرابي على

رَكِبْتِيهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلِّهِمْ نَعْرِفَهُمْ قَالَ: هُمْ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ
مَنْ قِبَائِلَ شَتَّى وَبِلَادِ شَتَّى يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ يَذْكُرُونَهُ. وَفِي حَدِيثٍ
آخَرَ: فَيَنْتَقُونَ أَطْيَابَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقِي آكِلُ الثَّمَرِ أَطْيَابَهُ.

“আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন অনেক মানুষকে এমনভাবে উত্থিত করবেন যে, তাদের চেহারা নূরে ঝলমল করতে থাকবে এবং তারা মোতির মিস্তরে উপবিষ্ট থাকবেন। তাঁদের এই মর্যাদা মানুষের মনে ঈর্ষা জাগ্রত করবে। অথচ তারা নবীও নন, শহীদও নন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন একজন গ্রাম্য আরবী ব্যক্তি দোজানু হয়ে বসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাদের পরিচয় বলে দিন, যাতে আমরা তাঁদের চিনতে পারি। তিনি বললেন, তারা বিভিন্ন গোত্র ও ভূখণ্ডের মানুষ, শুধু আল্লাহর জন্যই পরস্পরের প্রতি মহব্বত পোষণ করে এবং আল্লাহর স্মরণের জন্যই একত্র হয়ে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে। অন্য বর্ণনায় আছে, তখন তাঁরা এমনভাবে উত্তম কথামালা আহরণ করে, যেভাবে ফল অনুরাগী উত্তম ফল আহরণ করে থাকে।” -তবরানী কাবীর-মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৭

তাবলীগী বিশ্ব ইজতিমার বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয় বের হয়ে আসে। যথা :

১. অসংখ্য সৌভাগ্যবান এই তিন দিনের ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেন। এরপর সেখান থেকেই চিল্লা, তিন চিল্লার জন্য বের হয়ে যান। এই সামান্য সময়ের মেহনত তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। অন্তত এটুকু তো অবশ্যই হয় যে, তাদের মধ্যে আত্মসংশোধনের চিন্তা এবং ইবাদত-বন্দেগী ও অন্যান্য জরুরি নেক আমলের জন্য সময় বের করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। তাদের সাথী ও সহকর্মীদের চিন্তা করা উচিত যে, আমরাও কেন কিছু সময় বের করে নিজেদের জীবন ও কর্মকে সজ্জিত করছি না।

২. অনেক দীনদার মানুষ তাদের পরিবারের কোনো সদস্য, কোনো আত্মীয় কিংবা কোনো প্রতিবেশীর ব্যাপারে চিন্তিত থাকেন। তাদেরকে কীভাবে দীনদার বানানো যায়-এর সহজ কোনো পদ্ধতি তারা খুঁজে পান না। তারা এই সহজ ব্যবস্থাটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, বুঝিয়ে-গুনিয়ে কোনোভাবে তাদেরকে এই কাজে বের করা যায় কি না। এটি একটি সহজ সমাধান এবং একটি পরীক্ষিত ব্যবস্থা।

৩. যাদের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, বাজেট ছাড়া কোনো বড় কাজ সম্পন্ন হয় না এবং আধুনিক প্রচার-মাধ্যম ব্যবহার করা ছাড়া কোনো সম্মিলিত বৃহৎ কাজ

সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, তারা এই ইজতিমা থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। কাজের মূল শর্ত হল ইখলাস, ইত্তেবায়ে সুন্নত এবং ইনাবত ইলাল্লাহ বা আল্লাহ-অভিমুখিতা। আর প্রকৃত বিষয় হল, আল্লাহ তাআলার মদদ ও নুসরত। এটি হাসিল হলে অন্য সব উপকরণ 'মিন হাইছু লা ইয়াহতাসিব' অকল্পনীয়ভাবেই ব্যবস্থা হয়ে যায়। কোনো ধরনের আবেদন-নিবেদন ছাড়াই বিভিন্ন সূত্র থেকে সহযোগিতা আসতে থাকে, সে সহযোগিতা দ্বীনী উদ্দেশ্যে হোক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। অনেক ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠান; বরং রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক সর্ব মহলের মানুষ এর ব্যবস্থাপনাগত সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। যদিও এ কথা ভুল নয় যে, যেসব ব্যক্তি বা দল এ ধরনের দ্বীনী কাজের সহযোগিতায় কোনো দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে, বিশেষত রাজনৈতিক স্বার্থে অগ্রসর হয়, তাদের দুনিয়াও বরবাদ আখেরাতও বরবাদ।

৪. ইজতিমার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার জন্য অসংখ্য মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক পরিশ্রম এবং এত বড় ইজতিমা সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হওয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে যদি ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ চিন্তা-ভাবনা করেন, তবে তারা বুঝতে পারবেন যে, মানুষের অন্তরের উপর যদি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে সেটিই হচ্ছে প্রকৃত কর্তৃত্ব। আর এর একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে ঈমান ও আমানত এবং ত্যাগ ও ন্যায়পরায়ণতা অর্জন করে ইনসান হওয়া এবং মানুষকে আল্লাহতীতির তালকীন করে তাদের মাঝে ইনসানিয়াতের রূহ ফুঁকে দেওয়া।

৫. সাধারণত মানুষ ইজতিমার বিশাল উপস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। কেননা, তারা বাহ্যদর্শনে অভ্যস্ত। কিন্তু কাজের সাথে জড়িত প্রাজ্ঞজনের দৃষ্টি থাকে অভ্যন্তরের দিকে। তারা বাহ্যিক সংখ্যাধিক্য দেখেন না, দেখেন এর বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল। তারা লক্ষ করেন যে, অংশগ্রহণকারীরা এখান থেকে কী নিয়ে ফিরছেন, কতজন সময় লাগানোর জন্য তৈরি হলেন এবং সময় লাগানোর পর তাদের মধ্যে কী পরিবর্তন এল। তাদের আকীদা-বিশ্বাস, কাজকর্ম এবং রুচি ও স্বভাব কতটুকু বিশুদ্ধ হল। দ্বীনের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার পর দ্বীনী বুঝ অর্জন করার জন্য তারা আলেমদের শরণাপন্ন হচ্ছেন কি না? সময় লাগানো অবস্থায় উসুলের পুরোপুরি পাবন্দী না করার কারণে তাদের মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে তার সংশোধনের কী পস্থা হতে পারে।

৬. প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের এসব অনুভূতির মানদণ্ডে যারা নিজেদেরকে বিচার করেন এবং কাজের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করতে থাকেন, তারাই এ কাজের সুফল পেয়ে থাকেন। এজন্য এই কাজের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর

মালফুযাত ও মাকতুবাতে (বাণী ও পত্রাবলিতে) উল্লেখিত নির্দেশনা ও নীতিমালা বেশি বেশি চর্চা করা প্রয়োজন এবং তাঁর সময়ের মতো সফরে ইলম ও যিকিরের প্রতি খুব বেশি পরিমাণে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। ওয়াপেসির পর কাজের সাথে সম্পর্ক রাখার পাশাপাশি উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে কেরামের সাহচর্য গ্রহণ করার প্রতিও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। হযরত (রহ.) এ বিষয়গুলোর প্রতি খুব তাগিদ করতেন।

অনেক মানুষ শুধু ইজতিমার মুনাজাতে অংশগ্রহণ করে থাকে। অবশ্য কোনো দ্বীনী মজমায় এ ধরনের উপস্থিতিরও সওয়াব ও উপকারিতা আছে, কিন্তু আসল কাজ হল পুরো তিন দিন বা সম্ভাব্য বেশি থেকে বেশি সময় সেখানে নেককার ব্যক্তিদের সংস্পর্শে কাটানো এবং উলামায়ে কেরামের বয়ান শুনে কাজের হাকীকত বোঝার চেষ্টা করা এবং নিজের মধ্যে দ্বীনের তলব ও সংশোধনের পিপাসা সৃষ্টি করা।

যাদের ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে, তারা ইজতিমায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করেন, যদি বাস্তবতা তাই হয় তবে তাদের খেদমতে আরজ থাকবে, তারা যেন নিয়ত শুদ্ধ করে তওবার নিয়তে সেখানে শরীক হন। হতে পারে, এই ওসিলায় আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে হেদায়াত ঢেলে দেবেন। ফলে তাদের জীবন লক্ষ্যে পৌঁছবে এবং আসল গন্তব্যপথে বাঁধা দূর হবে।

আল্লাহ তাআলা বস্তুবাদী মানসিকতার বিনাশ করুন! এই মানসিকতা ইসলামী ইবাদত-বন্দেগী এবং ইসলামের নিদর্শন ও পরিভাষা সকল বিষয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে দাখিল করেছে। ফলে এখন অনেকের হজ্ব-উমরাও রাজনৈতিক হয়ে গিয়েছে এবং বিভিন্ন দ্বীনী ইজতিমায় অংশগ্রহণও রাজনৈতিক লক্ষ্যে ধাবিত হয়েছে। এমনকি তারা এক নতুন প্রকার ‘শহীদ’ রাজনৈতিক শহীদও উদ্ভাবন করেছেন। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে ইখলাস, ঈমান, আমানত ও তাকওয়া নসীব করুন এবং দ্বীনের নিদর্শনাদি; বরং যে কোনো দ্বীনী আমলকে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের মাধ্যম বানানোর মানসিকতা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।#

[জানুয়ারি '১০ঈ.]

সাত কারী চৌদ্দ রাবী : একটি আলোচনা

অনেক তালেবে ইলম, এমনকি সাধারণ শিক্ষিত অনেক মানুষের কাছেও 'সাত কারী চৌদ্দ রাবী' কথাটা পরিচিত। কিন্তু সাত কারী বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে আর চৌদ্দ রাবীর পরিচয়ই বা কী তা সাধারণ মানুষের জানা থাকে না। এ জন্য তাঁদের নাম-পরিচয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তাঁদের সনদ সম্পর্কে আগ্রহী মানুষ প্রশ্ন করে থাকেন। আমিও কয়েকবার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। বর্তমান নিবন্ধও একটি প্রশ্নের উত্তরে লেখা হয়েছিল। মূল আলোচনার আগে ভূমিকাস্বরূপ দুটি প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করছি :

* আজকালের পরিভাষায় 'কারী' বলা হয় যারা উত্তম সুরে তাজবীদের সাথে কুরআন পাঠ করতে পারেন। মকতবে বাচ্চাদের কুরআন শিক্ষাদানকারীকেও কারী বলা হয়। কিন্তু উপরোক্ত শিরোনামে কারী শব্দ এ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং ইসলামের প্রথম যুগে শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হত সে অর্থই এখানে উদ্দেশ্য। সে যুগে 'কারী' বা 'মুকরী' শুধু এমন সৌভাগ্যবান বুয়ুর্গ ব্যক্তিদের উপাধী ছিল, যারা ছিলেন ইলমে কেরাআত বা ইলমে তাজবীদের ইমাম। আর এ বিষয়ে অন্যরা তাঁদের শরণাপন্ন হত।

এ ধরনের ব্যক্তিত্ব তুলনামূলক কম কলেও প্রতি শতাব্দীতে কয়েক শ মনীষী এ পর্যায়ে উপনীত ছিলেন। আর তাঁদের নিকট থেকে ইলমে কেরাআত গ্রহণ করেছেন এবং কেরাআত বর্ণনা করেছেন তাঁদের হাজার হাজার বিশেষজ্ঞ শাগরেদ।

* তৃতীয় শতাব্দীতে আল্লামা ইবনে মুজাহিদ (রহ. ২৪৫-৩২৪হি.) ইলমে কেরাআত বিষয়ে একটি কিতাব রচনা করেছিলেন। তাতে তিনি প্রথম শতাব্দীর কেরাআত ও তাজবীদে পারদর্শী ইমামদের এই সুবিশাল জামাতের মধ্য থেকে সংক্ষিপ্ততার জন্য সাতজন ইমামকে নির্বাচন করেন আর তাঁদের অসংখ্য রাবীদের মধ্য থেকে শুধু দু'জন করে রাবী নির্বাচন করেন। এঁদের সূত্রেই ইবনে মুজাহিদ (রহ.) ইলমে কেরাআত ও তাজবীদ পেশ করেছেন।

একসময় এই কিতাব ব্যাপক পঠিত ছিল। ফলে ‘সাত কারী চৌদ্দ রাবী’ কথাটা প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং একটি পরিভাষা হয়ে যায়। এখান থেকে কারো কারো এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, কুরআন শরীফের সর্বমোট কারী হলেন সাতজন আর তাঁদের রাবী চৌদ্দজন। অথচ উপরের প্রেক্ষাপট থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, বাস্তব বিষয় এমন নয়। ইবনে মুজাহিদ (রহ.) শুধু সংক্ষিপ্ততার খাতিরে এটা করেছেন। বাস্তবে ইলমে কেরাআত ও তাজবীদের ইমাম এবং তাঁদের শাগরেদ ও রাবীদের সংখ্যা অগণিত। -আততিব্ব্যান লি-মাবাহিছিল মুতাআল্লিকাতি বিল-কুরআন, তাহের জাযায়িরী ১১২-১১৪ (১১৬-১১৮ ص طاهر الجزائري)

এই দু’টি কথা পেশ করার পর এবার ইলমে কেরাআতের ওই সাত ইমাম এবং তাঁদের চৌদ্দ রাবীর নাম নিচে উল্লেখ করছি। সাথে প্রত্যেক ইমামের অনেক সনদের মধ্য থেকে নমুনা হিসাবে একটি করে সনদ উল্লেখ করা হল।

১. আসেম (ইবনে আবিনাজুদ) আলকুফী (মৃত ১২৭হি.)

তাঁর রাবীদ্বয় : হাফস আলকুফী ও আবু বকর ইবনে আয়য়াশ আলকুফী।

সনদ : আসেম কুরআন শরীফ পাঠ করেছেন যথাক্রমে আবু আবদুর রহমান আসসুলামী, যির ইবনে হুবাইশ ও আবু আমর আশশায়বানী থেকে। উল্লেখিত তিনজন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এবং তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে।

আবু আবদুর রহমান আসসুলামী এবং যির ইবনে হুবাইশ দু’জনই হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) থেকেও পাঠ গ্রহণ করেন।

আবু আবদুর রহমান সুলামী হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রা.) ও যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)এর নিকটও কুরআন পড়েছেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) আলী (রা.) উসমান (রা.) উবাই ইবনে কা’ব (রা.) এবং যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) সকলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কুরআন পড়েছেন। -আন্বাশরু ফিল কিরাআতিল আশর ১/১৫৫

২. নাফে আলমাদানী (মৃত ১৬৯হি.)

রাবীদ্বয় : ক্বালুন ও ওয়ারশ্ আলমিসরী।

নাফে কুরআন পাঠ করেছেন আবদুর রহমান আলআ’রাজ (রহ.)এর নিকট।

তিনি পড়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.)এর নিকট। তাঁরা উভয়ে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)এর নিকট। আর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। -আন্বাশর ১/১১২

৩. আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর আলমাক্বী (মৃত ১২০হি.)

রাবীদ্বয় : (তাঁর শাগরেদদের মাধ্যমে) আহমদ আলবায়যী ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান কুনবুল।

আব্দুল্লাহ ইবনে কাসীর কুরআন পড়েছেন আবু সায়েব আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েবের নিকট। তিনি উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)এর নিকট। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। -আন্বাশর ১/১২০

৪. আবু আমর ইবনুল আলা আলবাসরী (মৃত ১৫৪হি.)

রাবীগণ : (তাঁর শাগরেদ ইয়াহুইয়া ইবনুল মুবারক-এর মাধ্যমে) আবু আমর হাফস ইবনে উমর আদুরী ও আবু শুআইব সালেহ ইবনে যিয়াদ সুসী।

আবু আমর কুরআন পড়েছেন যথাক্রমে নসর ইবনে আসেম এবং ইয়াহুইয়া ইবনে ইয়ামার (রহ.)এর নিকট। তাঁরা উভয়ে আবুল আসওয়াদ (রহ.)এই নিকট। তিনি হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)এর নিকট। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। -আন্বাশর ১/১৩৩

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমের আলইয়াহসুবী (মৃত ১১৮হি.)

রাবীদ্বয় : (তাঁর শাগরেদদের মাধ্যমে) হিশাম ইবনে আম্মার ও ইবনু যাকওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমের কুরআন পাঠ করেন আবু হাশেম আলমুগীরা মাখযুমীর নিকট। তিনি হযরত উসমান (রা.)এর নিকট, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। -আন্বাশর ১/১৪৪

৬. হামযা ইবনে হাবীব আলকুফী (মৃত ১৫৬হি.)

রাবীদ্বয় : (তাঁর শাগরেদ সালিম-এর মাধ্যমে) খালাফ ইবনে হিশাম আলবায়যার ও খাল্লাদ ইবনে খালেদ আলকুফী।

হামযা কুরআন পড়েন আবু ইসহাক সাবীযী-এর নিকট। তিনি আসেম ইবনে দামরাহ (রহ.)এর নিকট। তিনি আলী (রা.)এর নিকট। তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। -আনুশর ১/১৬৫

৭. আলী ইবনে হামযা আলকিসাঈ (মৃত ১৮৭হি.)

রাবীদ্বয় : আবুল হারেছ লাইস ইবনে খালেদ ও আবু আমর হাফস ইবনে উমর আদুরী।

কিসাঈ কুরআন পড়েছেন পূর্বোল্লিখিত হামযা (রহ.)এর নিকট। তাঁর সনদ আগে বর্ণিত হয়েছে। কিসাঈ ঈসা ইবনে উমর হামাযানির নিকটও কুরআন পড়েছেন, তিনি আ'মশের নিকট, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে ওয়াছ্ছাবের নিকট, তিনি উবাইদ ইবনে নুযাইলার নিকট, তিনি আলকামার নিকট, তিনি ইবনে মাসউদের নিকট এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। -আনুশর ১/১৭২, তাবকাতে ইবনে সাদ ৬/১৭১-১৭২#

[ফেব্রুয়ারি '০৮ঈ.]

আহ! আশরাফী ফুল বাগানের সর্বশেষ ফুলটি ...!

গত ৭ ও ৮ রবীউস সানী ১৪২৬হি. মোতাবেক ১৭ ও ১৮ মে ২০০৫ঈ. মঙ্গল ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাতটিতে অবশেষে সেই মুহূর্ত এসেই গেল যখন হযরত হারদুঈ মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা শাহ আবরারুল হক আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তাঁর হাকীকী মালিকের সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار

কয়েক বছর আগে ১৬ জুমাদাল উলা ১৪২৩ হিজরীতে হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর মাওলানা ইউসুফ লুথিয়ানভী (রহ.) মাসিক 'বাইয়িনাত'এ লিখেছিলেন-

“হযরত আকদাস মাওলানা ফকীর মুহাম্মদ (রহ.) পাকিস্তানে ছিলেন হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)এর সর্বশেষ খলীফা। হিন্দুস্তানে শুধু দুইজন ছিলেন- হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান এবং হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক মুদাজ্জিদুল আলী। হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান (রহ.)এর ইন্তেকালের পর আশরাফী ফুল বাগানের একটি ফুলই বাকি রয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সম্মান ও সুস্থতার সাথে জীবিত রাখুন। আমিন!”

সেই সর্বশেষ ফুলটিও আজ স্রষ্টার সান্নিধ্যে চলে গেছেন। হাকীমুল উম্মত (রহ.)কে যারা দেখেছেন তাদের মধ্যে দু'চারজন বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান রয়েছেন, কিন্তু তাঁর ইজায়তপ্রাপ্তদের মধ্যে কেউ রইলেন না। এজন্য হযরত হারদুঈ-এর ইন্তেকাল একজন ব্যক্তির তিরোধান নয়; একটি বর্ণিল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যুগের পরিসমাপ্তি।

فإنا لله وإنا إليه راجعون

১৩৩৯ হিজরী মোতাবেক ২০ ডিসেম্বর ১৯২০ঈ. সালে হিন্দুস্তানের উত্তর

প্রদেশের হারদুই জেলার একটি নেহায়েত শরীফ পরিবারে হযরত হারদুই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জনাব মাহমুদুল হক সাহেব হাকীমুল উম্মত (রহ.) এর মুজাযে সোহবত ছিলেন।

হারদুইতে তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত ইসলামিয়া মাদরাসায় হিফযে কুরআন এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর ১৩৪৯ হিজরীতে মাজাহেরুল উলূম সাহারানপুর মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৩৫৬ হিজরীতে সিলেবাস ভুক্ত পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। এরপর মাজাহেরুল উলূম সাহারানপুর, জামেউল উলূম মাদরাসা ও ফতেহপুর জামেয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনায় নিয়োজিত থাকেন। এই মাদরাসায় অধ্যাপনা কালে ১৩৬১ হিজরীতে হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর পক্ষ থেকে বাইআত ও তালকীনের ইজাযত লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২১ বছর কয়েক মাস। জামেউল উলূমে অবস্থানকালে তিনি সহীহ বুখারীর দরসও দিয়েছেন। (এই তথ্যগুলো আমি পেয়েছি হযরতের খলীফা, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবের কাছ থেকে। তিনি সরাসরি হযরতকে প্রশ্ন করে এসব তথ্য জেনেছেন বলে জানিয়েছেন।)

হযরত হারদুই (রহ.) এর দ্বীনী খেদমত সময়ের হিসাবে পৌনে এক শতাব্দী বা তার চেয়েও কিছু বেশি সময় নিয়ে এবং স্থানের বিবেচনায় বিশেষভাবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং অন্যান্য মুসলিম ও অমুসলিম দেশে পরিব্যাপ্ত। তিনি একদিকে যেমন মুখলিছ, মুত্তাবিয়ে সুন্নত ও অনন্যসাধারণ মুসলিহ ছিলেন, তেমনি ছিলেন একজন অক্লান্ত ও নিরলস সফল দাঈ। তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বে নিম্নোক্ত গুণাবলি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত ছিল :

১. উম্মতের প্রতি দরদ ও মাখলূকের প্রতি স্নেহ-মমতা

এটি প্রত্যেক যুগের দাঈগণের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যার মধ্যে এটি যত বেশি হবে, তিনি ততবড় দাঈ হবেন। হযরত হারদুই (রহ.) এর মাঝে এই বৈশিষ্ট্য খুবই উজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান ছিল। এটিই তাঁকে উম্মতের অবনতিশীল অবস্থার ব্যাপারে পেরেশান করে রেখেছিল এবং উম্মতের সংশোধনে অক্লান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন মেহনতে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য করেছিল। এরই স্বাভাবিক প্রকাশ ছিল নিম্নোক্ত গুণটি—

২. উম্মতের কল্যাণের অকল্পনীয় স্পৃহা

তাঁকে যারা দেখেছেন তারা জানেন, এই গুণ তাঁর কেমন ছিল। প্রতিটা মুহূর্ত

যেন এই ফিকিরে থাকতেন যে, কীভাবে দ্বীনের কোন কথা বলা যায়, কীভাবে দ্বীনের কোন কাজ হয়ে যায়, উম্মতের কোন না কোন ব্যক্তি কীভাবে উপকৃত হয়। বিমানবন্দরে আছেন, কি রেলস্টেশনে, ইস্তেকবালের উদ্দেশ্যে মানুষ জমায়েত হয়েছে, কি বিদায় জানাবার জন্য; সুযোগ হওয়া মাত্রই বয়ান আরম্ভ হয়ে গেছে। মোটকথা, দ্বীনী বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কোন সুযোগও তাঁর হাত থেকে ছুটে যাওয়া মুশকিল ছিল।

এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসটি ছিল—

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

“তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌছে দাও, যদিও একটি আয়াত হোক না কেন।” এজন্য তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগ এবং নসীহত ও তালীমের জন্য কোন আয়োজনেরও প্রয়োজন হত না, প্রচলিত ফর্মালিটিসমূহ পূরণ করা তো অনেক দূরের কথা।

৩. দ্বীনী গাইরত ও নাহি আনিল মুনকার

উপরোক্ত দুটি গুণের সাথে যখন এই তৃতীয় গুণটি কোন দাঈর মধ্যে থাকে তখন ‘নাহি আনিল মুনকার’ ছাড়া তাঁর শান্তি থাকে না। হযরত হারদুঈ (রহ.)-এর অবস্থাও এমন ছিল। উপরোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য তাকে নাহি আনিল মুনকারের বিষয়ে আপোষহীন করে তুলেছিল। এ বিষয়ে তিনি বড় নির্ভীক لا يخافون في الله لومة لا إله إلا الله তাঁরা আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দকের নিন্দাকে ভয় করতেন না’এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তৎক্ষণাৎ ভুলকে ভুল হিসেবে চিহ্নিত করার অভিনব পদ্ধতি তাঁর ছিল এবং এটা তাঁর জন্য মানান-সইও ছিল। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁকে বড়ত্ব ও মর্যাদা, সম্মান ও প্রতাপ, ইলম ও আমল, তাকওয়া ও পরহেযগারী, বয়স ও ভক্তি ইত্যাদি সকল বিষয়ে শীর্ষস্থান দান করেছিলেন।

নাহি আনিল মুনকারের বিষয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি সেসব ভুলের ব্যাপারে সাবধান করতেন, যা তুচ্ছ ও সাধারণ মনে করে অন্যরা সাবধান করেন না অথবা মানুষের মাঝে যে ব্যাপারে অবহেলা ও উদাসীনতা বেশি হয়ে থাকে। তাঁর নীতি নিঃসন্দেহে সঠিক ছিল, কেননা ভুলমাত্রই সংশোধনযোগ্য। কিন্তু ভুল হতে দেখেও নিশ্চুপ থাকা কোন অবস্থাতেই ঠিক নয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৌনতার ফলে অনেক ভুল সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।

৪. মানুষকে কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করার ফিকির

তাঁর দিনরাতের সবচেয়ে বড় বিষয় এটাই ছিল যে, উম্মত কুরআনওয়ালা হয়ে যাক, কুরআন সহীহ-শুদ্ধভাবে পড়তে শিখুক, কুরআনের নিয়মিত তেলাওয়াতকারী হয়ে যাক এবং কুরআনের মর্ম অনুধাবন করে সে অনুযায়ী আমলকারী হয়ে যাক।

তাঁর কাছে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের এতই গুরুত্ব ছিল যে, কেউ ইসলাহে নফস বা অন্তরের পরিশুদ্ধির জন্য তাঁর শরণাপন্ন হলে তার প্রথম কাজ হত কোন নির্ভরযোগ্য ক্বারীকে তেলাওয়াত শোনানো। এরপর মশকের প্রয়োজন হলে মশ্ক এমনকি প্রয়োজনে নুরানী কায়েদা থেকে নতুন করে কুরআন তেলাওয়াত শুদ্ধ করার মেহনত শুরু করতে হত।

তাঁর প্রত্যেক ওয়াজ বা বয়ানের অপরিহার্য অংশ ছিল তেলাওয়াত শুদ্ধ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। তাঁর কোন আলোচনা এ বিষয় থেকে শূন্য থাকা সম্ভব ছিল না। তিনি বলতেন, শুধু শুনে শুনে কুরআনের তেলাওয়াত শুদ্ধ হবে না, নির্ভরযোগ্য ক্বারীর তত্ত্বাবধানে নিয়মতান্ত্রিক মশ্ক করা জরুরি। কেবল শুনে নয়, কুরআনে কারীম শিখে পড়।

মানুষকে কুরআন মাজীদের সঙ্গে যুক্ত করার একটি বড় প্রয়াস হল মজলিসে দাওয়াতুল হক্ক, যার আলোচনা ভিন্ন শিরোনামে আসছে।

৫. এহইয়ায়ে সুন্নতের জযবা

এহইয়ায়ে সুন্নত ও সুন্নত জিন্দা করার কাজে তিনি এতই মনোযোগী ছিলেন যে, তাঁর খাস উস্তাদ ফকীহুল উম্মত হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান গংগুহী (রহ.) তাঁকে ‘মুহিউস্‌সুন্নাহ’ উপাধি দান করেন, যা আজকাল সাধারণ ও বিশিষ্টজন সবার মুখে মুখে। হাদীস শরীফে এসেছে—

مَنْ أَحْيَى سُنَّةَ قَدْ أَمِيتَتْ مِنْ سُنَّتِي فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ غَيْرَ أَنْ يُنْقَضَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ.

“যে ব্যক্তি আমার কোন মৃত সুন্নতকে জীবিত করে সে তার সওয়াব পাবে এবং তার পরে কেয়ামত পর্যন্ত যারা সে সুন্নতের উপর আমল করবে তাদের সওয়াবও সে পাবে অথচ ওই সব ব্যক্তির সওয়াব কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না।”

—জামে তিরমিযী, হাদীস ২৮৭২

অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিশিষ্ট খাদেম হযরত আনাস (রা.)কে লক্ষ্য করে বলেন-

يَا بُنَيَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِلٌّ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْبَبَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحْبَبَانِي، وَمَنْ أَحْبَبَنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ.

“প্রিয় পুত্র, যদি তোমার পক্ষে সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হবে (সবসময়) এমন অবস্থায় যে, তোমার মনে কোন মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ নেই, তবে তা-ই কর। কেননা এটি আমার সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে আমার সুন্নতকে জিন্দা করে সে আমাকে মহব্বত করে। আর যে আমাকে মহব্বত করে সে আমার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৭৮

এহইয়ায়ে সুন্নতের বিষয়ে তাঁর সকল মেহনত এই দুই হাদীসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এজন্য তাঁর দৃষ্টি ওই সব সুন্নতের প্রতি বেশি ছিল, যা সাধারণত অবহেলিত। এ প্রসঙ্গে মানুষের বাহ্যিক কর্ম ও আচরণ এবং অন্তরজগতের গুণ ও বৈশিষ্ট্য দু’দিকেই তাঁর সমান দৃষ্টি ছিল। উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় হাদীসে উদাহরণস্বরূপ যে সুন্নতটির কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন তা মানুষের অন্তর্জগতের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন যে, আকায়েদ, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত, সিয়াসিয়াত ও আখলাকিয়াত, মোটকথা দ্বীন ও দুনিয়ার সকল অঙ্গনে মানুষ যেন সুন্নতে নববীকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এবং দিন-রাতের সকল কাজকর্মে নববী আদাবকে অনুসরণ করে, যা তওহীদের পরে প্রত্যেক মুমিনের প্রতি কালিমায়ে তাইয়েবা ও কালিমায়ে শাহাদাতের গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

এহইয়ায়ে সুন্নতের বিষয়ে ছোট বড় সুন্নতের মাঝে পার্থক্য করার নীতি তাঁর ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল, ‘আদব’ পর্যায়ে সুন্নতসমূহ শরীয়তের দৃষ্টিতে নফল ও মুস্তাহাব হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এগুলোর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতে হবে। তেমনি এসব বিষয় পরিত্যাগ করা গুনাহ না হওয়ার অর্থও এই নয় যে, মানুষকে তা অনুসরণে উৎসাহিত করা বা সমাজে এর চর্চা অব্যাহত রাখার প্রয়োজন নেই। নাউযুবিল্লাহ!

নফল ও মুস্তাহাব বিষয়াদি সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ‘কিতাবুল কস্ব’এ লিখেছেন যে, এগুলো পালন করা যদিও নফল বা মুস্তাহাব, কিন্তু তার ইলম হাসিল করা এবং ইলমের চর্চা বাকি রাখা ফরযে কেফায়া।

হযরত হারদুঈ (রহ.)-এর আমল এই মাসআলা অনুযায়ীই ছিল এবং একজন সমাজ-সংস্কারক দাঈর বৈশিষ্ট্য তা-ই হয়ে থাকে।

৬. ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ এবং এতে সহজতা অবলম্বন

জনসাধারণের দ্বীনী ইসলামের জন্য উমূমী দাওয়াতের বিকল্প নেই। এজন্য আশিয়া আলাইহিমুস সালামের বিশেষ নিদর্শন এবং খাতামুল আশিয়া ওয়াল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিসগণের একটি বুনয়াদী কাজ; প্রতিযুগের দাঈ ও মুসলিহগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এই দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান যুগে এই বৈশিষ্ট্য হযরত হারদুঈ-এর মাঝে অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল, যার ফলাফলও আমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান। ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর ফুযূয ও বারাকাত জারি থাকবে। হযরত এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আপন মুরশিদ হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর প্রতিষ্ঠিত ‘মজলিসে দাওয়াতুল হক্’-এর কর্মপন্থাকে অবলম্বন করেছেন এবং সম্ভবত ১৩৭০ হিজরী থেকে তিনি এই মজলিসের মুরব্বী ছিলেন।

দাওয়াতের কাজকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করার জন্য তাঁর কাছে কর্ম-পন্থার সহজীকরণের বড় গুরুত্ব ছিল, কথায়ও ছিল এবং কাজেকর্মেও ছিল। তাঁর বড় তাগিদ ছিল যে, দাওয়াতের কাজ উসূল অনুযায়ী হতে হবে। শরীয়তের সীমারেখার ভেতরে হতে হবে। এমন কোন আনুষ্ঠানিকতা অবলম্বন করা যাবে না, যা কাজের ব্যাপকতাকে বাধাগ্রস্ত করে। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, ইসলাম-সংশোধন ব্যাপক হোক এবং পূর্ণাঙ্গ হোক। তবে কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং মানুষকে সংশোধনের কাজে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে **ما لا يدرك كله لا يترك كله** ‘পুরো না হোক আধাটাই সই’ এই নীতি অনুযায়ী মেহনত হওয়া চাই। এ নীতির উপর তিনি নিজেও আমল করতেন এবং অন্যকেও আমলের তাগিদ করতেন। এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত কিতাব ‘এক মিনিটের মাদরাসা’। এটি তাঁর দাওয়াতের নীতি ও ধরনকে প্রকাশ করে।

তিনি যেভাবে সওয়াবের কাজে উৎসাহিত করতেন এবং যে আগ্রহের সাথে ছোট থেকে ছোট সুযোগও কাজে লাগানোর শিক্ষা দিতেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি বলতেন, নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গিয়েছ, জামাআতের এক মিনিট বাকি আছে, এ সময়টুকু অযথা নষ্ট করো না; যদি কুরআন মজীদ নিয়ে একটি আয়াতও পড়তে পার তবে গুনে দেখ, কতগুলো সওয়াব হল। একটি আয়াতে কতগুলো

শব্দ, একটি শব্দে কতগুলো হরফ? প্রতি হরফে দশ নেকী!

তাঁর দাওয়াতের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যা নিম্নোক্ত হাদীস দুটির শিক্ষা- (ক) “لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا” (কোন নেক কাজকেও তুচ্ছ মনে করবে না।) (খ) “إِنَّكَ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ” “ওইসব গুনাহ থেকে দূরে থাক যা সামান্য মনে করা হয়।” যার সারসংক্ষেপ হল, নেক কাজ ছোট হলেও ছাড়বে না, পক্ষান্তরে গুনাহর কাজ ছোট হলেও করবে না। বলাবাহুল্য, যদি উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের মাঝে এই ফিকির পয়দা হয় তবে সমাজ সংশোধিত হতে বেশি সময় লাগবে না।

দাওয়াতের কাজের ব্যাপারে তিনি নিয়ামুদ্দীনের পন্থার মেহনতকেও অতি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত উপকারী মনে করতেন, তবে একথাও বলতেন যে, কাজটি উপকারী বটে কিন্তু যথেষ্ট নয়। তিনি আরো বলতেন, ‘আমর বিল মারুফ-এর জন্য তো মাশাআল্লাহ জামাআত আছে, নাহি আনিল মুনকারের জন্যও তো একটি জামাআত দরকার।’ দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় শরীয়তের হুকুম-আহকাম অনুযায়ী মেহনতকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন, “তোমরা রফীক (সহযোগী ও বন্ধু) হও, ফরীক হয়ো না।” অর্থাৎ একে অপরের সহযোগী হও। তোমরা একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ো না। তোমাদের প্রত্যেকের কাজ অপরের কাজের পরিপূরক। এজন্য কর্মবন্টনের প্রাকৃতিক ও দ্বীনী প্রয়োজনকে বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার মাধ্যম বানিয়ে না। তিনি আরো বলতেন, এমন বল, তালীমেরও প্রয়োজন আছে, তাবলীগেরও প্রয়োজন আছে, তাযকিয়ারও প্রয়োজন আছে; এমন বলো না, তাবলীগেরই প্রয়োজন অথবা তালীম বা তাযকিয়ারই প্রয়োজন। ‘এটাই’ বলা পরিত্যাগ করো, ‘এটাও’ বলতে শেখ।

বলাবাহুল্য, এটি একটি বাস্তবতা। দ্বীন কায়ম করার জন্য দাওয়াত, তালীমে কুরআন, তালীমে সুন্নাহ, তাযকিয়া ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-এই পাঁচ বিষয়েরই প্রয়োজন। এগুলোর কোন একটির প্রতি অবহেলাও মুসীবতের কারণ হিসেবে দেখা দেবে। # জুন '০৫ঈ.

৭. মাদরাসা ও মসজিদ সুন্নী বানানোর তাগিদ

মাদরাসা হচ্ছে নববী ইলম অর্জনের একমাত্র মারকায এবং মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মারকায। এই দুটি কেন্দ্র মুসলমানদের আশ্রয়স্থল।

এখানে মুসলমানরা বারবার উপস্থিত হন। এ দুটি স্থানে যদি নববী আদর্শ উজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান থাকে, সুন্নতের শিক্ষা ও চর্চা থাকে, সুন্নতের 'আমলী মশক' বা প্রশিক্ষণ থাকে এবং মসজিদ-মাদরাসার দায়িত্বশীলগণ কথা ও কাজ সকল দিক দিয়ে সুন্নতের দাঁষ্ট হন তবে হেদায়াতের আলো ঘরে ঘরে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগবে না। এজন্য অন্যান্য বুয়ুর্গদের মত হযরত হারদুঈ ও মসজিদ-মাদরাসার দায়িত্বশীলদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এদিকে মনোযোগী করতেন যে, মাদরাসা ও মসজিদসমূহকে সুন্নী বানাও, তাহলে সকল মুসলমান সুন্নী হয়ে যাবে। অর্থাৎ মুসলমানদের কেন্দ্রসমূহে যদি সুন্নতের তালীম-তরবীয়ত থাকে এবং মুসলমানদের অনুসরণীয় ব্যক্তিগণ যদি সুন্নতের পাবন্দী করেন তবে সমাজে অবশ্যই এর প্রভাব পড়বে এবং সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ইত্তেবায়ে সুন্নতের জয়বা সৃষ্টি হবে এবং সে অনুযায়ী আমলও শুরু হবে। এজন্য তাঁর প্রস্তাব ছিল যে, মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে 'সুন্নত শিক্ষা' বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং মসজিদসমূহে অন্যান্য দাওয়াতী কাজের পাশাপাশি 'সুন্নত শিক্ষাদান'এর ব্যবস্থা রাখা উচিত। প্রাথমিকভাবে 'এক মিনিটের মাদরাসা' বইটির মাধ্যমেই এ কাজ শুরু করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে তিনি এত ভাবতেন যে, মসজিদ ও মাদরাসার অনিয়মকেই তিনি উম্মতের অবনতির অন্যতম বড় কারণ মনে করতেন। তিনি তাঁর 'ইনহিতাতে উম্মত আওর উসকা এলাজ' পুস্তিকায় এই দুটি বিষয় এবং এর সংশোধনের পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। মসজিদ ও মাদরাসার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এ বইটি পড়া উচিত।

মাদরাসার ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি শুধু তাহলেবে ইলমদের তালীম-তরবীয়তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি মুহতামিম ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকেও করণীয় সম্পর্কে সতর্ক করতেন। তিনি বলতেন, 'একজন তাহলেবে ইলমও যদি ঠাণ্ডায় কষ্ট পায় তবে আল্লাহ তাআলার কাছে মুহতামিমকে জবাবদিহি করতে হবে।' ইত্তেকালের এক সপ্তাহ আগে হযরত মাওলানা মুফতী আবদুর রহমান সাহেব (দা. বা.) হারদুঈ গিয়েছিলেন; তখন তাঁকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এই নির্দেশও দেন যে, 'শীতকালে আপনার ওখানে ছাত্র-মেহমান সকলের জন্য গরম পানির ব্যবস্থা রাখবেন।'

এ থেকে বোঝা যায়, দায়িত্বশীলগণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি তাহলেবে ইলমদের পানাহারে কষ্ট দেন তাহলে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

৮. জরুরি বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি

তিনি বলতেন-

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

এই আয়াতে ذَكِّرْ শব্দের অর্থ হল বারবার স্মরণ করানো। অর্থাৎ বারবার নসীহত কর, নসীহতের কথাগুলি পুনরাবৃত্তি কর, নিঃসন্দেহে নসীহত মুমিনের জন্য উপকারী হয়ে থাকে। তাঁর সাধারণ অভ্যাস এই ছিল যে, একই কথা দিনে একাধিকবার বলতেন, বিভিন্ন মজলিসে বারবার বলতেন, একই ব্যক্তির সামনে এক কথার পুনরাবৃত্তি করতে তিনি সংকোচবোধ করতেন না। তাঁর নীতি এই ছিল যে, জরুরি বিষয়গুলোতে মানুষকে যত্নবান করার জন্য বারবার স্মরণ করানো জরুরি। তেমনি যেসব নেক আমলের ব্যাপারে ব্যাপক অবহেলা দেখা যায় বা যেসব গুনাহে মানুষ ব্যাপকভাবে লিপ্ত হয়, সেসব বিষয়ে বারবার বলা ছাড়া কোন উপায় নেই। বারবার বলার ফলে হয়তো মানুষের বোধোদয় ঘটবে।

৯. শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা

হযরত অত্যন্ত গোছানো স্বভাবের এবং নিয়ম-কানুনের পাবন্দ ছিলেন। তাঁর ওখানে সব কিছুর জন্য নির্ধারিত নিয়ম ছিল। তিনি অত্যন্ত শক্তভাবে তা মেনে চলতেন এবং তাঁর সাথে সংশ্লিষ্টদেরকেও মেনে চলার তাগিদ করতেন।

হাকীমুল উম্মত (রহ.) বলেছেন, “বাল্যকাল থেকেই সময়নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় আমি অভ্যস্ত ছিলাম। এরই বরকতে আল্লাহ তাআলা আমার দ্বারা এই পরিমাণ দ্বীনী কাজ করিয়েছেন ...।” এই কথা হযরত হারদুঈ (রহ.)এর ব্যাপারেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই বৈশিষ্ট্য তিনি আশরাফী উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ করেছেন। তাঁর সাহচর্যে যারা এসেছেন তারা জানেন, তাঁর সকল কাজ, খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ম অনুযায়ী ও যথাসময়ে, সব কিছুর হিসাব-নিকাশ একদম পরিষ্কার, সকল বস্তু নিজ নিজ স্থানে, সকল কথা নির্ধারিত উদ্দেশ্যে; যেন উদ্দেশ্যহীন কথা বলতে তিনি জানেনই না; জিহ্বাকে সংযত রাখা, রসম-রেওয়াজ থেকে দূরে থাকা, লৌকিকতা পরিহার করা, নিজের কাজে মশগুল থাকা, অন্যদের কষ্ট বা বিরক্তির কারণ না হওয়া ইত্যাদি গুণাবলি যা তাঁর শায়খ হাকীমুল উম্মত (রহ.)এর মাঝে উজ্জ্বল ছিল তা তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর অবিচল ছিলেন। বহুবার তাঁর নিকট থেকে শুনেছি যে, এসব হযরতওয়ালা (থানভী রহ.)এর শিক্ষা ও

নির্দেশনার বরকত। শৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁর এতই পারদর্শিতা ছিল যে, মাওলানা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রহ.) বলেছিলেন, মাওলানার শৃঙ্খলা দেখে তো মনে হয় তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবেন। -মাজলিসে আবরার ৮

১৯৮১ খৃষ্টাব্দে যখন হযরত প্রথমবার বাংলাদেশে আসেন, তখন তাঁর সে সময়ের খাদেম ও বর্তমানে হযরতের খলীফা মাওলানা ইয়াহুইয়া ভাম (সাউথ আফ্রিকা)ও সঙ্গে ছিলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেবকে বলেছিলেন, 'আপনি হারদুই আসার আগে আপনাদের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেবের দফতর দেখে আসবেন, তাহলে সুন্দর ব্যবস্থাপনা ও সুশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে হারদুই হযরতের পারদর্শিতা আন্দাজ করতে পারবেন।' প্রফেসর হযরতের মুখ থেকে আমি কয়েকবার একথা শুনেছি।

১০. তাহকীকের শওক

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.) একবার বলেছিলেন, 'বিশ্বাস করুন, আমি তাহকীকের আশেক।' -বাওয়াদেয়ুন নাওয়াদেয় ২/২৫১

নিঃসন্দেহে এটিই ছিল আমাদের আকাবিরের স্বভাব ও রুচি এবং প্রত্যেক হকপন্থী যোগ্য আলেমের বৈশিষ্ট্য। হযরত হারদুই এই ক্ষেত্রেও তাঁর পূর্বসূরি, বিশেষত তাঁর শায়খ ও মুর্শিদ হাকীমুল উম্মত (রহ.)এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে গেছেন। তিনি বলতেন, 'আমলকে কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখ, আলেমগণের নিকট থেকে তাহকীক কর; শুধু দেখাদেখি বা শুনে শুনে আমল করো না।'

হযরতের তাহকীকপ্রিয়তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, তাঁর মাদরাসা আশরাফুল মাদারিসে এবং মজলিসে দাওয়াতুল হকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ 'মজলিসে ইলমী' নামে বিদ্যমান ছিল, যেখানে মাসায়েলের তাহকীক হত। খানকায় আগমনকারী, সাক্ষাৎকারী বা অবস্থানেচ্ছু আহলে-ইলমকেও তাতে শরীক করা হত। প্রত্যেক আহলে-ইলমের নিকট হযরতের আবেদন ছিল যে, খানকায়, মাদরাসায়, মজলিসে দাওয়াতুল হকের কাজকর্মে কোন বিষয় আপত্তিকর মনে হলে তারা যেন অবশ্যই তাকে অবহিত করেন এবং মজলিসে ইলমীতে পেশ করে তা তাহকীক করে নেন। যদি দলীলপ্রমাণের মাধ্যমে বাস্তবেই কোন বিষয় ভুল প্রমাণিত হত বা এরচেয়েও ভাল কোন প্রস্তাব বা তাহকীক সামনে আসত তবে হযরত নির্দিষ্টায় তা গ্রহণ করে নিতেন। যারা মজলিসে দাওয়াতুল হক বা আশরাফুল মাদারিসের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখেন বা বারবার আসা-যাওয়া করেছেন তাদের

কাছে বিষয়টি একদম স্পষ্ট। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং হযরতের একাধিক খলীফা ও আহলে-ইলম মুরীদগণের নিকট থেকেও বিষয়টি জানা গেছে। তাহকীকের যোগ্যতার অধিকারী সকল আহলে-ইলমের মাঝে বিশেষত হযরতের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিশেষভাবে আকাবিরের এই রুচি জীবন্ত থাকুক এই কামনা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

হযরতের দশটি গুণের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। এর মধ্যে তিনটি বিষয়, যা হযরতের জীবনে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা হল (১) কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে মানুষের ঈমানকে মজবুত করা, কুরআনের ধারক ও বাহকদের প্রতি মানুষের মনে মর্যাদাবোধ জাগ্রত করা এবং কুরআনের হকসমূহ আদায়ের প্রেরণা উজ্জীবিত করার মেহনত চালু রাখা।

(২) আযানের বাক্য ও নামাযের যিকিরসমূহের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সুন্নত তরীকায় আযান-ইকামত ও নামায আদায়ের তাগিদ এবং এজন্য আমলী মশক বা প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও ব্যবস্থা।

(৩) ‘এহুইয়ায়ে সুন্নত’ এবং ‘নাহি আনিল মুনকার’ তথা সুন্নতের প্রচার-প্রসার এবং ভুল ও আপত্তিকর বিষয়াদি চিহ্নিত করে তা সমাজ থেকে দূর করার প্রচেষ্টা। তাই উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে তাঁর যবানে একটি বিষয়ই ছিল। তা হল বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া, আযান-নামায বিশুদ্ধ করা এবং ইত্তেবায়ে সুন্নতের দাওয়াত। তিনি যেখানেই থাকতেন, ঘরে বা মাদরাসায় কিংবা অন্য কোন জায়গায়, সেখানেই দাওয়াত আরম্ভ হয়ে যেত এবং তাঁর অস্থির জয়বার প্রভাব এই হত যে, কোন শ্রোতা কয়েক মুহূর্তের জন্যও তাঁর সোহবতে বসলে সে তার জীবনের কিছু না কিছু পুঁজি নিয়েই উঠত। হযরতের এই দাওয়াত ও তালীমের বদৌলতে হাজার হাজার, বরং লাখো মানুষের জীবনে পরিবর্তন এসেছে।

দাওয়াত ও তাবলীগের বিষয়ে হযরতের কর্মপদ্ধতি বোঝার জন্য তাঁর তিনটি রিসালা সহায়ক হবে—

(১) أشرف النظام للإصلاح العام والتام (২) أشرف الإصلاح للأنفس والأتباع (৩)

أشرف الهدايات لإصلاح المنكرات مع أحكام تبليغ

‘নাহি আনিল মুনকারের’ ক্ষেত্রে হযরতের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী (রহ.) লেখেন, “আমি অতি প্রশংসার

মাধ্যমে কাউকে খাটো করা থেকে আশ্রয় চেয়ে এটুকু না বলে পারছি না যে, আল্লাহ তাআলা ‘মুনকারাত’ (মন্দ, ভুল ও আপত্তিকর) বিষয়াদির সংশোধনের যে কাজ হযরত মাওলানা আবরারুল হক ছাহেবের মাধ্যমে করিয়েছেন তা আজ দুনিয়াতে আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। উপরন্তু ‘নাহি আনিল মুনকারের’ প্রেরণার পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুন্দর উপস্থাপনা ও এমনই আকর্ষণ দান করেছেন যে, তা কোন আপত্তি, বিরক্তি বা বিমুখতার কারণ হত না; বরং মন্দ বিষয়টির মন্দত্বই অন্তরে বসে যেত। এটা তার অন্তরের অস্থিরতা এবং ইখলাস ও কবুলিয়াতের আলামত।” -মাজালিসে আবরার (ভূমিকা)

দুটি বড় অবদান

১. মজলিসে দাওয়াতুল হক

উম্মাহর মুজাদ্দিদবৃন্দের মত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ. জন্ম ১২৮০ হি. মৃত্যু ১৩৬১ হি.) এর মধ্যেও ব্যাপকভিত্তিক দাওয়াত ও দ্বীন প্রচারের বড় আগ্রহ ছিল। তিনি তাঁর জীবনে বিভিন্নভাবে এই কাজে অনেক বড় অংশ নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর একটি অবদান হল ‘হায়াতুল মুসলিমীন’ কিতাবটি। এটি ১৩৪৬ হিজরীতে রচিত। তিনি এই কিতাবে কুরআন ও হাদীস থেকে ২৫টি জীবন পরিচালনার মূলনীতি লিপিবদ্ধ করেছেন; যা অনুসরণ করা হলে দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতা নিশ্চিত। তিনি এই কিতাবটিকে তাঁর গোটা জীবনের কামাই ও উপার্জন এবং সারা জীবনের পুঁজি মনে করতেন।

জীবন-পরিচালনার এই নীতিমালার ব্যাপক প্রচার এবং মুসলমানের জীবনে তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি একটি নিয়মতান্ত্রিক কর্মপন্থা প্রণয়ন করেন। ৩১টি দফা সম্বলিত এই কর্মপন্থা ‘সিয়ানাতুল মুসলিমীন’ নামে ১৩৪৯ হিজরীতে সবার সামনে পেশ করেন। পাকিস্তানে ‘সিয়ানাতুল মুসলিমীন’ নামে একটি সংগঠন এই নীতিমালা অনুযায়ী এখনও কাজ করে যাচ্ছে। এরপর হাকীমুল উম্মত (রহ.) ১৩৫১ হিজরীতে ‘তাফহীমুল মুসলিমীন’ এবং ১৩৫৬ হিজরীতে ‘তালীমুল মুসলিমীন’ নামে জনসাধারণের মধ্যে দ্বীন প্রচারের আরো সহজ বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপন্থার দ্বিতীয় আরেকটি খসড়া পেশ করেন এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য ১৩৫৮ হিজরীতে ‘মজলিসে দাওয়াতুল হক’ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, যার নীতি ও কর্মপদ্ধতি হযরতেরই ভাষায় কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে পেশ করা হল:

১. 'তালীমুল মুসলিমীন' ও 'তাফহীমুল মুসলিমীন'এর সকল দফা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও অবিচলতার সাথে পালন করতে থাকবেন। প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতিই লক্ষ রাখবেন এবং হিম্মত ও অবিচলতার পাশাপাশি দুআ ও রোনাযারীকেই আসল ওযীফা ও উপায় মনে করবেন।

২. যথাসাধ্য কুরআনের তরজমা শোনার ব্যাপারে যত্নবান হবেন।

৩. মুসলমানদের কর্তব্য হল, সকল ক্ষেত্রে জযবাকে শরীয়তের অধীনে রাখা।

৪. প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্যকর্তব্য হল, ইসলামী আখলাককে ইউনিফর্ম হিসেবে গ্রহণ করা। পাশাপাশি বাহ্যিক বেশ-ভূষা এবং সামাজিক রীতি-নীতিতে পরিপূর্ণরূপে শরীয়তের অধীনে থাকবেন, না ইংরেজদের অনুসরণ করবেন, না হিন্দুদের, না অন্য কোন জাতির।

৫. খেদমতে খাল্ক তথা সৃষ্টির সেবার প্রতি মনোযোগী হবেন এবং পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হওয়ার জন্য শরীরচর্চার অভ্যাস রাখবেন। লাকড়ি চেরাই করা ইত্যাদি কাজও শিখবেন এবং সিপাহীদের মত সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবেন। সিপাহী জীবনের অর্থ কারো সাথে লড়াই করা নয়; বরং আরামপ্রিয়তা পরিহার করা। খেদমত গ্রহণের পরিবর্তে খেদমত করার মানসিকতা গড়ে তুলবেন। যদি কোন মানুষের বিশেষত কোন মুসলমানের সাহায্য করার প্রয়োজন হয় তবে মজলুমের সাহায্য করাকেই নিজের দায়িত্ব মনে করবেন।

৬. প্রত্যেক মুসলমান প্রতিদিন ইশার নামাযের পরে শোয়ার আগে নিজের সকল গুনাহর কথা চিন্তা করবেন এবং ওই সব নেয়ামতের কথাও স্মরণ করবেন যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আপনাকে দেওয়া হয়েছে। এরপর নিজেকে ভর্তসনা করবেন যে, যে মালিক আমাকে এত নেয়ামত দান করেছেন আমি একদিনেই তাঁর এত নাফরমানী করেছি। এরপর আন্তরিকতা ও মনোযোগের সাথে সমস্ত গুনাহর জন্য তওবা ও ইস্তেগফার করে ঘুমাবেন। প্রতিদিন নিয়মিত এই আমল করবেন।” -দাওয়াতুল দাঈ, হযরত থানভী ৫-৬

এই কর্মনীতিতে 'তালীমুল মুসলিমীন' ও 'তাফহীমুল মুসলিমীন'এর উদ্ধৃতি আছে। এই কিতাব দুটি মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করা হলে মজলিসে দাওয়াতুল হকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং এর কর্ম-পদ্ধতি বুঝে আসবে। পাশাপাশি হযরত হারদুঈ-এর পুস্তিকা 'আশরাফুন নিয়াম'ও পড়া উচিত, যাকে তিনি নিজেই 'তাফহীমুল মুসলিমীন'এর শরাহ ও ব্যাখ্যা সাব্যস্ত করেছেন।

মজলিসে দাওয়াতুল হকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

এই মুহূর্তে আমার সামনে ‘মজলিসে দাওয়াতুল হক হারদুই কা ইজমালী তাআরুফ ওয়া খিদমাত’ শিরোনামে একটি লিফলেট আছে, যা ১৪১৭ হিজরীতে মজলিসে দাওয়াতুল হক হারদুই-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে আছে যে, “মজলিসে দাওয়াতুল হকের কাজ ৪ সফর ১৩৭০ হিজরী থেকে হারদুই শহরে হযরত হারদুই-এর তত্ত্বাবধানে উপরোক্ত নীতিমালা অনুযায়ী আরম্ভ হয়।” এরপর মজলিসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিবরণ রয়েছে, যা কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে উল্লেখ করা হল :

১. বেশি থেকে বেশি দ্বীনী মকতব প্রতিষ্ঠা করা এবং পুরাতন মকতবসমূহকে মজলিসের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করা; যেখানে সহীহ-গুদ্বভাবে কুরআন মজীদ নাজেরা ও হেফয করার ব্যবস্থা থাকবে এবং দ্বীনী ও দুনিয়াবী শিক্ষারও ব্যবস্থা (প্রাইমারি পর্যায়ের) থাকবে।

২. সম্মানিত মুদাররিস ও শিক্ষকগণের কুরআন গুদ্ব করার ব্যবস্থা এবং তাঁদেরকে শিক্ষাদান পদ্ধতি শেখানো। এই সময়ের মধ্যেই জরুরি বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁদেরকে অবহিত করা।

৩. তাবলীগে দ্বীনের উদ্দেশ্যে বেশি বেশি সফরের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি কালিমা, আযান, ইকামত, নামায ইত্যাদি বিশুদ্ধ করা এবং নিজেও সাদ্কা-পাক্কা মুসলমান হওয়া এবং অন্যকেও বানানোর চেষ্টা করা।

৪. বিভিন্ন স্থানে মাঝে মধ্যে দ্বীন প্রচার এবং ইসলাহী ওয়াজ ও জলসার আয়োজন করা।

৫. মুবাল্লিগগণের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা ও শরীয়তের বিধি-বিধান প্রচার করা।

৬. ভুল বা আপত্তিকর বিষয়াদি এবং গুনাহের কাজসমূহ সংশোধন করা এবং মাঝে মাঝে দ্বীনী মাসায়েলের প্রচার ও প্রসার করা।

৭. ওয়াজ-নসীহতে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮. দ্বীনী বই-পুস্তক বিলি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯. মানুষের আবেদনের ভিত্তিতে যথাসাধ্য মসজিদ স্থাপনের ব্যবস্থা করা এবং তারাবীর নামাযে পারিশ্রমিক ছাড়া কুরআনে কারীম শোনানোর ব্যবস্থা করা।

১০. মানুষের আবেদনে বিনা পারিশ্রমিকে বিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করা।

১১. প্রয়োজনের সময় লা-ওয়ারিস মৃতের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা।
১২. মাসিক তাবলীগী ও ইসলামী ইজতেমা ও জলসার ব্যবস্থা করা।
১৩. ছাত্রদের জন্য ও তেলাওয়াত ইত্যাদি শুদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য সম্ভব হলে ভাতার ব্যবস্থা করা।
১৪. সাধারণ মুসলমানদের সাময়িক দ্বীনী প্রয়োজন পূরণ এবং দ্বীনী কাজকর্মে সাধ্যমত সাহায্য করা।
১৫. উপরোক্ত কাজসমূহ সম্পন্ন করার জন্য শরীয়তের বিধি-বিধান অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা করা।

তাবলীগী জামাআত ও মজলিসে দাওয়াতুল হক

মজলিসে দাওয়াতুল হকের কাজটি চালু হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাবলীগী কাজেরই পূর্ণতার জন্য, যা আলেমগণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এই দুটি মেহনতের পারস্পরিক বন্ধন যত মজবুত হবে উন্নত তত বেশি উপকৃত হবে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলতেন—

“মাওলানা থানভী (রহ.) অনেক বড় কাজ করেছেন। আমার অন্তর শুধু এই চায় যে, তালীম (শিক্ষাদান পদ্ধতি) তাঁর হোক আর দাওয়াতের পদ্ধতি আমারটা। কেননা এতে তাঁর তালীমও ব্যাপকতা লাভ করবে।” —মালফূযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. ৫১

তিনি আরো বলেছেন, “তাবলীগ-জামাআতের শিক্ষা-সিলেবাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ‘তাজবীদ’ তথা কুরআন শরীফ সহীহশুদ্ধভাবে পাঠ করা। এটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়; কিন্তু তাজবীদের জন্য যতটা সময় দরকার তা জামাআতে পাওয়া যায় না। তাই এই সময়গুলোতে শুধু এই চেষ্টা করতে হবে যে, মানুষ যেন তাজবীদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং এর সাথে কিছুটা সম্পর্ক হয়ে যায়; এরপর তা শেখার জন্য আলাদা সময় বের করতে পারে।” —মালফূযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস ১৩৮

তাবলীগ-জামাআতের তৃতীয় নম্বর হল ইলম ও যিকির। এ প্রসঙ্গে আলেমদের নিকট থেকে মাসায়েল শেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাই যদি কুরআন শুদ্ধ করা এবং মাসায়েল জানার জন্য তাবলীগী ভাইয়েরা মজলিসে দাওয়াতুল হকেও সময় লাগান তাহলে ইনশাআল্লাহ অধিক ও পূর্ণাঙ্গ ফায়েদা হাসিল হবে।

মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশে

মজলিসে দাওয়াতুল হক যেহেতু থানভী (রহ.)-এর একদম শেষ জীবনের কাজ; তাই এর বিস্তারিত কর্ম-পন্থা প্রণয়ন এবং বাস্তবক্ষেত্রে এর পুরোপুরি প্রয়োগ ও প্রচার তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভব হয়নি। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর খলীফাগণ বিভিন্ন স্থানে নিজনিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করতে থাকেন। কিন্তু যাঁর হাতে এ কাজের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তিনি হযরত হারদুঈ (রহ.)। বাংলাদেশে এ কাজ হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)এর তত্ত্বাবধানে তাঁর সাহেবজাদা হাফেজ উবায়দুল্লাহ ছাহেব তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আরম্ভ করেন, যাঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী দা. বা. ও প্রফেসর হামীদুর রহমান ছাহেব দা. বা. উল্লেখযোগ্য।

হাফেজ উবায়দুল্লাহ ছাহেবের শাহাদাতের পর ১৯৮০ঈ. সালের হজ্জের সফরে হযরত হাফেজ্জী হুযূর মসজিদে হারামের উম্মে হানীতে বসে হযরত হারদুঈকে দাওয়াত করেন যে, আপনি আপনার এই খলীফাকে (আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের দিকে ইঙ্গিত করে) নিয়ে বাংলাদেশে আসুন। আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে সেখানে হযরত থানভী (রহ.)এর সিলসিলার কিছু কাজ নেবেন। তিনি হাফেজ্জী হুযূরের দাওয়াত কবুল করেন এবং সর্বপ্রথম ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁরা দুজন বাংলাদেশে আসেন। হাফেজ্জী হুযূর তাঁদের নিয়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ জেলাসমূহ সফর করেন এবং মানুষকে তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত করেন এবং তাঁদের নিকট থেকে উপকৃত হওয়ার নির্দেশনা দেন। (এই দাওয়াতের সময় প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি সেই সফরে হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)এর খাদেম ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে এই ঘটনা আমরা একাধিক বার শুনেছি।)

এরপর তাঁরা বাংলাদেশে বার বার তাশরীফ এনেছেন। সর্বশেষ হযরত হারদুঈ গত ডিসেম্বর ২০০৪ ঈ. বাংলাদেশে তাশরীফ আনেন এবং প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। হযরতের তাওয়াজ্জুহ এবং তাঁর খলীফাগণের মেহনতের বরকতে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে এই কাজ ক্রমাগত উন্নতির পথে ধাবমান। আল্লাহ তাআলা একাজকে আরো বেশি মজবুত করুন এবং মুসলমানদেরকে অধিক থেকে অধিক উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আশরাফুল মাদারিস হারদুঈ

এই মাদরাসাটিও হযরতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। দেখতে ছোট একটি

মাদরাসা, মেশকাত জামাআত পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি একটি আদর্শ মাদরাসা। এখানে তালীমের পাশাপাশি তরবিয়েতেরও পুরো ব্যবস্থা আছে। শুধু নামে মাত্র নয়, বরং ‘আদাবুল মুআশারা’, তাসাওউফ ও তায়কিয়া এবং সুনান ও আদাবে নববী নেসাবের অন্তর্ভুক্ত এবং আমলী মশক বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ বিষয়গুলো দৈনন্দিন আমলের অংশে পরিণত করা হয়। উপরন্তু কুরআন পাক সহীহ শুদ্ধভাবে শেখা, আযান ও নামায শুদ্ধভাবে শেখা এসব বিষয় তো আছেই। ছোট ছোট বিষয়গুলোও শেখানো হয়।

আমেরিকা থেকে এক মেহমান বেড়াতে এসে দেখেন যে, মসজিদের সামনে রাখা জুতোগুলো পরিপাটি অবস্থায় আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, জুতোগুলো এভাবে গুছিয়ে রাখার জন্য কোন লোক নিয়োজিত আছে কি? তাকে জানানো হয় যে, না, ছাত্রদের মধ্যেও বিশেষ কারো দায়িত্বে এ কাজটি নেই। প্রত্যেকে নিজ দায়িত্বে জুতোগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখে যায়। তাই জুতোগুলো পরিপাটি থাকে।

জীবনের শেষ দিনগুলো

শেষ দিনগুলোতে হযরত হারদুঈ-এর তবীয়ত মাশাআল্লাহ অনেক ভাল ছিল। যারা সে সময় তাঁকে দেখেছেন তাদের বর্ণনা হল, কাজকর্মে উদ্দীপনা অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং শেষ সময় পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগ এবং তালীম ও তরবিয়েতের ধারাবাহিকতা বড় উদ্দীপনার সাথে জারি রেখেছিলেন। মৃত্যুর দিনেও এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ইন্তেকালের দিন মাগরিবের পর শরীর কিছুটা খারাপ হয় এবং রাত আটটার সময় দয়াময় প্রভুর ডাকে সাড়া দেন।

মৃত্যু কোন নতুন বিষয় নয়। এতো আদম-সন্তানের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। তাই পৃথিবীতে আগমন বিদায়েরই ভূমিকা। এখানে যেই আসে যাওয়ার জন্যই আসে। জগতের এই সরাইখানায় প্রত্যেক মুসাফির আখেরাতের মন্ঘিল পানে সদা ধাবমান, কিন্তু কিছু মানুষের প্রস্থানও এমনই মহিমামণ্ডিত হয় যে, গোটা জগৎ তাঁদের বিচ্ছেদে শোকের সাগরে ভাসতে থাকে। তাঁদের বিদায়ে জমিনও কাঁদে, আসমানও কাঁদে। তাঁদের মৃত্যুতে শুধু পরিবার-পরিজনই শোকাবুল হয় না, ইলম ও আমলের গোটা জগৎ তাঁদের বিয়োগ-ব্যথায় আহাজারি করে। ইলম ও আমলের মজলিসসমূহ বিরাণ ভূমিতে পরিণত হয়। ইলম ও দাওয়াতের মজলিসসমূহে মাতমের রব ওঠে। তাঁদের রুচি-প্রকৃতি, তাকওয়া ও দ্বীনদারী, পবিত্রতা তাহারাত, সৃষ্টির সেবা ও দ্বীনের নুসরতের আলোচনা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। মানুষের

ব্যাকুল দৃষ্টি তাঁদের মত আরেকজন খুঁজে পায় না। এমনই মহিমায় উজ্জ্বল ছিলেন আমাদের শাইখুল মাশায়েখ, মুহিউস্ সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী হারদুঈ মারহুম ও মাগফুর। আল্লাহ তাআলা তাঁর ফয়েজ ও বরকত কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখুন। আমীন।

পরের দিন সকালে হারদুঈতে জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়। জানাযার নামায ঈদগাহে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা পড়ান জনাব মাওলানা ক্বারী আমীর হুসাইন দা. বা.; যিনি দীর্ঘদিন হযরতের সহকর্মী ছিলেন। জানাযা শেষে হারদুঈ-এর সাধারণ কবরস্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

اللهم أكرم نزلہ ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.

হযরতের সাথে লেখকের প্রথম ও শেষ মুলাকাত

সর্বপ্রথম ১৪০৭ হিজরীতে হযরতের যিয়ারত লাভ হয়। সে বছরই আমি করাচি গিয়েছিলাম এবং জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বিনুরী টাউন-এ দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হয়েছিলাম। সেখানে হযরত তাশরীফ এনেছিলেন এবং জামে মসজিদে তাঁর দীর্ঘ বয়ান হয়েছিল। সে সময়ের একটি দৃশ্য এখনও আমার স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বল। মসজিদের খাদেম বিনা প্রয়োজনে মসজিদের লাইটগুলো জ্বালিয়ে রেখেছিল অথচ তখন ছিল দিন এবং চারপাশ খোলা থাকায় লাইটের প্রয়োজন ছিল না। হযরতের সতর্ক করার ফলে লাইটগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। দুএকটি লাইট তারপরও জ্বলছিল। সেদিকে দৃষ্টি পড়লে হযরত পুনরায় লাইট নিভিয়ে দিতে বলেন। এরপর সেগুলোও নিভিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর নিউ টাউনেই দ্বিতীয়বার তাঁর যিয়ারত লাভ হয়। তিনি তাঁর উস্তাদ হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান ছাহেব এবং তাঁর খলীফা হযরত মাওলানা হাকীম আখতার সাহেব (দা. বা.)এর সাথে নিউ টাউনে তাশরীফ এনেছিলেন। করাচীতে পড়াশোনার প্রায় সাত বছরের দীর্ঘ সময়ে অনেকবার গুলশান ইকবালে আরেফ বিল্লাহ হযরত হাকীম আখতার ছাহেবের খানকাহ এবং অন্যান্য স্থানে হযরতকে দেখেছি এবং তাঁর নসীহত শোনার সৌভাগ্য হয়েছে।

১৪১৯ হিজরীর রমযান মাসে কিছু দিনের জন্য মাদরাসা আশরাফুল মাদারিস হারদুঈতেও উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে এবং নিকট থেকে তাঁকে দেখা ও উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। সে বছর হজ্জের মৌসুমেও হারাম শরীফের

নিকট তাঁর এক আত্মীয়ের বাসায় পুনরায় তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। এছাড়া ১৪১৭ হিজরী থেকে ১৪২৫ হিজরী পর্যন্ত হযরত যতবার ঢাকা সফরে এসেছেন প্রত্যেকবার তাঁর যিয়ারত ও নসীহত শোনার সুযোগ হয়েছে। শেষ যিয়ারত হয় হযরতের গত সফরে। এক সপ্তাহের অবস্থানকালে তাঁর অনেক মজলিসেই উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। প্রত্যেক মজলিসেই তাঁর অবস্থা ও বক্তব্য থেকে সেই দরদ ও অস্থিরতারই অনুভব করেছি যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

‘তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়’এর অবস্থা ছিল। আল্লাহ তাআলা এই অবস্থাগুলোতেও তাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করেছিলেন।

ইন্তেকালের এক সপ্তাহ আগে উস্তাযুল আসাতিয়া হযরত মাওলানা মুফতী আবদুর রহমান সাহেব দা. বা. (প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী, বসুন্ধরা) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে হারদুই তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। সে সময়ে কিছু অবস্থা ও কিছু নসীহত তিনি মজলিসে দাওয়াতুল হক-এর ২৬ মে ২০০৫ঈ.এর মাসিক জলসায় উল্লেখ করেন। তার মধ্যে একটি জরুরি কথা এই ছিল যে, মাদরাসায় এমন মানুষকে শিক্ষক রাখবেন, যার কুরআন তেলাওয়াত সহীহ, যার মাঝে ইত্তেবায়ে সুন্নতের প্রেরণা আছে এবং খেদমতের স্পৃহা আছে; শুধু ডিউটি পালনের মানসিকতায় নয়, মাদরাসার দায়িত্বগুলোকে খেদমত মনে করে ইখলাস ও ইত্কানের সাথে পালনে অভ্যস্ত এবং খাস শরয়ী পর্দার ব্যাপারে যত্নবান। এ সবার কোন একটির অভাব হলেও তাকে মুদাররিস হিসেবে রাখবেন না।”

ঈসালে সওয়াবের একটি গুরুত্বপূর্ণ পছা

মাওলানা মনযূর নুমানী (রহ.) সংকলিত ‘মালফূযাতে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহ.)’এর ৬০ নং পৃষ্ঠায় আছে, “কিছু দিন আগে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)এর ইন্তেকাল হয়েছে। তাঁর সাথে বায়আতের সম্পর্ক রাখেন এমন এক ব্যক্তি সাক্ষাতের জন্য এলেন। তখন হযরত দেহলভী (ইলিয়াস রহ.) বললেন, “যাদের সম্পর্ক ও মহব্বতের পরিধি এত বিস্তৃত -যেমনটি আমাদের হযরত থানভী (রহ.) এর ছিল- তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে ব্যাপকভাবে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। আমার ইচ্ছা যে, এ সময় হযরতের সকল ভক্তকে সান্ত্বনা

জানানো হোক এবং বিশেষ করে আজকাল বিষয়টি প্রচার করা হোক যে, হযরতের সাথে সম্পর্ক বাড়ানোর সবচেয়ে উন্নত ও মজবুত পন্থা হল হযরতের সঠিক শিক্ষা ও নির্দেশনার উপর অটল-অবিচল থাকা এবং তা অধিক পরিমাণে প্রচার করার চেষ্টা করা। যত বেশি হযরতের নির্দেশনা মোতাবেক চলা হবে, ততবেশি **مَنْ دَعَا إِلَيَّ** 'যে কাউকে ভাল পথে আহ্বান করে সে তার সওয়াব পাবে এবং তার উপর আমলকারীর সওয়াবও সে লাভ করবে'-এই নীতি অনুযায়ী তাঁর সওয়াব বর্ধিত হবে, মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এরপর বলেন, 'এটা ঈসালে সওয়াবের সবচেয়ে বড় পন্থা।' হযরত হারদুঈ (রহ.) সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই পন্থা অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রবন্ধটি শেষ করার পর এতে উল্লেখিত সন তারিখ এবং এ জাতীয় কিছু তথ্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি মাদরাসা আশরাফুল মাদারিস এবং মজলিসে দাওয়াতুল হক-এ ফোন করেছি এবং মাওলানা আবদুর রউফ সাহেব, যিনি সেখানকার নায়েবে নায়েম (উপপ্রধান), তাঁর সাথে আলোচনা করেছি। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, হরদুঈ হযরতের জামেউল উলূম মাদরাসায় সহীহ বুখারী পড়ানোর কথা শুনেছি। এটা কোন্ জামেউল উলূম? উত্তরে তিনি বলেছেন, এটা পটকাপুর, কানপুরে অবস্থিত। প্রথম জীবনে হযরত থানভী (রহ.)ও এ মাদরাসায় দীর্ঘ সময় সদরে-মুদাররিস ছিলেন এবং এই মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল হযরত থানভী (রহ.)এর কারণে।

আরো উলামায়ে কেরাম ও বুয়ুর্গানে উম্মত

উলামা মাশায়েখের কাছে একটি উক্তি বেশ প্রসিদ্ধ- **موت العالم موت العالم** 'আলেমের মৃত্যু জগতেরই মৃত্যু।' এই কথার সত্যতা শুধু অভিজ্ঞতা দ্বারাই প্রমাণিত নয়, সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। বর্তমান মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি বড় মুসীবত এই যে, বড় বড় বুয়ুর্গানে দ্বীন একে একে চলে যাচ্ছেন। এই দু'তিন বছরের মধ্যেই আমাদের দেশে একটি বড় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। হযরত মাওলানা ইদরীস সাহেব সন্দ্বীপী (রহ.) ওলীয়ে কামেল হযরত বু-আলী (রহ.) মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী (রহ. জন্ম ১৯৩৯, মৃত্যু ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩) মাওলানা হাবীবুল্লাহ মেসবাহ (রহ.)-এঁরা সবাই অল্প দিনের ব্যবধানেই মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন।

গত মাসে শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)এর বিশিষ্ট শাগরিদ মাওলানা নূরুদ্দীন গহরপুরী (রহ.)এরও ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে আলকাউসার-এর গত সংখ্যায় একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কিছু দিন পরেই শায়খ আশরাফ আলী বিশ্বনাথী (রহ.)ও আলমে আখেরাতে বসিন্দা হয়ে গেছেন। তিনি বাংলাদেশের বড় প্রসিদ্ধ আলোমে দ্বীন ছিলেন। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও দ্বীনী বিষয়াদিতে তাঁর কর্ম ও অবদানের ফিরিস্তি অনেক লম্বা। তালীম-তরবিয়ত, সুলুক ও তাসাওউফের পথেও তাঁর মূল্যবান খেদমত রয়েছে। তিনি শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মাদানী (রহ.)-এর হাতে বায়আত ছিলেন এবং তাঁর খলীফা শায়খে কৌড়িয়া (রহ.)এর পক্ষ থেকে ইজাযতপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে দারুল উলূম হাটহাজারী থেকে শিক্ষা সমাপন করেন। সে সময় থেকে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন ময়দানে অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে এবং বৃদ্ধ বয়সেও যুবকদের মত কর্মচাঞ্চল্যের সাথে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার কাজ করে গেছেন।

তাঁর একটি বড় কীর্তি ও সদকায়ে জারিয়া হল, তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মর্দে মুজাহিদ ১০ রবীউস সানী ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ২০মে ২০০৫ খৃষ্টাব্দে জুমার দিন ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর মাগফেরাতের চাদরে আবৃত করুন এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ও ভক্তবৃন্দকে সবরে-জামীল অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। তাঁর জীবনী, কর্ম ও অবদানের বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমরা আশা করি, তাঁর ছাত্র ও খলীফাগণ এদিকে মনোযোগ দেবেন।

গত কয়েকদিন আগে আকস্মিকভাবে হযরত মাওলানা ইসহাক ফরিদী (রহ.) এক সড়ক দুর্ঘটনায় শাহাদতবরণ করেন। তিনি তাঁর শ্রদ্ধাভাজনদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। রচনা ও সংকলনের ময়দানে বড় উদ্যমী পুরুষ ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর অবদানের ফিরিস্তি বেশ দীর্ঘ। তাঁর একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি সময়কে কাজে লাগানোর ব্যাপারে যত্নবান থাকতেন। সর্বদা কোন না কোন দ্বীনী কাজে মগ্ন থাকতে পছন্দ করতেন। তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি এবং কীর্তি ও অবদান বিষয়ে অতি শীঘ্র তাঁর মাদরাসা শামসুল উলূম চৌধুরীপাড়া থেকে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হবে।

তাঁর যে বিষয়টি আমার কাছে ঈর্ষণীয় মনে হয়েছে তা হল, তাঁর জানাযায় ঢাকা শহরের প্রসিদ্ধ আলেমগণের প্রায় সকলেই উপস্থিত হয়েছিলেন। আমার ধারণা, এটা তাঁর মাকবুলিয়াতের একটি নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি মাগফিরাতের অবিরাম ধারা বর্ষণ করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মাকাম দান করুন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[জুন ও জুলাই '০৫ঈ.]

ফেদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসআদ মাদানী (রহ.) (১৯২৮ঈ. - ২০০৬ঈ.)

গত ৪ মহররম ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ ঈসায়ী শনিবারের কথা। আমি রাত ১১টায় মাদ্রাসাতুল মদীনা আশরাফাবাদে মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ দামাত বারাকাতুলহুমে'র সঙ্গে মুলাকাতের পর মারকাযুদ দাওয়াহ-এ ফিরছিলাম। রাস্তায় এক বন্ধুর ফোন এল- 'আজ রাত সাড়ে ন'টায় হযরত মাদানী ইন্তেকাল করেছেন।' অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলাম। পরদিন সকালে চারদিকে চুপচাপ দেখে গত রাতের সংবাদটার ব্যাপারে সন্দেহ জাগতে লাগল। তারপরও হযরতের একজন বিশিষ্ট খলীফা মুহতারাম ও মুকাররাম জনাব মাওলানা আব্দুল মতীন ছাহেব (উস্তাদে হাদীস, মালিবাগ মাদ্রাসা ঢাকা)কে সমবেদনা জানাতে ফোন করি। এতে জানলাম, গতরাতের সংবাদ ভুল ছিল। কিন্তু একই সাথে অন্য এক দুঃসংবাদ পেলাম। গতরাতে ঠিক সে সময়েই দেশের অনেক বড় ব্যক্তিত্ব শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা তাজাম্মুল আলী ছাহেব ইন্তেকাল করেছেন।

তিনি ছিলেন শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)এর শীর্ষস্থানীয় খলীফাগণের অন্যতম। তালীম ও তরবীয়েতের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে অসংখ্য আল্লাহর বান্দাকে উপকৃত করেছেন। অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় তালীম ও অধ্যাপনা, ইসলাম ও সংশোধন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে কর্মব্যস্ত থেকে ৯৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরদিন সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে বিশাল জামাআতে তাঁর জানাযা হয় এবং নিজ গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে উচ্চ মাকাম দান করুন এবং তাঁর কবরে রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন।

হযরত মাদানীর ইন্তেকালের সংবাদ ভুল ছিল জেনে কিছুটা স্বস্তিবোধ করি, কিন্তু তারপরও আশংকা হচ্ছিল যে, না জানি কখন এই সংবাদটাই সত্য হয়ে যায়। মাঝে একদিনের বিরতি। ৬ মহররম মোতাবেক ৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ইশার নামাযের আগেই বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোনে সংবাদ এল যে, আজ ঢাকার সময় সন্ধ্যা ৬টায় হযরত মাদানী ইন্তেকাল করেছেন।

إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطي وكل شيء عنده بمقدار.
اللهم أجزنا في مصيبتنا هذه واخلف لنا خيرا منها.

হযরত মাওলানা আসআদ মাদানী (রহ.)এর কর্মক্ষেত্র প্রায় গোটা পৃথিবী-জুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে তিনি কর্মব্যস্ত ছিলেন। তাঁর কর্ম ও ব্যক্তিত্বে মহান পিতা শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)এর মত বৈচিত্র্য ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গনে বিভিন্ন ধরনের বহু কাজ করিয়েছেন। ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم।

রাসূলে পাক খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হল যা উম্মুল মুমিনীন হযরত খাজীদা (রা.) নবুওতের প্রথম দিনই বলেছিলেন—

إِنَّكَ لَتَصِلَ الرَّحْمَ، وَتَصْدُقَ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

“আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, অক্ষমদের বোঝা বহন করেন, কর্মহীন নিঃস্ব ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান করেন, মেহমানদারি করেন এবং বিভিন্ন বিপদাপদে মানুষের সাহায্য করেন।” -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩

সীরাতে নববীর এই অধ্যায়টি বর্তমানে মর্মান্তিকভাবে অবহেলিত। দ্বীনের অন্যান্য শাখার তুলনায় এ ব্যাপারেই আমাদের মাঝে উদাসীনতা বেশি। কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে, কিন্তু সেটিই যে একমাত্র কারণ নয় তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

এই প্রেক্ষাপটে হযরত মাওলানা আসআদ মাদানী (রহ.)এর মত ব্যক্তিত্ব অনেক বড় নেয়ামত ছিল। তাঁর জীবনটিই যেন নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সুন্নতগুলোকে জিন্দা করার জন্য। ‘খেদমতে খাল্ক’ অর্থাৎ জাত-ধর্ম নির্বিশেষে অনাথ-অসহায়ের সেবা ও মুসলিম জনগণের প্রয়োজন পূরণ ও স্বার্থ সংরক্ষণের সম্ভাব্য সকল প্রয়াস যেন তাঁর পরিচিতি-চিহ্ন ছিল। সংশোধন ও

আত্মশুদ্ধির মেহনত তো রয়েছেই। এই অঙ্গনেও তাঁর প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা কোন প্রসিদ্ধ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় মুর্শিদ থেকে কম ছিল না।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)এর সেই ঘটনা অনেকেই জানেন। তিনি একদিন খুব চিন্তিত ছিলেন। বুয়ুর্গানে দীন যেভাবে একে একে চলে যাচ্ছেন, মানুষের ইসলাম-সংশোধনের কী অবস্থা হবে- এই চিন্তায় তিনি বিমর্ষ ছিলেন। তিনি বলেন, এরপর যখন হোসাইন আহমদ মাদানীর কথা মনে পড়ল তখন শান্তি ও স্বস্তি পেলাম যে, আল্লাহ চাহে তো তাঁর মাধ্যমে এই ধারা অনেক দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর ধারণাকে সত্যে পরিণত করেছেন। থানভী (রহ.)এর ওফাতের পরও প্রায় ১৫ বছর হযরত মাদানী -শাইখুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)- জীবিত ছিলেন। তাঁর পরে তাঁর সুযোগ্য সন্তান ও খলীফাগণের ধারা আলহামদুলিল্লাহ এখনও চলমান রয়েছে। তবে তাঁরাও একে একে পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা অবশিষ্ট বুয়ুর্গানকে পূর্ণ আফিয়াতের সাথে হায়াতে তাইয়েবা নসীব করুন। আমীন।

হযরত মাওলানা আসআদ মাদানী (রহ.)এর বিভিন্ন মজলিসে বসার তাওফীক আলহামদুলিল্লাহ আমার অনেক বার হয়েছে। পাকিস্তানেও হযরতের মজলিসে উপস্থিত হয়েছি, বাংলাদেশেও। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ সোহবত লাভ করার সুযোগ আমার হয়নি। তারপরও যা কিছু দেখেছি এবং শুনেছি তা থেকে আমার মনে বিশেষভাবে দুটি বিষয় এসেছে। প্রথমটি হল, মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ তাআলার একটি বড় নেয়ামত। হাদীস শরীফে এই নেয়ামতের জন্য দুআও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে-

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي عَيْنِ النَّاسِ كَبِيرًا.

“ইয়া আল্লাহ, আমার চোখে আমাকে ছোট বানাও আর অন্যের চোখে বড় বানাও।” -মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৪৪৩৯

কিন্তু সঠিক অর্থে এই মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা, বিশেষত ব্যাপকভাবে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এবং ধর্মীয় গণ্ডি অতিক্রম করে ভিন্ন ধর্মীয় লোকদের মধ্যেও খুব কম মানুষই লাভ করতে পেরেছেন। আর যারা লাভ করেছেন তাদের মধ্যে এমন মানুষের সংখ্যা আরো কম যারা এই নেয়ামতকে খেদমতে খাল্কের-সৃষ্টির সেবায় কাজে লাগিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে দ্বীনের নুসরত করেছেন ও মজলুম মানবতার চোখের পানি মুছেছেন। সচেতন ব্যক্তিদের সাক্ষ্য হল, হযরত (রহ.) সেই স্বল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল, আজকাল 'উপাধি' ব্যবহারে খুবই শিথিলতা করা হয়। অনেক বড় বড় উপাধি উপযুক্ত-অনুপযুক্ত সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করে এর মর্যাদাহানী করা হয়। তারপরও কোন কোন ব্যক্তিত্বের জন্য ব্যবহৃত কিছু কিছু উপাধির ক্ষেত্রে সেই প্রসিদ্ধ উক্তি মনে পড়ে-

الأسماء تنزل من السماء

‘(কিছু) নাম আসমান থেকে নেমে আসে।’

এটি একটি সুন্দর উক্তি এবং অনেকটা বাস্তবসম্মত। হযরত (রহ.)এর জীবন আমি যতটুকু মতাল্লাআ করেছি এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা হল, উম্মতে মুসলিমার জন্য তাঁর অন্তরে যে পরিমাণ দরদ ও সমবেদনা ছিল এবং উম্মাহর উন্নতি ও কল্যাণের জয়বা কর্মক্ষেত্রেও তাঁকে যেভাবে অস্থির ও চঞ্চল করে রেখেছিল তাতে তাঁর ব্যাপারে অযুতকণ্ঠে উচ্চারিত ‘ফেদায়ে মিল্লাত’ উপাধিটি একদম বাস্তবসম্মত।

হযরতের পিতা শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) ছিলেন রিয়াযত-মুজাহাদা, ফানা ফী খিদমাতিল খাল্ক ওয়া নুসরাতিদ দীন, তাওয়াযু-ইনকাছারী ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে বিশেষ মাকামের অধিকারী। যাঁরা হযরত শাইখুল ইসলামের সান্নিধ্য পেয়েছেন এবং তাঁর জীবনও দেখেছেন তাঁদের বক্তব্য হল, পুত্রের মাঝে পিতার ছায়াপাত ঘটেছিল এবং যথাসম্ভব পিতার পথ থেকে চুল পরিমাণ সরে আসাও তাঁর অপছন্দ ছিল। আর যাঁরা শাইখুল ইসলামের সাহচর্য পাননি কিন্তু তাঁর জীবনী মনোযোগের সাথে পাঠ করেছেন তারাও অনুমান করতে পারেন যে, বাস্তবিকই হযরত তাঁর পিতার অনেক বৈশিষ্ট্যেরই জিন্দা নমুনা ছিলেন।

হযরতের ইন্তেকালের পর ঢাকার বিভিন্ন মাদ্রাসায় তাঁর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা-সভা হয়েছে। আমি শুধু মালিবাগ মাদ্রাসার মজলিসটিতে উপস্থিত হতে পেরেছি। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি সোমবার বাদ আসর তা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আজিজুল হক দামাত বারাকাতুহুম, খতীব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক দামাত বারাকাতুহুম প্রমুখ মুরুব্বী আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাসার মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস হযরত আব্বাস কাসেমী মুতাসিম বিল্লাহ দামাত বারাকাতুহুম হযরতের জীবন থেকে পিতা-মাতার খেদমতের অতুলনীয় কিছু ঘটনা আলোচনা করেন এবং তাঁর দ্বীনী সফরের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

জনাব মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুকী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম কিছুটা

বিশদভাবেই তাঁর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেছেন, হযরত (রহ.) ১৯২৮ ঈ. জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮ বছর বয়সে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দরসিয়াতের পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মদীনা মুনাওওয়ারায় অবস্থান করেন এবং তারপর থেকে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, ইউপি শাখার সভাপতি বানানো হয় এবং ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে গোটা হিন্দুস্তানের জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর সেক্রেটারি মনোনীত হন। দশ বছর পর ১৯৭৩ সালের পরে তিনি জমিয়তের কেন্দ্রীয় সভাপতির পদে বরিত হন। এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশি সময়ে তিনি জমিয়তের প্ল্যাটফর্মে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুষ্ঠু চিন্তা-ভাবনার সাথে হিন্দুস্তানের সুবিশাল কর্ম-ক্ষেত্রে এত সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজ করে গেছেন, যা খুব কম মানুষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

এছাড়া ইস্তিকালের আগ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ তিনি উম্মুল মাদারিস দারুল উলূম দেওবন্দের 'সারপরস্ত' ছিলেন। হযরতের জীবনীর উপর স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুস্তান-পাকিস্তানে অনেক লেখালেখি হচ্ছে এবং হবে। বিভিন্ন দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক ও অন্যান্য পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হবে। বাংলা ভাষায়ও তাঁর বরকতময় জীবনী নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি তৈরি হওয়া উচিত। বলাবাহুল্য, একাজের জন্য তাঁর খলীফাগণই সবচেয়ে উপযুক্ত, যারা তাঁর দীর্ঘ সান্নিধ্য পেয়েছেন। আমি তাঁদের কাছে আবেদন জানাই, তাঁরা যেন হযরত শাইখুল ইসলাম (রহ.)এর বিশিষ্ট জানেসীন, সাহেবযাদা মরহুম মাওলানা আসআদ মাদানী (রহ.) এবং বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা তাজাম্মুল আলী (রহ.)এর জীবনীর উপর মূল্যবান ও সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেন। এতে এ ধরনের বুয়ুর্গানে দ্বীনকে জানা এবং তাঁদের অনুসরণ করা আগামী প্রজন্মের জন্য সহজ হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের বর্তমান বুয়ুর্গানকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখুন এবং তাঁদেরকে দীর্ঘ ও পবিত্র হায়াত দান করুন। আর যাঁরা এই নশ্বর জগৎ থেকে চলে গেছেন তাঁদেরকে নৈকট্যের বিশেষ মকামে স্থান দান করুন এবং উত্তরসূরিদের মধ্যে পূর্বসূরিদের নমুনা পয়দা করে উম্মাহর হেদায়াতের ব্যবস্থা জারি রাখুন। আমীন।

বাংলাদেশীদের উপর তাঁর হক অনেক বেশি। এ অঞ্চলের মুসলমানদের প্রতি তাঁর ও তাঁর পিতার (হযরত শাইখুল ইসলাম রহ.) অবদান কোনভাবেই ভোলায় নয়। বিশেষত জীবনের শেষ বছরগুলোতে এ অঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সফর করে তিনি তাঁর খলীফা ও ভক্তদেরকে সজাগ করেছেন এবং

তাদের নিকট থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা খৃষ্টান মিশনারীদের ব্যাপারে সচেতন হবেন এবং মুসলিম উম্মাহর ঈমান-আমান কায়েম রাখার জন্য কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এ জন্য তিনি একটি কর্মনীতিও প্রণয়ন করে দিয়েছিলেন এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতাও করেছিলেন। আহ! আমরা যদি দৃঢ়তার সাথে এই কাজকে অগ্রসর করতে পারতাম। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

হযরত (রহ.)এর একটি আচরণ সর্বদাই আমার মনে থাকবে। গত '০৪ খৃষ্টাব্দে হযরতের দীর্ঘ সফরে সামান্য সময়ের একটি প্রোগ্রাম আমাদের অনুরোধে মারকাযুদ দাওয়াহ-এ রাখা হয়েছিল। হযরতও নির্ধারিত সময়ে তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে মারকাযে উপস্থিত হন। দারুল ইফতায় পৌঁছেই সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করেন, এখানে কী প্রোগ্রাম? উত্তর দেওয়া হল, দুআ। হযরত দুআ করেন এবং রওনা হয়ে যান। হযরতের মেজবানদের মজির খেলাফ আমিও কিছু বলা পছন্দ করিনি। পরে জানতে পেরেছি, হযরত তাঁর সফরসঙ্গীদের বলেছেন, ভাই, তোমরা আমাকে সেখানে নিয়ে গেছ কিন্তু এটুকুও জানাওনি যে, সেখানে কী কী কাজ হয় এবং কী ধরনের খেদমত আঞ্জাম দেওয়া হয়। এই কথা বিভিন্ন সূত্রে আমার কাছে পৌঁছার পর আমি হযরতকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখি এবং মারকাযুদ দাওয়াহ-এর বিভিন্ন শাখা এবং ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি। মারকাযুদ দাওয়াহ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা قسم تحقيق التراث সম্পর্কে কিছুটা বিশদ করেই সে চিঠিতে লিখেছিলাম এবং হযরতের কাছে আবেদন করেছিলাম, আল্লাহ তাআলা যদি কখনো মারকাযুদ দাওয়াহ-এর উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে হিন্দুস্তানের প্রাচীন কুতুব খানাসমূহ যেমন কুতুবখানা আসফিয়া, হায়দারাবাদ কুতুবখানা, টোঙ্ক কুতুবখানা, খোদাবখশ, পাটনা; এশিয়াটিক সোসাইটি, কোলকাতা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দুশ্রাপ্য পাণ্ডুলিপির ফটোকপি বা মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহ করার ব্যাপারে হযরতের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। ঐতিহাসিক কুতুবখানাগুলোর দায়িত্বশীলরা সাধারণত এসব দুশ্রাপ্য পাণ্ডুলিপিগুলোর ফটো দিতে চান না।

‘তাহকীকুত তুরাস’ বিভাগটির উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে পূর্ববর্তী মনীষী-আলেমগণের জ্ঞান-সম্পদ, যা তাঁরা কিতাবের পাতায় লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন সেগুলোর অনেক বড় অংশ এখনো পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়েছে। অনেক কিতাব এমন আছে যার প্রয়োজন গবেষক আলেমগণ অনুভব করেন; কিন্তু কিতাবটির নাম স্মরণ করে আফসোস করা ছাড়া তাদের আর কিছু করার থাকে না। পাঠ তো দূরের কথা, দর্শনও সম্ভব হয় না। সেই অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলোতে হিজরী তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দী বরং তারো আগের অনেক কিছু আছে। বিশেষত হানাফী

মাযহাবের বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের হাদীস, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ, উসুলুদ্দীন এবং ইলমুত তাফসীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব এখন পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়ে গেছে। মুদ্রিত অনেক কিতাবেরও যথাযোগ্য তাসহীহ ও তাহকীক এবং প্রয়োজনীয় তা'লীক ও টীকা সংযোজনের কাজ এখনো হয়নি। যুগোপযোগী মুদ্রণ তো ভিন্নই থাকল।

আল্লাহ তাআলার শোকর, মারকাযুদ দাওয়াহ-এ আকাবিরের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত দুচার জন এমন ব্যক্তি আছেন যারা শুধু আল্লাহ তাআলার ফযল ও করমে আল্লাহ চাহে তো একাজ করতে সক্ষম। কিন্তু এর জন্য প্রথমে চাই পাণ্ডুলিপি ও প্রাচীন মুদ্রিত কিতাবাদির বিশাল ভাণ্ডার। দ্বিতীয়ত আধুনিক বিভিন্ন উপায়-উপকরণও দরকার। এসব কিছুর জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু একে তো দ্বীনদার সম্পদশালী ব্যক্তিদের এসব বিষয়ে অবগতি নেই; দ্বিতীয়ত তাঁরা এসব খাতে ব্যয় করতেও প্রস্তুত হন না। আমরা দ্বীনী প্রয়োজনেও বিত্তশালীদেরকে কিছু বলা পছন্দ করি না। এর অনেক কারণ আছে, একটি কারণ হল দ্বীনী প্রয়োজনে কাউকে যদি তারই আখেরাতের জীবনের উন্নতির জন্য ব্যয়ের কোন খাত সম্পর্কে বলা হয় তাহলে এই নির্দেশনা আর ব্যক্তিস্বার্থে হাত বাড়ানোর মাঝে সাধারণত পার্থক্য করা হয় না।

কয়েক মাস আগে আমি জামেয়াতুল আযহারের এক শিক্ষার্থীর মাধ্যমে কিছু পাণ্ডুলিপির খোঁজ নিয়েছিলাম। এসব পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করার কোন ব্যবস্থা হতে পারে কি না এবং তাতে কী পরিমাণ খরচ হতে পারে তা জানতে চেয়েছিলাম। সে একটি কিতাবের ব্যাপারে আমাকে লিখেছে যে, কিতাবটির পাণ্ডুলিপি মোট দশ খণ্ডে রয়েছে। ছয় খণ্ড দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যায় আর বাকিগুলো ইস্তায্বুলের কুতুবখানায় আছে। দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যার খণ্ডগুলো যোগাড় করতে প্রায় চার শ ডলার খরচ হবে।

অপর আরেকটি কিতাবের পাণ্ডুলিপি ১৬ খণ্ডে আছে এবং ১৬ খণ্ডই দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যায় রয়েছে। এর ফটো সংগ্রহ করতে কমবেশি ছয় শ ডলার খরচ হবে। আল্লাহ তাআলার খায়ানায় কোন কিছুর কমতি নেই। আমরা নিজেরাও দুআ করি এবং আলকাউসারের পাঠক ভাইদের কাছেও দুআ কামনা করি—আল্লাহ তাআলা যেন সকল উপকরণের ব্যবস্থা গায়েব থেকে করে দেন। যোগ্য ও মুখলিস ব্যক্তিদের মাধ্যমে এই বিভাগটির সূচনা করার তাওফীক দেন এবং আমাদেরকে ইখলাসের সাথে দ্বীনের খেদমত করে যাওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

কথা অন্যদিকে চলে গেল। আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও আমার চিঠিটি আদ্যোপান্ত পড়েছিলেন এবং মারকাযুদ দাওয়াহ-এর জন্য

অনেক দুআ করেছিলেন। এরপর তিনি ছোট ভাই হযরত মাওলানা আরশাদ মাদানী দামাত বারাকাতুহ্মের মাধ্যমে দুআ সম্বলিত একটি চিঠি লিখে পত্রবাহকের হাতে সোপর্দ করেন। আলহামদুলিল্লাহ হযরতের সেই চিঠি আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। প্রিয় পাঠক, একেই বলে ذره نوازي (অণুতোষণ) আর এটিই হল চিত্তশীল শরীফ আলেমগণের পরিচয়। এটি হযরতের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে উচ্চ মকাম দান করুন এবং তাঁর অবদান দ্বারা উম্মতকে কেয়ামত পর্যন্ত উপকৃত করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।#

[মার্চ '০৬ঈ.]

হযরত খতীব সাহেব : কিছু স্মৃতি

(১৯২৮-২০০৭ঈ.)

এক. ১৪০৭ হিজরীর কথা। যখন আমি মাদরাসায়ে আরাবিয়া খেড়িহর শাহরাস্তির তালেবে ইলম, তখন ‘শিয়া সুন্নী ইখতেলাফ’ পুস্তিকাটি হাতে পেলাম। সম্ভবত এটিই ছিল খতীব সাহেব সম্পর্কে আমার প্রথম অবগতি। এর আগে তাঁর নূরুল আনওয়ারের শরাহ নজরে পড়লেও তা ঠিকমত লক্ষ্য করিনি। উল্লিখিত পুস্তিকার মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে যেমন প্রথম পরিচিতি লাভ হয়েছে তেমনি শিয়াদের বাতিল আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কেও আমার এই প্রথম প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হয়।

দুই. ১৪০৮ হিজরীতে যখন আমি করাচী জামিয়াতুল উলূম আলইসলামিয়া বিনুরী টাউনের দাওরায়ে হাদীসের তালেবে ইলম, তখন একবার তাঁর করাচী সফর হয়েছিল। দেখলাম, তিনি মাদরাসার মেহমানখানা থেকে বের হচ্ছেন। এটিই ছিল সরাসরি তাঁকে প্রথম দর্শন। বের হতেই বললেন, ‘গাড়ি কৌনসি হ্যায়’ (গাড়ি কোনটি)। এই একটি বাক্য উচ্চারণের ফলে উর্দু কথোপকথনে যে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল তা অনুমান করে নিয়েছিলাম।

তিন. ১৪১৩ হিজরীতে যখন আমি দারুল উলূম করাচীর ইফতা বিভাগের তালেবে ইলম, তখন একদিন উস্তাদে মুহতারাম মুফতী আব্দুল মান্নান সাহেব সিলেটি বললেন, আমি খতীব সাহেবকে বাসায় দাওয়াত করেছি। এই সফরে যেহেতু তিনি একবার দারুল উলূম এসে গেছেন এজন্য দ্বিতীয়বার এখানে আসবেন না। তিনি বলেছেন, দারুল উলূমের গেটে যদি কোন রাহবার থাকে তাহলে সে আমাকে বাসায় নিয়ে যেতে পারবে। তুমি কি এই খেদমতটি আঞ্জাম দিতে পারবে? আমি বললাম, এতো আমার সৌভাগ্যের কথা।

তাঁকে মুফতী সাহেবের বাসায় নিয়ে গেলাম। তখন তাঁর সঙ্গে দস্তরখানে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্যও হয়েছিল।

এই ঘটনায় এবং এই স্বল্প সময়ের সাহচর্যে আমি তাঁর আদাবুল মুআশারা তথা সামাজিক শিষ্টাচারের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করার বিষয়টি লক্ষ্য করেছি।

চার. ১৪১৬ হিজরীর রজব মাসে যখন শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু শুদাহ (রহ.)এর কাছ থেকে দেশে আসলাম, তারপর শাওয়াল মাসে (মার্চ ১৯৯৬) মারকাযুদ দাওয়াহ প্রতিষ্ঠা হল, তখন থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বহুবার সান্নিধ্য লাভ করার এবং বিভিন্ন মজলিসে তাঁর কাছ থেকে কিছু অর্জন করার ধারা অব্যাহত ছিল। এরই মাঝে আমার বড় ভাই মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ যেহেতু ইতোপূর্বে আজিমপুর ফয়জুল উলুম মাদরাসায় (খতীব সাহেব যে মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন) পাঁচ বছর খেদমত করেছিলেন, তাই তাঁর কাছ থেকেও খতীব সাহেবের বিভিন্ন বাণী ও বৈশিষ্ট্যের কথা শোনার সুযোগ হয়েছে।

পাঁচ. দারুল উলুম করাচীর ‘পঞ্চাশ সাল’ (পঞ্চাশ বছর পূর্তি) অনুষ্ঠানে খতীব সাহেব বিশেষ দাওয়াতী মেহমান ছিলেন। এর দেড় বছর পর কিছুদিনের জন্য আমার করাচীর সফর হয়েছিল, তখন জামিয়াতুর রশীদে উস্তাদদের কাছে তাঁর অনেক গুণাগুণের কথা শুনেছি। তারা তাঁর উর্দু ভাষার অনেক প্রশংসা করছিলেন এবং দস্তারবন্দী মাহফিলে তাঁর বয়ান, বয়ানের বাস্তবতা ও গভীরতার প্রশংসা করছিলেন। করাচীতে তাঁর সেই বয়ানের ক্যাসেটটিও বাজারে পাওয়া যেত।

ছয়. অনেক সময় তাঁর মাঝে এ বিষয়টি দেখেছি যে, তিনি হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। মুনকার ও মওযু হাদীস বলা থেকে বিরত থাকতেন। কোন বিষয়ে সংশয় হলে শুধু অনুমানের উপর তা চালিয়ে দিতেন না। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই মারকাযুদ দাওয়ার রচনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত ‘প্রচলিত জাল হাদীস’-এ অভিমত লিখতে তিনি সামান্যও দ্বিধাবোধ করেননি।

সাত. তাখাসসুসের তালেবে ইলমদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর দুটি বয়ান আমার শোনার সুযোগ হয়েছে। উভয় বয়ানেই তিনি বিশেষভাবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)এর ‘কিতাবুল খারাজ’ এবং ইমাম আবু উবাইদ (রহ.)এর ‘কিতাবুল আমওয়াল’ এবং মুতাকাদিমীনের এই জাতীয় কিতাবগুলো মুতালাআ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সাথে সাথে এ কথার উপর খুব তাকিদ দিয়েছেন যে, উলামায়ে কেরাম বিশেষত ফিক্হ-ফতোয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট আলেমগণ কখনোই যেন *من لم يعرف أهل زمانه فهو جاهل* “যে তার সমাজ সম্পর্কে অজ্ঞ সে মূর্খ”-এ কথার অন্তর্ভুক্ত না হয়।

আট. গতানুগতিক তাখাসসুসের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টির একটি কারণ এই ছিল

যে, এর দ্বারা মুফতী শব্দের অপব্যবহার দিন দিন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। অথচ এটি খুবই স্পষ্ট কথা যে, মুফতী একটি শরয়ী পদবী বা উপাধি, তা কোন ডিগ্রীর নাম নয়। এর সম্পর্ক হল ইলমে ফিক্‌হ ও ফতোয়ায় পাণ্ডিত্য অর্জনের সাথে এবং মানসাবে ইলমের প্রয়োজনীয় আদাবের প্রতি লক্ষ রাখার সাথে। এর সম্পর্ক কখনো তাখাসসুস বা তামরীনের নামে কোন কোর্স পূর্ণ করার সাথে নয়; চাই উপরোক্ত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হোক বা না হোক। কিন্তু এই গতানুগতিক তাখাসসুসের নীতিই এখন এরূপ হয়ে গেছে যে, কেউ তাখাসসুসে ইফতার কোর্স সম্পন্ন করামাত্রই মুফতী তার উপাধি হয়ে যায় বরং তাখাসসুসে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই তাকে এই উপাধিতে সম্বোধন করা হয়, যা নিতান্তই গর্হিত কাজ।

খতীব সাহেব যখন জানলেন যে, মারকাযুদ দাওয়ায় সব সময়ই এ বিষয়ের উপর আলোচনা হয় এবং এর খুব কঠিন প্রতিবাদ হয় তখন তিনি অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করেছেন।

নয়. প্রায় ছয় বছর আগের কথা। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আজিজুল হক দামাত বারাকাতুহুমে নতুন মাদরাসা জামিয়াতুল আজিজের ভিত্তিপ্রস্তরের মাহফিলে খতীব সাহেব উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি শামসে বাঙাল ফরিদপুরী (রহ. ১৮৯৫-২১ জানুয়ারী ১৯৬৯)-এর আলোচনা করলেন। বললেন, তিনি বড় কাটাঁরা, লালবাগ, ফরিদাবাদ কোথাও তাঁর নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও রুচি-অভিরুচি অনুযায়ী কাজ করতে পারেননি। খেদমতে দ্বীনের যুগোপযোগী যে নকশা তাঁর চিন্তায় ছিল, শিক্ষা-দীক্ষার সিলেবাস ও ব্যবস্থাপনার যে দৃষ্টিভঙ্গি তিনি লালন করতেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অসহযোগিতার ফলে তিনি তা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। পরে তিনি নিজের এলাকায় ঐতিহ্যবাহী গওহরডাঙ্গা মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করলেন। যাতে নিজের রুচি ও চিন্তা-চেতনার বাস্তবায়ন করতে পারেন। কিন্তু আফসোস যে, এরপর তিনি আর বেশী দিন বেঁচে থাকলেন না।

এ কথা শুনি খতীব সাহেব বললেন, এতদিন পর্যন্ত শায়খুল হাদীস সাহেব পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে নিজের রুচির বাস্তবায়ন করতে পারেননি। এখন সুযোগ হয়েছে। এই জামিয়াতুল আজিজের উপর ভিত্তি করে তার সবই হতে পারে।

আমি জানি না জামিয়াতুল আজিজ কর্তৃপক্ষ খতীব সাহেবের এ কথা কতটুকু গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন বা তারা এ ধরনের কোন ইচ্ছা আদৌ করেছেন কি না? কিন্তু তাঁর এই কথা তখন থেকেই আমার চিন্তা ও হৃদয়কে ছেয়ে আছে।

আসলে গতানুগতিক কাজ করা সহজ। এ কাজ করার লোকও অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু হযরত সদর সাহেব হযুরের চিন্তা-চেতনার বাস্তবায়ন এবং তাঁর

আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী হয়ে কাজ করা কঠিন। তাই এখন আমাদের প্রয়োজন এ ধরনের কাজের সংকল্প করা এবং কাজ শুরু করা।

সেই মাহফিলে খতীব সাহেব (রহ.) এ কথাও শুনিয়েছিলেন যে, হযরত মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী সাহেব যৌথ চিন্তা-ভাবনার পর চমৎকার একটি নেসাবও তৈরি করেছিলেন। পূর্ণ বিবরণ এখন আমার স্মরণ নেই। মনে হচ্ছে, খতীব সাহেব এও বলেছিলেন যে, আজমী সাহেব এই কাজ দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শূরা বা দারুল উলূমের মুহতামিম (হযরত মাওলানা কারী তাইয়েব রহ.)-এর নির্দেশে করেছিলেন। সেই প্রস্তাবিত নেসাব একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে তা কোথাও বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

এ কথা শুনে আমি খতীব সাহেবের সঙ্গে অগ্রিম অনুমতি নিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং পুস্তিকাটি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে অনেক কষ্ট করে তাঁর ছোট লাইব্রেরী তন্নতন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু ওই পুস্তিকাটির কোন কপি খুঁজে পেলেন না। বললেন, ‘মনে পড়ছে না। কেউ দেখতে নিলেন কি না, না অন্য কিছু হল।’ আমি এখনো সেই পুস্তিকাটির সন্ধানে আছি। তার একটি কপি আল্লাহ আমায় হস্তগত করে দিন।

এই সাক্ষাতে তিনি আমাকে ‘কুরআনে হাকীম আওর হামারী যিন্দেগী’ হাদিয়া দিলেন। যা মূলত রেডিও পূর্ব পাকিস্তানে প্রচারিত তাঁর আলোচনাসমূহের সংকলন।

দশ. মারকায়ুদ দাওয়ায় যখন তিনি তাশরীফ এনেছিলেন তখন ছাত্রদেরকে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)এর ‘আপ বীতী’ মুতালআ করার খুব তাকিদ করলেন। বললেন, সকলের কাছে এই কিতাবের একটি কপি থাকা উচিত। এই কিতাবটি মারকাযের ইজতেমায়ী তালীমের জন্য নির্ধারিত কিতাবগুলোর অন্তর্ভুক্ত শুনে তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন।

সেদিন তিনি ‘নুযহাতুল খাওয়াতির’-এর ৮ম খণ্ডটি পড়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন এবং দুই তিন দিনের মধ্যেই আবার তা পড়ে ফেরত দেন।

একবার আমি পাকিস্তানের মাসিক বাইয়িনাতের ‘শহীদে ইসলাম’ সংখ্যার (হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.)এর উপর বিশেষ সংখ্যা) একটি কপি তাঁকে হাদিয়া করলাম। তিনি খুব খুশী হলেন এবং পরবর্তী সাক্ষাতে তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করলেন। মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.)এর কোন একটি বিচ্ছিন্ন মতের উপর লুধিয়ানভী (রহ.)এর বিশ্লেষণধর্মী জবাবের খুব প্রশংসা করলেন।

এগার. আজিমপুর চায়না বিল্ডিং গলির ১৩৬ নং বাসায় প্রতি শনিবার (আগে হত প্রতি বৃহস্পতিবার) হযরত প্রফেসর হামিদুর রহমান সাহেবের ইসলামী মজলিস হয়। এই বাসাটি খতীব সাহেবের বাসার নিকটে। সেই মজলিসের শুরু থেকে এক দেড় বছর আগ পর্যন্তও আমি নিয়মিত সেখানে উপস্থিত হতাম। একান্ত ওজর ছাড়া বাদ পড়তো না। প্রফেসর হযরত নিজেকে আলেমদের জুতো বহনকারী বলেন এবং বাস্তবেও যে নিজেকে এমন মনে করেন, এ কথা যাদের তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তারা সবাই জানেন। তাঁর মজলিসে তাঁর দেখা আকাবির আলেমদের আলোচনা সব সময়ই হতে থাকে।

সে সূত্রে খতীব সাহেবের আলোচনাও অনেক হত এবং হয়। আমি প্রফেসর হযরতের কাছে এবং হযরত মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেবের কাছেও অনেকবার শুনেছি যে, হযরত হাফেজ্জী হযুর (রহ.) তাঁর পরিচিতজনদেরকে খতীব সাহেবের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করার খুব তাকিদ করতেন এবং বলতেন যে, তিনি একজন আকলমন্দ আলেম। আসলে ইলমের সাথে আকলের সমন্বয় অনেক বড় ব্যাপার। হাফেজ্জী হযুর (রহ.)-এর কথা অনুযায়ী খতীব সাহেবকে আল্লাহ পাক এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দান করেছেন।

এছাড়া খতীব সাহেবের হক কথা বলার যে দুঃসাহস ছিল এবং যে বিষয়টি তিনি অন্যায় মনে করতেন মুখের উপর তার প্রতিবাদের যে মহৎ গুণ আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছিলেন তা তো সকলেরই জানা।

কিন্তু এসব কিছুর পাশাপাশি এ কথাও সত্য যে, তাঁর মধ্যে নম্রতা এবং স্বভাবগত লজ্জা এ পরিমাণ ছিল যে, কেউ যদি আদবের সাথে কাকুতি-মিনতি করে কোন দরখাস্ত পেশ করত তাহলে তিনি তার সামনে নরম হয়ে যেতেন এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। আমার ধারণা, এজন্যই তিনি ইসলামী ব্যাংকসহ প্রায় এক ডজনের বেশি অর্থ প্রতিষ্ঠান-যারা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত বলে দাবী করে তারা সবাই তাঁকে নিজ নিজ শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান বানাতে সক্ষম হয়েছে। সম্ভবত তিনি ভাবতেন যে, প্রতিষ্ঠানের ইসলামী নামের লাজ রাখার জন্য হলেও অন্তত পর্যায়ক্রমে তারা প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম পূর্ণরূপে ইসলামী নিয়ম-নীতির আওতায় নিয়ে আসবে। কতই না ভালো হত, যতি তাঁর এ আশা তারা পূর্ণ করত।

বার. খতীব সাহেবের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি আকাবির উলামায়ে কেরামের আশির্বাদপুষ্ট ছিলেন। কিছুদিন তিনি মুফতী শফী (রহ.)-এর মাদরাসা দারুল উলূম করাচীর উস্তাদ ছিলেন। তখনকার অনেক ঘটনাও আমি তাঁর

নিকট গুনেছি। সম্ভবত দারুল উলূম দেওবন্দের মুহাদ্দিস শায়খুল আদব মাওলানা এযায আলী (রহ.)এর কাছে যখন মুফতী শফী (রহ.) উস্তাদ চেয়েছিলেন তখন তিনিই খতীব সাহেবকে নির্বাচন করেছিলেন। যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি চাই।

তের. কোন কারণে একবার আবুল আলা মওদুদী সাহেবের বিচ্ছিন্ন মত ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে আমার মনে খতীব সাহেবের মতামত জানার আগ্রহ হল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কখনো এ বিষয়ে কোন কথা হয়নি। কিছুদিন আগে পটিয়ার মাওলানা রফিক আহমদ সাহেবের কিতাব ‘মওদুদী সাহেব কি তাফসীর অ-নযরিয়াত পর ইলমী অ-তাহকীকী জায়েযাহ’ হস্তগত হল। সেখানে খতীব সাহেবের একটি প্রাণবন্ত অভিমতও পড়ার সুযোগ হয়েছে। যাতে বিষয়টির বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে। যেহেতু কিতাবটি ঢাকার ইলমী পরিসরে দুর্লভ, তাই এখানে তাঁর অভিমতটি আলোচনা করা সমীচীন মনে করেছি।

চৌদ্দ. খতীব সাহেব শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ. ১৩৩৬-১৪১৭হি.)কে জানতেন এবং চিনতেন। একবার হজ্বের সময় তিনি তাঁকে হযরত মাওলানা আমীমুল ইহসান (রহ. ১৩৯৪হি.)এর মজলিসে শিষ্যের মত বিনয়ের সঙ্গে বসে থাকতে দেখলেন। তখন তিনি আমীমুল ইহসান সাহেবের নিকট থেকে হাদীসের ইজাযত নিচ্ছেন। খতীব সাহেব বলেন, শায়খ এত বড় আলেম ছিলেন এবং বয়সও মনে হল আমীমুল ইহসান সাহেবের কাছাকাছি হবে, কিন্তু তাঁর বিনয় ও জ্ঞানপিপাসা এত উঁচু স্তরের ছিল যে, আমীমুল ইহসান সাহেবের সঙ্গে তিনি শিষ্যত্বের সম্পর্ক গড়লেন।

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)এর খেদমতে কিছু দিন থাকার যে সৌভাগ্য আল্লাহ পাক আমাকে দান করেছেন খতীব সাহেব তার খুব মূল্যায়ন করতেন।

আল্লাহ তাআলা খতীব সাহেবের সকল খেদমত কবুল করুন। বিশেষত জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের মিম্বর থেকে তিনি যে আমার বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের কাজ করেছেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার সুফল দান করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন।#

[আকাশছোঁয়া মিনার (জাতীয় খতীব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.) স্মরণে) পৃ. ৮৭-৯৩] (১৪ বৈশাখ ১৩৩৫বাং. ২মে ১৯২৮ঈ.-২৪ রমযান ১৪২৮হি. ৬ অক্টোবর'০৭ঈ.)

হযরত মাওলানা আমীনুল ইসলাম (রহ.)

[মার্চ ১৯৩২-নভেম্বর ১৯, ২০০৭ঈ.]

হযরত মাওলানা আমীনুল ইসলাম (রহ.)এর জানাযায় আমার শরীক হওয়ার তাওফীক হয়েছিল। সে সময়ই এ অনুভূতি জেগেছে যে, তাঁর সম্পর্কে নিজের কিছু উপলব্ধি লিখব। তাঁর খেদমতে আমার যাতায়াত যদিও খুব বেশি ছিল না, কিন্তু মহব্বতের সম্পর্ক বরাবর ছিল। একবার তিনি তাঁর বিশেষ বন্ধু মাওলানা মমতাজুল করীম ছাহেবের অনুরোধে ‘মারকায়ুদ দাওয়াহ’-এ তাশরীফ এনেছিলেন। দীর্ঘক্ষণ মজমায় বয়ান করেছিলেন এবং উস্তাদদের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেছিলেন। কোন মানুষের সব বিষয়ই অনুসরণযোগ্য হয় না। প্রত্যেকের ভালো দিকগুলোই গ্রহণ করা চাই। হাদীসেও ইরশাদ হয়েছে-

اذكروا محاسن أمواتكم

“তোমরা তোমাদের চলে যাওয়া ব্যক্তিদের ভালো বিষয়গুলোর আলোচনা কর।” আমার নাকেছ খেয়ালে মাওলানা আমীনুল ইসলাম (রহ.)এর জীবনের অনুসরণযোগ্য বিষয়গুলোর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর এশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানেন, এশকে রাসূলে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনি কীভাবে নিমজ্জিত হয়ে যেতেন। তাঁর অনুসরণীয় দ্বিতীয় বিষয়টি হল, সময়ের অপচয় থেকে বাঁচা এবং সময়কে অধিক থেকে অধিকতর ফলপ্রসূ বানানো। আল্লাহ তাআলা মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন এবং তাঁর পরিবারের সদস্য ও ভক্ত-অনুরক্তদের সবরে জামীল অবলম্বনের তাওফীক দান করুন। এ সংখ্যাটি যেহেতু বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে তাই আমি স্বতন্ত্র নিবন্ধ লিখতে পারিনি।

জানাযায় শরীক হওয়ার পর এ বিষয়ে বড়ই আফসোস হয়েছে যে, জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সীমাহীন বিলম্ব করা হয়েছে। স্মরণ রাখা দরকার যে, এ

বিলম্বকরণ মাইয়োতের প্রতি এক ধরনের জুলুম, যা থেকে জীবিত উত্তরাধিকারীদের বিরত থাকা আবশ্যিক। এ ছাড়া বড়দের জানাযা সামনে নিয়ে যে ধরনের বয়ানের রীতি আজকাল শুরু হয়েছে সেটিও চোখে পড়েছে। এটি একটি রেওয়াজমাত্র, রুসমপ্রবণতা ছাড়া এর কোন শরয়ী ভিত্তি নেই। তাই এ থেকেও বিরত থাকা জরুরি। বিশেষত এমনসব বড় ব্যক্তিত্বগণের ক্ষেত্রে, যারা তাদের জীবদ্দশায় মানুষকে দীন-ঈমান শিখিয়ে গেছেন এবং সুন্নতের পথ দেখিয়ে গেছেন তাঁদের ইন্তেকালের পর সুন্নতপরিপন্থী কোন কাজ অধিক পীড়াদায়ক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ ধরনের রুসম-রেওয়াজ থেকে হেফাযত করুন।
আমীন।#

[ডিসেম্বর '০৭ঈ. পৃ. ২৪; শিরোনামের মূল প্রবন্ধকার জহির উদ্দীন বাবর,
লেখক ভূমিকাস্বরূপ কথাগুলো বলেছেন।

আলহাজ্ব আবদুল ওয়াদুদ খান সাহেব

[১৯৩৮?-মে ১১, ২০০৮ঈ.]

জনাব আলহাজ্ব আব্দুল ওয়াদুদ খান তার সময়ের একজন প্রসিদ্ধ দানশীল ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। খেদমতে দ্বীনের জযবা এবং উলামায়ে কেরামের মহব্বত ছিল তার জীবনের অনুষঙ্গ। তার মধ্যে এমন অনেক গুণ ছিল যা কমপক্ষে প্রত্যেক যুগের বিত্তবানদের জন্য অনুসরণীয় এবং এ বিষয়টাই আলকাউসারের পাতায় তার ব্যাপারে কলাম লেখার মূল কারণ হিসাবে কাজ করেছে।

তার সদকায়ে জারিয়ার অন্যতম হল, তার গ্রামের মাদরাসাটি, যা তিনি তৎকালীন সময়ে আকাবেরে আহলে ইলমের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অর্থাৎ খেড়িহর মাদরাসা। দীর্ঘ দিন যাবৎ আমার শ্রদ্ধেয় ওয়ালিদ ছাহেব (দা. বা.) ওই মাদরাসার মুহতামিমের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। আমি ওই মাদরাসায় ইবতেদায়ী জামাত থেকে মেশকাত পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি। আমার মুহতারাম বড় ভাইও সেখানে কয়েক বছর লেখাপড়া করেছেন। মরহুম খান সাহেবের ওয়ারিশগণ ও তার শুভাকাঙ্ক্ষীগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তার জীবনী নিয়ে বিস্তৃত আকারে একটি স্মারকগ্রন্থ সংকলন করবেন। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে প্রাথমিক কিছু কথা পেশ করা হল মাত্র। ইনশাআল্লাহ আমি আমার স্মৃতিচারণ বিস্তারিতভাবে উক্ত স্মারকগ্রন্থের জন্য লিখিত প্রবন্ধে উল্লেখ করব। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় শুধু দুটি কথা আরজ করতে চাই।

এই ঘটনা আমি আমার ওয়ালিদ ছাহেব (দা. বা.)এর কাছ থেকে নিশ্চিত হয়েছি যে, একবার হাজী সাহেব স্বপ্নে দেখেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুলাফায়ে রাশেদীনসহ খেড়িহর মাদরাসায়-মাদরাসার উত্তর দিক দিয়ে তাশরীফ এনেছেন এবং দক্ষিণ দিকে পুকুরের কাছাকাছি গিয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করেছেন। যেখানে এখন মাদরাসার পশ্চিমের দালানের শেষ সীমানা। মাদরাসার

হাম্মামখানা উত্তর দিকে বানানোর সিদ্ধান্ত ছিল, কিন্তু এরপর হাজী সাহেব একদিন বললেন, এটা হতে পারে না। কেননা, এদিক দিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছিলেন। এজন্য তিনি মাদরাসার অন্যপাশের জমি দ্বিগুণ দামে খরিদ করে সেখানে হাম্মামখানা তৈরি করেন। উত্তর দিকে বর্তমানে হেফজখানা ও মেহমানখানার অবস্থান।

একবার মাদরাসার পুকুর থেকে মাছ ধরা হচ্ছিল। আমার সামনের ঘটনা। একটি মাছ তার বাড়িতে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তিনি তাতে রাজী হচ্ছিলেন না। পরবর্তীতে পাল্লাপাথর দিয়ে মেপে মূল্য নির্ধারণ করা হলে তিনি সেই মাছ গ্রহণ করতে রাজি হন।

আসলে আল্লাহ তাআলার রাস্তার জন্য খরচ এমনিই হওয়া উচিত যে, শতকরা একশ ভাগ আখেরাতের জন্যই রাখা হবে। দুনিয়াতে কোন আকারেই এর ন্যূনতম বদলা গ্রহণ করার ফিকির করা হবে না।

মারকাযুদ দাওয়ার সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক এই ছিল যে, যখন মুহাম্মাদপুরে মুহাম্মাদী হাউজিংয়ে মারকাযের ইজারাকৃত ভবনের মেয়াদ শেষ হয়ে এল তখন অন্য বাড়ি পেতে বিলম্ব হচ্ছিল। ঘটনাক্রমে ওই সময়ে তেজগাঁওয়ের পূর্বতেজতুরী পাড়ার বাজারে অবস্থিত তার ৬তলা ভবনের উপর তলা খালি পড়েছিল। তিনি আনন্দ চিত্তে মারকাযুদ দাওয়াহকে সেখানে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করার অনুরোধ জানান। ছয় মাস পর্যন্ত মারকায সেখানেই অবস্থান করে।

হাজী সাহেবের জীবনী থেকে যেমন শেখার অনেক কিছু আছে তেমনি ইবরত হাসিল করারও অনেক কিছু আছে। মনে রাখার মতো একটি কথা এই যে, উলামায়ে কেরামের মহক্বতের পাশাপাশি চিন্তা ও কর্মের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য তাদের সোহবত-সান্নিধ্যে থাকাও জরুরি।

হাজী সাহেব সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন খতীবের আযম হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহ.)এর মাধ্যমে। তিনি ছাড়াও মাওলানা নূরুল্লাহ সাহেব নোয়াখালী এবং আপন চাচা মাওলানা কালিমুল্লাহ সাহেবের উদ্ধৃতি বেশি দিতেন। ওই দুইজনই ছিলেন হযরত শাহ ছাহেব (রহ.)এর শাগরেদ। আল্লাহ তাআলা হাজী সাহেবের ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দিন। তার পরিবার-পরিজনকে 'সবরে জামীলের' তাওফীক দান করুন। তার সদকায়ে জারিয়াসমূহকে কেয়ামত পর্যন্ত চালু রাখুন।

[জুলাই '০৮ঈ., পৃ. ২৩]

কয়েকজন আকাবিরের ইন্তেকাল

আল্লাহই আমাদে রক্ষাকর্তা, আমাদের অভিভাবক

গত কয়েক মাসে আমাদের আকাবির ও বুয়ুর্গানের দ্বীনের বেশ কয়েকজন একের পর এক ইন্তেকাল করেছেন। বড়দের বিদ্যমানতা অনেক বড় রহমত এবং অনেক ফেতনা-ফাসাদের জন্য প্রতিবন্ধক। তাঁদের তিরোধান অনেক সময় বড় বড় ফেতনার পথ সুগম করে। আমাদের স্বভাব হল -এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্বভাব- বড়দের বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাঁদের মূল্য দেই না, তাঁদের দুর্বলতাগুলোর দিকে তাকিয়ে, তাঁদের গুণাবলি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকি। ফলে তাঁদের দ্বারা উপকৃত হওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু যখন তাঁরা বিদায় নিয়ে চলে যান তখন তাঁদের মূল্য অনুধাবন করে আফসোস করতে থাকি।

খতীব ছাহেব (রহ.) চলে গেলেন। এখন বায়তুল মুকাররমের মিস্বার-মিহরাব নিয়ে যা কিছু হচ্ছে তা সবার সামনে। আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হল, আমরা যেন বর্তমান আকাবিরের মূল্য দেই এবং সর্বদা তাঁদের সুস্থতা ও দীর্ঘ হায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করি। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে তাঁদের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন এবং নির্ধারিত সময়ে তাঁদের বিদায়ের পর তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরী তৈরি করে দেন।

বুয়ুর্গের বিদায়ের পর স্বভাবতই অন্তরে যে কষ্টের অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং তাঁদের শূন্যতা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চিন্তা-চেতনায় বিরাজ করতে থাকে তাকে কাজে লাগানো উচিত। যার একটি পদ্ধতি এই যে, তাঁদের জীবনের অনুসরণীয় বিষয়গুলো আলোচনা করা এবং নিজের জীবনে তা প্রতিফলিত করা। এজন্য পূর্বসূরীদের জীবনী বিষয়ে কখনো বিস্তারিত, কখনো সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশ করার ধারা প্রচলিত রয়েছে। মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.)এর 'ইয়াদে রফতেগাঁ', মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর 'পুরানে

চেরাগ', মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.)এর 'শখসিয়াত' এবং উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমে 'নুকুশে রফতেগাঁ' এই ধরনের প্রবন্ধ-নিবন্ধের চমৎকার সংকলন।

তবে স্মরণ ও শোক প্রকাশের শিল্পসম্মত ধারা আছে। তার শর্ত-শায়াতে রক্ষা করার জন্য এবং এ ধরনের আলোচনা যেন উদ্দিষ্ট সুফলে সফল হয় সে জন্য যোগ্যতারও প্রয়োজন। বলাবাহুল্য যে, এখনো আমরা সেসব বিষয় থেকে অনেক দূরেই অবস্থান করছি। তবুও যতটুকু আমাদের দ্বারা সম্ভব সে অনুযায়ী অতিসম্প্রতি বিদায়গ্রহণকারী আমাদের যে আকাবিরের বিয়োগ ব্যথা আমরা হৃদয়ে বহন করছি তাঁদের সম্পর্কে বিভিন্নজনের লেখা কিছু অনুভূতি পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরছি।

হযরত মাওলানা মুফতী আহমদুল হক ছাহেব (রহ.) সম্পর্কে আশা করি হাটহাজারী মাদরাসা থেকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ অবশ্যই তৈরি হবে। এখানে মুহতারাম মাওলানা আব্দুর রহীম ইসলামাবাদী ছাহেব অত্যন্ত সংক্ষেপে কিছু তথ্য পেশ করেছেন। হযরত (রহ.) আমার ওয়ালিদ ছাহেবেরও উস্তাদ ছিলেন এবং আমার বড় ভাইজানেরও। ঘটনাক্রমে দুজনের ভর্তি পরীক্ষাও তাঁর কাছেই হয়েছিল। সে হিসাবে তিনি আমার দাদা উস্তাদ। কয়েকবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। প্রতিবারই 'তাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়'—এর দৃষ্টান্ত সামনে এসে যেত।

হজ্বের আগে দেশের প্রাচীন দরসগাহ দারুল উলূম বড়ুরা মাদরাসার মুহতামিম বর্ষিয়ান বুয়ুর্গ হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব (রহ.)ও আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। তাঁর সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সামনের কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

আমার অনুরোধে মরহুম হযরত মাওলানা ড. এছহাক ছাহেব সম্পর্কে তাঁর ছাহেববাদা মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব কিছু বিষয় লিখে পাঠিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, তাতেও পাঠকবৃন্দের জন্য কিছু উপকারী কথা এসেছে। যদিও ডক্টর ছাহেবের জীবন এতই বৈচিত্রময় যে, তাঁর জীবনের উপর পূর্ণাঙ্গ কাজ হওয়া দরকার। মারকাযুদ দাওয়ার সাথে তাঁর গভীর অনুরাগপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মারকাযের কাজগুলোকে তিনি উৎসাহিত করতেন।

মারকাযের দারুল তাসনীফ থেকে প্রকাশিত কিতাব 'আহলে হাদীস সে যুগে এ যুগে' পড়ে তিনি খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর পরিচিতজনদেরকে তা পড়ার জন্যও বলতেন। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু শুদ্দাহ (রহ.)এর সঙ্গেও তাঁর

মুলাকাত ছিল এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী (রহ.)এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে তিনি আমাকে ভালবাসতেন এবং দুআ দিতেন।

হযরত মাওলানা নিয়ামী (রহ.) সম্পর্কে লিখেছেন তাঁর একজন নওজোয়ান শাগরিদ। তিনি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, তাই অধমও তাঁর সম্পর্কে জানতাম, তবে মুলাকাত শুধু একবার হয়েছিল, যখন হযরত মাওলানা হাকীম মায়হার ছাহেব দামাত বারাকাতুহ্মের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সফর হল এবং জামিল মাদরাসায়ও যাওয়া হল। সে সময় জেনেছি, মরহুম যরীফুল উম্মত, বাকিয়্যাতুস সালাফ হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গান্ধুহী (রহ.)এর খলীফায়ে মুজায ছিলেন।

হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন (রহ.) সম্পর্কে লিখেছেন ভাই মনসুর আহমদ শরীয়তপুরী। সরকার যদি মাওলানা নূরুদ্দীন ছাহেবকে খিতাবতের দায়িত্বে বহাল রাখত, অন্তত এই জন্য যে, তিনি পূর্ব থেকেই পেশ ইমাম এবং অন্তবতীকালীন সময়ে ভারপ্রাপ্ত খতীবের দায়িত্ব পালন করেছেন তাহলে অন্তত এই প্রকাশ্য 'খিয়ানতের' মধ্যে তাদের লিগু হতে হত না, বর্তমান খতীবকে বায়তুল মুকাররমের মতো মসজিদের মিস্বার-মিহরাব সোপার্দ করে যা তারা করেছে। সন্দেহ নেই, এটা সরকারের জন্য একটি কালো দাগ হয়ে থাকবে যদি তারা এই দায়িত্ব কোন যোগ্য ব্যক্তির হাতে অর্পণ না করেন।

মরহুমের সঙ্গে আমার এজন্যও হৃদয়তা ছিল যে, পাকিস্তান বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার প্রধান এবং জামিয়া ফারুকিয়া করাচীর মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান ছাহেব দামাত বারাকাতুহ্ম তাঁকে পছন্দ করতেন। তিনি যখনই বাংলাদেশে এসেছেন তো অপরিহার্যভাবেই মাওলানা মরহুমের মেহমান হয়েছেন। হযরত মাওলানার এবং জামিয়া ফারুকিয়ার সাথে মাওলানা মরহুমের গভীর সম্পর্ক ছিল।

এরপর তাঁর প্রতি মহব্বত আরো বৃদ্ধি পেল যখন মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দামাত বারাকাতুহ্মের কাছ থেকে শুনলাম যে, 'তিনি অত্যন্ত ভাল মানুষ। তাঁর পুত্র এখানে (মাদরাসাতুল মদীনায়) পড়ত। আমরা তাঁর মধ্যে একজন উত্তম অভিভাবককে পেয়েছি।'

তিনি আরো বলেছেন, 'তাঁর পুত্র দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করার পর তিনি তাকে পত্র দিয়ে পাঠালেন, যাতে লেখা ছিল, 'তাকে শুধু এজন্য পাঠাচ্ছি যে, আপনার জুতোগুলো সোজা করবে।'

মরহুমের এই আচরণে তালেবে ইলম ও তাদের অভিভাবকের জন্য অনেক

বড় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কিন্তু এই বিষয়গুলো গ্রহণ করার মতো মানুষও তো আজকাল দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের অবস্থার উপর রহম করুন।

দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পাঠকদের আবদ্ধ রাখার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। তাঁরা যে এতক্ষণ আমাকে সময় দিয়েছেন এজন্য তাদের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

[পৃ. ৯, এপ্রিল '০৯ঈ.]

পাঠকবৃন্দের প্রতি দুআয়ে মাগফেরাতের আবেদন

অল্পকিছু দিনের মধ্যেই উলামায়ে কেরামের আরো একটি জামাত আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের মাগফেরাত করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন। তাঁদের পরিবার-পরিজনদের সবরে জামীল-এর তাওফীক দান করুন এবং তাঁদের শূন্যতা পূরণ করে উম্মতকে হেফায়ত করুন। আমীন।

৭ রবীউল আউয়াল ১৪৩০ হি., ৫ মার্চ ২০০৯ ঈ. উজানীর হযরত মাওলানা শরাফত করীম ছাহেব জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ইন্তেকাল করেন। ওয়াজ-নসীহতের ময়দানে তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত উম্মতের খেদমত করে গেছেন। জীবনের শেষ রাতেও তিনি তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেন। তিনি হযরত মাওলানা কারী ইবরাহীম ছাহেব (রহ.) এর নাতি এবং হযরত মাওলানা কারী শামসুল হক ছাহেবের মেঝো ছেলে। তাঁর বড় ভাই হযরত মাওলানা মুবারক করীম ছাহেব (পীর ছাহেব, উজানী) এখনও জীবিত আছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুস্থতার সাথে দীর্ঘ হায়াতে তাইয়িবা দান করুন। উজানী মাদরাসায় মরহুমের জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় এবং হযরত মাওলানা কারী ইবরাহীম (রহ.) এর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

১০ রবীউস সানী ১৪৩০ হি. ৭ এপ্রিল ২০০৯ ঈ. চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা জামাল উদ্দীন ছাহেবের ইন্তেকাল হয়েছে। তিনি নাজিরহাট মাদরাসা চট্টগ্রামের উস্তাযুল হাদীস ছিলেন। তিনি একজন ভালো ওয়ায়েজ ছিলেন। তাঁর ওয়াজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি ঢালাওভাবে কিস্সা-কাহিনীর পরিবর্তে অধিক পরিমাণে হাদীসের মাধ্যমে বয়ান করতেন। এমনকি সাধারণত হাদীসের আরবী মূল পাঠও বলে দিতেন। আমি যতটুকু জানি, তিনি অমূলক ও ভিত্তিহীন হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতেন। যদি ওয়ায়েজগণ তাঁর এই পদ্ধতি অবলম্বন করতেন তাহলে কত ভালো হত!

কিছু দিন আগে ২৯ রবীউস সানী ১৪৩০হি., ২৬ এপ্রিল ২০০৯ঈ. সোমবার মাওলানা আব্দুল মাজীদ ফিরোজী সাহেবও দীর্ঘদিন অসুস্থতার পর ইন্তেকাল করেছেন। একসময় তিনি জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগ মাদরাসার উস্তাদ ছিলেন। মরহুম একজন শুদ্ধভাষী আলেম ছিলেন, তাঁর মুখের শব্দগুলো যেন মোতি হয়ে ঝরত। তিনি হযরত মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী (রহ.)এরও ছাত্র ছিলেন। হযরত মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী (রহ.)এর ‘আহাদা আশারা কাওকাবান’ নামক ছাবাত (সনদগ্রন্থ)এর ইজায়ত আমি তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করি আর আমার মাধ্যমে আরবেরও কয়েকজন আলেম এর ইজায়তপ্রাপ্ত হন।

গতকাল ৫ জুমাদাল উলা ১৪৩০হি. ১ মে ২০০৯ঈ. শুক্রবার জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগের প্রবীণ উস্তাদ হযরত মাওলানা মুজীবুর রহমান সাহেবেরও ইন্তেকাল হয়। মরহুম জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগের তিন যুগেই একজন সফল শিক্ষক ছিলেন। এই সুবাদে অনেকেই তাঁর ছাত্র হয়েছেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা দারুল উলুম বড়ুরার একজন প্রসিদ্ধ উস্তাদ ছিলেন। যিনি শিক্ষাজীবনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেও অত্যন্ত ভালোভাবেই শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেছেন। আমার শ্রদ্ধেয় পিতাও দারুল উলুম বড়ুরায় পড়াশোনার সময় তাঁর শাগরিদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুমের জানাযার নামায লালবাগ শাহী মসজিদে জুমার নামাযের পর অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠকবৃন্দের কাছে বিদায়গ্রহণকারী এ সকল আকাবির এবং অন্যান্য সকলের জন্য মাগফেরাতের দুআ আবেদন করছি।

[পৃ. ১৪, মে '০৯ঈ.]

গবেষণা : অধিকার ও নীতিমালা

‘গবেষণা’ একটি প্রয়োজনীয় বিষয় এবং তা শরীয়তে কাম্যও বটে। কিন্তু প্রশ্ন হল ‘গবেষণা’ কে করবেন এবং এর নীতিমালা কী?

অতি সাধারণ বুদ্ধিতেও এ কথাটি বোধগম্য যে, কোন বিষয়ে গবেষণার অধিকার তারই আছে, যিনি সে বিষয়ে দক্ষ ও পারদর্শী। কেননা দক্ষতা ও পারদর্শিতা ছাড়া তিনি গবেষকই কীভাবে হবেন আর গবেষণাই কীভাবে করবেন? সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য ছাড়া ‘গবেষণা’ কখনো প্রকৃত গবেষণা হয় না এবং তাতে গবেষণার উদ্দেশ্যও হাসিল হতে পারে না।

তাহকীক বা গবেষণা হয়েই থাকে এমন সব বিষয়ে, যা অস্পষ্ট বা জটিল। যাতে বিভিন্ন মতামত ও তথ্য প্রমাণের আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে সঠিক ও বাস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বলাবাহুল্য, একাজে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে গলদঘর্ম হতে হয়। প্রচুর পরিশ্রম, সম্মিলিত চিন্তা-ভাবনা এবং আলোচনা-পর্যালোচনার পরই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। অতএব এসব ক্ষেত্রে আনাড়ী লোকেরা, যারা সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ তারা কী গবেষণা করবেন!

এ ধরনের লোকদের গবেষণার অঙ্গনে অনুপ্রবেশ বিবেক ও শরীয়ত উভয় দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। তেমনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই এ বিষয়ে একমত যে, এটি একটি দায়িত্বহীন কর্ম, যা কোন বিবেকবান ও ব্যক্তিত্ববান মানুষ কখনো পছন্দ করতে পারেন না। কেননা এধরনের কাজ শুধু ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধির স্বল্পতারই পরিচায়ক নয়, বরং তা অনধিকার চর্চাও বটে। এর দ্বারা সত্য ও বাস্তবতার বিকৃতি ঘটে এবং ইলম ও জ্ঞানের পরিমণ্ডলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

এই দায়িত্বহীন কর্ম তার পক্ষেই সম্ভব, যার না আছে নিজের মান-মর্যাদার মূল্য, আর না আছে নীতি-নৈতিকতার সাধারণ অনুভূতি। সকল মানুষকে নির্বোধ মনে করার মত ভুল না করলে কোন লোক এ কাজে অগ্রসর হতে পারে না।

কেননা নিজস্ব বিষয়ের বাইরে অন্য কোন বিষয়ে গবেষণাজাত সিদ্ধান্ত প্রদান করতে যাওয়া নিঃসন্দেহে শ্রোতা ও পাঠকবৃন্দকে নির্বোধ মনে করারই নামান্তর।

শরীয়তে দ্বীনী বিষয়াদি ছাড়াও সাধারণ নিয়ম-শৃঙ্খলার বিষয়াদিতে মতামত প্রদানের জন্যও ‘আহলে ইস্তিমবাত’এর মত উঁচু মানের বুদ্ধি-বিবেচনার শর্ত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ.

“যখন তাদের কাছে আসে কোন সংবাদ শান্তির কিংবা ভয়ের, তখন তারা তা রটিয়ে দেয়। যদি তারা তা পৌঁছে দিত রাসূল এবং কর্তা ব্যক্তিদের নিকট, তাহলে তাদের মধ্যে যারা সঠিক তথ্য উদ্ঘাটনে সক্ষম তারা তা ভালভাবে জেনে নিতে পারত।” -সূরা নিসা ৮৩

অযোগ্য লোকের গবেষণা কেয়ামতের একটি বড় আলামত। জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি ইরশাদ করেন, “যখন আমানত বিনষ্ট করা হবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর।” প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করলেন, আমানত কীভাবে বিনষ্ট করা হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন—

إِذَا وَسَدَ الْأَمْرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

“যখন অযোগ্য লোকের উপর কর্মের ভার অর্পণ করা হবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর।” -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯

এ হাদীসে কেয়ামতপূর্ব সময়ে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আইনজীবী যদি চিকিৎসা-ব্যবস্থাপত্র লেখা শুরু করেন, তবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কেমন অরাজকতা সৃষ্টি হবে? কামার যদি হাপড় ছেড়ে স্বর্ণের যাচাইয়ে লেগে যান তবে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? ঠিক একই অবস্থা হবে দ্বীন ও শরীয়তের, যদি দ্বীনী বিষয়ের ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনা কোন অযোগ্য লোকের হাতে অর্পিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বায়আত করতেন তখন এই অঙ্গীকারও নিতেন যে, لَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ‘আমরা দায়িত্বশীল (ও যোগ্য) লোকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হব না।’ -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০৫৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭০৯/৪১

মোটকথা, তাহকীক ও গবেষণার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্যতা ও পারদর্শিতার শর্ত শুধু শরীয়তের দৃষ্টিতেই জরুরি নয়, সকল বিবেকবান ব্যক্তির নিকটেও তা স্বীকৃত। যদিও জ্ঞান ও বুদ্ধির দাবিদার একশ্রেণীর লোক শুধু দ্বীনী বিষয়ে এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটি মানতে প্রস্তুত নন। এই অবস্থা নিঃসন্দেহে হাদীসে উল্লিখিত যোগ্য লোকের সাথে অযোগ্য লোকের বিবাদে লিপ্ত হওয়ার একটি নিকৃষ্টতম উদাহরণ।

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর ভাষায়- “যে ব্যক্তি যে বিষয়ে পারদর্শী নয়, সে ওই বিষয়ের প্রশ্নে ‘জানি না’ বলতে সংকোচ বোধ করে না। একজন বড় প্রকৌশলীকে যদি চোখের সমস্যার কথা বলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দেবেন, আমি ডাক্তার নই। তদ্রূপ একজন ডাক্তারকে যদি প্রকৌশল বিষয়ক প্রশ্ন করেন, তিনি তড়িৎ জবাব দেবেন, আমি ইঞ্জিনিয়ার নই; জগতের সকল শাস্ত্রে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই নিয়ম স্বীকৃত ও প্রচলিত অথচ দ্বীন ও শরীয়তকে এমনই ‘লাওয়ারিস’ মনে করা হয় যে, প্রত্যেকেই এতে নিজের ‘মতামত’ অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তুত। ‘আমি আলেম নই’ একথা বলতে কেউ প্রস্তুত নন।

সাহারানপুরের এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট একবার থানাভবনে এলেন এবং একটি আয়াতের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলেন। সাথে একথাও বললেন যে, অমুক ব্যক্তি আয়াতটির এই তাফসীর করেছেন, অথচ তার উদ্ধৃত ব্যক্তি ছিলেন উর্দু ভাষার একজন সাহিত্যিক মাত্র, আলেম ছিলেন না। আমি তার উদ্ধৃতির উত্তরে বললাম, জনাব! আপনি যে আইন ও বিধি মোতাবেক কোর্টে রায় দিয়ে থাকেন, তার একটি কপি আমাকে দেবেন। আমি তার উপরে একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখব। আপনি এই ব্যাখ্যা অনুসারে কোর্টে ফয়সালা করবেন। যদি সরকারের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি আসে, তবে আমার কথা বলবেন যে, আশরাফ আলী এই বিধির এই ব্যাখ্যাই করেছেন। দেখবেন রাষ্ট্রীয়ভাবে আপনাকে কী উপাধি প্রদান করা হয়!!”
-মাজালিসে হাকীমুল উম্মত, সংকলন-মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. ৯৯-১০০

শাস্ত্রীয় যোগ্যতার মাপকাঠি

আশা করি উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি ভুল ধারণারও অবসান ঘটবে। এক ধরনের মানুষকে দেখা যায় যে, গবেষণার যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শাস্ত্রসমূহের পারদর্শিতা অর্জন এবং শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞদের তরবিয়ত ও সাহচর্য তো

দূরের কথা, শুধু আরবী ভাষা শেখার জন্যও পর্যাপ্ত সময় বের করাও তাদের পক্ষে অতি কঠিন, অথচ তারা কুরআনে কারীম ও কিছু হাদীসগ্রন্থের বাংলা-ইংরেজি অনুবাদ পড়ে নিজেদেরকে দ্বীনীয়াতের বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক ভাবতে থাকেন! উপরন্তু এরা নিজেদের গবেষণা সম্পর্কে খুবই উচ্চধারণা পোষণ করেন এবং এইসব গবেষণালব্ধ (?) সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বড় অহমিকায় ভোগেন। ফলে আহলে ইলমের প্রতি তাদের মনে থাকে প্রচণ্ড অবজ্ঞা। তাঁদেরকে পুরনো যুগের অনভিজ্ঞ মোল্লা-মৌলভী ভাবতেই ভালোবাসেন আর নিজেদেরকে ভাবেন দ্বীন ও শরীয়তের ব্যারিস্টার ও বিজ্ঞ চিন্তাবিদ। এ অবস্থা আজকাল ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আমার মনে হয়, এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। কেননা এ জাতীয় পারদর্শিতার অধিকারীগণ নিজেরাই যদি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করেন তবে বুঝবেন যে, অনুবাদের সাহায্যে কুরআন ও হাদীসের অর্থ জানাই যদি শাস্ত্রের পারদর্শিতা হয়, তবে তা পারদর্শিতা শব্দের অবমাননা ও বিকৃতিসাধন ছাড়া আর কিছু নয়।

বলাবাহুল্য, কোন শাস্ত্রে এই পরিমাণ জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করাকেই পারদর্শিতা বলে, যাকে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞগণ ‘পারদর্শিতা’ বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন।

গবেষণার নিয়ম-নীতি

এ বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। বর্তমান নিবন্ধে শুধু এ প্রসঙ্গে দু-একটি মৌলিক নীতি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব ইনশাআল্লাহ।

১. প্রথম নীতি হল, নিজ মেধা ও সময় এমন বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় না করা, যার কোন দ্বীনী বা দুনিয়াবী উপকারিতা আশা করা যায় না। ইসলামে ‘গবেষণার জন্য গবেষণা’ একটি অর্থহীন কাজ হিসেবে বিবেচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এজাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَا لَا يَغْنِيهِ. قَالَ النَّوَوِي فِي الْأَرْبَعِينَ:

حديث حسن

“(মুসলমান) ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হল, অনর্থক কাজসমূহ পরিহার করা।” —জামে তিরমিযী ৪/৪৮৩

আর এমন গবেষণা ও পর্যালোচনা তো বিশেষভাবে নিষিদ্ধ; যা পৃথিবীতে ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। মুফতী শফী (রহ.)-এর ভাষায় “এ জাতীয়

গবেষণার দৃষ্টান্ত হল, কোন সুপুত্র পিতার পিতৃত্ব নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হল যে, গাকে আমি পিতা হিসেবে জানি, বাস্তবেই তিনি আমার পিতা কি না। সে তার মেধা ও সময় নিয়োজিত করল জননীর চরিত্র গবেষণায়।” -মাকামে সাহাবা ১০-১১

মোটকথা প্রথম মূলনীতি হল, গবেষণা এমন বিষয়ে হওয়া উচিত, যে বিষয়ে গবেষণার কোন দ্বীনী প্রয়োজন আছে অথবা শরীয়তসম্মত কোন দুনিয়াবী কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

২. দ্বিতীয় মূলনীতি হল, গবেষণার বিষয়বস্তু এমন না হওয়া উচিত যা বাদীহিয়াত (অতি সাধারণ বুদ্ধিতেও বোধগম্য) মুসাল্লামাত (সর্বজন স্বীকৃত) ও ইজমাইয়াত (শরীয়তের ইমাম ও আলেমগণের ঐকমত্যপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ)-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এসব বিষয়ের সত্যতা ও বাস্তবতায় কোন সন্দেহ নেই। অথচ গবেষণা হয়ে থাকে কোন বিষয়ের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য। অতএব যেসব বিষয় সন্দেহাতীতভাবে সত্য, যাতে সংশয়ের লেশমাত্রও নেই, তাতে কিসের ভিত্তিতে এবং কী কারণে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা করতে হবে? এসব কাজ যে শুধু অর্থহীন গবেষণা-বিলাস তাই নয়, এসব সর্বজন স্বীকৃত ও সর্ববাদীসম্মত বিষয়ের প্রতি সন্দেহের চোখে তাকানো এবং এসবের পেছনে পড়া বেদ্বীনী-মানসিকতার ফলাফল। পাশাপাশি এ যে অতি স্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা তা তো বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত (মুসাল্লামাত ও ইজমাইয়াত) বিষয়াদির দলীলভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করা অবশ্যই কাম্য। তদ্রূপ এ জাতীয় বিষয়ে বেদ্বীন লোকের পক্ষ থেকে বিভ্রান্তিমূলক বা সংশয় সৃষ্টিকারী প্রচার-প্রচারণা হলে তার দলীলভিত্তিক খণ্ডনও অপরিহার্য।

আজকাল তথাকথিত গবেষকদের মাঝে যে ব্যাধি ক্রমশ ব্যাপক হচ্ছে তা এই যে, উম্মতের মুসাল্লামাত বা সর্বস্বীকৃত বিষয়াদি এবং আহলে ইলমের ইজমাইয়াত বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তসমূহকেই তারা রিসার্চ ও গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন। তারা উম্মাহর সর্ববাদীসম্মত বিষয়, ইমামগণের ইজমায়ী বিষয় আর প্রচলিত রসম ও রেওয়াজ সবকিছুকে এক নিষ্কিতে ওজন করতে অভ্যস্ত। অথচ প্রথমোক্ত বিষয়গুলো হল দ্বীনের মৌলিক বিষয় আর শেষোক্ত বিষয়াদির সাথে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে প্রথম সারির প্রচারক হলেন আহলে ইল্ম ও মিল্লাতের মুজাদ্দিদবন্দ, অথচ শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাঁরাই হন প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

আমজনগণ রসম-রেওয়াজের অনুসরণ করে তখন আহলে ইল্ম তাদেরকে এসব থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। পক্ষান্তরে ‘মুসাল্লামাত’ ও

‘ইজমাইয়াত’ এর অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে কেউ কোন বিভ্রান্তি বা সংশয় ছড়ানোর চেষ্টা করলে সকল আহলে ইলম ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার মোকাবেলা করেন। রসম-রেওয়াজের পেছনে কোন শরয়ী দলীল থাকে না, অথচ মুসাল্লামাত ও ইজমাইয়াত-এর পক্ষে শরীয়তের অন্য সব দলীল ছাড়াও ইজমায়ে উম্মতের মত শক্তিশালী দলীল বিদ্যমান।

এতসব কিছুর পরও আপনি দেখবেন, এই সব নামধারী গবেষকদের গবেষণার প্রধান বিষয় হল এই ‘মুসাল্লামাত’ ও ‘ইজমাইয়াত’, যার শিরোনাম তাদের ভাষায় ‘সমাজে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা’। বলাবাহুল্য, এই শিরোনামটি ‘রসম ও রেওয়াজের’ অর্থ হতে পারে। মুসাল্লামাত ও ইজমাইয়াতকে এই নাম দেওয়া বাস্তবতার বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাকে এ ধরনের এক গবেষণা বৈঠকে দাওয়াত করা হয়েছিল। আমি কোন দ্বীনী প্রয়োজনে সেখানে দু-তিনবার গিয়েছি। তাদের তখনকার আলোচ্যবিষয় ছিল, ‘অর্থ না বোঝে কুরআন পড়া গোনাহের কাজ।’ (নাউযুবিল্লাহ ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ।)

যেখানে প্রকৃত বিষয় হল, অর্থ না বুঝলেও কুরআন তেলাওয়াত করা অনর্থক নয়, এতে সওয়াবের পাশাপাশি অন্যান্য দ্বীনী উপকারিতাও রয়েছে এবং একে অনর্থক বলা বে-দ্বীনী বা বদদ্বীনী, সেখানে গবেষণা (?) এই করা হচ্ছে যে, এমন তেলাওয়াত গোনাহ! আর এই গবেষণার সুফল সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, লোকেরা কুরআনের অর্থ বুঝতে চায় না, তাই তাদেরকে একাজে বাধ্য করাই মূল উদ্দেশ্য।

এরপর আমাকে জানানো হয়েছে যে, পরবর্তী আলোচ্যবিষয় ‘অযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা জায়েয।’ (নাউযুবিল্লাহ!)

এই মজলিসে যখন আমি উপস্থিত হয়েছি তখন দেখেছি, অধিকাংশ গবেষকেরই মুখমণ্ডলে দাড়ি নেই –যা একটি ইসলামী শে‘আর। উপস্থিত ব্যক্তিদের অধিকাংশের লেবাস-পোশাক ছিল ইংরেজি স্টাইলের। কুরআনের আয়াতসমূহের শুদ্ধ তেলাওয়াতও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এবং মজলিসের সদস্যবৃন্দের মধ্যে বোধ হয় একজনও এমন ছিলেন না, যিনি সরাসরি আরবী কিতাব পড়তে বা বোঝতে সক্ষম। আজব ব্যাপার হল এহেন মজলিসের যিনি মধ্যমণি জ্ঞান-বুদ্ধি ও লেবাস-পোশাকে তার অবস্থা অন্য অনেকের তুলনায় আরো শোচনীয়। এই হল আমার চোখে দেখা তথাকথিত গবেষণা ও গবেষকদের একটি মাত্র চিত্র।

এখন আপনি যদি দাড়ি-টুপি ও পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে কিছু বলেন, তাহলে আপনি হয়ে যাবেন পশ্চাৎপদ মৌলভী। আর যদি জ্ঞানহীনতা ও শাস্ত্রীয় অযোগ্যতার

কথা বলেন, তবে আপনি অভিহিত হবেন গবেষণার ক্ষেত্রে ইজারাদার উপাধিতে। অথচ বাহ্যিক লেবাস-পোশাকে ইসলামী বেশ অবলম্বন করাও সুন্নত। দ্বীনী বিষয়ে গবেষণা ও তাহকীকে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য ইত্তেবায়ে সুন্নত, তাকুওয়া ও ইখলাসের মত গুণাবলি অর্জন করাও জরুরি। এই শর্তও কুরআন হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। আর শাস্ত্রীয় দক্ষতা ও পারদর্শিতার শর্তটি যেকোন বিবেকবান ব্যক্তির নিকটেই স্বীকৃত। এতে কোন ধরনের সংশয় প্রকাশের পরিবর্তে নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে স্বীকার করে নেওয়াই সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচায়ক।

এ জাতীয় গবেষণা ও তার কুশীলবগণ সম্ভবত নিম্নোক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত হবেন-

إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سُنُونٌ خِدَاعَةٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيَكْذَبُ فِيهَا الصَّادِقُ، يُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيَخُونُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوْبِضَةُ، قِيلَ: وَمَا الرُّوْبِضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: السَّفِيهَ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ. وَفِي رَوَايَةٍ: الرَّجُلُ التَّافَهُ يَنْطِقُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ.

হাদীসে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একটি বর্ণনা রয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন: "একদিন মানুষের সামনে কিছু প্রতারণার বছর অতিবাহিত হবে। যখন মিথ্যুককে সত্যবাদী মনে করা হবে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হবে। খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং আমানতদারকে মনে করা হবে খেয়ানতকারী। তখন কথা বলবে 'রুআইবিজাহ'। সাহাবায়ে কেলাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ 'রুআইবিজাহ' কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, নির্বোধ ব্যক্তি, যে গণমানুষের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।" - মুসনাদে আহমদ ২/২৯১; সুনানে ইবনে মাজাহ ২৯২

“নিশ্চয়ই মানুষের সামনে কিছু প্রতারণার বছর অতিবাহিত হবে। যখন মিথ্যুককে সত্যবাদী মনে করা হবে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হবে। খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং আমানতদারকে মনে করা হবে খেয়ানতকারী। তখন কথা বলবে 'রুআইবিজাহ'। সাহাবায়ে কেলাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ 'রুআইবিজাহ' কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, নির্বোধ ব্যক্তি, যে গণমানুষের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।" - মুসনাদে আহমদ ২/২৯১; সুনানে ইবনে মাজাহ ২৯২

হাদীস শরীফে এজাতীয় গবেষকদের বিরুদ্ধেই আহলে ইলমকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُوَّهُ، يَنْفَرُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.

وهو حديث حسن كما ذكره العلائي في بغية الملتبس ص ٣٤.

“এই ইলমকে বহন করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ। তারা সীমালংঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার ও মূর্খদের অপব্যাত্ম্য থেকে এই ইলমকে পরিচ্ছন্ন করবে।” –আততামহীদ, ইবনে আব্দুল বার ১/৫৯

৩. তৃতীয় মূলনীতি হল ইজতিহাদী (ইজতিহাদযোগ্য) বিষয়াদিতে নিজের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত মনে না করা এবং তাকে সমালোচনা ও পর্যালোচনার উর্ধ্বে মনে না করা। উপযুক্ত সমালোচনা এলে তা সহনশীলতার সাথে গ্রহণ করা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া।

উপযুক্ত সমালোচনার বিষয়ে অসহিষ্ণুতা রুগ্ন মানসিকতার পরিচায়ক। এ থেকে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই মুক্ত থাকা উচিত। বিশেষত তাহকীক ও গবেষণার ক্ষেত্রে। অন্যথায় সমাজে জ্ঞানচর্চা উৎসাহিত হবে না এবং গবেষণার সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকলেও তা কোন সুফল বয়ে আনবে না।

এ বিষয়ে খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর (রা.)-এর একটি ঘটনা লক্ষ্য করুন। কী ধরনের প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ওজনদার ঘটনা। ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ.) ‘জামিউ বয়ানিল ইলম’ (২/৫৯) গ্রন্থে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। “কোন এক প্রসঙ্গে এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)কে বললেন, এ বিষয়ে আলী (রা.) ও যায়েদ (রা.) এই রায় দিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, আমি হলে অন্য রায় দিতাম।” লোকটি বলল, জনাব! তবে কেন আপনি তাদের রায়কে পরিবর্তন করছেন না, আপনি তো আমীরুল মুমিনীন। হযরত উমর (রা.) উত্তরে বললেন, “এ তো কিতাবুল্লাহ বা সুনতে রাসূল নয়। এ তো হল আমার মত *الرأي مشترك* এবং অন্যদেরও মত থাকতে পারে।”

খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর (রা.)এর বাক্য *الرأي مشترك* ‘এভাবে অন্যদেরও মত থাকতে পারে।’ স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত। তবে ভুলে গেলে চলবে না যে, এ নীতি শুধু যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৪. আরো একটি মূলনীতি এই যে, ব্যক্তি সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া তার ব্যক্তি সত্তাকে আক্রমণ করা কোনক্রমেই বৈধ নয়। কারো জীবন-চরিত লিখতে হলে, তার শাস্ত্রীয় জ্ঞানের পরিধি নির্ণয় করতে হলে, তার চিন্তা-ভাবনা ও মতামতের পর্যালোচনা করতে হলে, তবে এজন্যও বেশ কিছু নীতি ও নির্ধারিত সীমারেখা রয়েছে, যা লঙ্ঘন করা কোনক্রমেই কাম্য হতে পারে না। এসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা এই নিবন্ধে সম্ভব নয়। এ বিষয়ের জন্য ইল্মু উসূলিল জারহ ওয়াত তা’দীল ও ইল্মু উসূলিল তারীখ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন

করা অপরিহার্য।

এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে চারটি মৌলিক নীতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হল।
অন্যান্য মূলনীতি সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ অন্য কোন সুযোগে আলোচনা করা যাবে।

মহান আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দাতা, তাঁর উপরই ভরসা করি। আল্লাহ
তাআলা গবেষণা ও সমালোচনার অঙ্গনে উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টি করুন এবং
অযোগ্য গবেষকদের ফেতনা থেকে উন্নতকে হেফাযত করুন। আমীন! #

[ফেব্রুয়ারি '০৫ঈ.]

আমিও বলি, কোথায় যাব, কার কাছে যাব!

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى

দৈনিক প্রথম আলোতে (২৭ অক্টোবর ২০০৮ঈ. সোমবার) প্রকাশিত জনাব হুমায়ুন আহমেদ-এর ‘এখন কোথায় যাব, কার কাছে যাব’ শীর্ষক নিবন্ধটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নিবন্ধকার ঢাকা বিমানবন্দরের অদূরে, হাজী ক্যাম্পের সামনে থেকে লালন ভাস্কর্য সরিয়ে ফেলার কারণে সরকারের প্রতি ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করেছেন। একই সাথে হাদীস ও সীরাতের কিছু উদ্ধৃতি এবং কতিপয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, ভাস্কর্য ইসলামে নিষিদ্ধ নয়; বরং বৈধ ও অনুমোদিত।

নিবন্ধকার যদি ভাস্কর্য শিল্প সম্পর্কে তাঁর নিজের মত বা সতীর্থ বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য উল্লেখ করতেন তবে আমাদের বিশেষ কিছু বলার ছিল না। কিন্তু তিনি ইসলামী আকীদা ও বিধানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে সম্পূর্ণ অসত্য কথা বলেছেন। তাই এই বিষয়ে কলম ধরাকে আমরা ঈমান ও আমানতের দাবি বলে মনে করি।

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

তিনি প্রথমে যে (অবাস্তব) ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন তা তার ভাষায় এই :

“আমাদের মহানবী (সা.) কাবা শরীফের ৩৬০টি মূর্তি অপসারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেয়ালের সব ফ্রেসকো নষ্ট করার কথাও তিনি বললেন। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল কাবার মাঝখানের একটি স্তম্ভে, যেখানে বাইজেন্টাইন যুগের মাদার মেরির একটি অপূর্ব ছবি আঁকা। নবীজী (সা.) সেখানে হাত

রাখলেন এবং বললেন, ‘এই ছবিটা তোমরা নষ্ট করো না।’ কাজটি তিনি করলেন সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর অসীম মমতা থেকে। মহানবীর (সা.) ইন্তেকালের পরেও ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধর্মপ্রাণ খলিফাদের যুগে কাবা শরীফের মতো পবিত্র স্থানে এই ছবি ছিল। এতে কাবা শরীফের পবিত্রতা ও শালীনতা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

মহানবীর (সা.) প্রথম জীবনীকার ইবনে ইসহাকের (আরব ইতিহাসবিদ, জন্ম : ৭০৪ খ্রিষ্টাব্দ, মদীনা, মৃত্যু : ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দ, বাগদাদ) লেখা দি লাইফ অব মোহাম্মদ গ্রন্থ থেকে ঘটনাটি বললাম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত বইটি অনুবাদ করেছেন আলফ্রেড গিয়োম (প্রকাশকাল ২০০৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৫২)”

পর্যালোচনা : এটি একটি অসত্য বর্ণনা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাত যাদের অধ্যয়নে এসেছে এবং প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি ও তার ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর ফয়সালা যারা অবগত আছেন তারা নিজেরাই এ মিথ্যাচার বুঝতে পারেন। তেমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় যেভাবে কাবা শরীফকে সব ধরনের ছবি ও মূর্তি থেকে মুক্ত করেছেন তা যাদের সহীহ হাদীস থেকে অধ্যয়ন করার কিংবা অন্তত নিবন্ধকারের উদ্ধৃতিগুলো পরীক্ষা করার সুযোগ হয়েছে তাদেরও কোনো সন্দেহ থাকবে না যে, ঐ বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিষয়টা তাদেরকে দলীল-প্রমাণ দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যাদের সামনে এই বিষয়গুলো নেই, তারা ওই সীরাত-গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেখে বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এজন্য মূল কথাগুলো প্রথমে সংক্ষিপ্ত আকারে আরজ করছি :

১. আলফ্রেড গিয়োম ইবনে ইসহাকের ‘কিতাবুস সীরাত’ অনুবাদ করেননি, করেছেন ইবনে হিশামকৃত ‘সীরাত’এর অনুবাদ। যদিও প্রচ্ছদে সরাসরি ইবনে ইসহাকের নাম ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু ভূমিকায় তিনি প্রকৃত কথাটা বলেছেন। ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরের ব্যক্তি। তার মৃত্যু ২১৮ হিজরীতে। অন্যদিকে ইবনে ইসহাকের জন্ম ৮০ হিজরীতে এবং মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে।

২. ওই ঘটনা ইবনে ইসহাকের কিতাবুস সীরাতেও নেই, ইবনে হিশামের

কিতাবুস সীরাতেও নেই। অনুবাদক অন্য জায়গা থেকে বর্ণনাটি সংগ্রহ করে সীরাতে ইবনে হিশামে জুড়ে দিয়েছেন।

৩. নিবন্ধকার ইংরেজি অনুবাদের ২০০৬ সালের সংস্করণের ৫৫২ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে নিজের পক্ষ থেকেও এমন কিছু কথা যোগ করেছেন যা ইংরেজি অনুবাদে নেই।

৪. সর্বশেষ কথা এই যে, ইংরেজি অনুবাদকের জুড়ে দেওয়া বর্ণনা এবং হুমায়ূন সাহেবের নিজস্ব বক্তব্য আগাগোড়া বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

একটিমাত্র উদ্ধৃতিতেই যদি এত ‘কাণ্ড’ থাকে তবে তাকে কী বলা যায়? এবার বিস্তারিত শুনুন।

১. ইবনে ইসহাককে ‘মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম জীবনীকার’ বলে দাবি করা ভুল। ইবনে ইসহাকের অনেক আগেই এ বিষয়ের সূচনা হয়ে গিয়েছিল। কেননা, হাদীস শরীফ হল সীরাতের সবচেয়ে বড় ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য উৎস আর হাদীস শরীফ গ্রন্থাকারে সংকলন শুরু হয়েছিল ইবনে ইসহাকের জন্মেরও আগে থেকে। দ্বিতীয়ত ইবনে ইসহাকের দাদা উস্তাদ উরওয়া ইবনুয যুবাইরও (জন্ম : ২২হি. মৃত্যু : ৯৪হি.) সীরাত-সংকলকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাহলে ইবনে ইসহাক প্রথম জীবনীকার কীভাবে হচ্ছেন?

ইবনে ইসহাকের পূর্বসূরীদের ‘মাগাযী’ শিরোনামে সংকলিত গ্রন্থগুলো মূলত সীরাত-গ্রন্থ। ইবনে ইসহাকের ‘সীরাত’কেও ‘কিতাবুল মাগাযী’ বলা হয়েছে। [দেখুন: সীরাতে ইবনে ইসহাক, তাহকীক : মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ (ভূমিকা ও গ্রন্থের সূচনা অংশ); তাহযীবু সীরাতে ইবনে হিশাম, আবদুস সালাম হারুন পৃ. ৮; তাদবীনে সীরাত ওয়া মাগাযী, মাওলানা কাযী আতহার মোবারকপুরী, প্রকাশনা শায়খুল হিন্দ একাডেমী, দারুল উলূম দেওবন্দ; সীরাতুননবী, শিবলী নুমানী (ভূমিকা অংশ)]

২. ইবনে ইসহাকের ‘কিতাবুস সীরাত’ তার একাধিক শাগরিদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তাদের একজন যিয়াদ আলবাক্কায়ী। এরই সূত্রে ইবনে হিশাম এই গ্রন্থ গ্রহণ করেছেন এবং সংযোজন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে তার সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করেছেন।

অত্যন্ত আমানতদারীর সাথে তিনি এই কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনাগুলোর সনদ ও মতন-(সূত্র ও বক্তব্য) ছবছ বর্ণনা করেছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে যা কিছু বাড়িয়েছেন তা ‘ক্বালা ইবনে হিশাম’ বলে উল্লেখ

করেছেন। ইবনে হিশামের এই রচনা ‘সীরাতে ইবনে হিশাম’ নামে পরিচিত। যেহেতু সীরাতে ইবনে ইসহাকের পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না তাই একেই সীরাতে ইবনে ইসহাকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আলফ্রেড গিয়োম এই রচনারই, অর্থাৎ সীরাতে ইবনে হিশামেরই অনুবাদ করেছেন এবং এতে সংযোজন-বিয়োজন করেছেন, তবে বিশ্বস্ততা রক্ষা করেননি। যেমন আগেও বলা হয়েছে যে, তিনি সীরাতে ইবনে হিশামকে সীরাতে ইবনে ইসহাক নামে পেশ করেছেন। তেমনি এমন বর্ণনা তিনি এই গ্রন্থে সংযুক্ত করেছেন যা না মূল গ্রন্থে রয়েছে আর না সীরাতে ইবনে ইসহাকের কোনো পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত সংস্করণে। আমাদের কাছে ইবনে ইসহাকের ওই গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ রয়েছে, কোথাও বর্ণনাটি নেই।

খোদ ইংরেজি অনুবাদকও এই বর্ণনা ওই দুই গ্রন্থের কোনো মুদ্রিত সংস্করণে কিংবা পাণ্ডুলিপিতে পাননি। তাই তা বন্ধনীর মধ্যে রাখতে বাধ্য হয়েছেন এবং একেই এই সংযুক্তির বৈধতার পক্ষে যথেষ্ট মনে করেছেন। বিষয়টা অনুবাদের বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ণ করে কি না এ দিকে তিনি ভ্রক্ষেপ করেননি।

নিবন্ধকার যখন ইংরেজি অনুবাদ থেকে বর্ণনাটা গ্রহণ করেছেন তখন তার বলে দেওয়া অপরিহার্য ছিল যে, অনুবাদে এটা বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে, অর্থাৎ বর্ণনাটা সীরাতে ইবনে হিশাম বা সীরাতে ইবনে ইসহাক কোনো গ্রন্থেই নেই।

৩. ইংরেজি অনুবাদক এই বর্ণনাটা আযরাকীকৃত ‘আখবারু মক্কা’ থেকে সংগ্রহ করে সীরাতে ইবনে ইসহাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ আযরাকী ঘৃণাক্ষরেও বলেননি যে, এই বর্ণনা সীরাতে ইবনে ইসহাকে রয়েছে। হাঁ, আযরাকীর সনদে ইবনে ইসহাক একজন বর্ণনাকারী হিসেবে রয়েছেন।

আযরাকী ইবনে ইসহাকের শাগরিদ নন, তার অনেক পরের। অতএব আযরাকী থেকে ইবনে ইসহাক পর্যন্ত যে সনদ তা-ও বিচার করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, ইবনে ইসহাক এই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন তবুও এটা প্রমাণিত হয় না যে, এটা তার ‘কিতাবুস সীরাত’-এ রয়েছে। মানুষ সাধারণ আলাপচারিতায় প্রসঙ্গত কোনো ভিত্তিহীন বর্ণনা উল্লেখ করতে পারে (যেমন তার ভিত্তিহীনতা আলোচনার উদ্দেশ্যে) কিন্তু সেটাকে সে ‘সহীহ’ মনে করে না এবং তার রচনায় অন্তর্ভুক্ত করে না।

অনুবাদক এসব বিষয়ে মোটেও অসচেতন নন, কিন্তু যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক বর্ণনাটা এখানে সংযুক্ত করা তার কাছে অপরিহার্য বলে মনে হয়েছে!

৪. এখানে বিষয়টা শুধু এই নয় যে, দলীল-প্রমাণ ছাড়া একটা বর্ণনা সীরাতে ইবনে ইসহাকে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে; বরং আসলে অপরাধ এই যে, একটি মিথ্যা অপবাদ খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর আরোপ করা হয়েছে।

৫. আযরাকীর (মৃত্যু : ২৪৭ হিজরীর পরে) রচনা ‘আখবারু মক্কা’ থেকে প্রথমে বর্ণনাটির সনদ ও পূর্ণ মতন লক্ষ্য করুন :

أخبرني محمد بن يحيى، عن الثقة عنده، عن ابن اسحاق، عن حكيم بن عباد بن حنيف وغيره من أهل العلم، أن قريشا كانت قد جعلت في الكعبة صورة فيها عيسى بن مريم ومريم عليهما السلام. قال ابن شهاب: قالت أسماء بنت شقر: إن امرأة من غسان حجت في حاج العرب، فلما رأت صورة مريم في الكعبة قالت: بأبي وأمي إنك لعربية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمحوا تلك الصور إلا ما كان من صورة عيسى ومريم.

এই বর্ণনার যে তরজমা গিয়োম করেছেন এবং যার উদ্ধৃতি আমাদের নিবন্ধকার দিয়েছেন তা এই :

I. I. From Hakim b. `Abbad b. Hanif and other traditionists : Quraysh had put picturers in the Ka'ba including two of Jesus son of Mary and Mary (on both of whom be peace!) 1. Shihab said : Asma' b. Shaqr said that a woman of Ghassan joined in the pilgrimage of the Arabs and when she saw the picture of Mary in the Ka'ba she said, 'My father and my mother be your ransom! You are surely an Arab woman!' The apostle ordered that the pictures should be erased except those of Jesus and Mary.

আলোচিত নিবন্ধে এই অংশটুকুর যে অনুবাদ করা হয়েছে তা মূল ইংরেজি পাঠের সাথে তুলনা করে দেখা যেতে পারে। সেখানে কি এ কথা আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারইয়াম (রা.)-এর ছবিতে হাত রেখেছিলেন? কিংবা এটা কি আছে যে, এই ছবি বাইতুল্লাহ শরীফে ৬৮৩ খৃ. পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল? তেমনি এ কথাও তো নেই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টি হঠাৎ কা'বার মাঝখানের স্তম্ভে পড়ল, যেখানে মাদার মেরির একটি অপূর্ব ছবি আঁকা ছিল।

অথচ এই কথাগুলো নিবন্ধকার উপস্থাপন করেছেন গিয়োম-এর অনুবাদ ও সীরাতে ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতিতে।

মূল আরবী গ্রন্থে-সীরাতে ইবনে ইসহাক ও সীরাতে ইবনে হিশামে-আদৌ এই বর্ণনা আছে কি না তা খুঁজে দেখা সম্ভব না হলে অন্তত ইংরেজি অনুবাদের উদ্ধৃতিতে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেওয়া কর্তব্য ছিল। প্রকাশক, প্রকাশনার সন এবং পৃষ্ঠানম্বর ইত্যাদি সব কিছু উল্লেখ করে এ ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন কি সাধারণ পাঠকের জন্য বিভ্রান্তিকর হয়ে যায় না?

৬. আযরাকীর বর্ণনায় যে বিষয়টুকু পাওয়া যাচ্ছে আমরা প্রথমে তার উপর আলোচনা করব। এরপর নিবন্ধকার যা যোগ করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।

আযরাকী ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইবনে ইসহাক এই বর্ণনার কিছু অংশ হাকীম ইবনে আব্বাদ ইবনে হানীফ ও জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তির উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন, আর কিছু কথা ইবনে শিহাবের উদ্ধৃতিতে। ইবনে শিহাব সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে যে, তিনি কিছু কথা আসমা বিনতে শাকার-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন এবং কিছু কথা উদ্ধৃতি ছাড়া।

বর্ণনার এই অংশটুকু সঠিক যে, (জাহেলিয়াতের যুগে) বাইতুল্লাহয় মারইয়াম (রা.)-এর ছবি ছিল। বিভিন্ন সহীহ বর্ণনায় তা আছে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর মারইয়াম (রা.)-এর ছবি না মুছে রেখে দেওয়া হয়েছিল, কিংবা (মাআযল্লাহ) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা রেখে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন-এটা নির্জলা মিথ্যা।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুতাওয়াতির ও সুপ্রমাণিত শিক্ষা, তাঁর পবিত্র সীরাতে বাস্তব ঘটনাবলি এবং সহীহ ও মুত্তাছিল হাদীসসমূহের সুস্পষ্ট বক্তব্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইনশাআল্লাহ পাঠকবৃন্দ তা দেখতে পাবেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই অবাস্তব বিষয়টা কীভাবে, কার কল্যাণে 'বর্ণনা'র রূপ লাভ করল? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য সনদ বিচার করতে হবে। সনদে একটি নাম আসমা বিনতে শাকার। সে এমনই অজ্ঞাতপরিচয় যে, আসমাউর রিজালের গ্রন্থে তার নামই পাওয়া যায় না। এরপর কোন সূত্রে সে গাসসানের ওই আগন্তুক মহিলার কথা জানতে পেরেছে তারও কোনো উল্লেখ নেই। ইবনে ইসহাককে স্বয়ং ইবনে শিহাব এই তথ্য দিয়েছেন এটা তিনি বলেননি। যদি ভিন্ন কোনো সূত্রে ইবনে শিহাবের বর্ণনা তিনি পেয়ে থাকেন তবে সেই মাঝের সূত্রটি কে তা ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেননি।

মোটকথা, সনদে যেমন শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তেমনি উল্লেখিত রাবীদের পরিচয়ও অজ্ঞাত। এধরনের বিচ্ছিন্ন ও অজ্ঞাত সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণ দ্বারা দাবি প্রমাণের কাজ চলে না।

কথা এখানেই শেষ নয়। খোদ আযরাকী সম্পর্কেও অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা তার সম্পর্কে বিস্তর তালাশ করেছি। একে তো তার সম্পর্কে আলোচনা খুব অল্প এত্বেই পাওয়া যায়। এরপর যারা তার সম্পর্কে লিখেছেন তার সততা ও সত্যবাদিতা এবং তার স্মৃতিশক্তি ও ধীশক্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ইমামদের কোনো মন্তব্য আনতে সক্ষম হননি। এজন্য খোদ আযরাকীরই সততা ও বিশ্বস্ততা অজ্ঞাত। আযরাকী থেকে ইবনে ইসহাক পর্যন্ত মাক্কেস দুটি সূত্রও সন্দেহযুক্ত। সবশেষে ইবনে ইসহাক সম্পর্কেও দেখার বিষয় এই যে, জারহ-তাদীলের ইমামদের দৃষ্টিতে তাঁর অবস্থান কেমন?

একজন বর্ণনাকারীর কোনো বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তাকে সততা ও সত্যবাদিতা ছাড়াও উত্তম স্মৃতিশক্তি ও ধীশক্তির অধিকারী হতে হয়। এটা অপরিহার্য। এছাড়া তার মধ্যে তাদলীসের প্রবণতা থাকলে দেখতে হবে যে, যার উদ্ধৃতিতে তিনি বর্ণনা করেছেন তার নিকট থেকে সরাসরি ওই তথ্যটা গ্রহণ করেছেন কি না।

‘তাদলীস’ বলতে বোঝায়, একজন রাবী কোনো বিষয় কারো কাছ থেকে সরাসরি শোনেনি, অন্যের মাধ্যমে শুনেছে, কিন্তু বর্ণনার সময় মাক্কেস সূত্র গোপন রেখে পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীর উদ্ধৃতি দিল, যার কারণে শ্রোতা মনে করে যে, কথাটা তিনি সরাসরি উদ্ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকেই শ্রবণ করেছেন। অথচ প্রকৃত অবস্থা এমন নয়। যেমন— ইয়াযীদ ইবনে জু‘দুবা একটা তথ্য ইবনে ইসহাককে প্রদান করলেন ইবনে শিহাবের উদ্ধৃতিতে। ইবনে ইসহাক যদি কথাটা ইয়াযীদ ইবনে জু‘দুবুর নাম উল্লেখ করা ছাড়া ইবনে শিহাবের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন তাহলে তা হবে ‘তাদলীস’। বর্ণনাকারীদের পরিচয় ও সময়কাল সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারা যেহেতু জানেন যে, ইবনে ইসহাক ছিলেন ইবনে শিহাবের শীষ্য তাই তাদের ধারণা হতে পারে যে, ইবনে ইসহাক তথ্যটা সরাসরি ইবনে শিহাব থেকেই নিয়েছেন। অথচ প্রকৃত বিষয় এমন নয়। ইবনে ইসহাকের সূত্র হল ইয়াযীদ ইবনে ইয়ায। সেই তাকে তথ্যটা সরবরাহ করেছে ইবনে শিহাবের উদ্ধৃতিতে।

মোটকথা, তাদলীস-প্রবণ বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য একটি শর্ত এই যে, তিনি যার উদ্ধৃতি দিচ্ছেন তার নিকট থেকে সরাসরি শুনেছেন? এটা পরিষ্কার ভাষায় বলবেন।

বিষয়গুলো যেহেতু ইলমে উসূলে হাদীস ও ইলমে উসূলে ফিকহের স্বীকৃত ও সর্বসম্মত মূলনীতি এবং প্রাচ্যবিদ গবেষকরাও এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন না তাই এ প্রসঙ্গে বরাত উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি না।

আলোচিত বর্ণনার বর্ণনাকারী ইবনে ইসহাকের মধ্যে তাদলীসের প্রবণতা ছিল এবং তার স্মৃতিশক্তি ও ধীশক্তিও আশানুরূপ ছিল না। তার এই দুর্বলতা দুটি সম্পর্কে জারহ-তা'দীলের (বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতা-অগ্রহণযোগ্যতা বিচার-পর্যালোচনা করার শাস্ত্র) ইমামগণ একমত এবং উপরোক্ত কারণে তার বর্ণনার মধ্যে কিছু মুনকার (আপত্তিকর ও অবাস্তব) বিষয় ঢুকে পড়েছে—এটাও জারহ-তা'দীল ও ইলালুল হাদীসের ইমামগণের কাছে স্বীকৃত।

বরং অনেক বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত এই যে, কোনো দ্বীনী মাসআলা প্রমাণের জন্য একা ইবনে ইসহাকের বর্ণনা দলীল হতে পারে না। (সিয়ারু আলামিন নুবালা খ. ৭, পৃ. ৪১; মীযানুল ই'তিদাল খ ৩, পৃ. ৪৭৫ দারুল ফিকর মিসর)

এখানে ইবনে ইসহাকের 'কিতাবুস সীরাত'কেই দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। আমাদের সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণী প্রাচ্যবিদদের প্রভাবে একে সীরাতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে মনে করলেও তারীখ, সীরাত ও হাদীসের বিশেষজ্ঞদের বিচারে কিন্তু তা নয়। তারা এই গ্রন্থকে মোটামুটিভাবে সীরাতের একটা ভালো তথ্যসূত্র মনে করেন; সাথে সাথে এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেন যে, এতে মুনকার-মুনকাতে (বিচ্ছিন্ন ও অবাস্তব) বর্ণনাও বিদ্যমান রয়েছে। শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে (খ. ৩, পৃ. ৪৬৯) অভিযোগ করেছেন যে, ইবনে ইসহাকের 'কিতাবুস সীরাত'-এ অনেক মুনকার বিষয় রয়েছে যেগুলোর সনদ 'মুনকাতে' (বিচ্ছিন্ন)। তেমনি বিভিন্ন বানানো কবিতাও তাতে রয়েছে।

জারহ-তা'দীলের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তানের মন্তব্য উল্লেখ করে যাহাবী বলেন, 'কাত্তান ইঙ্গিত করেছেন যে, সীরাতে ইবনে ইসহাক-এ কিছু ভিত্তিহীন কবিতা এবং কিছু মুনকাতে-মুনকার রেওয়ায়েত রয়েছে। সুতরাং গ্রন্থটির পরিমার্জিত সংস্করণ তৈরি হলে তা পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা পাবে।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা খ. ৭, পৃ. ৫২, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০২ হি.)

দেখুন, বিশেষজ্ঞ মনীষীগণ যেখানে এই গ্রন্থের মুনকার বিষয়গুলো বাদ দিতে বলেছেন সেখানে গিয়োম অন্য স্থান থেকে আরো মুনকার বর্ণনা তাতে প্রক্ষেপণ করেছেন।

পাঠক অনুগ্রহপূর্বক আবার একবার বর্ণনার সনদটা লক্ষ করুন। দেখা যাচ্ছে যে, ইবনে ইসহাক হাকীম ইবনে আব্বাদ-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কিন্তু সরাসরি তার কাছ থেকে শুনেছেন-একথা বলেননি। তেমনি ইবনে শিহাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কিন্তু সেখানেও সরাসরি শোনার কথা নেই। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইবনে ইসহাক তাদলীস-প্রবণতার শিকার ছিলেন এবং ধরন ও পরিমাণ কোনো দিক থেকেই তা সামান্য ছিল না।

বিশেষজ্ঞ ইমামগণ স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন যে, অনির্ভরযোগ্য ও অজ্ঞাতপরিচয় লোকেরা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য লোকের উদ্ধৃতিতে যেসব তথ্য বর্ণনা করত তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং বর্ণনা করার সময় মধ্যবর্তী সূত্র গোপন রেখে সরাসরি ওই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিবরণ বলে বর্ণনা করতেন। অর্থাৎ তার সনদে যয়ীফ বা মাজহুল রাবী বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তিনি তা গোপন রেখেছেন। তো যে তাদলীসের উদ্দেশ্য সনদ থেকে অনির্ভরযোগ্য রাবী বাদ দিয়ে বাহ্যত ওই সনদকে 'সহীহ' বলে প্রকাশ করা তা কত মারাত্মক বিষয় হতে পারে-তা তো বলাই বাহুল্য। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় বহু মুনকার বিষয় এই পথেই অনুপ্রবেশ করেছে।

জারহ-তা'দীলের ইমাম ইবনে হিব্বান বুসতী (মৃত্যু ৩৫৪ হিজরী) ইবনে ইসহাকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করার পর লেখেন, 'তার সমস্যাটা হল, তিনি যয়ীফ রাবীদের নিকট থেকে রেওয়ায়েত শুনতেন এবং তাদের নাম গোপন রেখে বর্ণনা করতেন। এজন্য তার বর্ণনায় বিভিন্ন মুনকার বিষয় অনুপ্রবেশ করেছে।' (কিতাবুছ সিকাত খ. ৭, পৃ. ৩৮৩, হায়দারাবাদ, প্রথম সংস্করণ ১৩৯৩ হি.)

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হি.) লেখেন, 'ইবনে ইসহাক নিজে সত্যবাদী। তবে যয়ীফ, মাজহুল ও তারও নীচুস্তরের রাবীদের কাছ থেকে বর্ণনা সংগ্রহ করতে ও তাদের নাম গোপন রেখে বর্ণনা করতে অভ্যস্ত। এই তাদলীস-প্রবণতায় তিনি প্রসিদ্ধ। ইমাম আহমদ, ইমাম দারাকুতনী প্রমুখ তার এই প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন। (তা'রীফু আহলিত তাকদীস বিমারাতিবিল মওসুফীনা বিত-তাদলীস নং ২২৯)

ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) ঐ গ্রন্থে তাদলীসকারীদের যে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন তাতে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন চতুর্থ শ্রেণীতে, যাদের ব্যাপারে তার রায় এই যে, এদের বর্ণনায় যদি উদ্ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে সরাসরি শ্রবণ করে বর্ণনা করার কথা স্পষ্টভাবে পাওয়া না যায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা অগ্রহণযোগ্য।

আলোচিত বর্ণনাও তার ওই ভিত্তিহীন বর্ণনাগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সামনের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ।

৭. ইবনে ইসহাক যেহেতু এই কথাটা ইবনে শিহাব থেকে সরাসরি শুনেছেন বলে উল্লেখ করেননি, অর্থাৎ ‘আমি ইবনে শিহাবকে বলতে শুনেছি’ বাক্য ব্যবহার না করে ‘ইবনে শিহাব বলেছেন’ ব্যবহার করেছেন তাই তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, তিনি ওই সব তাদলীসকারীর অন্তর্ভুক্ত যাদের প্রত্যক্ষ শ্রবণের উল্লেখবিহীন বর্ণনা সর্বসম্মতভাবে অগ্রহণযোগ্য।

রেওয়ায়েতের বিচার-বিশ্লেষণ সম্পর্কে যাদের ধারণা রয়েছে তারা যদি আযরাকীর ‘আখবারু মক্কা’ গ্রন্থের খ. ১ পৃ. ১৬৮-এর শেষ প্যারা এবং পৃ. ১৬৯-এর প্রথম প্যারাটুকুই মনোযোগ সহকারে লক্ষ করেন তবে তাদের বুঝতে বাকি থাকবে না যে, এই রেওয়ায়েতে ইবনে ইসহাক ও ইবনে শিহাবের মধ্যে ইয়াযীদ ইবনে ইয়ায ইবনে জু‘দুবা বা এ ধরনের আরো কোনো মাতরুক-মুত্তাহাম (পরিত্যক্ত ও মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত) রাবী বিদ্যমান ছিল, যার নাম ইবনে ইসহাক তাদলীসের পন্থায় গোপন করেছেন। এই ইয়াযীদ একজন মাতরুক ও মুত্তাহাম রাবী। তিনি ইবনে ইসহাকের সমসাময়িক এবং দু’জনের আবাসও ছিল একই শহরে। [মীযানুল ই‘তিদাল, শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হি.) খ. ৪, পৃ. ৪৩৬-৪৩৮; তারীখু বাগদাদ, খতীব বাগদাদী (মৃত্যু ৪৬৩ হি.) খ. ১৪, পৃ. ৩৩২ মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো; আলকামিল, ইবনে আদী (মৃত্যু ৩৬৫ হি.) খ. ৭, পৃ. ২৬৪, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৯ হি.]

৮. তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ইবনে শিহাব এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা, ধরে নেওয়া হল তিনি তা বর্ণনা করেছেন! তখন প্রশ্ন হবে যে, তিনি কি মক্কাবিজয়ের সমসাময়িক? সবাই জানেন যে, মক্কাবিজয় ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে আর ইবনে শিহাব জন্মগ্রহণ করেছেন ৫০ হিজরীতে। তিনি রেওয়ায়েতের উপযুক্ত হতে হতে মক্কাবিজয়ের পর অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, ইবনে শিহাব এই তথ্য কার কাছ থেকে পেয়েছেন?

এখানে কেবলই শূন্যতা বিরাজ করছে। ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি অনুযায়ী ইবনে শিহাব তা বর্ণনা করেছেন বলে ধরে নিলেও দেখা যাচ্ছে, তিনি এই তথ্যের কোনো সূত্র উল্লেখ করেননি। বিনাসূত্রে কেবল একটি দাবিমাত্র। এরপর সনদের অন্যান্য ক্রটিগুলো তো রয়েছেই।

৯. নিবন্ধকার যদি মূল আরবী গ্রন্থের সহায়তা নিতে পারতেন তবে সম্ভবত তিনি সরাসরি আযরাকীর ওই কিতাবটা খুলে দেখতেন। সেক্ষেত্রে টীকাকার রুশদী ছালেহ সন্নিবেশিত দীর্ঘ টীকাও তার নজরে পড়ত। রুশদী ছালেহ পরিষ্কার ভাষায়

আলোচনা করেছেন যে, আযরাকীর কোনো কোনো বর্ণনায় ঈসা (আ.) ও তাঁর জননীর ছবি মুছে না ফেলার যে বিবরণ আছে তা প্রক্ষিপ্ত। সহীহ ও সঠিক বর্ণনাগুলোতে এই কথা নেই; বরং সকল ছবি মুছে ফেলার সুস্পষ্ট বিবরণ এসেছে। নিঃসন্দেহে আযরাকীর ওই বর্ণনা বাতিল ও মাতরুক (পরিত্যক্ত ও ভিত্তিহীন)।

রুশদী ছালেহ লেখেন, প্রথমত ওই দুই ছবি আলাদা রাখার কোনো কারণ নেই।

দ্বিতীয়ত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো হারামকে বহাল রাখার আদেশ করা তো দূরের কথা, এ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর শরীয়তে প্রাণীর ছবি সংরক্ষণ হারাম, যা অসংখ্য হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত।

তৃতীয়ত প্রক্ষিপ্ত অংশটি এ বিষয়ক অনেক সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক।

তিনি এই বলে তার দীর্ঘ আলোচনার সমাপ্তি টেনেছেন যে, এই বিষয়গুলো অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে প্রক্ষিপ্ত অংশটুকুর স্বরূপ প্রকাশ করে। (আখবারু মক্কা পৃ. ১৬৫-১৬৬ টীকা ১, মাকতাবাতুছ ছাকাফা, অষ্টম সংস্করণ ১৪১৬ হি.)

• বাইতুল্লাহকে চিত্র ও মূর্তি থেকে পবিত্র করার বিষয়ে

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদক্ষেপ

এবার আমরা পাঠকবৃন্দের সামনে সহীহ হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যাদির মাধ্যমে এই বিষয়টা পেশ করতে চাই যে, মক্কাবিজয়ের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ ও তার চারপাশ থেকে কত গুরুত্বের সাথে সকল ধরনের মূর্তি ও প্রাণীর প্রতিকৃতি অপসারণ করেছেন এবং কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া কীভাবে সকল ছবি, মূর্তি ও ভাস্কর্য বিলুপ্ত করেছেন।

কা'বার বাইরে যে তিনশত ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল সেগুলোর ক্ষেত্রে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই মু'জিয়া প্রকাশ পেয়েছিল যে, তাঁর হাতের লাঠির শুধু ইশারার দ্বারাই সেগুলো ভূপাতিত হয়ে যাচ্ছিল। আর যে মূর্তিগুলো বিভিন্ন স্থানে রাখা ছিল তা তিনি বের করে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। কা'বার বিভিন্ন স্তম্ভে এবং ভেতরের ও বাইরের দেয়ালে যত ছবি অঙ্কিত ও খোদিত ছিল সব মুছে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় একাধিক ব্যক্তিকে এই দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর আদেশে সকল চিত্র মুছে ফেলা হয় এবং এ

সংবাদ জানানোর পর তিনি বাইতুল্লাহর ভেতরে প্রবেশ করেন। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে খোদিত ছবিগুলো মুছে ফেলার পরও কিছু কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে দেখে পুনরায় ভালোভাবে মুছে ফেলার আদেশ দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম পানিতে কাপড় ভিজিয়ে ডলে ডলে সমান করার চেষ্টা করলেন। এরপরও যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সেগুলোতে জাফরানের রং লাগিয়ে দিলেন। কিছু কিছু খোদিত চিত্রে মাটির লেপ দিয়ে জাফরানের রং লাগানো হল। এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এবার হাদীসগুলো লক্ষ্য করুন। সবগুলো হাদীসই মানের বিচারে 'সহীহ' বা 'হাসান' পর্যায়ে উন্নীত এবং সনদ মুত্তাছিল ও অবিচ্ছিন্ন।

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন তখন বাইতুল্লাহর আশে পাশে তিনশ ষাটটি মূর্তি বিদ্যমান ছিল। তিনি প্রত্যেক মূর্তির দিকে হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন:

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي
الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ.

“সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। সত্য আগমন করেছে আর মিথ্যা না পারে কোনো কিছু সূচনা করতে, না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।” (সহীহ বুখারী হাদীস ২৪৭৮, ৪২৮৭, ৪৭২০; সহীহ মুসলিম হাদীস ১৭৮১)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, লাঠির শুধু ইস্তিকের দ্বারাই মূর্তিগুলো ধরাশায়ী হচ্ছিল।

[সীরাতে ইবনে হিশাম খ. ৭, পৃ. ১১৪ (আররওয়ুল উনুফ-এর সাথে মুদ্রিত সংস্করণ) তারীখুল ইসলাম শামসুদ্দীন যাহাবী খ. ২, পৃ. ৩১৮ ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতিতে, দি লাইফ অব মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুবাদে আলফ্রেড গিয়োম পৃ. ৫৫২]

এই কথাটা হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীসেও এসেছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীস : ৩৮০৬০)

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় এলেন তখন বাইতুল্লাহয় মিথ্যা উপাস্যদের থাকা অবস্থায় তাতে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাঁর আদেশে ওই মূর্তি ও প্রতিকৃতিগুলো বের করা হল। এগুলোর মধ্যে ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাইল

(আ.)-এরও প্রতিকৃতি ছিল। তাঁদের হাতে ছিল ভাগ্যানির্ধারণী শর! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন, তাদের জানা ছিল যে, এই দুইজন কখনও শর দ্বারা ভাগ্যগণনার চেষ্টা করেননি। (সহীহ বুখারী হা. ৪২৮৮, ১৬১৯; সুনানে আবু দাউদ হা. ২০২০)

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসে প্রতিকৃতিসমূহকে মিথ্যা উপাস্য বলা হয়েছে। ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাইল (আ.)-এর প্রতিকৃতি পূজার মূর্তি ছিল না।

দেয়ালে ও স্তম্ভে অঙ্কিত ছবি

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইতুল্লাহয় বিভিন্ন প্রতিকৃতি দেখলেন তখন তাতে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং সেগুলো বিলুপ্ত করার আদেশ দিলেন। তাঁর আদেশে সেগুলো মুছে দেওয়া হয়। (সহীহ বুখারী হা. ৩৩৫২; সহীহ ইবনে হিব্বান হা. ৫৮৬১)

৫. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)কে আদেশ দিলেন, তিনি যেন কাবা ঘরের সব ছবি মুছে ফেলেন। সকল ছবি মোছার আগ পর্যন্ত তিনি কাবায় প্রবেশ করেননি। (সুনানে আবু দাউদ হা. ৪১৫৩; সহীহ ইবনে হিব্বান হা. ৫৮৫৭; তবাকাতে ইবনে সা'দ খ. ২, পৃ. ৩২০; আরো দেখুন, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা খ. ২০, পৃ. ৪৭৯ হা. ৪/৩৮০৭৪)

যে ছবিগুলো মোছার পরও কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিল তার উপরও তিনি আপত্তি করেছেন এবং ভালোভাবে মোছার কাজে নিজেও অংশগ্রহণ করেছেন।

৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করে ইবরাহীম (আ.) ও মারইয়াম (রা.)-এর ছবি দেখলেন। তখন তিনি বললেন, এঁরা তো (যাদের চিত্র এই লোকেরা অঙ্কন করেছে) (আল্লাহর এই বিধান) শুনেছেন যে, ফেরেশতারা সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যাতে কোনো চিত্র থাকে। (সহীহ বুখারী হা. ৩৩৫১; সহীহ ইবনে হিব্বান হা. ৫৮৫৮)

অর্থাৎ চিত্র সম্পর্কে এঁরা কখনও সম্মত থাকতে পারেন না। অথচ জাহেলরা তাঁদেরই প্রতিকৃতি তৈরি করেছে। এই বর্ণনায় মারইয়াম (রা.)-এর প্রতিকৃতির উপরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপত্তি জানিয়েছেন। এরপরও তিনি তা বহাল রাখতে বলবেন?

৭. উসামা (রা.) বলেন, আমি কাবা ঘরের ভেতরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তখন কিছু চিত্র তার দৃষ্টিগোচর হল। তিনি এক বালতি পানি আনতে বললেন। আমি পানি উপস্থিত করলাম। তিনি তখন ছবিগুলো মুছতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন—

قَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ

“আল্লাহ তাদের বিনাশ করুন যারা এমন কিছুর ছবি অঙ্কন করে যা তারা সৃষ্টি করতে পারে না।” (মুসনাদে আবু দাউদ তুয়ালিসী পৃ. ৮৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা. ৩৮০৬৫; শরহু মাআনিল আছার, তহাবী খ. ৪, পৃ. ৩৮৩; আলআহাদীসুল মুখতারাহ, জিয়াউদ্দীন মাকদেসী-সূত্র সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, নাসীরুদ্দীন আলবানী খ. ২, পৃ. ৭৩১; আনিসুস সারী ফী তাখরীজি আহাদীসি ফাতহিল বারী, নাবীল ইবনে মানসূর খ. ৪, পৃ. ৩০৬৮)

যে প্রতিকৃতিগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা সত্ত্বেও পুরোপুরি মোছা সম্ভব হয়নি তার উপর জাফরানের প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল।

৮. জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ্য় প্রবেশ করে দুই রাকাত নামায পড়লেন। সেখানে ইবরাহীম (আ.) ইসমাঈল (আ.) ও ইসহাক (আ.)-এর প্রতিকৃতি দৃষ্টিগোচর হল। তারা ইবরাহীম (আ.)-এর হাতে ভাগ্যনির্ধারণী ‘শর’ স্থাপন করেছিল, যেন তিনি সেগুলোর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করছেন! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা ওই মূর্খদের বিনাশ করুন, ইবরাহীম (আ.) তো কখনও শর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করেননি!

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফরান আনতে বললেন এবং সেগুলোর উপর জাফরানের প্রলেপ দিয়ে দিলেন।

فَلَطَّخَهُ بِتِلْكَ التَّمَائِيلِ

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা. ৩৮০৬০; মুসনাদে ইবনে আবী শাইবা-আলমাতালিবুল আলিয়া, ইবনে হাজার আসকালানী হাদীস ৪৩০৩)

৯. একই বিবরণ মুসাফে ইবনে শাইবার বর্ণনাতেও এসেছে।

মুসাফে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাইবা (রা.)কে বললেন—

اكفني هذه

এই বিষয়টা সমাধা কর। কিন্তু কাজটা ছিল কঠিন। (কেননা, কিছু ছবি সহজে মুছে ফেলা যাচ্ছিল না।) একজন পরামর্শ দিলেন যে, এগুলোতে মাটির প্রলেপ

দিয়ে উপরে জাফরানের রং লাগিয়ে দাও। পরে তাই করা হল। (তারীখুল ইসলাম, শামসুদ্দীন যাহাবী খ. ২ পৃ. ৩১৯)

মোটকথা, হাদীস ও ইতিহাসের স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে অসংখ্য সূত্রে যেসব তথ্য এসেছে, নিবন্ধকার সেগুলো পরিত্যাগ করেছেন এবং আযরাকীর একটি কাহিনীগ্রন্থের ভিত্তিহীন বর্ণনা সীরাতে ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহয় কিছু ছবি বহাল রেখেছিলেন! বিষয়টা অত্যন্ত দুঃখজনক।

ধারণা করা যায় যে, ঈসা (আ.) ও তাঁর জননী মারইয়াম (রা.)-এর ছবি খোদিত ছিল, যা মাটি ও জাফরান দ্বারা লেপে দেওয়া হয়েছিল। কালক্রমে কোনো কোনো স্থান থেকে সেই প্রলেপ খসে পড়লে নীচের খোদিত ছবি প্রকাশিত হয়ে যায়। এই অবস্থাটা যাদের দৃষ্টি-গোচর হয়েছে তারা বর্ণনা করেছেন যে, বাইতুল্লাহর স্তম্ভে ঈসা (আ.) ও মারইয়াম (রা.)-এর ছবি দেখেছি। জিজ্ঞাসা করা হল, এখন সেগুলো কোথায়? উত্তরে বলেছেন, ৬৪ হিজরীর অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত হয়ে গেছে।

নিবন্ধকার সম্ভবত কোনো সূত্র থেকে এই বর্ণনাটা জেনেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করে রায় দিয়েছেন যে, এই ছবি ৬৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাইতুল্লাহর শোভাবর্ধন করছিল এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও তা বাইতুল্লাহয় বিদ্যমান ছিল!

বলাবাহুল্য, এটা নিছক একটা কল্পনা। যে দু'একজন বলেছেন যে, আমরা বাইতুল্লাহয় অমুক অমুকের ছবি দেখেছি তারা একই সাথে একথাও বলেছেন যে—

وَأَرَاهُمَا وَالطَّمَسُ عَلَيْهِمَا

“ওই ছবিগুলো যে মোছা হয়েছিল তা দেখা যাচ্ছিল।” (আযরাকী ১৬৮)

পরিস্কার কথা যে, মাটি ও জাফরান লাগিয়ে বিলুপ্ত করার পর যখন কোনো কোনো স্থান থেকে তা খসে পড়েছিল তখন তা দৃষ্টিগোচর হয়। তাহলে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও এই ছবি ছিল, কিন্তু তা ছিল মাটি ও জাফরানের প্রলেপের নীচে।

এই হল প্রকৃত অবস্থা। কিন্তু একেই তারা বানিয়েছেন যে, এই ছবি-নাউযবিলাহ-অমুক সন পর্যন্ত বাইতুল্লাহর শোভাবর্ধন করছিল!

বাইতুল্লাহ তো আল্লাহর ঘর, মসজিদ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিজের ঘরেও ছবি রাখা বরদাশত করতেন না। সহীহ বুখারীতে (৫৯৫২) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে—

لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ التَّصَالِيْبُ إِلَّا نَقَضَهُ، وَفِي نُسْخَةٍ: تَصَاوِيرُ.

“তিনি তাঁর ঘরে ছবি অঙ্কিত কিছু দেখলে তা বিনষ্ট করে দিতেন।”

একবার মদীনাতে হযরত আলী (রা.)কে পাঠালেন যে, যেখানেই কোনো ছবি দেখবে তা মুছে দেবে। -সহীহ মুসলিম ৯৬৯

যিনি ঘরে-বাইরে কোথাও ছবি রাখার অনুমোদন দেননি; বরং তা মুছে ফেলার আদেশ করেছেন, তিনি বাইতুল্লাহ্‌য় কোনো ছবি, বিশেষত নারীর ছবি বহাল রাখতে বলবেন যেখানে শুধু ছবিই নয় পর্দাহীনতাও রয়েছে?

আয়েশা (রা.) বলেছেন, বাইআত গ্রহণের সময় তাঁর হাত কখনও কোনো নারীর হাত স্পর্শ করেনি। তিনি শুধু মৌখিক বাইয়াত নিতেন।

উম্মে আতিয়া (রা.) বলেছেন, এ মৌখিক বাইআত পর্দার আড়াল থেকে বা অন্য কারো মাধ্যমে নেওয়া হত। (সহীহ বুখারী হা. ৪৮৯১; সহীহ মুসলিম হা. ৪৯৭৯; ফাতহুল বারী ৮/৫০৫ দারুন্ন রায়ান, কায়রো, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৭ হি.)

সুতরাং তাঁর সম্পর্কে এ মিথ্যাচার করা যে, সকল চিত্র মোছার আদেশ দিয়েও শুধু একজন নারীর ছবির উপর তিনি হাত রেখেছেন এবং তা বহাল রাখার অনুরোধ করেছেন কতখানি ন্যাকারজনক হতে পারে!

খোলাফায়ে রাশেদীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। এটা তো হতেই পারে না যে, চিত্র সম্পর্কে তাঁর এই সকল সতর্কবাণী জানা সত্ত্বেও তারা এ বিষয়ে উদাসীনতার পরিচয় দেবেন।

মক্কা বিজয়ের সময়েরই আরেকটি ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহকে মুশরিকদের সকল নিদর্শন থেকে পবিত্র করার পর কিছুক্ষণ তাতে অবস্থান করে যখন বের হলেন তখন উছমান ইবনে তলহা (যাঁর কাছে কাবার চাবি ছিল) তাকে ডেকে বললেন, আমি তোমাকে ওই শিং দু'টি ঢেকে দেওয়ার আদেশ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। সেগুলো ঢেকে দিও। ঘরে এমন কোনো বস্তু থাকা উচিত নয়; যা নামাযীর মনোযোগ বিনষ্ট করে।

لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغُلُ الْمُصَلِّيَّ

(সুনানে আবু দাউদ হা. ২০২৩; মুসনাদে আহমদ হা. ১৬৬৩৭; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হা. ৯০৮৩; আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী খ. ২, পৃ. ৪৩৮)

এই হাদীসটি সহীহ। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শিং দু'টি ছিল ওই দুয়ার, যা ইসমাইল (আ.)-এর বদলে হযরত ইবরাহীম (আ.) কুরবানী করেছিলেন। শিং দুটো ঢেকে দেওয়ার আদেশ যিনি করছেন তিনি নারীর ছবি রেখে দিতে বলবেন?

সবশেষে বিনয়ের সাথে একটি প্রশ্ন করতে চাই যে, আপনাদের ধারণায় যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চিত্র ও ভাস্কর্যের মধ্যে আপত্তির কিছু না থেকে থাকে তাহলে অন্য সব চিত্র মুছে ফেলার আদেশ কেন দেওয়া হল? সেগুলোও থাকত অন্তত মিল্লাতে ইবরাহীম-এর ইমাম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতিকৃতিটা অক্ষত থাকত, শুধু তার হাতে যে ভাগ্য-শর মূর্খেরা স্থাপন করেছিল সেটা বাদে?

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটি ভিত্তিহীন বর্ণনাকে তারা এভাবে অবলম্বন করছেন! যদি প্রকৃতপক্ষেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আদর্শ হয়ে থাকেন তবে তাঁর জীবনাদর্শ ভিত্তিহীন বর্ণনা থেকে নয়, বিশুদ্ধ ও সহীহ বর্ণনা থেকে গ্রহণ করা কর্তব্য। সকল সহীহ হাদীসের বক্তব্য এ বিষয়ে অভিন্ন যে, মক্কাবিজয়ের সময় বাইতুল্লাহর ভেতরে-বাইরে এবং চারপাশে না কোনো মূর্তি অবশিষ্ট রাখা হয়েছিল না কোনো চিত্র।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে চিত্র ও চিত্রকর

পাঠকবৃন্দ ওই সহীহ হাদীসগুলোর উপর একবার নজর বুলাতে পারেন যেগুলোতে চিত্র ও চিত্রকর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফয়সালা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১. হযরত আমর ইবনে আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, “নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রেরণ করেছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার, মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে ফেলার এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার ও তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক না করার বিধান দিয়ে।” (সহীহ মুসলিম হা. ৮৩২)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحِبُّوا مَا خَلَقْتُمْ.

“যারা এই সব প্রতিকৃতি প্রস্তুত করে তাদেরকে কেয়ামতের দিন আযাবে নিশ্কেপ করা হবে। তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছিলে তাতে প্রাণ সঞ্চার কর।” (সহীহ বুখারী হা. ৫৯৫১; সহীহ মুসলিম হা. ২১০৭)

৩. মুসলিম ইবনে সুবাইহ্ বলেন- “আমি মাসরুকের সঙ্গে একটি ঘরে ছিলাম যেখানে মারইয়াম (রা.)-এর প্রতিকৃতি ছিল। মাসরুক জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি কিসরার প্রতিকৃতি? আমি বললাম, না, এটি মারইয়াম (রা.)-এর প্রতিকৃতি। তখন মাসরুক বললেন-

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ.

“আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা.) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারীরা কেয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাবের মুখোমুখি হবে।” (সহীহ মুসলিম হা. ২১০৯)

৪. আবু যুরআ (রহ.) বলেন-

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ، فَرَأَى فِيهَا التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، وَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً.

“আমি আবু হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে মারওয়ানের গৃহে প্রবেশ করলাম। সেখানে কিছু চিত্র তাঁর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি তখন বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي.

“ওই লোকের চেয়ে বড় জালেম আর কে যে আমার সৃষ্টির মতো কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চায়। (তাদের যদি সামর্থ্য থাকে তবে) সৃষ্টি করুক একটি কণা, একটি শস্য কিংবা একটি যব!” (সহীহ মুসলিম হা. ২১১১; সহীহ বুখারী হা. ৫৯৫৩)

৫. হযরত আবু তলহা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ.

“ওই গৃহে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না যাতে কুকুর বা ছবি রয়েছে।” (সহীহ বুখারী ৫৯৪৯; সহীহ মুসলিম হা. ২১০৬)

৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ أَوْ تَصَاوِيرٌ.

“ফেরেশতারা ওই ঘরে প্রবেশ করেন না যাতে মূর্তি বা ছবি রয়েছে।” (সহীহ মুসলিম ২১১২)

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفَخَ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

“আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো প্রতিকৃতি তৈরি করবে তাকে কেয়ামতের দিন বাধ্য করা হবে যেন সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে, অথচ সে তা করতে সক্ষম হবে না।” (সহীহ বুখারী হা. ৫৯৬৩; সহীহ মুসলিম হা. ২১১০)

৮. সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (রহ.) বলেন—

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صُنْعَةِ يَدَيَّ، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أَحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفَخَ فِيهِ الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهِ أَبَدًا، فَرَأَى الرَّجُلُ رُبُوعَةً شَدِيدَةً وَأَصْفَرَ وَجْهَهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلَّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

“আমি (হযরত আব্দুল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে একজন লোক এসে তাঁকে বলল, হে ইবনে আব্বাস, আমি একজন হস্তশিল্পী, হাতে তৈরি প্রতিকৃতির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করি। (এই পেশা কি বৈধ?) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমি শুধু তোমাকে সে কথাই বলব, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে শুনেছি। আমি তাকে বলতে শুনেছি, ‘যে কেউ কোনো প্রতিকৃতি তৈরি করে আল্লাহ তাআলা

তাকে আযাব দেবেন যে পর্যন্ত না সে তাতে প্রাণ দান করে, অথচ সে প্রাণ দান করতে পারবে না।’ একথা শুনে সে অস্থির হয়ে পড়ল এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, ‘প্রতিকৃতিই যদি তৈরি করতে হয় তবে প্রাণহীন বস্তুর প্রতিকৃতি তৈরি করবে।’ (সহীহ বুখারী হা. ২২২৫)

৯. হযরত আবু জুহাইফা (রা.) বলেন—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغْيِ، وَلَعْنِ أَكْلِ الرِّبَا وَمُوكَلَّهِ، وَالْوَأْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُصَوِّرِ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য এবং ব্যভিচারের দ্বারা উপার্জিত অর্থ। আর লানত করেছেন সূদ ভক্ষণকারী ও সূদ প্রদানকারীর উপর, উক্কি অঙ্কনকারী ও উক্কি গ্রহণকারীর উপর এবং প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারীর উপর।” (সহীহ বুখারী হা. ৫৯৬২)

১০. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন—

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ، فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ، وَقَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَضَاهُونَ بِخُلُقِ اللَّهِ، قَالَتْ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَاهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ.

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর থেকে ফিরলেন। আমি কক্ষের দ্বারে একটি পর্দা ঝুলিয়ে ছিলাম, যাতে ছবি অঙ্কিত ছিল। তিনি তা খুলে ফেললেন এবং বললেন, কেয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিন আযাব দেওয়া হবে যারা আল্লাহর সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।’ উম্মুল মুমিনীন বলেন, তখন আমরা তা কেটে ফেললাম এবং একটি বা দুইটি বালিশ বানালাম।” (সহীহ বুখারী হা. ৫৯৫৪; সহীহ মুসলিম হা. ২১০৭)

১১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন—

وَعَدَ جَبْرِيلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ.

“একবার হযরত জিব্রীল (আ.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

কাছে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু আসছিলেন না। এতে নবীজীর কষ্ট হচ্ছিল। তিনি তখন বাইরে বের হলেন এবং জিব্রীল (আ.)এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পেয়েছেন বলে অভিযোগ করলেন। তখন জিব্রীল (আ.) বললেন, আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করি না, যাতে কোনো চিত্র থাকে বা কুকুর থাকে।” (সহীহ বুখারী হা. ৫৯৬০)

১২. আবুল হাইয়াজ আসাদী (রহ.) বলেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব আমাকে বললেন—

أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ لَا تَدْعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتُهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ.

“আমি কি তোমাকে এমন কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করব না, যার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? (তা এই যে) তুমি সকল প্রাণীর মূর্তি বিলুপ্ত করবে এবং সকল সমাধি-সৌধ ভূমিসাৎ করে দেবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে ...এবং সকল চিত্র মুছে ফেলবে।” (সহীহ মুসলিম হা. ৯৬৯)

১৩. আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন বললেন—

أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَا يَدْعُ بِهَا وَثْنًا إِلَّا كَسَرَهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّاهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا.

“তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে মদীনায় যাবে এবং যেখানেই কোনো মূর্তি পাবে তা ভেঙ্গে ফেলবে, যেখানেই কোনো সমাধি-সৌধ পাবে তা ভূমিসাৎ করে দেবে এবং যেখানেই কোনো চিত্র পাবে তা মুছে দেবে?”

আলী (রা.) এই দায়িত্ব পালন করলেন। ফিরে আসার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

مَنْ عَادَ لَصْنَعَةِ شَيْءٍ مِّنْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

“যে কেউ পুনরায় ওই সব বস্তু তৈরি করবে সে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রতি নাযিলকৃত দ্বীনকে অস্বীকারকারী।” (মুসনাদে আহমদ হা. ৬৫৯)

১৪. আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—

اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرٌ، فَإِنَّمَا أَنْ تَقْطَعَ رُؤُوسَهَا أَوْ تَجْعَلَ
بَسَاطًا يُؤْطَأُ، فَإِنَّمَا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرٌ.

“একদিন জিব্রীল (আ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, ভেতরে আসুন। জিব্রীল (আ.) বললেন, কীভাবে আসব, আপনার গৃহে ছবিযুক্ত পর্দা রয়েছে। আপনি হয়তো এই ছবিগুলোর মাথা কেটে ফেলুন কিংবা তা বিছানায় ব্যবহার করুন, যা পদদলিত হবে। কেননা, আমরা ফেরেশতারা ওই গৃহে প্রবেশ করি না যাতে ছবি থাকে।” (সুনানে নাসায়ী হা. ৫৩৬৫; সহীহ ইবনে হিব্বান ৫৮৫৩)

১৫. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতার সময় তাঁর জনৈকা স্ত্রী একটি গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। গির্জাটির নাম ছিল মারিয়া। উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা ইতিপূর্বে হাবাশায় গিয়েছিলেন। তাঁরা গির্জাটির কারুকাজ ও তাতে বিদ্যমান প্রতিকৃতিসমূহের কথা আলোচনা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয্যা থেকে মাথা তুলে বললেন—

أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا
فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ، أُولَئِكَ شَرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ.

“তাদের কোনো পুণ্যবান লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর ইবাদতখানা নির্মাণ করত এবং তাতে প্রতিকৃতি স্থাপন করত। এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।” (সহীহ বুখারী হা. ১৩৪১; সহীহ মুসলিম হা. ৫২৮)

এই হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ পূর্বের শরীয়তেও হারাম ছিল। তা না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহর নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করতেন না।

বাইবেলে এখনও পর্যন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরির অবৈধতা বিদ্যমান রয়েছে। বলা হয়েছে—

"Do not make for yourselves images of anything in heaven or on earth or in the water under the earth." (HOLY BIBLE (Good news Bible) p. 80, The Bible society of India)

মোটকথা, প্রাণীর প্রতিকৃতি প্রস্তুত করা এবং এর মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার দুটোই শরীয়তে নিষিদ্ধ ও হারাম। এ প্রসঙ্গে যে হাদীসগুলো এসেছে তা অকাটা ও

মুতাওয়াতির। ইসলামের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য ও ইজমা রয়েছে। এটা মুমিনদের ঐকমত্যপূর্ণ পথ। আর কুরআন মজীদে মুমিনদের ঐকমত্যপূর্ণ পথ পরিহার করাকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বলা হয়েছে। (সূরা নিসা ১৫)

প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণের অবৈধতা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান। এতে পূজার শর্ত নেই। এই অবৈধতার কারণ হল আল্লাহর সৃষ্টিগুণের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ, যা বিভিন্ন হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

আমরা আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যেই আমাদেরকে অবস্থান করতে হবে। আল্লাহ তাআলা প্রাণীর আকৃতি দানকে একমাত্র তাঁরই অধিকার সাব্যস্ত করেছেন। কেননা আকৃতির মধ্যে শুধু তিনিই প্রাণ দান করতে পারেন। যার পক্ষে প্রাণ দান সম্ভব নয়, তাকে আল্লাহ আকৃতি নির্মাণেরও অনুমতি দেন না। একে তিনি তাঁর সঙ্গে মোকাবেলা করার সমার্থক বলে মনে করেন।

তবে মানুষের স্বভাবে অঙ্কন ও নির্মাণের যে প্রেরণা রয়েছে তার জন্য আল্লাহ তাআলা জড়বস্তু বা প্রাণহীন বস্তুর চিত্র-প্রতিকৃতি প্রস্তুতের অনুমতি দিয়েছেন।

উপরের আলোচনা থেকে প্রাণীর প্রতিকৃতি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা ও পদক্ষেপ আমরা জেনেছি। তেমনি মক্কা-বিজয়ের সময় সব ধরনের চিত্র ও মূর্তি সরিয়ে দেওয়ার বিষয়েও তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপ উপরে আলোচিত হয়েছে। এরপরও কি চিন্তা করা যায় যে, তিনি বাইতুল্লাহ্য় কোনো ছবি রাখার অনুমতি দেবেন, উপরন্তু একজন নারীর ছবি?

দুই

নিবন্ধকারের দ্বিতীয় বক্তব্য এই—

“আমরা সবাই জানি, হজরত আয়েশা (রা.) নয় বছর বয়সে নবীজীর (সা.) সহধর্মিনী হন। তিনি পুতুল নিয়ে খেলতেন। নবীজীর তাতে কোনো আপত্তি ছিল না, বরং তিনিও মজা পেতেন এবং কৌতূহল প্রদর্শন করতেন। (মুহাম্মদ আলী আল-সাবুনী, রাওয়াইউল বয়ন, ২য় খ, পৃষ্ঠা ৪১৩)”

এই হাদীসটি সহীহ। এখানে ‘রাওয়াইউল বয়ানের’ উদ্ধৃতি না দিয়ে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দেওয়া উচিত ছিল।

তবে হাদীসটি আলোচ্য বিষয়ে আপ্রাসঙ্গিক। এটা এসেছে মেয়েদের খেলনা

সম্পর্কে। এখান থেকে মূর্তি ও ভাস্কর্যের বৈধতা আহরণের প্রয়াস কি অপরিণত চিন্তার প্রমাণ বহন করে না?

চিন্তাশীল মানুষ আলোচ্য বিষয়ের বিধান উন্মুল মুমিনীন-এর ওই হাদীস থেকে আহরণ করবেন যেখানে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর থেকে ফিরলেন। আমি দরজায় একটি ঝালরবিশিষ্ট পর্দা ঝুলিয়ে ছিলাম, যাতে পাখাওয়ালা ঘোড়ার ছবি অঙ্কিত ছিল। তিনি তা খুলে ফেলার আদেশ দিলেন। আমি তা খুলে ফেললাম। (সহীহ মুসলিম হা. ২১০৭)

আম্মাজান যখন ছোট ছিলেন তখন পাখাওয়ালা ঘোড়ার পুতুল ছিল তার খেলার সামগ্রী। এর উপর নবীজী আপত্তি করেননি, কিন্তু যখন তিনি বড় হলেন এবং ঘোড়ার ছবিসুজ পর্দা ব্যবহার করলেন তখন নবীজী তা খুলে ফেলার আদেশ দিয়েছেন এবং তাকে সতর্ক করেছেন। এ সম্পর্কিত কিছু হাদীস ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি।

রাওয়াইউল বয়ানের পূর্ণ বয়ান কি লক্ষ করা হয়েছে

মক্কা মুকাররমার ‘কুল্লিয়াতুশ শরীয়া ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়া’এর উস্তাদ শায়খ মুহাম্মাদ আলী আসসাবুনীর কিতাব ‘রাওয়াইউল বয়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম মিনাল কুরআন’-এর উদ্ধৃতিতে ছোট মেয়েদের খেলনা বিষয়ক উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ওই গ্রন্থেই প্রতিকৃতি সম্পর্কে যে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে তা কেন নিবন্ধকারের দৃষ্টিগোচর হল না তা আমাদের বোধগম্য নয়। গ্রন্থকার সেখানে চিত্র ও মূর্তি সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এক স্থানে তিনি পরিষ্কার ভাষায় লেখেন—

“ইসলাম তাওহীদের ধর্ম এবং সে শিরকের প্রতিপক্ষ। শিরকের চেয়ে বড় গোনাহ ইসলামে নেই। এজন্য সে পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজার উপর প্রবলভাবে আক্রমণ করেছে। আর হাদীস শরীফ চিত্র ও চিত্রকরদের সম্পর্কে মৃত্যুর পয়গাম নিয়ে এসেছে। চিত্র ও প্রতিকৃতির ঘৃণ্যতা ও তা সংরক্ষণের নিষিদ্ধতা ঘোষণা করেছে। ইসলামে চিত্র ও মূর্তির নিষিদ্ধতা সম্পর্কে দ্বিধা-সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।” (রাওয়াইউল বয়ান খ. ১ পৃ. ৪০৬)

এরপর তিনি যে শিরোনাম দিয়েছেন তা হল—

الأدلة القاطعة على تحريم التصاوير.

“যে দলীলগুলো অকাট্যভাবে চিত্র অঙ্কনের অবৈধতা প্রমাণ করে।”

এই শিরোনামের অধীনে শুধু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকেই আটটি হাদীস উল্লেখ করে মন্তব্য করেন—

هذه النصوص، وأمثالها كثيرة، تدل دلالة قاطعة على حرمة التصوير، وكل من درس الإسلام علم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير، واقتناء الصور وبيعها، وكان يحطم ما يجده منها ...

“উপরোক্ত হাদীসগুলো এবং এর সমার্থক আরো অনেক হাদীস সুস্পষ্টভাবে প্রতিকৃতি তৈরির অবৈধতা প্রমাণ করে। ইসলাম সম্পর্কে জানাশোনা আছে এমন প্রত্যেকেই সন্দেহাতীতভাবে জানেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিত্র অঙ্কন, চিত্র সংরক্ষণ এবং চিত্র বিক্রি সবই নিষিদ্ধ ও হারাম করেছেন। তিনি এগুলো পেলে বিনষ্ট করে দিতেন।” (প্রাগুক্ত পৃ. ৪০৮)

পরবর্তী শিরোনাম—العلة في تحريم التصوير

চিত্র অঙ্কন অবৈধ ঘোষণার কারণ

এখানে তার আলোচনার সারকথা এই যে, চিত্র ও মূর্তি হারাম হওয়ার কারণ হল সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যে স্রষ্টার সাদৃশ্য গ্রহণ। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে এই কারণ উল্লেখিত হয়েছে।

তেমনিভাবে পৌত্তলিকতার প্রতিভূ মূর্তিকে পরিহার করা এবং আক্বীদা-বিশ্বাসকে শিরক ও মূর্তিপূজার মিশ্রণ থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে এই বিধানের পেছনে কার্যকর। কেননা অতীত জাতিসমূহে এ পথেই মূর্তিপূজার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। (প্রাগুক্ত পৃ. ৪০৯-৪১০)

গ্রন্থকার বৈধ ও অবৈধ দুই ধরনের চিত্র ও প্রতিকৃতির কথা আলোচনা করেছেন। অবৈধ প্রতিকৃতির মধ্যে চার ধরনের বস্তু উল্লেখিত হয়েছে— ১. কোনো মানুষ বা প্রাণীর মূর্তি। ২. হাতে অঙ্কিত প্রাণীর চিত্র। ৩. প্রাণীর পূর্ণ ছবি। ৪. কোনো প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত কিংবা কোথাও ঝোলানো ছবি।

প্রতিটির সাথে বুখারী মুসলিম থেকে হাদীস শরীফ উল্লেখ করেছেন। (প্রাগুক্ত পৃ. ৪১১-৪১২)

বৈধ প্রতিকৃতির মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে তিন ধরনের বস্তু— ১. জড়বস্তু,

বৃক্ষলতা, সাগর-নদী, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি প্রাণহীন বিষয়। ২. বিচ্ছিন্ন কোনো অঙ্গ যেমন শুধু হাত, চোখ, পা ইত্যাদি। ৩. ছোট মেয়েদের খেলার পুতুল। (প্রাগুক্ত পৃ. ৪১২-৪১৩)

যেহেতু নিবন্ধকার ‘রাওয়াইউল বয়ান’-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাই আশা করা যায়, এই প্রমাণসিদ্ধ আলোচনাও তিনি গ্রহণ করবেন।

তিন

নিবন্ধকারের তৃতীয় কথাটি এই—

“৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে হজরত ওমর (রা.) জেরুজালেম জয় করেন। প্রাণীর ছবিসহ একটি ধূপদানি তার হাতে আসে। তিনি সেটি মসজিদ-ই-নববীতে ব্যবহারের জন্য আদেশ দেন। (আব্দুল বাছির, ‘ইসলাম ও ভাস্কর্য শিল্প : বিরোধ ও সমন্বয়’, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুমদ পত্রিকা, জুলাই ২০০৫-জুন ২০০৬।)”

আব্দুল বাছির সাহেবের ওই প্রবন্ধ আমরা পড়েছি। সেখানে ধূপদানির গল্পের কোনো উদ্ধৃতি নেই। তাহলে ওই প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দেওয়া কি অর্থহীন হয়ে গেল না? আর প্রাবন্ধিকের অবস্থা তো এই যে, অনেক সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি হাদীস ও ফিকহ অস্বীকারের প্রবণতাকে গোপন রাখতে পারেননি। যাহোক, আমাদের জানা মতে এ বর্ণনার মূলসূত্র একটিই। সেখান থেকেই পরের লোকেরা বর্ণনা করে থাকেন। সেটা হচ্ছে ইয়াহইয়া ইবনুল হুসাইন-এর ‘আখবারুল মাদীনা।’ কিন্তু ওই গ্রন্থে বর্ণনাটির একটিমাত্র সনদ (সূত্র) রয়েছে, যে সনদের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি ‘আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আম্মার।’ এর সম্পর্কে জারহ-তাদীলের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন ‘লাইছা বিশাই’ বলে রায় দিয়েছেন। অর্থাৎ এই রাবী মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। না তার মধ্যে সততা আছে, না তার স্মৃতিশক্তি ভালো। ইয়াহিয়া ইবনে মায়ীন (রহ.)-এর এই সিদ্ধান্ত ‘কিতাবুল জারহি ওয়াত তাদীল’ ইবনে আবী হাতিম (খ. ৫ পৃ. ১৫৭) এবং সুয়ালাতুদ দারিমী-তে (পৃ. ১৬৯ দারুল মামুন লিত তুরাছ, দামেস্ক ১৪০০ হি.) সনদের সাথে উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত উমর (রা.)এর যুগে মসজিদে নববীতে ছবিযুক্ত ধূপদানি ব্যবহৃত হওয়া এবং খলীফা মাহদীর যুগে তা বিনষ্ট হওয়া—এই দুটো বিষয়ই ওই পরিত্যক্ত রাবীর বর্ণনা। তাহলে এই বর্ণনা এবং এর দ্বারা প্রমাণ দান দুটোই যে পরিত্যক্ত হবে তা তো বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ছবিযুক্ত ধূপদানি ব্যবহার আর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশিষ্ট

কারো ভাস্কর্য স্থাপন, দুটো কি এক কথা হল?

সর্বশেষ প্রশ্ন এই যে, হযরত উমর (রা.)-এর যে ঘটনা সহীহ ও মুত্তাছিল সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং নবুওতের রুচি ও আদর্শ ও নবী-আদর্শে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতেরও রুচি-প্রকৃতির সাথে যা পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ, সেটা প্রকাশ করতে কী অসুবিধা ছিল?

আসলাম (হযরত উমর (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম ও তাঁর একান্ত সহচর) বলেন, উমর (রা.) যখন শামে আগমন করলেন তখন খ্রিষ্টানদের কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করল। হযরত উমর (রা.) একথা বলে অপারগতা প্রকাশ করলেন যে-

إِنَّا لَا نَدْخُلُ كِنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّورِ الَّتِي فِيهَا، يَعْنِي التَّمَاثِيلَ

“তোমাদের গির্জাগুলোতে বিভিন্ন মূর্তি রয়েছে। এজন্য আমরা তাতে প্রবেশ করব না।” (মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক, খ. ১০, পৃ. ৩৯৮; হা. ১৯৪৮৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা. ২৫৭০৬, ৩৪৫৩৮)

চার

নিবন্ধকারের চতুর্থ কথাটি এই-

“পারস্যের কবি শেখ সাদীকে কি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু আছে? উনি হচ্ছেন সেই মানুষ যার ‘নাত’ এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা মিলাদে সব সময় পাঠ করে থাকেন।

‘বালাগাল উলা বি কামালিহি,
কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি ...

মাদ্রাসার ‘উত্তেজিত বালকেরা’ শুনলে হয়তো মন খারাপ করবে যে, শেখ সাদীর মাজারের সামনেই তার একটি মর্মর পাথরের ভাস্কর্য আছে। সেখানকার মাদ্রাসার ছাত্ররা তা ভাঙেনি।

ইসলামের দুজন মহান সুফিসাধক, যাঁদের বাস ছিল পারস্যে (বর্তমান ইরান) এঁদের একজনের নাম জালালুদ্দীন রুমী। অন্যজন ফরিদ উদ্দীন আত্তার (নিশাপুর)। তাঁর মাজারের সামনেও তাঁর আবক্ষ মূর্তি আছে। (বরফ ও বিপ্লবের দেশে, ড. আবদুস সবুর খান, সহকারী অধ্যাপক, ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।)।”

এই কথাগুলো যে আলোচ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রশ্ন এই যে, সাদী, রুমী ও আত্তার কি নিজেদের ভাস্কর্য নির্মাণ করিয়েছেন? কিংবা তাদের পূর্বসূরীদের কারো ভাস্কর্য তৈরি করিয়েছিলেন। মূর্খ লোকেরা তো তাদের উপাস্যদের ও বরণ্য ব্যক্তিদেরই ভাস্কর্য তৈরি করে থাকে। কিন্তু চিন্তাশীল মানুষ এ প্রসঙ্গে কোন বিষয়টা বিবেচনা করবেন—কে ভাস্কর্য নির্মাণ করল, না কার ভাস্কর্য নির্মাণ করা হল? জাহেলী যুগে মক্কার মুশরিকরা তো ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাইল (আ.)-এরও প্রতিকৃতি প্রস্তুত করেছিল। এতে কি এই দাবি করা যায় যে, প্রতিকৃতি নির্মাণ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর নীতি ছিল?!

যদি বরণ্য ব্যক্তিদের কর্ম ও সিদ্ধান্তের দ্বারাই দাবি প্রমাণ করতে হয় তাহলে ইতিহাস থেকে দেখাতে হবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম, আইম্মায়ে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে তাবেয়ীন এবং পরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে কেউ কারো কোনো ভাস্কর্য নির্মাণ করিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে, এটা প্রমাণ করা অসম্ভব। এই অপারগতার কারণেই কি সাদী ও সাদীর ভাস্কর্যকে এক করে ফেলা হল?

ভাস্কর্য নির্মাণে ইরানীরা খুব অগ্রসর। সেখানে শীয়া মতবাদের অনুসারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইসলামের সাথে শীয়া সম্প্রদায়ের (ইছনা আশারিয়া ও ইসমাইলিয়া) যে সম্পর্ক তা সচেতন মানুষের অগোচরে নয়। কিন্তু খোঁজ নিন, খোদ শীয়াদেরও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতেই রয়েছে যে, প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ এবং তার মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ('ফুরুউল কাফী' ও 'মান লা ইয়াহযুরুল ফকীহ' ইত্যাদি)

পাঁচ

নিবন্ধের শেষের দিকে লালন শাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'তার জীবনের সাধনাই ছিল আল্লাহর অনুসন্ধান।'।

ওই সাধনার স্বরূপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি না। সংক্ষেপে শুধু এটুকুই বলি যে, সে 'সাধনা' শালীন ও ভদ্রোচিত এবং পরিচ্ছন্ন ও বাস্তবসম্মত কোনো বিষয় ছিল না।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রশ্ন যদি আসে তবে তার একমাত্র পথ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। বলা বাহুল্য, লালন শাহ এই পথের পথিক ছিলেন না।

তার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে নিবন্ধকারের 'আল্লাহর অনুসন্ধান' শব্দ দুটির উপর বলতে

চাই যে, যারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছিলেন তাদের কারো ভাস্কর্য তৈরি করাও কি ইসলামসম্মত? এক্ষেত্রে তো মূলনীতি এটাই যে, যে যত বড় ব্যক্তিত্ব তার ভাস্কর্য নির্মাণ ততই ক্ষতি ও ভ্রষ্টতার কারণ।

ছয়

অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় এই যে, তিনি মূর্তিস্থাপন প্রতিরোধের মতো একটি ইসলামী কাজের প্রতিবাদ করছেন। প্রতিবাদ কি ভালো কাজের করা হয় না মন্দ কাজের? সত্য ও ন্যায়ের সামনে শির নত করাই ঈমান ও ভদ্রতার দাবি। সারা দেশে কত অশ্লীল ও গর্হিত কার্যকলাপ হচ্ছে সেসব বিষয়ে নিবন্ধকার কখনো প্রতিবাদের প্রয়োজন বোধ করেননি। এখন ভাস্কর্য প্রতিরোধের মতো একটি ঈমানী কাজের প্রতিবাদ করা তার কাছে খুব প্রয়োজনীয় হয়ে গেল!

সাত

প্রবন্ধকার লিখেছেন—

“বাংলাদেশে তো অনেক বড় বড় ইসলামি পণ্ডিত আছেন।
তারা কেন চুপ করে আছেন? তারা কেন পূজার মূর্তি এবং
ভাস্কর্যের ব্যাপারটা বুঝিয়ে সবাইকে বলছেন না?”

আমার জানা নেই ‘ইসলামী পণ্ডিত’ বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন। উলামায়ে কেরাম তো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, পূজার মূর্তি দুই কারণে নিষিদ্ধ—১. প্রাণীর প্রতিকৃতি। ২. পূজা, আর সাধারণ ভাস্কর্য প্রাণীর প্রতিকৃতি হওয়ার কারণে অবৈধ।

পূজা শুধু মূর্তিরই হয়নি, বিভিন্ন বস্তুও হয়েছে। সেগুলোর ভাস্কর্য তৈরি করাও নিষিদ্ধ ও হারাম। এটা পূজার কারণে। যদিও তা প্রাণীর প্রতিকৃতি নয়। তেমনি ছবি বা মূর্তির পেছনে কখনো শুধু সৌন্দর্যই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এটা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ প্রাণীর প্রতিকৃতি। আবার কখনো স্মরণ ও সম্মানের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। এটা যেমন প্রাণীর প্রতিকৃতি হওয়ার কারণে হারাম তেমনি এ কারণেও যে, এভাবে কোনো প্রতিকৃতির সম্মান দেখানো এক ধরনের ইবাদত বলেই গণ্য।

আধুনিক বুদ্ধিজীবী মহল যেসব ইসলামী পণ্ডিতের প্রতি প্রসন্ন, ড. ইউসুফ কারযাভী তাদের অন্যতম। অনেকটা তাঁরই সমশ্রেণীয় আরেকজন পণ্ডিত মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আলহাজারী। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ এদের হয়েছিল। নিবন্ধকারের অনুরোধক্রমে ভাস্কর্য সম্পর্কে তাঁদের সিদ্ধান্তও উল্লেখ করছি।

১. তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক আলাপচারিতায়, যেখানে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বও উপস্থিত ছিলেন, ভাস্কর্য সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান হাজারী (১২৯১ হি.-১৩৭৬ হি.) বলেছেন, 'ইসলামী শরীয়তে এটা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। এখানে বিশিষ্ট ও কীর্তিমান ব্যক্তিদের স্মৃতিরক্ষার প্রশ্ন যদি আসে তবে সে জন্য ভাস্কর্য নির্মাণই একমাত্র পন্থা নয়। আমরা তাদের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারি। তেমনি ইতিহাসের পাতায় তাদের কর্ম ও অবদান সংরক্ষিত থাকবে। এভাবে অধিকতর উত্তম ও ফলপ্রসূ পন্থায় তাদের স্মৃতিরক্ষা হতে পারে।

আসলে সব বিষয়ে পাস্চাত্য সভ্যতার অন্ধঅনুসরণ সভ্যতা নয়, বরং নিন্দনীয়। আমরা তাদের ওই অংশটুকু গ্রহণ করব যা আমাদের জন্য উপযোগী। আর যা আমাদের জন্য উপযোগী নয় তা আমরা পরিত্যাগ করব। এটা অপরিহার্য নয় যে, তাদের সকল বিষয় আমাদের জন্য উপযোগী হবে কিংবা তাদের কাছে যা কিছু নিন্দিত তা বাস্তবেও নিন্দনীয় হবে। সর্বাবস্থায় আমাদেরকে শরীয়তের সীমারেখার ভেতরেই অবস্থান করতে হবে। শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় আমরা গ্রহণ করতে পারি না।" (আলফিকরুস সামী খ. ২, পৃ. ৪২৩-৪২৫ আলমাকতাবাতুল ইলমিয়া, মদীনা মুনাওরা, ১৩৯৭ হি.)

২. ড. ইউসুফ কারযাভী বলেন, 'ইসলামে মূর্তি ও ভাস্কর্য অবৈধ।'

এই বিধানগত দিক ছাড়াও ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও চেতনার সাথে মূর্তি ও ভাস্কর্যের বিরোধ সম্পর্কে প্রমাণসিদ্ধ আলোচনা করেন। সারসংক্ষেপ তুলে দিচ্ছি:

ক. ইসলামে প্রাণীর প্রতিকৃতি নিষিদ্ধ হওয়ার অন্যতম তাৎপর্য হল, মুসলমানের চিন্তা-চেতনা এবং মন-মানসকে শিরকের কলুষ থেকে পবিত্র রাখা। তাওহীদের বিষয়ে ইসলাম অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং এটা অত্যন্ত যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত। কেননা, অতীত জাতিসমূহে মূর্তির পথেই শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

খ. কোনো কোনো ভাস্কর তার নির্মিত বস্তুর ব্যাপারে এতই মুগ্ধতার শিকার হয়ে যায় যে, যেন ওই প্রস্তরমূর্তি এখনই জীবন্ত হয়ে উঠবে! এখনই তার মুখে বাক্যের স্ফূরণ ঘটবে! বলাবাহুল্য, এই মুগ্ধতা ও আচ্ছন্নতা তাকে এক অলীক বোধের শিকার করে দেয়। যেন সে মাটি দিয়ে একটি জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করে ফেলেছে! এজন্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'যারা এইসব প্রতিকৃতি প্রস্তুত করে তাদেরকে কেয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, 'যা তোমরা সৃষ্টি করেছিলে তাতে প্রাণসঞ্চার কর।'

গ. আরো দেখা যায় যে, এই শিল্পের সাথে জড়িতরা কোনো সীমারেখার পরোয়া করে না। ফলে নগ্ন ও অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি, মূর্তিপূজার বিভিন্ন চিত্র ও নিদর্শন ইত্যাদি সবকিছুই নির্মিত হতে থাকে।

ঘ. তদুপরি এগুলো হচ্ছে অপচয় ও বিলাসিতার পরিচয়-চিহ্ন। বিলাসী লোকেরা বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত প্রতিকৃতিসমূহের মাধ্যমে তাদের কক্ষ, অট্টালিকা ইত্যাদির 'সৌন্দর্য বর্ধন' করে থাকে। ইসলামের সাথে এই অপচয় ও বিলাসিতার কোনো সম্পর্ক নেই।

কীর্তিমানদের স্মৃতিরক্ষার প্রশ্নে ইসলামী আদর্শ এবং অনৈসলামিক পদ্ধতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'মানুষ যত বড়ই হোক না কেন তার প্রকৃত অবস্থা থেকে তাকে উন্নীত করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দিত। স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের সম্পর্কেও সাবধান করে বলেছেন, 'তোমরা আমার এমন অবাস্তব প্রশংসা করো না যেমন খৃষ্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে করেছে। তোমরা আমার সম্পর্কে বলবে, আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।' (সহীহ বুখারী)

শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যাপারে যে দ্বীনের আদর্শ এই, সে দ্বীন কখনও কোনো মানুষের সম্মানে মূর্তির মতো স্মারকস্তুম্ভ নির্মাণে সম্মত হতে পারে না, যার পেছনে অজস্র অর্থ ব্যয় করা হবে, যার প্রতি ভক্তি ও সম্মানের সাথে লোকেরা অঙ্গুলি নির্দেশ করবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে অমরত্ব লাভ হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে। এই অমরত্বই মুমিনের লক্ষ্য। আর যেসব ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যেও স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন হয় সেখানে তার উপাদান ইট-পাথরের ভাস্কর্য নয়; বরং হৃদয়ের ভালোবাসা, কর্ম ও কীর্তির সশ্রদ্ধ আলোচনা এবং চিন্তা ও চেতনায় আদর্শ অনুসরণের প্রেরণাই হল অমরত্বের উপাদান।

আল্লাহর নবী ও তার খলীফাগণের এবং ইসলামের মহান পূর্বসূরীদের অমর স্মৃতি পাথরের ভাস্কর্যের দ্বারা সংরক্ষিত হয়নি। তা হয়েছে প্রজন্ম পরম্পরায় মানুষের হৃদয়ে এবং তাদের কর্ম ও অবদানের সুরভিত আলোচনায়। এটা হল ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যদিকে ভাস্কর্যভিত্তিক স্মৃতিরক্ষার পদ্ধতি হচ্ছে অত্যন্ত স্থূল ও পশ্চাৎপদ চিন্তার ফসল। এ প্রসঙ্গে তিনি উস্তাদ মুহাম্মদ মুবারক-এর একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। শেষ কথাগুলো এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি—

“মূর্তি ও ভাস্কর্যের মতো স্থূল উপকরণের মাধ্যমে স্মৃতিরক্ষার প্রয়াস

প্রকৃতপক্ষে পশ্চাৎপদতা। প্রাচীন গ্রীক, পারস্য সভ্যতায় এটা বিদ্যমান ছিল। পরে ইউরোপীয়রা তা অনুসরণ করেছে। এরা স্বভাবগতভাবেই ছিল মূর্তি পূজারী। তাদের পক্ষে মানুষের প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ণ করা সম্ভব হয়নি। ত্যাগ ও বীরত্বের সমুন্নত দৃষ্টান্তরূপে মানুষের সম্ভাবনাকে অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি বলেই তারা তাদের বীর পুরুষদেরকে উপাস্য হিসেবে এবং উপাস্যদেরকে বীর যোদ্ধা হিসেবে কল্পনা করেছে।” (আলহালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম পৃ. ৯০-৯৪, মাকতাবা ওয়াহবা, কায়রো চতুর্বিংশ সংস্করণ ১৪২১ হি.)

মূর্তি ও ভাস্কর্যের পারস্পরিক যোগসূত্র

আগেও বলেছি যে, ইসলামে প্রাণীর প্রতিকৃতির অবৈধতা একটি স্বতন্ত্র বিধান। পূজার উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক প্রাণীর মূর্তি তৈরি করাই অবৈধ। প্রাণীর প্রতিকৃতি হওয়াই অবৈধতার কারণ। এজন্য ভাস্কর্যের বিধানগত দিক বোঝার জন্য মূর্তি ও ভাস্কর্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা অপরিহার্য নয়। বাইতুল্লাহ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে পূজার মূর্তি সরিয়েছেন তেমনি স্তম্ভ ও দেয়ালে অঙ্কিত চিত্রগুলোও মুছে দিয়েছেন। তিনি সেগুলোর উপর এই বলে আপত্তি করেননি যে, এগুলোর পূজা করা হয়; বরং তিনি বলেছেন—

قَاتِلِ اللَّهَ قَوْمًا يَصُورُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ

“আল্লাহ ওই গোষ্ঠীকে ধ্বংস করুন যারা এমন প্রতিকৃতি নির্মাণ করে যা তারা সৃষ্টি করে না।”

আরো বলেছেন—

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرٌ.

“ফেরেশতাগণ ওই গৃহে প্রবেশ করেন না যাতে রয়েছে প্রতিকৃতি।”

আম্মাজান আয়েশা (রা.)-এর কক্ষে ঝোলানো পর্দা তিনি এই বলে খুলে দেননি যে, এই চিত্রগুলো পূজার সামগ্রী; বরং তিনি বলেছেন—

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخُلُقِ اللَّهِ.

“কেয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিক আযাবে ওই সব লোক পতিত হবে যারা আল্লাহর সৃষ্টবৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।”

আরো বলেছেন—

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيَاؤُا مَا خَلَقْتُمْ

“এই প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারীদেরকে কেয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে, তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা ‘সৃষ্টি’ করেছিলে তাতে প্রাণ সঞ্চার কর।”

মোটকথা, মূর্তি এজন্যই অবৈধ যে, তা প্রাণীর প্রতিকৃতি। ওই মূর্তির পূজা করা না হলেও এবং পূজিত কোনো কিছুর মূর্তি না হলেও তা অবৈধ।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এ প্রসঙ্গে মূর্তি ও ভাস্কর্যের মধ্যে কোনো যোগসূত্রই নেই বলে তারা যে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন— তা কি সঠিক?

এ প্রসঙ্গে আমি শুধু দুটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে চাই।

১. নিবন্ধকার আবদুল বাছির সাহেবের প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ওই প্রবন্ধের প্রথম কটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি।

‘মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকে ভাস্কর্য নির্মাণ ও চিত্রশিল্পের ধারা চলে এসেছে। কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য অনুসারে হযরত আদম (আ.) এবং হযরত নূহ (আ.)-এর মাঝামাঝি সময়ের প্রজন্মের লোকেরা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।’ (কলা অনুষদ পত্রিকা জুলাই ২০০৫-জুন ২০০৬)

এখানে তিনি যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে— মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনা মাওলানা মহিউদ্দীন খান, রিয়াদ ১৪১৩ হি., পৃ. ১৪০৮)

তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনের উদ্ধৃত অংশটুকু হুবহু তুলে দিচ্ছি—

ইমাম বগতী বর্ণনা করেন, এই পাঁচ জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হযরত আদম ও নূহ (আ.)-এর আমলের মাঝামাঝি। তাঁদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাঁদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল— তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরি করে সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বুঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরি করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদতে বিশেষ পুলক অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায় তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে

তাদেরকে বোঝাল- তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল। তারা এই মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিমাপূজার সূচনা হয়ে গেল।” (সংক্ষিপ্ত মাআরিফুল কুরআন পৃ. ১৪০৮)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্মারক মূর্তি থেকেই পূজার মূর্তির সূচনা।

২. বাংলা পিডিয়ায় ভাস্কর্যের যে প্রবন্ধটি রয়েছে তার সারকথাই হল, এই শিল্পের সূচনা ও বিকাশ পুরোটাই ঘটেছে মূর্তিকে কেন্দ্র করে। বিখ্যাত ও প্রাচীন সকল ভাস্কর্যই বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। কিছু উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি-

ক. ‘এই শিল্পে কেন্দ্র ছিল মথুরা। এখানে সে সময় ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন মূলত এই প্রধান তিনটি কেন্দ্রের অনুসারীরা পূজার নিমিত্তে মূর্তি বানাতে গিয়ে এর সূচনা করেছিল।’ (বাংলা পিডিয়া প্রকাশনায় : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৪০৯/মার্চ ২০০৩, খ. ৭, পৃ. ৩৩৩)

খ. ‘গুপ্ত শাসকগণ ছিলেন একনিষ্ঠ বৈষ্ণব। প্রাথমিক গুপ্তমূর্তিগুলোর বেশির ভাগই বিষ্ণু অথবা বিষ্ণু সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন মূর্তি। এ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্যটি বিহারের ভাগলপুরের শাহকুণ্ড থেকে আবিষ্কৃত নরসিংহ মূর্তি।’ (প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩৪)

গ. ‘বাংলার গুপ্ত ভাস্কর্যগুলো বেশির ভাগই প্রতীকী এবং এগুলির আকৃতি নির্ধারিত হয়েছে মধ্যদেশ বা মধ্যভারতের পুরোহিত কর্তৃক বর্ণিত দেবতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে।’ (প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩৫)

ঘ. ‘অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরিস্থিতির উন্নতি হতে শুরু করে। পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন এবং এ ধর্মের মহাযান মতবাদটি তাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

‘পাল ভাস্কর্যের সর্বপ্রাচীন নমুনাটি ধর্মপালের ২৬ রাজ্যাস্কের (আনুমানিক ৭৭৫-৮১০ খৃ.) যা বিহারের গয়া থেকে পাওয়া গেছে। দেবপালের সময়ের তারিখ সম্বলিত বলরামের দুটি ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য ও তারার একটি প্রস্তর ভাস্কর্য এ অঞ্চল থেকেই পাওয়া গেছে।’ (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮)

ঙ. ‘বাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকে দশম শতকে যে সকল ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে বৌদ্ধ মূর্তির সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ্যমূর্তিও অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ হিসেবে প্রতীকী চিহ্ন সম্বলিত বেশ কিছু মনসা মূর্তির কথা বলা যায়, যেগুলি এ অঞ্চলের প্রথম পর্যায়ের ভাস্কর্য হিসেবে পরিচিত।’ (প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩৯)

চ. ‘পশ্চিম দিনাজপুরের এহনাইল থেকে প্রাপ্ত লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্তিটি (২৪.৪ সেমি) তাদের কমণীয় আলিঙ্গনভঙ্গির জন্য শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হিসেবে প্রতীয়মান।’ (প্রাপ্ত পৃ. ৩৩৯)

এধরনের আরো অনেক উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলা পিডিয়ায় ‘মূর্তিতত্ত্ব’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি—

ক. ‘মহাজাগতিক বা পঞ্চবোধিসত্ত্ব বাংলায় পৃথকভাবে পূজিত হতেন। মান্দার (নওগাঁ জেলা) ভারসন থেকে প্রাপ্ত ও বরেন্দ্র জাদুঘরে রক্ষিত মস্তকবিহীন কালো পাথরে খোদিত ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভোর এ অনিন্দ্যসুন্দর ভাস্কর্যটি পঞ্চবোধিসত্ত্ব ভাস্কর্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।’ (প্রাপ্ত খ. ৮, পৃ. ৩১৪)

জৈন ধর্মীয় মূর্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নিবন্ধকার বলেন—

খ. শুধু বর্ধমানেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বাকুড়া জেলাগুলিতে প্রচুর সংখ্যক পাথরের জৈন ভাস্কর্য ও অন্যান্য পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু এখনও সেখানে পূজিত হচ্ছে, আবার কিছু কিছু জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। (প্রাপ্ত পৃ. ৩১৮)

মোটকথা, ভাস্কর্য থেকে মূর্তি এবং মূর্তি থেকে ভাস্কর্য—এই চলাচলই হল মূর্তি ও ভাস্কর্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সারকথা। একে অস্বীকার করা বাস্তবতাকেই অস্বীকার করার নামান্তর। এ প্রসঙ্গে দৈনিক আমার দেশ (১/১১/০৮ঈ.)—এ প্রকাশিত জনাব ফাহমীদুর রহমানের প্রবন্ধটি পাঠকবৃন্দ পড়ে নিতে পারেন।

আট

প্রবন্ধের শেষদিকে তিনি লেখেন—

“এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মতো বুদ্ধিমান কোনো প্রাণীর সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অতি তুচ্ছ এই প্রাণী নিজের মেধায় সৃষ্টিরহস্যের সমাধানের দিকে এগুচ্ছে। তার পরিচয় সে রেখে যাচ্ছে কাব্যে, সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পকলায়। মাত্র সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার এই প্রাণী তার দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। মানুষের সৃষ্টির প্রতি সম্মান দেখানো মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতিই সম্মান দেখানো। কারণ সব সৃষ্টির মূলে তিনি বাস করেন।”

এ প্রসঙ্গে শুধু এটুকুই আরজ করব যে, সৃষ্টিরহস্যের প্রকৃত সমাধান হল স্রষ্টার

পরিচয় লাভ করা। এটা ওই সব চিন্তাশীল মানুষের সামনে প্রতিভাত হয়েছে যাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদের ইরশাদ—

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

“যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে। (তারা বলে) পরওয়ার দেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই। আমাদেরকে তুমি দোষখের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।” (সূরা আলে ইমরান ১৯১)

আরো ইরশাদ হয়েছে—

الْم تَرَانَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا
الْوَانِهَا، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ الْوَانِهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ.
وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُّخْتَلِفٌ الْوَانِهُ كَذَلِكَ، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ.

“তুমি কি দেখনি, আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এরপর তার দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উদগত করি। পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের—সাদা, লাল ও নিকষ কালো। তেমনি রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণী। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।” (সূরা ফাতির ২৭-২৮)

বলাবাহুল্য যে, এঁরা আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অনুগত হয়ে থাকেন। আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উপনীত হন না।

সর্বশেষ দরখাস্ত এই যে, সৃষ্টি ও আবিষ্কার এক জিনিস নয়। তেমনি কোনো কিছু যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি আবিষ্কারক, স্রষ্টা নন। স্রষ্টা তিনি যিনি তার সৃষ্টিকে মেধা ও চিন্তাশক্তি দান করেছেন এবং বাক্য ও কলম দ্বারা ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা দিয়েছেন। #

[ডিসেম্বর '০৮ঈ.]

বিচারপতি, আপনার বিচার করবে কে?

প্রশ্ন : গত ৯ মার্চ '১০ঈ. মঙ্গলবার 'দৈনিক আমাদের সময়'-এ জনাব গোলাম রব্বানী সাহেবের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তিনি ফোনে সাক্ষাৎকারটি দিয়েছেন। শিরোনাম ছিল 'কুরআনে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে।' ভেতরে দেখা গেল, সাক্ষাৎকারদাতা মীরাছের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান হিস্যার কথা বলেছে! উপরন্তু এই অভিনব দাবির সপক্ষে কিছু 'দলীল'ও উপস্থাপন করেছে! তার মধ্যে একটি এই যে, কুরআনে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব মীরাছের ক্ষেত্রেও তাদেরকে পুরুষের সমান অংশীদার বলা হলে তা কুরআন-বিরোধী হবে না!

আমার জানা ছিল না যে, কোনো বিচারপতি-সে যত বড় বেদ্বীনই হোক- এমন অনৈতিক কথা বলে। কারণ হায়া ও শরাফত বলেও তো কিছু বিষয় আছে! ওই পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী সে আরও বলেছে যে, শরীয়তে রদ-বদল হতে পারে। যুগের পরিবর্তনে এতেও পরিবর্তন করা যায়। মীরাছের আইন হচ্ছে সচল আইন, এতে রদ-বদলের অবকাশ আছে। (নাউযুবিল্লাহ)

এগুলো যে সম্পূর্ণ কুফরী কথাবার্তা তা সম্ভবত প্রত্যেক মুসলিমেরই জানা আছে। শরীয়ত যদি পরিবর্তনযোগ্যই হত তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে আসার কী প্রয়োজন ছিল? তেমনি মীরাছ-বন্টনের বিধিবিধানও যদি পরিবর্তনযোগ্য হত তাহলে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে এর মৌলিক নীতিমালা ও সাধারণ বিধি-বিধান কেন ঘোষণা করেছেন? এই সহজ সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য তো অনেক বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তবে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী যারা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র কারণে জেনে-বুঝেও অনেক সত্য অস্বীকার করে-এটা তাদের দুর্ভাগ্য ও হঠকারিতা।

আমি আপনাকে তাকলীফ দিচ্ছি এজন্য যে, সাক্ষাৎকারটিতে এমন চারটি কথা

বলা হয়েছে, যা পরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় কিতাবপত্র ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সূত্র আমার কাছে নেই এবং সম্ভবত আমার মতো অনেক পাঠকের কাছেও নেই। এজন্য আশা করছি, সঠিক বিষয়টি উদঘাটন করবেন যে, বাস্তবিকই আলোচিত বিষয়ের সাথে ওইসব কথার কোনো সম্পর্ক আছে কি না।

আমি হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর উদ্ধৃতির বাস্তবতা সম্পর্কে এবং ড. ইকবাল ও তিউনিসিয়ার উত্তরাধিকার-আইনের উদ্ধৃতি সম্পর্কে জানতে চাই।

আশা করি, প্রকৃত অবস্থা উদঘাটন করে উপকৃত করবেন।

ওয়াস সালামু আলাইকুম

আবু মাসরুর ফরীদী

রংপুর

উত্তর : কুরআন হাকীমে ওয়ারিছদের হিস্যা সম্পর্কে যে আয়াতগুলো আছে প্রথমে তার তরজমা দেওয়া হল—

“আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন— এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু কেবল কন্যা দুই-এর অধিক থাকিলে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকিলে তাহার জন্য অর্ধাংশ। তাহার সন্তান থাকিলে তাহার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হইলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হইলে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; তাহার ভাই-বোন থাকিলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; (এ সবই) সে যাহা ওসিয়াত করে তাহা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নহ। নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহর বিধান; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাহাদের সন্তান থাকিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ; ওসিয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ; তোমরা যাহা ওসিয়াত করিবে তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তাহার (বৈপিত্রের) ভাই অথবা ভগ্নী, তবে প্রত্যেকের জন্য

এক-ষষ্ঠাংশ। তাহারা ইহার অধিক হইলে সকলে সম অংশীদার হইবে এক-তৃতীয়াংশ; ইহা যাহা ওসিয়াত করা হয় তাহা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি কাহারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। ইহা আল্লাহর নির্দেশ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

এই সব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহা মহাসাফল্য।

আর কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য হইলে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিলে তিনি তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন; সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং তাহার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।” (সূরা নিসা : ১১-১৪)

“লোকে তোমার নিকট জানিতে চায়। বল, ‘পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ তোমাদিগকে ব্যবস্থা জানাইতেছেন, কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি নিঃসন্তান হয় এবং তাহার এক ভগ্নি থাকে তবে তাহার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীন হয় তবে তাহার ভাই তাহার উত্তরাধিকারী হইবে, আর দুই ভগ্নি থাকিলে তাহাদের জন্য তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে—এই আশংকায় আল্লাহ তোমাদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইতেছেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।” (সূরা নিসা : ১৭৬)

উপরোক্ত ফারায়েযে তিন জায়গায় আছে— لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

অর্থাৎ ‘পুরুষের জন্য রয়েছে দুই নারীর সমান অংশ’। এই ঘোষণায় কোনোরূপ অস্পষ্টতা নেই। তাই কুরআন মজীদ যেখানে পুরুষের জন্য দ্বিগুণ অংশ নির্ধারণ করেছে, সেখানে কেউ যদি বলে যে, জ্বী না, নারী-পুরুষের অংশ সমান, তাহলে এটি হবে কুফরী বক্তব্য। নারী-পুরুষের অংশ সমান হওয়া কুরআন-বিরোধী নয় এমন কথা শুধু তারাই বলতে পারে যারা চায়, তাদের মিথ্যাচার মুহূর্তেই উদঘাটিত হোক এবং তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার বিষয়ে কারো তিলমাত্র সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকুক।

মীরাত্বের আহকাম বয়ান করার পর আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন—

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

(তরজমা) “এই সব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহা মহাসাফল্য।

আর কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য হইলে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিলে তিনি তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন; সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং তাহার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।” (সূরা নিসা : ১৩-১৪)

এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পরও যদি বলা হয় যে, কুরআন ও সুন্নাহয় উল্লেখিত মীরাছের আহকাম রদ-বদলযোগ্য তাহলে তা কি সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহ করা হয় না?

আল্লাহর তাআলার ওসিয়ত (অটল নির্দেশ)কে বিলুপ্ত করার এবং যে বিধানকে আল্লাহ তাআলা ‘হদ’ (সীমা) বলে ঘোষণা করেছেন তা বদলে দেওয়ার অপচেষ্টা যে চরম সীমালঙ্ঘন তাতে তো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করার শাস্তি স্বয়ং আল্লাহই ঘোষণা করেছেন—

يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا

“অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন; সেখানে সে স্থায়ী হইবে।”

কুরআনে তাহরীফ ও বিকৃতির এই ইহুদীসুলভ কর্মকাণ্ড সফল হওয়ার জন্য তারা একের পর এক নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। কারণ বাতিলের পক্ষে মিথ্যা ও প্রতারণা এবং অপব্যখ্যা ও তথ্যবিকৃতি ছাড়া ‘দলীল’ সংগ্রহ করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব! কিন্তু এদের এতই অধঃপতন ঘটেছে যে, খলীফায়ে রাসূল আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং খলীফায়ে ছানী আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সম্পর্কেও মিথ্যাচার করতে তাদের দ্বিধা হল না। তাদের বক্তব্য হুবহু তুলে দিচ্ছি:

“উত্তরাধিকার প্রশ্নে খলীফাদের যুগেই শরীয়ার বিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে। খলীফা আবু বকরের সময় এক নারী তার নানী ও দাদীকে জীবিত রেখে মৃত্যুবরণ করেন। শরীয়া আইন অনুযায়ী নানী সম্পদের উত্তরাধিকারী হন না। কিন্তু আবু বকর ন্যায়বিচারের স্বার্থে নানী ও দাদী দুজনকে সম্পদ সমানভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন।”

এখানে এক নিঃশ্বাসে কয়েকটি মিথ্যাচার করা হয়েছে। শরীয়ত সম্পর্কে অপবাদ দেওয়া হয়েছে যে, শরীয়তে নানীর কোনো অংশ নেই। অথচ মীরাছে নানীর হিস্যা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং এ বিষয়ে সাহাবা ও তাবেয়ীদের ইজমাও রয়েছে। দ্বিতীয় অপবাদ আরোপ করা হয়েছে আবু বকর (রা.)-এর উপর যে, তিনি শরীয়ার বিধান লঙ্ঘন করেছেন! অথচ তাঁর সম্পর্কে এমন ধারণা করাও অপরাধ। তৃতীয় মিথ্যাচার শরীয়ত সম্পর্কে করা হয়েছে যে, তাতে ন্যায়বিচার নেই। এজন্য তার মতে-ন্যায়বিচারের স্বার্থে আবু বকর (রা.)কে শরীয়তের বিধান বদলাতে হয়েছে। অথচ শরীয়ত নাযিলই হয়েছে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য। ইরশাদ হয়েছে-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ.

(তরজমা) “নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদের সংগে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়াছি যাহাতে রহিয়াছে প্রচণ্ড শক্তি ও রহিয়াছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ এবং এই জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করিয়া দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করিয়াও তাঁহাকে ও তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।” (সূরা হাদীদ : ২৫)

প্রকৃত ঘটনা এই যে, জনৈক ‘জাদ্দা’ (আরবীতে জাদ্দা নানী ও দাদী উভয়কেই বোঝায়। কিন্তু আগত মহিলাটি ছিল মৃতের নানী, ইবনে মাজার বর্ণনা (২৭৫৬) থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়) তার দৌহিত্রের ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা.)-এর নিকটে এলেন এবং বললেন যে, আমি শুনেছি, কিতাবুল্লাহ্য আমার হক (ঘোষিত) রয়েছে। আবু বকর (রা.) বললেন, কিতাবুল্লাহ্য তো মীরাছে তোমার কোনো হিস্যা উল্লেখিত হয়নি, তেমনি সুন্নায়ও তোমার হিস্যা আছে বলে আমার জানা নেই। অতএব আমি অন্যদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। তো আবু বকর (রা.) অন্যদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, ‘জাদ্দা’ (নানীর) মীরাছ পাওয়া প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো ফয়সালা কি তোমাদের কারো জানা আছে? মুগীরা ইবনে শো’বা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি ‘জাদ্দা’কে মীরাছের ‘ছুদুস’ (ছয় ভাগের এক ভাগ) দিয়েছেন। আবু বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, আরও কেউ

কি তা জানে? মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, আমিও শুনেছি। এরপর আবু বকর (রা.) সেই নারীকে ছয় ভাগের এক ভাগ প্রদান করেন।

হযরত উমর (রা.) এর খেলাফত আমলে সেই মৃতেরই দ্বিতীয় 'জাদা' (দাদী) এল এবং তার হিস্যা চাইল। উমর (রা.) বললেন, কিতাবুল্লাহয় তোমার কোনো হিস্যা উল্লেখিত হয়নি। আর এক ষষ্ঠমাংশ প্রাপ্তির যে ফয়সালা (আবু বকর রা.-এর আমলে সুন্নাহর ভিত্তিতে) হয়েছিল তা ছিল অন্য 'জাদা' (নানী)র ক্ষেত্রে। আমি ফারায়েযের বিধানে কোনো কিছু যোগ করতে পারি না। 'জাদা'র হক ছয় ভাগের এক ভাগ। অতএব 'জাদা' দুজন হলে ছয় ভাগের এক ভাগ সম্পদ দু'জনে ভাগ করে নেবে। একজন হলে সম্পূর্ণ হিস্যা (ছয় ভাগের এক) সে একাই পাবে।

উপরের রেখাঙ্কিত বাক্যটির পাঠ এই- وما انا بزائد في الفرائض شيئا

এই ঘটনা হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বিশদভাবে। দেখুন, মুয়াত্তা মালেক (২/৫১৩); মুসান্নাফ আবদুর রায়যাক (১০/২৭৪); মুসনাদে আহমদ হাদীস ১৭৯৮০; সুনানে আবু দাউদ ২৮৯৪; জামে তিরমিযী হাদীস ২১০০, ২১০১; ইবনে মাজাহ হাদীস ২৭৭৫; আলইসতিযকার ইবনে আবদিল বার ১৫/৪৪৭-৪৭৮; সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস ৬০৩১০

আরো দেখুন, আলমুহাল্লা ইবনে হাযম খ. ৯, পৃ. ২৭৪; আততালখীসুল হাবীর খ. ৪, পৃ. ২০৩২ (১৭২৭)

আবু বকর (রা.)-এর আমলে এ ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। এক ব্যক্তির ইন্তেকালের পর তার দাদী ও নানী দু'জনই তার মীরাছের জন্য এল। (কিন্তু যেহেতু পূর্ববর্তী ঘটনাতেই জানা হয়ে গিয়েছিল যে, সুন্নাহতে 'জাদা'র হিস্যা হচ্ছে 'সুদুস' এবং ঘটনার বিবরণ থেকে 'জাদা' বলতে মার মা (নানী)ই বোঝা যাচ্ছিল এজন্য) তিনি নানীকেই পূর্ণ হিস্যা দিতে চাইলেন। কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে সাহল ইবনে হারিছা (রা.) যিনি একজন বদরী সাহাবী ছিলেন, বললেন, (নানী ও দাদী দু'জনই তো 'জাদা'। উপরন্তু) নানীর মৃত্যুতে নাতি কিছু পায় না, পক্ষান্তরে দাদীর মৃত্যুতে নাতি মীরাছের হিস্যা পায় (এজন্য 'জাদা'র নির্ধারিত অংশ অর্থাৎ ছয় ভাগের এক ভাগ শুধু নানীকে দিয়ে দেওয়া মুনাসিব নয়) তখন আবু বকর (রা.) 'ছুদুস' দু'জনের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

এই ঘটনা মুয়াত্তা মালেক খ. ২, পৃ. ৫১৩-৫১৪ এবং সুনানে দারাকুতনী খ. ৪, পৃ. ৯০-৯১-এ উল্লেখিত আছে।

প্রাসঙ্গিক অন্যান্য হাদীস, আছার ও রেওয়ায়েতের আলোচনায় না গিয়েও শুধু এই দুই ঘটনা থেকেই যে বিষয়গুলো সামনে আসে তা এই :

১. শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মীরাছে 'জাদ্দা'র হিস্যা আছে। আর আরবী ভাষায় 'জাদ্দা'-য় দাদী ও নানী দু'জনই शामिल।

২. মীরাছের বিষয়ে আবু বকর (রা.) শরীয়তের হুকুমকেই অনুসরণ করেছেন।

৩. মীরাছের বিষয়ে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) দু'জনই কিতাব ও সুন্নাহর শরণাপন্ন হয়েছেন। ইজতিহাদ শুধু ওই ক্ষেত্রেই করেছেন যেখানে তাঁদের জানা মতে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো সুস্পষ্ট বিধান ছিল না।

পরবর্তী সময়ে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য হাদীস ও আছার একত্র করার পর প্রতীয়মান হয়েছে যে, তারা ইজতিহাদের ভিত্তিতে সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন যা সুন্নাহর রয়েছে। স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দাদী ও নানীর ক্ষেত্রে এই ফয়সালাই করেছেন। অর্থাৎ দু'জন জীবিত থাকলে তাদের মাঝে 'ছুদুস' (ছয়ভাগের এক ভাগ) বণ্টন করে দিয়েছেন।

দেখুন, সুন্নাহে দারাকুতনী খ. ৪, পৃ. ৯০-৯২; আসসুনানুল কুবরা বায়হাকী খ. ৬, পৃ. ২৩৪-২৩৫

এবার চিন্তা করুন তারা প্রকৃত ঘটনাকে কীভাবে বিকৃত করেছে।

উমর (রা.) সম্পর্কে তাদের বক্তব্য—'আর একবার এক ব্যক্তি মারা গেলে খলিফা ওমর তার সম্পত্তি বিপত্রিক, বৈমাত্র্যেয় ও আপন এই তিনজনকে সমানভাবে ভাগ করে দেন যদিও এর মধ্যে একজনের সম্পদের অধিকার নেই।'

এখানে যদিও বিষয়টি অত্যন্ত অস্পষ্ট রাখা হয়েছে, বৈমাত্র্যেয় ও আপন বলতে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে এবং কতজন হলে এই বিধান কিছুই বলা হয়নি, তবুও কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি উমর (রা.) সম্পর্কে একটি মিথ্যা অপবাদ। মাইয়েতের যদি সন্তান না থাকে তাহলে স্বামীর অংশ হল পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক। এটা কুরআন মজীদে নির্ধারিত। হযরত উমর (রা.) তার অংশ 'অর্ধেক' থেকে কমিয়ে দেবেন তা অসম্ভব। হাদীস, তাফসীর ও ফতোয়ার কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবে এ ধরনের কোনো দৃষ্টান্ত আমরা দেখিনি। আপনি সাক্ষাৎকার প্রদানকারী এবং তা প্রকাশকারীকে বলুন এই তথ্যের উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য।

মীরাছের বিষয়ে উমর (রা.)-এর নীতি এই ছিল যে, যা ওহী (কুরআন ও সুন্নাহ) দ্বারা প্রমাণিত তাতে ইজতিহাদের ভিত্তিতে হ্রাস-বৃদ্ধির কোনো অবকাশ নেই। (দেখুন সুন্নাহে দারাকুতনী খ. ৪, পৃ. ৯৩-৯৪; তাফসীরে কুরতুবী ৫/৬৯)

সারকথা এই যে, ওহীর নুসুস (কুরআন ও সুন্নাহর) উল্লেখিত মীরাছের

আহকামকে রদ-বদলের উপযুক্ত মনে করা সুস্পষ্ট কুফরী। আর সেই কুফরীর সমর্থনে শায়খাইন (আবু বকর ও উমর রা.)কে উদ্ধৃত করা যে কত বড় গর্হিত অপরাধ তা তো বলাই বাহুল্য।

শায়খাইন সম্পর্কে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী যেসব মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছে সে সম্পর্কে কোনো মুমিনেরই বিভ্রান্তি থাকার কথা নয়। কারণ ঈমানী যওকের দ্বারাই এসব উদ্ধৃতির অসারতা ও অবাস্তবতা অনুমান করা যায়। তবে বিস্তারিত জানার জন্য তাকে সংশ্লিষ্ট কিতাবপত্রের সহায়তা নিতে হবে।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হচ্ছি যে, তারা এ প্রসঙ্গে একটি সমকালীন উদ্ধৃতিও প্রদান করেছে। এটুকু চিন্তাও করেনি যে, তথ্য ও প্রযুক্তির এই যুগে কম্পিউটার বা মোবাইলের সুইচ টিপে যে কারো পক্ষে এই উদ্ধৃতির অবাস্তবতা জেনে নেওয়া সম্ভব। তারা তিউনিসিয়ার উদ্ধৃতি দিয়েছে যে, সেখানে মীরাছের শরীয়া আইন পরিবর্তন করে নারী-পুরুষকে সমান হিস্যার হকদার সাব্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম কথা তো এই যে, তিউনিসিয়া কেন, গোটা পৃথিবীতে যদি আল্লাহর আইন পরিবর্তন করা হয় তবুও আল্লাহর আইনই সত্য ও শিরোধার্য। মুসলমানের ঈমান সেই আইনের উপরই থাকবে এবং তারা তা-ই অনুসরণ করবেন। ভূ-পৃষ্ঠে যদি একজন মুসলিমও থাকে তাহলে সেও এ কথা বলবে যে, মুক্তি ও সফলতা আল্লাহর আইনেই রয়েছে, তা পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই। সে আইনের অনুসরণই প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। তা পরিবর্তন করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহ করার নামান্তর। যখন ভূ-পৃষ্ঠে এই আকীদার একজন মুমিনও থাকবে না তখন কেয়ামত হবে। শুধু বেদীনুরাই এমন কথা বলতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি কুফরী করেছে তাই সেও কুফরী করবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, তিউনিসিয়ায় মীরাছের আইন পরিবর্তন হয়নি। যে কেউ ইন্টারনেটে তিউনিসিয়ার ‘মাজাল্লাতুল আহওয়ালিশ শাখছিয়াহ’ অধ্যয়ন করতে পারেন। তাতে ৫৮ নং অনুচ্ছেদ থেকে ১৮৫ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মীরাছের আইন-কানুন উল্লেখিত হয়েছে, যা কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামী ভিত্তিক। যেমন অনুচ্ছেদ ১০৩-এ আপন কন্যার ব্যাপারে বলা হয়েছে—

والإرث بتعصيب أخيهن لهن للذكر مثل حظ الأنثيين

অর্থাৎ কন্যার সাথে যদি মৃতের পুত্রও বিদ্যমান থাকে তাহলে—পুরুষের জন্য দুই নারীর সমান হিস্যা-নীতি অনুযায়ী সম্পদ বন্টন হবে।

তেমনি অনুচ্ছেদ ১০৫-এ আপন বোনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

والتعصيب بالأخ الشقيق وبالجد للذكر مثل حظ الأنثيين

অর্থাৎ বোনের সাথে যদি মৃতের ভাইও বিদ্যমান থাকে তাহলে এক্ষেত্রেও-পুরুষের হিস্যা দুই নারীর সমপরিমাণ-নীতি অনুযায়ী সম্পদ বণ্টিত হবে।

এরপরও-আল্লাহ না করুন- সম্প্রতি কোনো বেদীন-মুলহিদ তার রাজনৈতিক বা আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করে কুরআনের বিধানের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ করেছে কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা তিউনিসিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সাথে যোগাযোগ করেছি। তিউনিসিয়ার সংশ্লিষ্ট আইনের বিশেষজ্ঞ উকীল শায়খ মুহাম্মাদ আলহাদী ইবনে মুস্তফা আযযামযামী আমাদেরকে লিখেছেন- ‘সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট মীরাছে নারীকে পুরুষের সমান হিস্যা প্রদানে সফল হতে পারেনি। কিছু ধর্ম-বিরোধী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে এই আন্দোলন চলছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত তারা সফল হতে পারেনি।

আমি আপনাকে ‘কানুনুল আহওয়ালিশ শখছিয়াহ’ থেকে ‘কানুনুল মীরাছ’ অংশটি পাঠাচ্ছি ...।’

সেখানকার আরেকজন বড় ইলমী ব্যক্তিত্ব শায়খ আলী ইবনে মাসউদ লেখেন, ‘তিউনিসিয়ায় নারীকে পুরুষের সমান মীরাছের হিস্যা দেওয়া হয়েছে’-এ কথা সত্য নয়। তবে সাবেক প্রেসিডেন্ট তা করতে চেয়েছিল, কিন্তু এই দুরভিসন্ধি মাথায় নিয়েই তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। কারণ, আপনি তো জানেন যে, এটি কিতাবুল্লাহর মুহকাম ও অটল বিধান। এজন্য সে তা পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়েছে। ... এরপরও যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সে বা অন্য কেউ এমন কাজ করল তাহলে আল্লাহর দ্বীনে ইলহাদ ও বেদ্বীনীর সূত্রপাত এবং শরীয়তের সাথে ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয়ে তার অনুসরণ কখনো বৈধ হবে না ...।’

যে কথাটি সবশেষে বলতে চাই তা এই যে, প্রকৃতপক্ষেই যদি এই শ্রেণীর লোকদের নারীর প্রতি সহানুভূতি থাকত তাহলে তারা নারী-উন্নয়নের নামে কুরআনের বিধান পরিবর্তন করার স্থলে কুরআন-প্রদত্ত প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখত। আমাদের সমাজে নারীরা কি মীরাছের শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অংশ পেয়ে থাকেন? ওইসব বিচারক ও আইনজীবীদের সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখুন, তাদের কয়জন পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বোনের অংশ এবং দাদার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ফুফীর অংশ (যতটুকু কুরআন নির্ধারণ করেছে) পরিশোধ করেছে? তো নির্ধারিত অংশের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের প্রসঙ্গে না গিয়ে নারী জাতির সাথে নিষ্ঠুর প্রতারণা ও

পাশ্চাত্যের প্রভুদের বাহবা পাওয়ার জন্য আল্লাহর আইন পরিবর্তনের শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে!

বর্তমান পৃথিবীতে কোটি কোটি ঈমানদার নারী এমন রয়েছেন, যারা এইসব ভণ্ডদের আল্লাহ-বিরোধী কর্মকাণ্ডের উপর অভিসম্পাত করে থাকেন; তেমনি এমন দৃঢ়চেতা ঈমানদার নারীর সংখ্যাও কম নয়, যাদেরকে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে গোটা পৃথিবীর সম্পদ প্রদান করা হলেও তারা তা অকুণ্ঠ চিন্তে প্রত্যাখ্যান করে দেবেন!

এই বর্ণচোরা গোষ্ঠী কি অন্তত এই আইন প্রণয়নে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে যে, নারীকে পণ্যের মডেল বানানো কিংবা পণ্যের বিজ্ঞাপনে তাদের ব্যবহার করা দণ্ডনীয় অপরাধ? পাশ্চাত্য ‘সভ্যতা’ নারীর উপর যত অবিচার করেছে (যা মানবেতিহাসের অন্ধকারতম যুগের অবিচারকেও হার মানিয়েছে) তার মধ্যে এটি একেবারে প্রথম সারির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বলাবাহুল্য, এখানেই তাদের মেকি সহানুভূতি একেবারে উন্মুক্ত হয়ে পড়বে।

কথা দীর্ঘ হয়ে গেল। আমি বলছিলাম যে, তিউনিসিয়ার আইন পরিবর্তনের বিষয়টি সম্পূর্ণ অবাস্তব। এটি সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ‘উর্বর’ মস্তিষ্কের কল্পনা! তার দায়িত্বহীনতা কিংবা অকুণ্ঠ মিথ্যাচারের আরেকটি নমুনা হচ্ছে তার শেষ কথাটি। আমাদের সময়ের রিপোর্ট অনুযায়ী তার কথা—

“বর্তমান শরীয়া আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির পুত্র সন্তান না থাকলে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় তার ভাই ও ভাইয়ের পুত্ররা। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো এক্ষেত্রে আমরা আবাবো তিউনিসিয়ার উদাহরণকে সামনে আনতে পারি। তিউনিসিয়ায় এসব ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির মেয়েরা পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়।”

যেহেতু সে শরীয়তকে ছেলেখেলায় বিষয় মনে করে এজন্য শরীয়ার সাথে ‘বর্তমান’ শব্দটি প্রয়োগ করেছে, অথচ অতীত ও বর্তমানে সর্বযুগেই শরীয়তের আইন এই যে, মাইয়েতের পুত্রসন্তান না থাকলে, কন্যাসন্তান একজন হওয়ার ক্ষেত্রে সে মীরাছের অর্ধেক এবং দুই বা ততোধিক হওয়ার ক্ষেত্রে তারা মীরাছের দুই তৃতীয়াংশের অধিকারী হয়। এরপর অন্যান্য ‘আসহাবুল ফুরুয’ ও ‘আসাবাত’-এর অংশ।

কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা—

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

ফিকহ-ফতোয়া ও ইলমুল ফারায়েযের প্রাচীন ও সাম্প্রতিক গ্রন্থে এ কথাই বলা

আছে। এখন এ উপমহাদেশে ফতোয়া আলমগীরী ও ফতোয়া শামীর উদ্ধৃতি বেশি দেওয়া হয়। ফতোয়ায় আলমগীরী হচ্ছে হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর সংকলন, সেখান থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

وأما النساء فالأولى البنت ولها النصف إذا انفردت وللبننتين فصاعدا الثلثان كذا في الاختيار شرح المنار وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الأنثيين كذا في التبيين.

(ফাতাওয়া আলমগীরী খ. ৬, পৃ. ৪৪৮)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত ‘বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন’ প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ পৃষ্ঠা ১৭৬ দফা ৪১৯-এ বলা হয়েছে—

“কন্যার প্রাপ্য অংশ :

ক) মৃতের একজন মাত্র কন্যা বর্তমান থাকিলে সে সমস্ত ত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাইবে;

খ) কন্যার সংখ্যা দুই বা ততোধিক হইলে তাহারা সকলে মিলিয়া মোট সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাইবে;

গ) মৃতের কন্যা ও পুত্রসন্তান বর্তমান থাকিলে ‘পুরুষ নারীর দ্বিগুণ অংশ’ পাওয়ার নীতি অনুযায়ী তাহাদের মধ্যে ত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টিত হইবে।”

আমি বুঝতে অক্ষম, এই আইনের জন্য তাকে তিউনিসিয়ায় চলে যেতে হল কেন?

ঈমান-ইয়াকীন এবং দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতির জন্য যদি এরা শরীয়তের আহকামকে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এবং বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করতে আগ্রহী না হয় তাহলে যখন তা পরিবর্তনের কুফরী সংকল্প মাথায় সওয়ার হয়—আল্লাহ রক্ষা করুন— অন্তত তখন তো শরীয়তের হুকুম নির্ভুলভাবে জেনে নেওয়া উচিত। অন্যথায় তাদের ওই বদমতলবও তো ভেসে যেতে পারে। আলোচিত বিষয়ে কিন্তু তা-ই ঘটেছে। নানীর প্রাপ্য অংশের বিষয়ে শরীয়ার বিধান বদলাতে গিয়ে এমন কথা সে বলেছে, যা আগে থেকেই শরীয়ার বিধান! তেমনি পুত্রের অবর্তমানে কন্যার প্রাপ্য অংশের বিষয় নতুন বিধান আবিষ্কার করতে গিয়েও শরীয়ার বিধানেরই পুনরাবৃত্তি করেছে!

আর শরীয়তের বিধান জানা থাকা সত্ত্বেও যদি এমন তামাশা করে থাকে তাহলে প্রশ্ন হয়, গোটা পাঠক-সমাজকে নির্বোধ ঠাওরানোও কি মানবাধিকারের এই

যুগে(১) কোনো অপরাধ নয়? শরীয়ত নিয়ে ছেলেখেলার প্রসঙ্গ না হয় বাদই দিলাম।

সবশেষে তার ওই দাবি সম্পর্কেও দু একটি কথা আরজ করছি, যা তার ভাষায়— ‘একেক যুগের পরিবেশ ও চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শরিয়া আইন তৈরি হয়েছে। আমরা সাধারণত মনে করি শরিয়া আইন স্থির ও নির্দিষ্ট একটি বিষয়। কিন্তু আদতে তা নয়। এটি পরিবর্তনশীল। শরিয়া আইন যুগে যুগে পরিবর্তিত হতে পারে। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মো. ইকবালের অভিমত তাই। ড. ইকবাল তার ইসলাম ধর্ম পুনর্গঠন প্রবন্ধে এই মত দেন।’

এ প্রসঙ্গে আমার নিবেদন এই :

১. ‘শরীয়া আইন’ একটি ব্যাপক শব্দ। এতে নিম্নোক্ত প্রকারগুলি অন্তর্ভুক্ত :

ক) কুরআন ও সুন্নাহয় পরিষ্কারভাবে ঘোষিত বিধিবিধান।

খ) ইসলামের প্রথম যুগ থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারা-পরম্পরায় বর্ণিত ইজমায়ী আহকাম।

গ) ওইসব আহকাম, যেগুলোকে শরীয়ত বিশেষ কোনো ‘ইল্লতের’ সাথে যুক্ত করেছে—ইল্লত পাওয়া গেলে হুকুম আরোপিত হবে, ইল্লত পাওয়া না গেলে হুকুমও আরোপিত হবে না।

ঘ) মুজতাহাদ ফীহ আহকাম অর্থাৎ ওইসব বিধান যা ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তি ইজতিহাদের সীমারেখার ভেতরে থেকে শরীয়তের দলীলসমূহের আলোকে উদঘাটন করেছেন।

ঙ) ব্যবস্থাপনাগত নিয়ম-কানুন, যা শরীয়তের মুবাহ শ্রেণীর বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট। যে সম্পর্কে শরীয়ত কিছু মৌলিক নীতি প্রদান করেছে এবং প্রায়োগিক খুঁটিনাটি বিচার-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সর্বসাধারণের কল্যাণকে সামনে রেখে নীতি নির্ধারণ করার হুকুম দিয়েছে। যেমন ট্রাফিক-ব্যবস্থা, ডাক-ব্যবস্থা এবং যেসব অপরাধের হুদুদ ও তাযীর শরীয়তের পক্ষ হতে নির্ধারিত নয়, তার জন্য উপযুক্ত দণ্ডবিধি প্রণয়ন ইত্যাদি।

এই পঞ্চম বিষয়টি এমন, যাতে সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে যৌক্তিক ও যথার্থ রদ-বদলের অবকাশ আছে।

চতুর্থ বিষয়ে ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারীদের বিভিন্ন মত হতে পারে এবং পুনরায় চিন্তা-ভাবনার পর এক মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনও হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও ইজতিহাদের যোগ্যতাহীন কারো অনুপ্রবেশের অধিকার নেই।

তাকে তাকলীদের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী মুজতাহিদীদের তাকলীদ করতে হবে।

তৃতীয় প্রকারটি যুক্ত ইল্লতের সাথে। অতএব তা শুধু সময় ও সমাজের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় না। এটি পরিবর্তিত হওয়া নির্ভর করে ইল্লতের পরিবর্তনের উপর। একটি দৃষ্টান্ত : নারীর বিষয়ে শরীয়তের নির্দেশ হল গৃহের অভ্যন্তরে নিভৃত কোণে নামায আদায় করা। এটিই তার জন্য উত্তম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মসজিদে উপস্থিত হতে নিরুৎসাহিত করেছেন। এরপরও তিনি পুরুষদের লক্ষ করে বলেছেন যে, 'আল্লাহর কোনো বাঁদী যদি তোমাদের কাছে মসজিদে আসার অনুমতি প্রার্থনা করে তাহলে তাদের নিষেধ করো না।' তেমনি কেউ যদি আসতেই চায় তাহলে বিভিন্ন শর্তের সাথে আসার অনুমতি দিয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নির্দেশনা ও আচরণ থেকে উপলব্ধি করেছেন যে, বর্তমান তাকওয়া ও পরহেয গারীর পরিবেশে যেহেতু শর্তযুক্ত সীমিত অনুমতিতে অসুবিধা নেই, নারীরা আশঙ্কামুক্ত তাই এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল যে, একদিকে সে শর্ত-শরায়ত রক্ষিত হচ্ছে না, অন্যদিকে তাকওয়া-পরহেযগারিতেও কমতি আসছে। তখন অনুমোদনের ইল্লতের (কারণ) বিদ্যমানতা সন্দেহযুক্ত হওয়ায় সাহাবায়ে কেরাম নিষেধ করতে লাগলেন। সে সময়ই আশ্বাজান আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁর ঐতিহাসিক উক্তিটি করেন—

لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ

كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

অর্থাৎ নারীগণ (আজ) যা আরম্ভ করেছে তা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেন তাহলে তাদেরকে নিষেধ করে দিতেন যেভাবে বনী ইসরাইলের নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল।' (সহীহ বুখারী হাদীস ৮৬৯; সহীহ মুসলিম হাদীস ৪৪৫) এ তো গেল তৃতীয় প্রকারের আলোচনা।

প্রথম দুই প্রকারের বিষয়টি একদম স্পষ্ট। এতে রদ-বদলের কোনো সুযোগ নেই। এতে যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপের অর্থই হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার পরিবর্তন এবং আল্লাহর কালাম ও তাঁর ওহীর বিকৃতিসাধন, যা সুস্পষ্ট কুফরী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ। ইসলামের উপর যার ঈমান আছে তাকে এই কথা বোঝানোরও প্রয়োজন নেই। কারণ সে কেমন মুমিন ও মুসলিম, যে আল্লাহ ও তার রাসূলের উপরও আপত্তি করে?

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী যে বিষয়ে তার মতামত প্রকাশ করেছে তা কুরআন

মজীদে ঘোষিত একটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিষয়; যে বিষয়ে সকল যুগে গোটা উম্মতের ইজমা ছিল এবং যা 'জরুরিয়াতে দ্বীনে'র মধ্যে शामिल। এতে রদ-বদলের প্রসঙ্গই অবাস্তব এবং ছাফ বেদ্বীনী।

২. এমন কোনো কথা বলা যে, পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে কুরআনের আয়াতের বিভিন্ন তাফসীর হয়েছে এবং সেসব তাফসীরের ভিত্তিতে শরীয়া আইন প্রস্তুত হয়েছে, এটি একটি অস্পষ্ট কথা এবং তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই অস্পষ্ট রাখা হয়েছে, যাতে শরীয়তের 'কতয়ী' আহকাম তথা অকাট্য বিধানাবলির অপব্যাক্যার জন্য তা ব্যবহার করা যায়। এই মুহূর্তে আমি শুধু একটি প্রশ্নই করছি। তা এই যে, মীরাছের আলোচিত মাসআলায় তাফসীর বা ফিকহী মাযহাবের কী মতভেদ আছে-এখানে তো না তাফসীরের কোনো মতভেদ আছে, না ফিকহী মাযহাবের। এটি তো একটি অটল ও অবিসংবাদিত বিধান। মতভেদের প্রসঙ্গই এখানে অবাস্তব।

৩. ড. ইকবাল তাঁর বক্তৃতায় ইজতিহাদী ও ইনতিযামী বিষয়াদি সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। এই শ্রেণীর নব-উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান শরীয়তের নীতিমালার আলোকে প্রদান করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানকে বর্তমান যুগের বোধ, ভাষা ও উপস্থাপনার নিকটবর্তী করে সংকলন করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে অর্থহীন রক্ষণশীলতা পরিহার করার এবং প্রচলিত বিশ্ব-ব্যবস্থার তুলনায় শরীয়ার আইনের শ্রেষ্ঠত্ব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি যেহেতু একজন কবি ও দার্শনিক ছিলেন, ফিকহ ও উসূলে ফিকহ তার বিষয় ছিল না, আর না আহলে ইলমের সোহবতে থেকে দ্বীনী ইলম অর্জনের সুযোগ তাঁর হয়েছে, তাই নিজের আলোচ্য বিষয়কে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। উপরন্তু যে প্রস্তাব তিনি পেশ করেছেন তা নতুন কিছু নয়, প্রতি যুগের দায়িত্বশীল ফকীহগণ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। যাহোক, তাঁর সদৃশ্য সম্পর্কে সন্দেহের কারণ নেই এবং তাঁর প্রস্তাবও মৌলিকভাবে সঠিক, তবে তাঁর ভাষা ও উপস্থাপনায় কোথাও কোথাও অসম্পূর্ণতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝিরও অবকাশ রয়েছে। কিছু কথা এমনও আছে, যা সম্পূর্ণ ভুল। তবে তাঁর হৃদয়ে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য দরদ ও কল্যাণকামিতা ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ ও হাকীকত সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। এজন্য অত্যন্ত সফলভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষত্রুটিগুলো তিনি চিহ্নিত করেছেন। বস্তুত এটিই তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান।

আলোচ্য সাক্ষাৎকারের বিচারপতি তো ইকবালের উদ্ধৃতি দিয়েছেন কিন্তু

মাঝের দূরত্ব সম্পর্কে চিন্তা করেননি। কোথায় ইকবালের মতো মর্দে মুমিন আর কোথায় তার মতো লোকের বেদ্বীনী কর্মকাণ্ড! তিনি কি পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনায় ইকবালের সহগামী হতে পারবেন? নারীর বিষয়ে পংক্তির পর পংক্তিতে ইকবাল যেভাবে ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশনার প্রতিনিধিত্ব করেছেন তা কি তিনি স্বীকার করতে পারবেন? ‘আসরার ও রুমূয’-এ ইকবাল কী বলেন শুনুন-

در معنی این که نظام ملت غیر از آئین صورت نہ بود و آئین ملت محمدیہ قرآن است

অর্থাৎ আইন ছাড়া কোনো জাতির স্থিতি ও শৃঙ্খলা অস্তিত্ব লাভ করে না। আর মিল্লাতে মুহাম্মাদিয়ার আইন হচ্ছে কুরআন।’ এরপর সেই কবিতায় তিনি বলেছেন, কুরআন হচ্ছে আবাদী কিতাব ও শাস্ত্র গ্রন্থ। এতে যেমন কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয় নেই, তেমনি কোনো ধরনের রদ-বদলেরও অবকাশ নেই।’

অন্য কবিতায় তিনি বলেন, ‘রাজ্যশাসন থেকে দ্বীন-ধর্ম ভিন্ন হয়ে গেলে সে হবে চেংগীজি শাসন। রাষ্ট্র ও ধর্ম যদি একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সেখানে লালসাই হবে রাজা, লালসাই উয়ির। এই কথাগুলো কি বিচারপতি সাহেব স্বীকার করতে পারবেন?

৩. আলোচিত বক্তৃতায় ইকবাল শরীয়তের দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে এ কথাও বলেছেন যে, আইন প্রণয়নের কাজ আলেমদের তত্ত্বাবধানে হওয়া জরুরি। এতে আলেমগণের মৌলিক ও নীতিনির্ধারণী ভূমিকা থাকতে হবে। যাতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা শরীয়তের আহকাম বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল না করে। রাব্বানী সাহেব কি এই প্রস্তাব সহ্য করতে পারবেন?

৪. আমি আগেই বলেছি যে, উপরোক্ত বক্তৃতায় ইকবাল ঘুণাক্ষরেও বলেননি যে, কুরআন-সুন্নাহয় উল্লেখিত শরীয়তের অটল বিধানাবলিতে হস্তক্ষেপ করা যাবে; বরং তিনি ওইসব লোকের নিন্দা করেছেন, যারা কুরআনে উল্লেখিত বিধানসমূহের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। তিনি তুর্কি কবি জিয়ার ব্যাপারে শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সমালোচনা করেছেন, যে কুরআনের পারিবারিক আইন ও মীরাছের আহকামের স্থলে নতুন প্রস্তাব পেশ করেছিল। ইকবাল বলেন, ‘কবি জিয়ার দাবি সম্পর্কে আমার ধারণা এই যে, সম্ভবত তিনি ইসলামী পরিবার সম্পর্কিত আইন সম্যক অধ্যয়ন করেননি। কুরআনের উত্তরাধিকার ব্যবস্থার অর্থনৈতিক তাৎপর্যও মনে হয় তাঁর কাছে যথাযথ রূপে সুপ্রকাশ নয়। ইসলামী বিধানে বিবাহ একটি দেওয়ানি চুক্তি। বিবাহের সময় স্ত্রী ইচ্ছা করলেই শর্তসাপেক্ষে স্বামীর তালাক দেবার অধিকার নিজের জন্যে অর্জন করে নিতে পারে। উত্তরাধিকারের বেলায়ও

জিয়ার প্রস্তাবিত সংশোধন ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আইনসম্মত অংশের অসমতার জন্যেই যে পুরুষ নারীর ওপর আইনগত আধিপত্যের অধিকার পেয়ে যায়, এ কথা মনে করা উচিত নয়। তা হলে এ ব্যবস্থা ইসলামের মূলনীতির বিরোধী হয়ে দাঁড়াত। কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে :

নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার, পুরুষের ওপর নারীরও তেমন অধিকার। কন্যার সম্পত্তির অংশ নির্ধারিত হয় তাকে জন্মসূত্রে নিকৃষ্ট মনে করে নয়; বরং সমাজ সংস্থায় তার নির্বিঘ্ন স্থান ও সুযোগাদির বিবেচনায়। অধিকন্তু কবির নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারেও উত্তরাধিকার ব্যবস্থাকে সম্পত্তি বিভাগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে বিচার করলে চলবে না; বরং অন্যান্য আইন-কানুন এবং ব্যবস্থাপনার সাথে একযোগে বিচার করতে হবে। ইসলামী আইন অনুসারে, নারী বিবাহকালে পিতা ও স্বামীর কাছে যা পায় তাতে তার নিরঙ্কুশ অধিকার বর্তায়। (মহর ও) যৌতুক (প্রচলিত যৌতুক নয়; বরং বিবাহের সময় মেয়েকে তার পিতা-মাতা স্বৈচ্ছায়-স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে হাদিয়া-উপঢৌকন দিয়ে থাকেন) সম্পদের সে পূর্ণ অধিকারিণী হয়; তা নগদ বা পরে আদায় করা তারই ইচ্ছাধীন এবং তা আদায়সাপেক্ষে সে স্বামীর সমগ্র সম্পত্তি আটক রাখতে পারে। এসব সত্ত্বেও নারীর সমগ্র জীবনব্যাপী ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত রয়েছে। এসব কথা স্মরণে রেখে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের বিচার করলে স্বতঃই প্রতীত হবে যে, এতে পুত্র ও কন্যার আর্থিক সমতা সাধনের যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং কবি জিয়া যা চেয়েছেন তা সরাসরি স্বীকৃত না হয়ে থাকলেও অন্যভাবে স্থির নিশ্চিত করা হয়েছে। ফন্ ক্রেমার কুরআনীয় আইনের উত্তরাধিকার প্রথাকে একটি বিশিষ্ট মৌলিক অবদান বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আসলে মুসলিম আইনজ্ঞরাই আজ পর্যন্ত এর প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দেননি।’ (ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন পৃ. ১৪৫-১৪৬)

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে বক্তৃতায় ইকবাল কুরআনের মীরাছ বণ্টনের বিধিবিধানকে কোনো ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া হুবহু অনুসরণের আহ্বান করেছেন সেই বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে সেই বিধি-বিধান পরিবর্তনযোগ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে!

ইকবাল তাঁর প্রবন্ধ ‘ইসলাম ও আহমদিয়্যাত’-এ লিখেছেন যে, কুরআনের মীরাছের আইন পরিত্যাগ করে সুইজারল্যান্ডের উত্তরাধিকার আইন গ্রহণ করা তুর্কীদের একটি মারাত্মক ভুল।’ (হরফে ইকবাল)

৪. ইকবালের এই বক্তৃতার ইংরেজি নাম ‘The Principle of Movement

in the Structure of Islam-এর বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও আল্লামা ইকবাল সংসদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যার শিরোনাম 'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন।' এই শিরোনাম ইংরেজি শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইকবাল নিজেও এক প্রবন্ধে এ বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে তার শিরোনাম 'ইসলামী তাফাক্কুর কী তাশকীলে জাদীদ' (ইসলাম আওর আহমদিয়্যাত, হরফে ইকবাল, সংকলনে লতীফ আহমদ শেরওয়ানী এম.এ)

এই সবগুলো শিরোনামই অস্পষ্ট। সঠিক শিরোনাম হবে, 'ইজতিহাদ কী আহম্মিয়াত আওর কানুনে শরীয়ত কী তাদবীনে জাদীদ কী জরুরত' অর্থাৎ ইজতিহাদের গুরুত্ব ও শরীয়া আইনের যুগোপযোগী সংকলনের প্রয়োজনীয়তা।' কারণ ইকবাল এ বিষয়েই তাঁর উপরোক্ত বক্তৃতায় তার জ্ঞান ও চিন্তা অনুযায়ী আলোকপাত করেছেন। কিন্তু রাব্বানী সাহেব নিজের পক্ষ থেকে শিরোনাম দিয়েছেন : 'ইসলাম ধর্মের পুনর্গঠন।' ইসলামের স্বরূপ ও হাকীকত যার জানা আছে সে ইসলামের সাথে 'পুনর্গঠন' শব্দ ব্যবহার করতে পারে না। এটা তার পক্ষেই সম্ভব যে মনে করে যে, দ্বীন ইসলাম ও তার মৌলিক উৎসসমূহ মানবরচিত আইনকানুনের সমগোত্রীয় ও সমমর্যাদার। (নাউয়ুবিল্লাহ) আর বাস্তবতা এই যে, এই শ্রেণীর লোকেরা দ্বীনে ইসলাম, শরীয়তে ইসলাম ও কিতাবে ইসলাম (কুরআন কারীমকে) মানবরচিত আইন কানুনের চেয়েও তুচ্ছ মনে করে (নাউয়ুবিল্লাহ! ছুন্না নাউয়ুবিল্লাহ) কারণ সাধারণ আইন-কানুনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য তাদের নিকটেও শর্ত-শরায়ত আছে। এতে যে কারো ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনা গ্রহণযোগ্য হয় না। শুধু বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে তাদের দৃষ্টিতেই কুরআন-সুন্নাহ ও আহকামে শরীয়তের ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনার বিষয়ে যে কেউ মত প্রকাশ করতে পারে, এমনকি তা দেশের আইনও হতে পারে! যদিও তার দ্বীনদারী ও আমানতদারী এবং ইলম ও আকলের অবস্থা তা-ই হয় যা উপরোক্ত সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত!

যাহোক, যে ব্যক্তি ইকবালের ওই বক্তৃতার উপর 'ইসলাম ধর্মের পুনর্গঠন' শিরোনাম যুক্ত করেছে, সে একই সাথে দ্বীন ও শরীয়ত, কুরআন ও সুন্নাহ, সত্য ও বাস্তবতা, ন্যায় ও ইনসাফ, এমনকি খোদ ইকবালের উপরও জুলুম করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়েত দান করুন। আরো জানতে হলে আলকাউসারের আগামী কোনো সংখ্যায় 'ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ও ইসলামী শরীয়তে রাজ্যশাসনের স্থান' বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধটির জন্য অপেক্ষা করুন। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাই উত্তম রক্ষাকারী। **# حسبنا الله ونعم الوكيل**

[এপ্রিল '১০ঈ.]

যাবীহুল্লাহ কে-এ প্রশ্ন কেন?

ইবরাহীম (আ.) তাঁর বড় পুত্র ইসমাইল (আ.)কে কুরবানী করার বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ আদেশ ছোট পুত্র ইসহাক (আ.) সম্পর্কে ছিল না। এটিই অকাট্য সত্য। কুরআন কারীম দ্বারা এটিই প্রমাণিত এবং এর উপরই প্রতি যুগের মুহাক্কিক-মনীষীগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত। এর বিপরীতে ইসহাক (আ.)কে ‘যাবীহুল্লাহ’ সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ মনগড়া কথা, যার ভিত্তি হল ইহুদীদের তাহরীফ ও অপব্যাখ্যা।

এই ফেতনার যামানায় দ্বীন ও ঈমানের বিভিন্ন প্রসঙ্গে এবং স্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদি সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির অপপ্রয়াস ধারাবাহিকভাবে চলছে। এর পেছনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বহু কারণ বিদ্যমান। সম্প্রতি ‘যাবীহুল্লাহ’ সম্পর্কে হাইকোর্টে রিট দায়েরের বিষয়টিও সেই ধারাবাহিকতারই একটি অংশ। অথচ তা গোড়াতেই আদালতের বিষয় নয়।

সে সময় বিচারক ও আইনজীবীদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার জন্য আলকাউসারের তত্ত্বাবধায়ক যে প্রবন্ধটি নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতিসহকারে প্রস্তুত করেছিলেন তা আমরা পাঠকবৃন্দের সামনে পেশ করে দেওয়া মুনাসিব মনে করছি। ইনশাআল্লাহ এতে ওইসব বন্ধুর উপকার হবে যাদের মনে উপরোক্ত বিষয়ে কোন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। -সম্পাদক

ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে কুরবানী করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন, ইসহাককে নয়। ছোট পুত্র ইসহাককে কুরবানী করার

আদেশ করা হয়েছিল-এ কথা ভুল। এই বাস্তব সত্য কয়েকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

- ১। কুরআন মাজীদের আলোকে।
- ২। বাইবেলের স্পষ্ট বর্ণনার আলোকে।
- ৩। তারীখ-ইতিহাসের আলোকে।
- ৪। মনীষীদের গবেষণার আলোকে।

১। কুরআন মাজীদের আলোকে

কুরআন মাজীদের ৩৭তম সূরা ‘আসসাফফাত’এ যবাহ (কুরবানী)এর ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। পরিপূর্ণ বিশ্লেষণসহ পূর্বাপর তা লক্ষ করা জরুরি। ইরশাদ হয়েছে-

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ, قَالَ يَاقَبْتُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّاهُ لِلْجَبِينِ. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا, إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّمَّنْ الصَّالِحِينَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ, وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ.

(তরজমা) “তারা পরস্পর বলল, ইবরাহীমের জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত কর এবং তাকে সে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। মোটকথা তারা ইবরাহীমের অনিষ্ট করার ইচ্ছা করল। সুতরাং আমি তাদেরকে অধঃপতিত করে দিলাম এবং ইবরাহীম বললেন, আমি তো আমার রব্বের দিকে ফিরে যাচ্ছি, তিনি আমাকে (উত্তম স্থানে) পৌঁছে দেবেনই। (তিনি দুআ করলেন) হে আমার রব্ব! আমাকে একটি সুসন্তান দান করুন। অতপর আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিলাম। অনন্তর যখন পুত্রটো তার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে

উপনীত হল, তখন তিনি বললেন, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি। অতএব তুমিও চিন্তা কর, তোমার কী মত। তিনি বললেন, আব্বাজান! আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা পূর্ণ করুন, ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। ফলকথা, যখন তারা আত্মসমর্পণ করলেন এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শায়িত করলেন এবং আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! নিশ্চয়ই আপনি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। আমি বিশিষ্ট বান্দাদেরকে এরূপই পুরস্কার প্রদান করে থাকি। প্রকৃতপক্ষেও তা ছিল একটি বড় পরীক্ষা। আর আমি তার পরিবর্তে একটি শ্রেষ্ঠ যবেহের পশু দান করলাম এবং আমি তার জন্য পশ্চাতে আগমনকারীদের মধ্যে এই বাক্য থাকতে দিলাম যে, ইবরাহীমের প্রতি সালাম হোক। আমি বিশিষ্ট বান্দাদেরকে এরূপই পুরস্কার প্রদান করে থাকি। নিঃসন্দেহে তিনি আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্যতম ছিলেন। আর আমি তাকে (পুত্র) ইসহাকের সুসংবাদ প্রদান করলাম যিনি নবী (এবং) সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর আমি ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি বরকত নাযিল করেছি এবং তাদের উভয়ের বংশে অনেক নেক লোকও রয়েছে এবং অনেকে এমনও রয়েছে, যারা প্রকাশ্যে নিজেদের ক্ষতি সাধন করছে।” -সূরা সাফফাত ৯৭-১১৩

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও সামনে উল্লেখিত এ সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত সামনে রেখে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ করা দরকার-

১। সূরা সাফফাত-এর উপরোক্ত আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আ.)এর দুজন সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। প্রথম সন্তানের নাম উল্লেখ করা হয়নি; বরং غلام حليم (ধৈর্যশীল একটি পুত্রসন্তান) বলে উল্লেখ করে তার কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় পুত্রসন্তানের সুসংবাদ নামসহ দেওয়া হয়েছে-فبشرناه باسحق

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ইবরাহীম (আ.)এর মাত্র দুজন পুত্রসন্তান ছিলেন; ইসমাইল ও ইসহাক। সুতরাং একজন অর্থাৎ ইসহাক (আ.)এর উল্লেখ নামসহ হলে অপরজন, যাকে غلام حليم (একজন ধৈর্যশীল পুত্রসন্তান) আখ্যা দিয়ে তার কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তিনি ইসমাইল (আ.) ছাড়া আর কে হবেন?

ইসহাক (আ.)এর আলোচনা তো কুরবানীর ঘটনার পরে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর সুসংবাদ তো নিজের ‘একমাত্র পুত্র’ ইসমাইলকে কুরবানী করার আদেশ পালনের পুরস্কার হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকেই তা সুস্পষ্ট।

২. কুরবানীর ঘটনা যে পুত্রের সাথে সংঘটিত হয়েছে তাকে কুরআন মাজীদে (সূরা সাফফাত (৩৭) : ১০৭) غلام حلیم (ধৈর্যশীল পুত্রসন্তান) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অথচ ইসহাক (আ.)কে তো غلام عليم (বিদ্বান সন্তান) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দেখুন, সূরা হিজর (১৫) : ৫৩; সূরা যারিয়াত (৫১) : ২৮

বোঝা গেল, غلام حلیم দ্বারা ইসমাইল (আ.) উদ্দেশ্য। যিনি নিঃসঙ্কোচে নিজের জীবন উৎসর্গ করাকে বরণ করে নিয়েছেন। এরচেয়ে বড় حلم (সহনশীলতা) আর কী হতে পারে?

কুরআনে ইসমাইল (আ.)কে من الصابرين (ধৈর্যশীল) বলেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দেখুন, সূরা আশিয়া (২১) : ৮৫। এ গুণটিই উপরোক্ত আয়াতসমূহে কুরবানীর ঘটনায় (সূরা সাফফাত (৩৭) : ১০২) উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কুরআন মাজীদের কোথাও ইসহাক (আ.)এর জন্য এ গুণের উল্লেখ নেই।

৩। যে পুত্রের সঙ্গে কুরবানীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ.)এর দুআর পরিপেক্ষিতে তাঁর সুসংবাদ প্রদান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

(তরজমা) “হে আমার রব! আমাকে একটি সুসন্তান দান করুন। অতপর আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিলাম।” —সূরা সাফফাত (৩৭) : ১০০-১০১

আর ইসহাক (আ.) غلام عليم এর জন্মের সুসংবাদ ইবরাহীম (আ.)এর দুআ ছাড়াই বৃদ্ধবয়সে ফেরেশতাদের মুখে প্রদান করা হয়েছে। যার কারণে তিনি অনেকটা অবাকও হয়েছেন যে, আমি তো বৃদ্ধ, আমার স্ত্রীও বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা, তাহলে সন্তান কীভাবে হবে? বিবি (সারা রা.)ও বিস্মিত হয়েছে। কুরআন মাজীদে (সূরা হুদ (১১) : ৬৯-৭৫; সূরা হিজর (১৫) : ৫১-৫৬; সূরা যারিয়াত (৫১) : ২৪-৩০) এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দুআ ব্যতীত যে غلام (পুত্রসন্তান)এর সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তার নাম ইসহাক। সূরা হুদ (১১:৭১) এ তা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর সূরা সাফফাত (৩৭ : ১০০-১০১)এ কথা সুস্পষ্ট যে, কুরবানীর ঘটনা যে পুত্রের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছে তার সুসংবাদ ইবরাহীম (আ.)এর দুআর

পরিপেক্ষিতে প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং তা ইসহাকের নয়, ইসমাইলের ঘটনা।

ঘ- কুরআন মজীদে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, কুরবানীর আদেশ ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পরীক্ষা। আর এটা ইসমাইল (আ.)এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, ইসহাক (আ.)এর ক্ষেত্রে নয়। কারণ ইসহাক (আ.)এর জন্মের সুসংবাদ দেওয়ার সময় আরো দুটি বিষয়ের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। প্রথমত তার ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম থেকে ইয়াকুব জন্মলাভ করবেন। দ্বিতীয়ত তিনি (অর্থাৎ ইসহাক আ.) নবী হবেন।

প্রথম বিষয়টি সূরা হুদ (১১:৭১)-এ এবং দ্বিতীয় বিষয়টি সূরা সাফফাত (৩৭:১১২)-এ উল্লেখিত রয়েছে। যেহেতু তাঁর সম্পর্কে পূর্ব থেকেই এই দুটি বিষয়ের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তাই তিনি পরীক্ষার বিষয় হতে পারেন না। কেননা, পূর্ববর্তী সুসংবাদের কারণে তার সম্পর্কে ইবরাহীম (আ.) অবগত আছেন যে, এই সন্তান বড় হবে, তাঁর বংশে ইয়াকুব জন্মলাভ করবেন এবং তিনি নবী হবেন। আর আল্লাহ তাআলা এসব স্পষ্ট দুটি সুসংবাদ প্রদানের পর এর পরিপন্থী কোন নির্দেশ কখনো দেবেন না। অতএব পরীক্ষা ইসমাইল (আ.)এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার জন্মের সুসংবাদের সাথে এমন কোন সুসংবাদ যোগ করা হয়নি যা পরীক্ষার প্রতিবন্ধক হতে পারে।

মোটকথা, কুরআন মজীদের উল্লেখিত আয়াতসমূহ এবং বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা অকাট্যভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানীর ঘটনা ইসহাক (আ.)এর সাথে নয়; বরং ইবরাহীম (আ.)এর অপর পুত্র ইসমাইল (আ.)এর সাথে সংঘটিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত আরো ইঙ্গিত (যা অনেক সময় স্পষ্ট বর্ণনা থেকেও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকে) কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে, এখানে শুধু চারটি বিষয় উল্লেখ করা হল।

একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে, এত আলোচনার পর যাবীহুল্লাহকে (যার সাথে কুরবানীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে) নাম উল্লেখ করে (ইসমাইল) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন থাকে না। তাছাড়া উক্ত বর্ণনা নাম উল্লেখের তুলনায় কম স্পষ্ট নয়।

এ বিষয়ে আরো জানতে হলে সূরা সাফফাতের সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর তাফসীরে ইবনে কাসীর খ. ৪, পৃ. ১৬-২১; তাফসীরে উসমানী পৃ. ৫৮৩-৫৮৪; তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন খ. ৭, পৃ. ৪৬২-৪৬৬; তাফহীমুল কুরআন খ. ৪, পৃ. ২৯৭-৩০১ দেখা যেতে পারে।

* বাংলাভাষায় কুরআন মজীদের সর্বপ্রথম অনুবাদক হিসাবে খ্যাত জনাব গিরিশ চন্দ্র সূরা সাফফাতের সংশ্লিষ্ট আয়াতের এই অর্থ করেছেন- “হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সাধুদিগের (একজন) দান কর। অবশেষে আমি তাহাকে

প্রশান্ত বালকের (ইসমায়িল নামক পুত্রের) সুসংবাদ দান করিলাম।” -কোরআন শরীফ (হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-৭ থেকে মুদ্রিত) পৃ. ৫১৩, সূরা সাফফাত ৯৯-১০০

হায়! যদি দেব নারায়ণ মহেশ্বর বাবুও এই সহজ-সত্যকে অনুধাবন করতেন!!

২। বাইবেলের বর্ণনার আলোকে

যেহেতু কটরপন্থী ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ই কুরআনের এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এবং কুরবানীর ঘটনাটি ইসহাক (আ.)এর সাথে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করে তাই বাইবেলের আলোকেও বিষয়টি আলোচনা করা সমীচীন মনে হচ্ছে।

বাইবেল পুরাতন নিয়মের প্রথম কিতাব ‘আদি পুস্তক’-এর ১৬, ১৭, ২১ ও ২২ নং অধ্যায়ে ইসমাইল ও ইসহাক (আ.)এর সুসংবাদ ও জন্মের আলোচনা এবং কুরবানীর ঘটনাও উল্লেখ রয়েছে। যেখানে নিচের বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে:

১। অব্রাহামের ছিয়াশি বছর বয়সে ইশ্মায়েলের জন্ম হয়েছিল। -আদি পুস্তক ১৬:১৬

২। অব্রাহামের বয়স যখন একশো বছর তখন তাঁর ছেলে ইসহাকের জন্ম হয়েছিল। -আদি পুস্তক ২১:৫

বোঝা গেল, বাইবেলের বর্ণনা মতেও ইসমাইল জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন, যিনি ইসহাক থেকে ১৪ বছরের বড়। আর ১৪ বছর পর্যন্ত ইসমাইলই ইবরাহীম (আ.)এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। আদি পুস্তকে (Genesis:) ২২তম অধ্যায়ে (২২:২) কুরবানীর যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাতে only son (একমাত্র পুত্র)কে কুরবানী করার কথা রয়েছে। (বাইবেলের অনুবাদে ‘অধিতীয় পুত্র’ কথাটি ভুল।)

বলাবাহুল্য বড় পুত্র ইসমাইলের বর্তমানে ইসহাক একমাত্র পুত্র হতে পারেন না। তবে ইসহাকের জন্মের ১৪ বছর পূর্ব পর্যন্ত ইসমাইল পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। সুতরাং বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ীও কুরবানীর ঘটনা ইসমাইলের সাথে সংঘটিত হয়েছে। এ বিষয়ে বাইবেলের তরজমাসমূহে ইসহাকের উল্লেখ স্পষ্ট ভ্রান্তি, যা বাইবেলের স্পষ্ট বর্ণনাসমূহেরও পরিপন্থী।

অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত Short Encyclopedia of Islam-এর অনুসরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত ‘সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ’-এর নিম্নোক্ত দুটি আলোচনা লক্ষ করা যেতে পারে :

“ইসমাইল اسمعيل (‘আ) একজন প্রসিদ্ধ নবী, বীবি হাজিরাঃ-এর গর্ভজাত হযরত ইবরাহীম (‘আ)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র। ইসমাইল শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ হইল ...।

হযরত ইবরাহীম (‘আ)-এর ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহার জন্ম (Genesis, ১৬ঃ১-১৬)। তিনি ছিলেন কুরাইশ ও উত্তর ‘আরবের ‘আদনান বংশীয় অধিবাসিগণের আদি পিতা। তাঁহার জন্মের অল্প কিছুদিন পর পিতা ইবরাহীম (‘আ) আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে বর্তমানে যেখানে কা’বাঃ অবস্থিত সেখানে এক জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে রাখিয়া আসেন। ...।

ইবরাহীম (‘আ) তাঁহার প্রচার ক্ষেত্র কানআন-এর দিকে চলিয়ে গিয়াছিলেন। কিছুদিন পর তিনি আসিয়া দেখিলেন, ইসমাইল (‘আ) কিছুটা বড় এবং পিতার সহিত চলাফেরা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তখন ইবরাহীম (‘আ) একদা স্বপ্নে তাঁহাকে কুরবানী করিতে আদিষ্ট হন। জাগ্রত হইয়া তিনি পুত্রকে বলিলেন, “হে পুত্র আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি তোমাকে কুরবানী করিতেছি, তুমি কি বল? তিনি বলিলেন, হে পিতা, আপনি যাহা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আপনি, ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল দেখিতে পাইবেন (৩৭ঃ১০২)।” পুত্রকে কুরবানী করিবার উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (‘আ) এক প্রান্তরে (মিনা) উপস্থিত হইলেন। ইবরাহীম (‘আ) পুত্রের গলায় ছুরি চালাইবেন-এমন সময় আল্লাহর তরফ হইতে আওয়াজ শুনিলেন, “হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়াছ। আমি এই প্রকারেই সৎকর্মশীল ব্যক্তিদিগকে পুরস্কৃত করি (৩৭ঃ১০১-১০৫)।”

অতঃপর আল্লাহ ইবরাহীম (‘আ)কে পুত্রের পরিবর্তে এক পশু দান করিলেন কুরবানীর জন্য (৩৭ঃ১০৭)। তখন হইতে ইসমাইল (‘আ) যাবীহুলাহ নামে খ্যাত হইলেন। মুসলিমবিশ্ব তখন হইতে একই দিবসে সেই মহান কুরবানীর অনুষ্ঠান করিয়া থাকে আত্মোৎসর্গের প্রতীকরূপে। কুরবানী সংক্রান্ত আয়াতে ইসমাইল (‘আ)-এর নামটিই উল্লেখ নাই। এই সুযোগে যাহুদী ও খৃষ্টান লেখকগণ তাহাদের নিকটতম পূর্বপুরুষ, সারার-এর গর্ভজাত ইবরাহীম (‘আ)এর দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক (‘আ)কে যাবীহুলাহ নামে আখ্যায়িত করেন।

তাহাদের এই দাবী ভ্রান্ত। কারণ ইসহাক বাইবেলোক্ত Thine only son (Genesis, ২২ঃ২) ইবরাহীম (‘আ)-এর একমাত্র পুত্র নহেন। তাঁহার পূর্বে ইসমাইলের জন্ম হইয়াছিল। Genesis ১৬ঃ১৬ অনুযায়ী ইবরাহীম (‘আ)-এর ৮৬ বৎসর বয়সে ইসমাইলের জন্ম এবং Genesis ২১ঃ৫ অনুযায়ী ১০০ বৎসর বয়সে ইসহাকের জন্ম। সুতরাং ইসহাক তাঁহার প্রথম পুত্রও নহেন। যদি হইতেন তাহা

হইলে দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাকে একমাত্র পুত্র বলা হইত। কুরআনের কথায় ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ আসিয়াছিল প্রথম পুত্র ইসমাইলের জন্ম এবং কুরবানী অনুষ্ঠানের পর (৩৭ঃ১১২)।

খলীফা উমার ইবন 'আবদিল আযীয একদা জনৈক ইসলামে দীক্ষিত যাহুদীকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, যাহুদীরা জানে, ইসমাইলই প্রকৃত যাবীহ। তবে তাহারা আপনাদের প্রতি ঈর্ষাবশত ইহা স্বীকার করে না।" -সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ১৮৫-১৮৬

"ইসহাক (اسحاق) ('আ) ইনি বাইবেলোক্ত Issac। তাল্মুদ (Roshhash-shana, পৃষ্ঠা ১১) অনুসারে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল Foast of passah -এর সময়। মুসলিম কিংবদন্তী অনুসারে তাঁহার জন্ম 'আশুরা-র রাত্রিতে (আছ-ছা'লাবী, পৃ. ৬০; আলকিসাঈ, পৃ. ১৫০)। ইবরাহীম ('আ)-এর নিয়ম এই ছিল যে, কোন দরিদ্র অর্থাৎ পথিক মেহমানরূপে উপস্থিত হইলে তবে তিনি তাহার সহিত আহার করিতেন। একদা কতিপয় ফিরিশতা মানুষের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার মেহমান হইলেন। তাঁহাদের আপ্যায়নের জন্য তিনি একটি ভর্জিত গো-বৎস তাঁহাদের সামনে উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা আহাৰ্য গ্রহণ করিতেছেন না দেখিয়া তিনি বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। মেহমানগণ তাঁহাকে জানাইলেন, তাহারা ফিরিশতা। লূত ('আ)-এর অবাধ্য উম্মাহকে শাস্তি দানের জন্য তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছেন। অতঃপর ফিরিশতাগণ তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী সারা-র গর্ভজাত একটি পুত্রসন্তান লাভের সুসংবাদ প্রদান করেন। সারাঃ এই সুসংবাদ শ্রবণে অতিশয় আশ্চর্যম্বিতা হইলেন, (১১ঃ৬৯-৭৩), কারণ তাঁহার বয়স ছিল নব্বই এবং তাঁহার স্বামীর বয়স একশত বৎসর (Genesis, ১৭ঃ১৮)। ইহার পর ইসহাক ('আ) জন্মগ্রহণ করেন। বাইবেলে উক্ত হইয়াছে, ইবরাহীম ('আ) আব্রাহামের আদেশে ইসহাককে কুরবানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন (Genesis, ২২ঃ২)। কিন্তু ইহা ভ্রামাত্মক, কারণ উক্ত শ্লোকে Issacকে Thine only son বলা হইয়াছে। অথচ ইসহাক-এর জন্মের পূর্বে ইসমাইল ছিলেন only son। অন্যপক্ষে Issac যে ইবরাহীমের ২য় পুত্র-বাইবেলের বর্ণনায় ইহাও সুস্পষ্ট। ইসমাইলের বংশধরগণই সেই কুরবানীর আদর্শ আজ পর্যন্ত বজায় রাখিয়াছে, ইসহাক ও তৎপুত্র যাকুবের বংশধর ইহাতে শরীক নহে।

ইসহাক ('আ) ফিলিস্তীনের হেবরন নামক স্থানে তাঁহার পৈতৃক আবাসস্থলেই বাস করিতেন (মাওদূদী, তাফহীমুল কুরআন ২ঃ৩৮১)। এখানে তিনি তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্তরূপে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি যথাসময়ে নুবুওয়াঃ প্রাপ্ত

হন। ইহার পুত্র য়াকুব ('আ), বাইবেলের Jacob ইসরাঈলীদের আদি পিতা।”
-সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন খ. ১, পৃ. ২০০-২০১

তাছাড়া বাইবেলের সবচেয়ে বিশুদ্ধতম বর্ণনা, যা 'ইজিলে বারনাবাস' নামে প্রসিদ্ধ, তাতে ৪৩ ও ৪৪ নং অধ্যায়ে ঈসা (আ.)এর স্পষ্ট বাণী উল্লেখ রয়েছে যে, কুরবানীর ঘটনা ইসমাইল (আ.)এর, ইসহাক (আ.)এর নয়।

এটা ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, খৃষ্টানগণ এই ইজিলটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। আর তা মূলত এর এসব বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট তথ্যসমূহের কারণেই। -ইজিলে বারনাবাস পৃ. ১৭৭-১৮১

এ প্রসঙ্গে ড. হামীদুল্লাহ (রহ.)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দের কথা। ড. সাহেব যখন এ বিষয়ের উপর ইহুদীদের কিতাবসমূহ এবং ইতিহাসের অর্থসমূহ থেকে প্রমাণ করে দিলেন যে, কুরবানীর ঘটনা ইসমাইল (আ.)এরই তখন ইহুদী পণ্ডিতগণ তাকে নির্জনে বলেছিল, আপনার এই গবেষণা মেনে নিলে তো আমাদের পুরো মাযহাবই বাতিল হয়ে যাবে। ড. সাহেব বলেছিলেন, সঠিক বিষয় পেশ করা আমার কাজ। দলীলের আলোকে আমি তা করেছি। এখন মানা না মানা আপনাদের কাজ। -ড. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ কী বেহতরীন তাহরীরে, ভূমিকা, পৃ. ২৯-৩০, সাপ্তাহিক তাকবীর-এর উদ্ধৃতিতে

৩। তারীখ-ইতিহাসের আলোকে

ইতিহাসের সুদৃঢ় পরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত যে, কুরবানীর এই ঘটনা মক্কার হারাম এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। কুরবানীর আদেশ পালনের সময় শয়তান যে তিনটি স্থানে কুমন্ত্রণা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং ইবরাহীম (আ.) প্রত্যেকবার ওকে ৭টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন মূলত তারই স্মৃতিচারণে মিনার জামরাসমূহে কঙ্কর নিক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তখন থেকেই হজ্জের বিধানসমূহে কুরবানী অন্তর্ভুক্ত হয়। হজ্জ ছাড়াও যিলহজ্জ মাসে কুরবানী প্রথা আরবে (যারা ইসমাইল-এর বংশধর) পালিত হয়ে আসছে। বলাবাহুল্য যে, মক্কার হারাম এলাকা ইসমাইল (আ.)এর বাসস্থান ছিল, ইসহাক (আ.)এর নয়। কেননা, তিনি শাম এলাকায় বসবাস করতেন। সুতরাং হারাম এলাকায় কুরবানীর ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং আজ পর্যন্ত তার প্রচলন অব্যাহত থাকা এ কথার প্রমাণ যে, এই ঘটনাটি ইসমাইলের, ইসহাকের নয়। কুরবানীর আদর্শ ইসমাইল-বংশীয়দের মাঝে পালিত হয়, ইসহাক-বংশীয়দের মাঝে নয়। -ইবনে তাইমিয়া (৭২৮হি.) : মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া খ. ৪, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬; ইবনুল কাথির (৭৫১হি.) : যাদুল মাআদ ফী

হাদয়ি খাইরিল ইবাদ খ. ১, পৃ. ৭৩; ইগাছাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ শায়তান খ. ২, পৃ. ৩৮৫; শাক্বীর আহমদ উসমানী (১৩৬৯হি.) : তাফসীরে উসমানী, সূরা সাফফাত; সায়্যিদ সুলাইমান নদভী ১৩৭৩হি.) : সীরাতুল্লাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খ. ১, পৃ. ৭৮-৮৬

বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ দ্বারা এ কথাও সুপ্রমাণিত যে, হযরত ইসমাইল (আ.)এর পরিবর্তে যে দুম্বাটি জবাই করা হয়েছিল তার শিং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)এর সময় পর্যন্ত কাবা শরীফে সংরক্ষিত ছিল। (আলআযরকীকৃত আখবারে মক্কায় এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে।) মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ঢেকে রাখার নির্দেশ দেন। যেন কোন নামাযীর মনোযোগে বিঘ্ন না ঘটে। -সুনানে আবু দাউদ খ. ২, পৃ. ২৮৯-২৯০, কিতাবুল মানাসিক; মুসনাদে আহমদ খ. ৪, পৃ. ৬৮ ও খ. ৫, পৃ. ৩৮০

এর দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানীর ঘটনা শামদেশে নয়, মক্কায় সংঘটিত হয়েছে। আর ইসহাক (আ.) নয়, ইসমাইল (আ.)এর সাথে সংঘটিত হয়েছে। এ জন্য ইবরাহীম ও ইসমাইল কর্তৃক নির্মিত বাইতুল্লাহ শরীফে তার স্মৃতিচিহ্ন (ইসমাইলের পরিবর্তে প্রদত্ত দুম্বার শিং) সংরক্ষণ করা হয়েছিল। -ইবনে কাসীর (৭৭৪হি.) : তাফসীরুল কুরআনিল আযীম খ. ৪, পৃ. ১৮, সূরা সাফফাত

৪। সকল যুগের গবেষকদের বিশ্লেষণের আলোকে

প্রত্যেক যুগের গবেষকদের বিশ্লেষণ একটি দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। এখানে শুধু নমুনাস্বরূপ কয়েকজন ব্যক্তি ও কিতাবের নাম উল্লেখ করা হল।

১। সাহাবিয়ে রাসূল আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, “যার পরিবর্তে দুম্বা কুরবানী করা হয়েছে তিনি ইসমাইল। ইহুদীরা তাকে ইসহাক বলে থাকে। এটি তাদের মিথ্যাচার।” -তাফসীরে ইবনে কাসীর খ. ৪, পৃ. ১৯

২। তাবেরী মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আলকুরায়ী (১২০হি) বলেন, “আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ.)কে যে পুত্র কুরবানী করার আদেশ করেছেন তিনি হলেন ইসমাইল। এ বিষয়টি আমরা কিতাবুল্লায় (কুরআন মজীদে) পেয়েছি। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরবানীর ঘটনা উল্লেখ করার পর ইসহাক (আ.)এর আলোচনা করেছেন এবং অন্য স্থানে ইরশাদ করেছেন-

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

(তরজমা) “আমি ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইসহাকের বংশে পৌত্র ইয়াকুবের

সুসংবাদ প্রদান করেছি।”

এরপরও তাকে জবাই করার আদেশ কীভাবে দেওয়া যেতে পারে? নিঃসন্দেহে জবাই করার আদেশ ইসমাইল সম্পর্কেই ছিল। -তাকসীরে ইবনে কাসীর ৪/২০

৩। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আলকুরায়ীর বর্ণনা যে, আমার উপস্থিতিতে উমর ইবনে আব্দুল আযীযকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, যাবীহ হযরত ইসমাইল ছিলেন নাকি হযরত ইসহাক? তখন মজলিসে এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যিনি পূর্বে ইহুদী পণ্ডিত ছিলেন পরবর্তী সময়ে পরিপূর্ণ মুসলমান হয়েছেন। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর শপথ, তিনি ইসমাইলই ছিলেন। ইহুদীরা এই বিষয়টি জানে, কিন্তু আরবদের প্রতি ঈর্ষাবশত এই দাবি করে যে, যাবীহ হলেন হযরত ইসহাক।

-ইবনে জারীর : তাকসীরুত তাবারী খ. ১০, পৃ. ৫১৪

৪। আসমায়ী একবার আবু আমর আলআলা (১৫৪হি.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, যাবীহ কে ছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, তোমার বুদ্ধি-বিচার কোথায় গেল! ইসহাক (আ.) কি কখনো মক্কায় ছিলেন? ইসমাইল (আ.)ই তো পিতার সঙ্গে বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছেন। আর কুরবানীস্থল তো মক্কায়! -আবু হাইয়ান উন্দুলুসী (৭৫৪হি.) : আলবাহরুল মুহীত (সূরা সাফফাত)

যেসব কিতাবে এ বিষয়ে প্রামাণিক গবেষণা উল্লেখ রয়েছে তা থেকে কয়েকটি কিতাবের নাম এখানে উল্লেখ করা হল :

১। مجموع فتاوى ابن تيمية (মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া) খ. ৪, পৃ. ৩৩১-৩৩৬

২। منهاج السنة النبوية (মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়া) ইবনে তাইমিয়া খ. ৫, পৃ. ৩৫৩-৩৫৫ (পুরাতন মুদ্রণ খ. ৩, পৃ. ৮৮-৮৯)

৩। زاد المعاد في هدي خير العباد (যাদুল মাআদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ) ইবনুল কায়্যিম (৭৫১হি.) খ. ১, পৃ. ৭১-৭৪

৪। إغائة اللفان (ইগাসাতুল লাহফান) ইবনুল কায়্যিম খ. ২, পৃ. ৩৮৫-৩৮৮

৫। سيرة النبي (সীরাতুননাবী) শিবলী নুমানী খ. ১, পৃ. ৭৮-৮৬

৬। الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (আলইসরাঈলিয়াত ওয়াল মওযুআত ফী কুতুবিত তাফসীর) ড. মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আবু শাহবা পৃ. ২৫২-২৬০

৭। رحمة للعالمين (রাহমাতুল্লিল আলামীন) কাযী মুহাম্মাদ সুলাইমান মনসুরপুরী

খ. ২, পৃ. ৪৭-৫১

৮। القول الصحيح في تعيين الذبيح (আলকওলুস সহীহ ফী তা'য়ীনিয় যাবীহ) মুহাম্মাদ সাঈদ আলআনী, যা উপরোক্ত বিষয়ে লিখিত ৮৮ পৃষ্ঠার বৃহৎ পুস্তিকা।

৯। الرأي الصحيح في من هو الذبيح (আররা'যুস সহীহ ফী মান হুয়ায যাবীহ) হামীদুদ্দীন ফারাহীর প্রবন্ধ, যা তার কিতাব 'তাফসীরে নিয়ামুল কুরআন'এর ভূমিকায় উল্লেখিত হয়েছে। যার উর্দু তরজমা 'কুরআন আওর উসকি হাকীকত' নামে মাকতাবা তামীরে ইনসানিয়াত, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

১০। قصص الأنبياء (কাসাসুল আন্বিয়া) আব্দুল ওয়াহহাব নাজ্জার।

১১। قصص القرآن (কাসাসুল কুরআন) হিফজুর রহমান সীওহারাভী খ. ১, পৃ. ১৬৫-১৬৭

১২। উর্দু দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া লাহোর, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি খ. ২৮, পৃ. ৭৩৪, প্রবন্ধ : ইসমাঈল আ.।

১৩। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন খ. ১, পৃ. ১৮৫-১৮৬ ও ২০০-২০১

সত্যসন্ধানীদের জন্য ইনশাআল্লাহ এই দলীল-প্রমাণ অপ্রতুল নয়। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের নিকট আরো তথ্য-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আপাতত এখানেই সমাপ্ত করা হল। আশা করি, সত্যপন্থীদের কোন সংশয় থাকবে না। আর সাধারণ মুসলমানদের উচিত তারা যেন নিজের আকীদায়ে মুতাওয়্যারাসার বিষয়ে স্বার্থান্বেষী কিংবা মূর্খ লোকদের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত না হন।#

[অক্টোবর '১০ঈ.]

সাক্ষাৎকার

[তাহকীকৃত তুরাস-মুদ্রিত-অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ সম্পর্কে]

[মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক জন্ম ১৩৮৯হি., চাঁদপুর শাহরাস্তির খেড়িহর মাদরাসায় গুরু থেকে মেশকাত পর্যন্ত অধ্যয়ন। করাচির বিনৌরি টাউনের জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়ায় তাকমীল ১৪০৮ হি.। ওই জামিআতেই হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ নুমানী (রহ.)এর তত্ত্বাবধানে তাখাসসুস ফিল হাদীস (উলূমুল হাদীস বিষয়ে উচ্চতর পাঠ গ্রহণ) করেন শাওয়াল ১৪০৮ থেকে শাওয়াল ১৪১১ হি. পর্যন্ত। দারুল উলূম করাচিতে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমেঁর তত্ত্বাবধানে তাখাসসুস ফিল ইফতা (ফতোয়া বিষয়ে উচ্চতর পাঠ গ্রহণ) করেন যিলকদ ১৪১১ হি. থেকে ১৪১৪হি. মুহাররাম পর্যন্ত। ১৪১৪হি. সফর থেকে ১৪১৬হি.এর রজব পর্যন্ত রিয়াদে শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু শুদ্দাহ (রহ.)এর তত্ত্বাবধানে উচ্চতর উলূমুল হাদীস ও ইলমী গবেষণার কাজে আড়াই বছর অতিবাহিত করেন। এর পরের শাওয়াল ঢাকায় উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা'র প্রতিষ্ঠা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের আমীনুত তালীম ও উলূমুল হাদীস অনুষদ প্রধানের দায়িত্ব পালন এবং এখনও এ দায়িত্বে নিয়োজিত। গত ১৪২৬হি.এর মুহাররাম থেকে ওই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র মাসিক আলকাউসার-এর তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন। ইসলামী উলূম, হাদীস নিয়ে বিভ্রান্তির উন্মোচন, বিদআতসহ দ্বীনের পোশাকে প্রচলিত বহু বাতিলের স্বরূপ বিশ্লেষণে গবেষণাধর্মী শতাধিক

মৌলিক নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ। উলূমুল হাদীস বিষয়ে মৌলিক আরবী গ্রন্থ ‘আলমাদখাল ইলা উলূমিল হাদীসিশ শারীফ’, ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহের উপর বাংলা গ্রন্থ ‘প্রচলিত জাল হাদীস’ এবং ইলমে তাসাওউফ বিষয়ে বাংলা গ্রন্থ ‘তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ’ তার তিনটি সাড়া জাগানো গ্রন্থ।

প্রধানত উলূমুল হাদীসকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে ফিক্হ, সীরাত, উসূল ও ইসলামী উলূমের অন্যান্য শাখায় গবেষণারত এই চল্লিশছোঁয়া তারুণ্যদীপ্ত সাধক, বিনয়ী ও প্রাজ্ঞ আলেমে দ্বীন বাংলাদেশ, উপমহাদেশসহ পৃথিবীর বহু বরেণ্য মুহাক্কিক ও হাক্কানী বুয়ুর্গ আলেমের মহব্বত ও শফকতের ছায়ায় দ্বীনী উলূমের গবেষণা ও চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর গবেষণা ও মনোযোগের বিশেষ একটি বিষয় হল, আকাবির ও আসলাফের মুদ্রিত-অমুদ্রিত বিভিন্ন কিতাবের তাহকীক; পরিভাষায় যাকে বলে তাহকীকুত তুরাস। এরই মধ্যে পৃথিবীর বহু কুতুবখানায় সংরক্ষিত শত বছর থেকে নিয়ে হাজার বছর আগেরও দুর্লভ বহু অমূল্য পাণ্ডুলিপির সন্ধান নিয়ে তিনি কাজ করে চলেছেন। সেসব পাণ্ডুলিপি কিংবা তার অনুলিপি উদ্ধার, তাহকীক-সম্পাদনার পর সেগুলো যথার্থ যত্নে প্রকাশের একটি মিশন তাঁর সামনে। ইসলামী উলূমের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রায় অপ্রচলিত ও অচর্চিত একটি বিষয়ে তাঁর চিন্তা, পদক্ষেপ ও ভবিষ্যৎপ্রোগ্রাম জানতে তাঁর মুখোমুখি বসেছিলেন মাসিক আলকাউসার-এর নির্বাহী সম্পাদক শরীফ মুহাম্মাদ।]

* তুরাসে ইসলামী ও তাহকীকুত তুরাস বিষয়টি কী?

** সালাফ বা পূর্ববর্তী ইসলামী মনীষীগণের রেখে যাওয়া ইলমী মীরাস বা উত্তরাধিকার, যা তারা কিতাবি আকৃতিতে রেখে গিয়েছেন। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যে উলূমে নবুওয়াত বা নববী ইলম সাহাবায়ে কেরাম অর্জন করেছেন এবং তাঁরা ও পরবর্তী সালাফগণ এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যা বলেছেন ও লিখেছেন তা বিভিন্ন আঙ্গিকে সংরক্ষিত রয়েছে; সেসব আঙ্গিকের অন্যতম হল কিতাবী আকৃতি। প্রথমদিকে এগুলো ছিল মাখতূতাত বা পাণ্ডুলিপির আকৃতিতে, পরবর্তী সময়ে মুদ্রিত (মাতবূআত) গ্রন্থে রূপান্তর করার কাজ শুরু হয়। এই প্রক্রিয়াটিতে সতর্কতা, যাচাই-বাছাই এবং পর্যাপ্ত তাহকীকের

ব্যবস্থা করা হত। এ কারণে এক পর্যায়ে এটি একটি স্বতন্ত্র বিষয় বা শাস্ত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এভাবেই 'তুরাস' নিয়ে তাহকীক করার একটি ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। 'তুরাসে ইসলামী' নিয়ে তাহকীক নীতি কী হবে? কোনো একটি পাণ্ডুলিপি বা গ্রন্থকে কখন তুরাসের অন্তর্ভুক্ত করা হবে? তুরাসের মাপকাঠি কী? পাণ্ডুলিপি পর্যায়ের কোনো তুরাস মুদ্রণে নিতে হলে কী কী উসূল বা নীতি অনুসরণ করতে হবে? এই তুরাসটি যেই লেখকের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, আসলেও সেটি তার কিনা? এই কপিটি বাস্তবেই লেখকের মূল কপি বা তার অনুলিপি কিনা? অনুলিপি হলে তার নির্ভরযোগ্যতা কতটুকু? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে অনেক স্বতন্ত্র কিতাবাদি রচিত হয়েছে। তুরাসে ইসলামীর তাহকীক বা সম্পাদনার ক্ষেত্রে ওই কিতাবগুলোতে বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করতে হয়।

* প্রাচীন কোনো পাণ্ডুলিপি পর্যায়ের তুরাস কি এখন যে কেউ মুদ্রিতরূপে প্রকাশ করতে পারেন?

* * ইলমী গভীরতার পাশাপাশি তুরাসের বিষয় ও মূলনীতি জানা থাকা, দীর্ঘ অধ্যবসায়, যাচাই-বাছাই ও গবেষণা করা এবং আমানতদারী বজায় রেখে এ কাজ করার চেষ্টা যারা করেন তারা সফল হন। যে কোনো প্রকাশক ইচ্ছা করলেই এটা করতে পারেন না। করলে তাতে প্রচুর ভুলত্রুটি ও অসামঞ্জস্য থেকে যায়। মূলত ইলমী অবস্থানের গভীরতা ও আমানতদারী ছাড়া একাজ ছুট করে করা উচিত নয়।

* আমরা শুনেছি প্রাচ্যবিদদের হাতে ইসলামী উলূমের বহু পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত হয়ে গ্রন্থরূপ নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কতটুকু?

* * প্রাচ্যবিদরা ইসলামী তুরাস নিয়ে কিছু কাজ করেছেন। কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা যে, তুরাসে ইসলামী নিয়ে তাহকীকের সূচনা তাদের হাতে হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে তাদের দেখাদেখি মুসলিম গবেষকরাও সে পথে গিয়েছেন। মিসরের প্রখ্যাত গবেষক আলেম আহমাদ শাকের এ রকম ভুল ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন। ইয়াহইয়া ইবনে আদম (২০৩হি.) সংকলিত 'কিতাবুল খারাজ' এর ভূমিকায় আহমদ শাকের প্রাচ্যবিদ বা মুস্তাশরিকদেরকে 'তাহকীকে তুরাসে'র সূচনাকারী হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে 'জামে তিরমিযী' তাহকীক করে প্রকাশ করার সময় তুরাসের তাহকীক বিষয়ে ঐতিহাসিক বাস্তবতা তার কাছে উদ্ভাসিত হলে তিনি তাঁর পূর্বমত থেকে ফিরে আসেন। আসলে তাহকীকে তুরাস এর কাজ মুসলিম মনীষীগণই আগে শুরু করেছেন। আর এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়। কারণ, তুরাস তো মুসলমানদের। সুতরাং এর প্রতি তাদের আগ্রহ অমুসলিমদের চেয়ে বেশি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাহকীকৃত

তুরাসের বেশ কয়েকটি দিক রয়েছে—

১. তাওসীকুন নস ও তাসহীহুহ (ভাষ্যের বিস্তৃতা যাচাই ও সম্পাদনা)।
২. যাবতুন নস (বিস্তৃত পাঠের বিবরণ)।
৩. আলমুরাজাআ ওয়াত-তাখরীজ (উৎসের বিবরণ)।
৪. তালীক (টীকা লিখন)।
৫. তারকীম (যতি চিহ্নের ব্যবহার)।
৬. ফাহরাসা (নির্ঘণ্টায়ন/ইন্ডেক্সিং)।

এসব কটিরই সূচনা হয় মুসলিম মনীষীদের হাতে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক বিষয় হল প্রথম চারটি, যেগুলোতে প্রাচ্যবিদদের কোনো স্বাতন্ত্র্যই নেই। তাদের কাছে ভালো কিছু যদি থাকে তবে তা মুসলিম মনীষীদের কাছ থেকেই ধার করে নেওয়া।

থাকল তারকীম ও ফাহরাসার কথা। এগুলোরও সূচনা হয় মুসলমানদেরই হাতে। তারকীমের মূল ভিত্তি হল ‘ইলমুল আওকাফ’ এবং ‘ইলমুল ফাওয়াসেল’। যা ইস্তেশরাক অস্তিত্বে আসার হাজার বছরেরও বেশি আগে মুসলিম মনীষীদের হাতেই সূচিত হয়। এমনভাবে ফাহরাসার ভিত্তি হল আইন্মায়ে হাদীসের আসমায়ে রিজালের ওই সব গ্রন্থের উপর যেগুলো আরবী বর্ণমালার বর্ণনাক্রমানুসারে বিন্যস্ত। আর এ ধরনের গ্রন্থগুলোর সংকলন শুরু হয়েছে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী বা তারও কিছু আগ থেকে। তবে, তুরাসে ইসলামী নিয়ে তাহকীক করার মূলনীতিগুলো আয়ত্ত্ব করে নেওয়ার কারণে তারা এ বিষয়ে কিছু কিছু কাজ করতে পেরেছে। তুরাসের তাহকীক যে প্রাচ্যবিদদের বহু আগে মুহাদ্দিসীদের হাতে হয়েছে এ তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনাটি আহমদ শাকের যে ভূমিকাটিতে লিখেছেন সেই ভূমিকাটির তাহকীক করেছেন শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু শুদ্দাহ (রহ.)।

* তুরাসের প্রয়োজনীয়তা ইলমী ক্ষেত্রে কতটুকু?

* * এর প্রয়োজনীয়তা তো প্রশ্নাতীত। দ্বীনের উৎস কুরআন ও সুন্নাহকে আল্লাহ তাআলা যেমন হেফায়ত করেছেন, তেমনি এ দু উৎসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে উলামায়ে সালাফ যে মহান খেদমত আগ্রাম দিয়েছেন সেগুলোও আল্লাহ তাআলা হেফায়ত করেছেন। দ্বীনের বাহক বা মাধ্যম দু ধরনের—১. রিজালে দ্বীন-ইসলামী মনীষীগণ। ২. কুতুবে দ্বীন-দ্বীনী বিষয়ে লিখিত কিতাবসমূহ। সুতরাং এটা পরিষ্কার তুরাসে ইসলামী যাকে বলা হয় তার প্রয়োজনীয়তা এবং ইলমে দ্বীনের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রায় সমান।

* দ্বীনের বহু প্রয়োজনীয় ও প্রামাণ্যগ্রন্থ মুদ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান। এ অবস্থায় পূর্বযুগের পাণ্ডুলিপি (মাখতুতাত) নিয়ে তাহকীক করা ও মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

* * পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাহকীক ও গবেষণার এ প্রক্রিয়াতেই বর্তমানে প্রাপ্ত কিতাবগুলো আমরা পেয়েছি। এগুলোও সেভাবেই এসেছে। এখনকার কিতাবগুলো অবশ্যই প্রয়োজন পূরণ করছে। কিন্তু এগুলোকেই এমনভাবে যথেষ্ট মনে করার প্রয়োজন নেই যে, আমাদের সামনে পূর্ব যুগের বহু নির্ভরযোগ্য কিতাবের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার ও তা নিয়ে কাজ করার সুযোগ থাকলেও তা করা যাবে না। এ ছাড়া তুরাস নিয়ে তাহকীক বা গবেষণার যে বিষয়টি রয়েছে তা মুদ্রিত কিতাবাদি নিয়েও তো চলছে। তাহকীকে তুরাস মানেই শুধু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা নয়; মুদ্রিত-অমুদ্রিত উভয় পর্যায়েই তুরাস নিয়েই তাহকীক চলে এবং এর প্রয়োজনও রয়েছে এবং এসব তাহকীকের দ্বারা বহু ত্রুটি-বিচ্ছৃতি চিহ্নিত হয়। বহু ফায়েদা হয়।

* তাহকীকৃত তুরাসের বিষয়টি তো সম্ভবত এ কারণেও উদ্ভাবিত হয়েছে যে, আগের যুগের লেখকগণ তাদের হাতে কিতাব মুদ্রণ করে যেতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে একশ-দুশ বা আরো শত শত বছর পরে সেই পাণ্ডুলিপি কেউ উদ্ধার করে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তখন প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই ও তাহকীকের কাজ করেছেন?

* * তাহকীকৃত তুরাসের এ কাজ লেখক নিজে তার পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করে গেলেও চলেছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। যেমন তাহের আলজাযায়েরী (মৃত্যু ১৩৩৮ হিজরী) ১৩২৮ হিজরীতে তার লিখিত 'তাওজীহুন নযর' কিতাবটি ছেপেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ১৪১৬ হিজরীতে সেই কিতাবটিকেই তাহকীক করে দু'খণ্ডে প্রকাশ করেছেন শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)। সেই কাজে শায়খের হেদায়াত ও নির্দেশে কিছু কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রায় শতাব্দিক ভুল তাতে সংশোধিত হয়েছে এবং বহু জায়গায় হাশিয়া ও টীকা-টিপ্পনী যুক্ত করা হয়েছে। তাই লেখক নিজে প্রকাশ করে যেতে পারেননি বলেই তাহকীকের এ ধারার উদ্ভব এমন নয়, বরং সত্য হচ্ছে এই যে, ইসলামী উলূমের সংকলন-রচনাকর্ম বা তাসনীফ যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই তাহকীক বা গবেষণা শুরু হয়েছে। আর এ তাহকীক মুদ্রিত কিতাব ও অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি উভয় ক্ষেত্রেই চলেছে। আর এটা জরুরিও ছিল।

* তাহকীকৃত তুরাস নিয়ে প্রথম ধারণা ও অবগতি আপনি কীভাবে পেলেন?

* * করাচির ইউসুফ বিনোরি টাউনে উলুমুল হাদীস নিয়ে তাখাসসুসে অধ্যয়নকালে এ বিষয়ে ধারণার সূচনা। আমাদের পাঠ্য একটি কিতাব ছিল হযরত মাওলানা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহ.)এর লিখিত। সে কিতাবে নামের সাথে লেখা দেখলাম-হাক্কাকাহ, খাররাজা নুসুসাহ, ওয়া আল্লাকা আলাইহি' এখানে শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ (রহ.)এর নাম। কিতাব লিখেছেন মাওলানা লাখনোভী। আর তাতে তাহকীক, তাখরীজ ও তালীক করেছেন শায়খ আবু গুদাহ। বিষয়টি কী? প্রথমে কৌতূহলী হলাম। এরপর হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ নুমানী (রহ.)এর তত্ত্বাবধানে কাজ করা ও এ বিষয়ে কিতাবাদি পাঠ করার সুযোগ হয়েছে। এরপর যখন শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ (রহ.)এর তত্ত্বাবধানে রিয়াদে কাজ করার সুযোগ হয়েছে সেখানে এ বিষয়ে শায়খ নছর আলহোরীনির লেখা 'আলমাতালিউন নাছরিয়া লিল মাতাবিইল মিসরিয়া' কিতাবটি দেখার সুযোগ হয়েছে। এ কাজে শায়খ আবু গুদাহর পূর্ববর্তী ছিলেন শায়খ আব্দুস সালাম হারুন (রহ.)। এ বিষয়ে তার লেখা দুটি কিতাবও রয়েছে। ১. তাহকীকুন নুসুস ও নাশরিহা ২. কুতুফুন আদাবিয়া ফী তাহকীকিস তুরাস।

* পাণ্ডুলিপি আকারে তুরাসে ইসলামী পৃথিবীর কোথায় কোথায় বিদ্যমান বলে আপনি জানেন?

* * হিজায়, মিসর, সিরিয়া, ইরাক, তুর্কিস্তান ও হিন্দুস্তানের কোনো কোনো কুতুবখানায় মাখতুতাতের যখীরা বা পাণ্ডুলিপি আছে বেশি। ইসলামী দারুল খেলাফত বাগদাদ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়ায় ওখানে বেশি পাণ্ডুলিপি জমা হয়েছে। এ ছাড়াও মাগরিবের দেশগুলোর মধ্যে মরক্কো ও স্পেনেও বহু পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান। ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রচুর পাণ্ডুলিপি রয়েছে। কিন্তু তাও মুসলিম বিশ্ব থেকে নেওয়া। তাই কেন্দ্রীয় অবস্থান সেখানকার নেই। এসব পাণ্ডুলিপির মধ্যে রয়েছে হাদীস, ফিক্হ, সীরাত, তারীখ ও আদব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি।

* তাহকীকে তুরাসের কাজ আপনি কোথায় কী কী করেছেন?

* * হযরত শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ (রহ.) এ কাজ করেছেন বহু বছর যাবৎ। আড়াই বছর তাঁর খেদমতে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। হযরত শায়খের হেদায়াত ও নেগরানিতে এ সময়ের মধ্যে ২৩টির মতো কিতাবের তাহকীকে আমার শামিল হওয়ার তাওফীক হয়েছে। যেমন যাকারুল আমানী, আলইনতিকা, ছালাছু রাসায়েল, আলইমাম ইবনু মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান ইত্যাদি।

* তুরাস নিয়ে তাহকীক বা গবেষণার কাজগুলো করার সাধারণ প্রক্রিয়া কী?

* * নির্ধারিত উসূল ও নীতিমালা রয়েছে। কিছু কিতাবের নাম ইতোমধ্যে বলেছি সেগুলো পড়তে হবে। তাসহীহুল কুতুব-এর হাশিয়ায় আরো ১৭টি কিতাবের নাম রয়েছে। সেগুলোও দেখা যেতে পারে। আসলে এ বিষয়ে নিয়মনীতি জানাই বড় কথা নয়, নিয়ম তো বহু কিতাবেই পাওয়া যাবে। এর সঙ্গে মূলত গভীর ইলম ও প্রজ্ঞা থাকতে হবে। একই সাথে এ বিষয়ে কাজ করেছেন এমন কোনো প্রাজ্ঞ শায়খের অধীনে ও সংশ্রবে থেকে কাজ করার অভিজ্ঞতাও লাগবে।

* পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য কে কে এখন এ কাজে যুক্ত আছেন?

* * মদীনা মুনাওওয়ারায় শায়খ মুহাম্মাদ আওওয়ামা এবং বৈরুতের মুআসাসাতুর রিসালায় কাজ করছেন শায়খ শুয়াইব আরনাউত।

* এ ধরনের তুরাস যা পাণ্ডুলিপি পর্যায়ে রয়েছে, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা'য় কিছু কি আনতে পেরেছেন? এবং কোনো কোনোটার কাজ কি চলছে?

* * ইতোমধ্যে এখানে বেশকিছু পাণ্ডুলিপির সিডি, ফটো এবং কিছু মূল পাণ্ডুলিপিও সংগৃহীত হয়েছে। আদ-দুররুল মুখতার-এর বিখ্যাত অথচ অমুদ্রিত একটি ষোল খণ্ডের ব্যাখ্যাগ্রন্থের অনুলিপিও (মূল পাণ্ডুলিপি থেকে) আমাদের হাতে আছে। আরো কিছু সংগ্রহ হচ্ছে এবং হবে ইনশাআল্লাহ। এ ক্ষেত্রে তাহকীকের কাজ করার যে এরাদা আমাদের রয়েছে, তার জন্য বড় পরিসরের জায়গা, বড় ও স্বতন্ত্র কুতুবখানা দরকার। যেটা আমাদের এখানে আপাতত সংকুলানযোগ্য নয় এবং স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনাও নেই। যে বিষয়ের কিতাব বা পাণ্ডুলিপির তাহকীক চলবে, সে বিষয় এবং তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর শত শত কিতাব সংগ্রহ করে কাজে বসতে হবে। এ কাজের উপযোগী লোক দরকার। কারণ, এটা এমন কাজ যে আদুররুল মুখতারের যে ব্যাখ্যা গ্রন্থের কথা উল্লেখিত হয়েছে এ ধরনের একেকটি কিতাবের যথাযথ তাহকীকের কাজ যোগ্যতাসম্পন্ন দশ-পনের জনের একটি পরিষদকে কাজ করতে হবে চার-পাঁচ বছর। ইতোমধ্যে মারকাযের শিক্ষাসমাপনকারী অনেকেই এ কাজের উপযুক্ত রয়েছেন। কিন্তু গভীর অধ্যবসায়পূর্ণ এ কাজে যাদের যুক্ত করতে হবে তাদেরও তো ফারোগ করে নেওয়ার মতো ব্যবস্থাপনা দরকার। আসলে আমাদের এখানকার এ বিষয়ক কাজ এগিয়ে নিতে আল্লাহ তাআলার খাস ফযল ও করম দরকার। এ ধরনের কাজের প্রতি উৎসাহী ও আগ্রহী সবার তাই দুআও চাই।

* হালাকুখার আক্রমণে বাগদাদে বহু পাণ্ডুলিপি ধ্বংস হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে।

* * হ্যাঁ, সে সময় বাগদাদে ও মা-ওয়ারাউনুহার অঞ্চলে বহু কিতাব, বহু পাণ্ডুলিপি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায় সেগুলোর অনেক বিকল্প এখনো রয়ে গেছে। সেগুলোও থাকলে ভালো হত। কিন্তু না থাকায় ইসলামী উলূম ও প্রজ্ঞার জগতে মৌলিক কোনো দুর্লভতা বা জটিলতা নেই। যেসব পাণ্ডুলিপি এখনো দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলো উদ্ধার ও যথাযথ তাহকীকের মাধ্যমে মুদ্রিত হলে ইসলামী জগতের আরো অনেক ফায়েদা হবে। আল্লাহ তাআলা সহজ করুন, কবুল করুন। #

[ফেব্রুয়ারি '১০ঈ.]

সাক্ষাৎকার : ‘ভাষার বিশুদ্ধতা শরীয়তের কাম্য’

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। একটি রাজনৈতিক ঘটনার কারণে বাংলা ভাষার বিষয়টি ফেব্রুয়ারি মাসের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। এখন একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘোষণা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা-দিবস হিসেবে। তাই ফেব্রুয়ারি মাসে দেশব্যাপী ভাষাকেন্দ্রিক তৎপরতা নতুন মাত্রা লাভ করে।

সময়ের গডডলিকা প্রবাহে ভেসে না গিয়ে আমাদের কর্তব্য সকল পরিস্থিতিতে যথার্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান অক্ষুণ্ণ রাখা। এজন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে সাধারণ মুসলমান ও আলেম-তালেবে ইলমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে মারকায়ুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর ‘আমীনুত তালীম’ ও মাসিক আলকাউসারের তত্ত্বাবধায়ক মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেবের একটি মূল্যবান সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মূল বিষয় ছাড়াও প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন আলোচনা তাতে উঠে এসেছে। আশা করি, পাঠকবৃন্দ এর দ্বারা উপকৃত হবেন। আলকাউসারের পক্ষ হতে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ।

—সম্পাদক

প্রশ্ন : আমাদের দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি একটি বিশেষ দিবস। এখন তা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমরা যেহেতু মুসলমান তাই সকল বিষয় কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়ার আলোকে মূল্যায়ন করা আমাদের কর্তব্য। তাই শরীয়তের আলোকে মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং মাতৃভাষার প্রতি আমাদের দায় ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : মাতৃভাষার গুরুত্বের যে দিকগুলো আছে তা কিন্তু ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রিক নয়। এটি একটি সাধারণ বিষয় এবং সব সময়ের বিষয়। আপনার মূল প্রশ্ন যদিও মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে, তবে তাতে একুশে ফেব্রুয়ারিকে একটি বিশেষ দিবস হিসেবে উদযাপনের প্রসঙ্গও এসেছে। এই বিষয়েও আমাদের সচেতনতা প্রয়োজন। দিবসের ক্ষেত্রেও শরীয়তের কিছু নীতি-নির্দেশনা আছে, যা জানা থাকা জরুরি। এটা ঠিক যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি হিসেবে সকল মুনকারের প্রতিবাদ করা সবার জন্য ফরয নয়। তবে তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। প্রচলিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শরীয়তের বিধি-বিধান জেনে নেওয়া সবার জন্য জরুরি। অন্তত ইলম ও আকীদার পর্যায়ে তো খুবই জরুরি। এজন্য শরীয়তে দিবস পালন সম্পর্কে কী কী নির্দেশনা আছে, নিয়মিত সকল কাজ বন্ধ করে, অফিস-আদালতে বিরতি দিয়েই দিবস পালন করতে হবে, না অন্য কোনো পদ্ধতিও হতে পারে, তা জানা দরকার। যা হোক, আপনার মূল প্রশ্ন ছিল মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে।

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হচ্ছে, যাদের দ্বীনী ভাষা ও মাতৃভাষা অভিন্ন তারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। অর্থাৎ আরব মুসলমান। তাদের দ্বীনী ভাষা যেমন আরবী তেমনি মাতৃভাষাও আরবী। তাদের দায়িত্ব কম। পক্ষান্তরে যাদের দ্বীনী ভাষা ও মাতৃভাষা এক নয় অর্থাৎ অনারব মুসলমান, তাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষা দুটি : দ্বীনী ভাষা ও মাতৃভাষা। এরপর দাওয়াতের স্বার্থে কিংবা দুনিয়াবী প্রয়োজনে অন্য কোনো ভাষারও প্রয়োজন হতে পারে। আমার প্রশ্ন হল, মাতৃভাষার গুরুত্ব বলতে কোন দিকটি আপনি জানতে চাচ্ছেন?

প্রশ্ন : আমি শরয়ী দৃষ্টিকোণ জানতে চাচ্ছি, অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে মাতৃভাষার গুরুত্ব কী এবং তা শরীয়তের কোন কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত—এ বিষয়ে বিস্তারিত বললে আমরা উপকৃত হব ইনশাআল্লাহ।

উত্তর : এ সম্পর্কে যদি শরীয়তের দলীল-প্রমাণের শাস্ত্রীয় আলোচনা করতে হয় তাহলে তা কঠিন ও দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই আমি কিছু সহজ কথা বলি। দেখুন, ইসলাম যখন আরবের সীমানা পার হয়ে আজমে পৌঁছে তখন সেসব অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম, মুজাহিদীনে ইসলাম ও দু'আতে ইসলামের অবস্থান কী ছিল, তা আমরা দেখতে পারি। তারা কি সেসবের অধিবাসীদেরকে তাদের মাতৃভাষা ত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন? করেননি। তাদেরকে দ্বীনী ভাষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, কিন্তু মাতৃভাষা ত্যাগ করতে বলেননি। এতে বোঝা যায় যে, ইসলাম কাউকে মাতৃভাষা ত্যাগ করার আদেশ করে না। শরীয়তের কোথাও এই আদেশ নেই এবং কোনো মুসলিম মনীষীও তা বলেননি।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, সকল ভাষাই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও তাঁর নেয়ামত। কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেছেন—

الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

এই আয়াতে ইনসান বলতে শুধু আরবের ইনসানকে বোঝানো হয়নি; বরং সমগ্র মানবজাতিই বোঝানো হয়েছে। সকল মানুষকে নিজ নিজ ভাষায় ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা আল্লাহ তাআলাই দান করেছেন। তেমনি সূরা 'আলাকে আল্লাহ তাআলা বলেন—

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

'আল্লাহ কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।' (৫৫:২) কী শিক্ষা দিয়েছেন, কাদের শিক্ষা দিয়েছেন—এগুলো উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, তা অত্যন্ত ব্যাপক। সকল জাতি, সকল ভাষা এবং কলম দ্বারা শেখার যা কিছু আছে সব এতে অন্তর্ভুক্ত। সারকথা হচ্ছে, মুখের ভাষা, লেখার ভাষা, ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা এগুলো আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। সে হিসেবেই একে মূল্যায়ন করতে হবে।

তৃতীয় কথা এই যে, সব মানুষই দুনিয়াবী প্রয়োজনে মাতৃভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু ইসলামের পর তাতে ভিন্ন একটি মাত্রা যুক্ত হয়। অর্থাৎ যে আগে অমুসলিম ছিল সে ইসলাম গ্রহণের কারণে আর যে মুসলিম হয়েও ইতিপূর্বে দাওয়াতী দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন ছিল সে সচেতন হওয়ার পর অনুভব করে যে, দৈনন্দিন প্রয়োজন ছাড়াও মাতৃভাষাকে কাজে লাগানোর আরো ক্ষেত্র আছে। ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারে মাতৃভাষা ব্যবহার করা কর্তব্য।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ সকল রাসূলকে স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছেন। ইসলামের নির্দেশনা হল যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে তাদেরকে তাদের ভাষায় দাওয়াত দিতে হবে, যেন তারা বুঝতে পারে। অতএব ভাষাচর্চায় আত্মনিয়োগ করার এটিও একটি ক্ষেত্র এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এ উদ্দেশ্যে ভাষাচর্চায় যারা আত্মনিয়োগ করবে তাদের এই কাজ আমলে ছালেহ হিসেবে গণ্য হবে। অতএব শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কাম্য। শর্ত হল নিয়ত ও কর্মপদ্ধতি সঠিক হতে হবে।

আরেকটি কথা এই যে, মাতৃভাষা চর্চাকে যদি শুধু মুবাহ বা বৈধ কাজ হিসেবেও ধরে নেওয়া হয় তবুও শরীয়তের অন্য একটি মূলনীতির দ্বারা তা মাতলুব বা 'করণীয়' সাব্যস্ত হয়। শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে, মুমিন যে কাজই করুক তা

ইতকানের সাথে করবে, অর্থাৎ নিখুঁতভাবে করতে হবে। হাদীসে এসেছে, ‘সবল মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম।’ –সহীহ মুসলিম পৃ. ৬৭২৮

সকল কাজ নিখুঁতভাবে করার বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। মুমিনকে যেমন আখেরাতের বিষয়ে বিচক্ষণ হতে হবে, তেমনি দুনিয়ার কাজকর্মেও যত্ন ও মনোযোগিতা থাকতে হবে। আর যে বিষয়গুলো শিল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা শিল্পমানসম্পন্ন হওয়াও শরীয়তের কাম্য। এজন্য মাতৃভাষা আপনি দ্বীনের কাজে ব্যবহার করুন কিংবা দুনিয়ার কাজে, তা বিশুদ্ধ হওয়া কাম্য। এজন্য মৌলিকভাবে বিষয়টি মুবাহ ধরে নিলেও উপরোক্ত নীতির দ্বারা তা শরীয়তের দৃষ্টিতে মাতলুব ও করণীয় বলে সাব্যস্ত হয়।

এরপর ভাষার বিশুদ্ধতার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। একদম অক্ষর থেকে শুরু করতে হবে। অক্ষরগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে হবে, শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার বিশুদ্ধ ও ব্যাকরণসম্মত হতে হবে। পঠনের ক্ষেত্রে আবৃত্তির নিয়ম-কানুন রক্ষা করতে হবে। লেখার ক্ষেত্রেও শব্দ, বাক্য, বিষয়বস্তু বিশুদ্ধ ও শিল্পসম্মত হওয়ার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

দেখুন, আরবী ভাষা আরবদের জন্য যেমন দ্বীনী ভাষা তেমনি তা তাদের মাতৃভাষাও বটে। সাহাবায়ে কেরাম এই ভাষায় শুধু যিকির-আযকার করতেন, কুরআন তেলাওয়াত করতেন এমন নয়, তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মও এই ভাষায় সম্পন্ন হত। হাদীস শরীফে আমরা দেখি যে, তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্মেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষার বিশুদ্ধতা, উপযুক্ত শব্দচয়ন ইত্যাদির প্রতি তাকিদ করেছেন।

একবার এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। তিনি বাইর থেকে সালাম দিয়ে বললেন, ‘আ-আলিজু?’ ঢোকা অর্থে এই শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষায় আছে, কিন্তু অনুমতি প্রার্থনার ক্ষেত্রে তা প্রমিত শব্দ নয়। প্রমিত শব্দ হচ্ছে, ‘আ-আদখলু?’ তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ‘আ-আদখলু?’ বল। এভাবে তার শব্দ-প্রয়োগ ঠিক করেছেন। অথচ তা যিকির-আযকার বা এ জাতীয় কোনো বিষয় ছিল না। মুসলিম শরীফে তো একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই আছে ‘কিতাবুল আলফায়’ শিরোনামে।

সেখানে বিভিন্ন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দপ্রয়োগ সংশোধন করেছেন, ইশার নামাযকে ‘আতামা’ বোলো না, ‘ইশা’ বোলো। আঙুরকে ‘করম’ বোলো না, ‘ইনাব’ বোলো।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় 'কিতাবুল আদব'-এর একটি শিরোনাম হল- 'মান কানা ইউয়াল্লিমুহুম ওয়া-য়াদরিবুহুম আলাল লাহনি' অর্থাৎ সন্তানকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া এবং ভুল হলে শাসন করা প্রসঙ্গ। এ পরিচ্ছেদে সহীহ সনদে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কথাবার্তায় লাহ্ন বা ভাষাগত ভুল হলে তিনি সন্তানদের শাসন করতেন। তেমনি 'শুআবুল ইমান' গ্রন্থে সতেরোতম শো'বা (খ. ২ পৃ. ২৫৮) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বিষয় বর্ণিত আছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, দৈনন্দিন জীবনেও একজন মুমিনের ভাষা বিশুদ্ধ ও শালীন হতে হবে। এটা দ্বীনী ভাষার প্রসঙ্গ নয়, মাতৃভাষার প্রসঙ্গ। অতএব মাতৃভাষা যাই হোক তার বিশুদ্ধতা শরীয়তে কাম্য।

আর এটা কখনো চর্চা ছাড়া হাসিল হবে না। অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে নিয়মিত চর্চা করা ছাড়া ভাষার বিশুদ্ধতা অর্জন করা কঠিন।

প্রশ্ন : তাহলে বলা যায়, বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের সাধারণ কর্তব্য হচ্ছে বাংলাভাষার বিশুদ্ধতার বিষয়ে সচেতন হওয়া। এই সাধারণ কর্তব্য ছাড়াও এক্ষেত্রে আলেম ও তালেবে ইলমদের কোনো করণীয় আছে বলে মনে করেন কি না?

উত্তর : আমি তো শুধু গোড়ার কথাটা বলেছি। আলেম ও তালেবে ইলমদের জন্য তো বাংলা ভাষা-চর্চায় আত্মনিয়োগ করার বড় বড় কারণ রয়েছে। আমি যে কারণ বলছি, অন্যান্য কারণ না থাকলেও শুধু এই এক কারণই বাংলা ভাষা-চর্চার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যথেষ্ট।

আর বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তো প্রয়োজন শুধু ভাষা-চর্চার নয়; বরং ওই বিষয়ের, যা হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাভী (রহ.) বলে গেছেন এবং এখন তাঁর সার্থক উত্তরসূরী হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ ছাহেব বলেন, অন্যান্য বুয়ুর্গরাও কথাটা বলেছেন। তা হচ্ছে, বাংলা ভাষার সাধারণ চর্চা এখন যথেষ্ট নয়। এটা তো সবাই করবেন। এখন কিছু মানুষকে বাংলা ভাষার কর্তৃত্ব হাতে নেওয়ার জন্য প্রাণপণ সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। এটা যেমন আলেমদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন, তেমনি বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান ও খোদ বাংলা ভাষারও প্রয়োজন। বাংলা ভাষার শোধন, সংস্কার ও সমৃদ্ধির জন্য এ কাজ অপরিহার্য।

জগতের অনেক ভাষাই মাযলুম, কিন্তু সর্বাধিক মাযলুম ভাষাগুলোর মধ্যেও বাংলা ভাষার স্থান প্রথম দিকে। কেননা, দীর্ঘ দিন যাবৎ বাংলা ভাষার কর্তৃত্ব এমন

লোকদের হাতে, যাদের চিন্তা-চেতনা এবং জীবন ও চরিত্র কলুষমুক্ত নয়। তাদের সাহচর্যে এ ভাষায়ও কলুষ ও অশ্লীলতা প্রবেশ করেছে। এজন্য বাংলা ভাষায় রূপ ও রূহানিয়াত এবং প্রাণ ও প্রাণময়তা সৃষ্টির জন্য এমন কিছু মানুষকে প্রাণপণ সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে, যারা সমুন্নত চিন্তা-চেতনা এবং পবিত্র রুচি ও আদর্শের অধিকারী। এটি হচ্ছে ভাষার শোধন ও সংস্কারের দিক। এরপর প্রয়োজন ভাষার পুষ্টি ও সমৃদ্ধি। এ লক্ষ্যে নানামুখী কাজের প্রয়োজন। এ দিক থেকেও বাংলা ভাষা অত্যন্ত দরিদ্র। এর কারণও তা-ই যা আগে বলেছি। একটি ভাষার ধারক-বাহকদের সামনে যখন সমুন্নত কোনো লক্ষ্য না থাকে এবং গভীর কোনো প্রেরণা দ্বারা তারা পরিচালিত না হয় তখন তা চর্চাকারীদের স্বার্থ হাসিলের উপায় হলেও ভাষা থাকে বঞ্চিত। এদিক থেকেও আলেমদের জন্য সুযোগ আছে। তারা একে দ্বীনী খেদমত হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। উপরন্তু তাদের সামনে নমুনা আছে। তারা যদি খোঁজ করেন যে, আরবী ভাষায় কত ধরনের খেদমত হয়েছে তাহলে নিজেদের কাজের জন্য পর্যাপ্ত উদাহরণ তারা পেয়ে যাবেন।

আরবী ভাষা স্বভাবগতভাবেই অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, উপরন্তু কুরআনের ভাষা হওয়ায় এবং এর সাথে দ্বীনী প্রেরণা যুক্ত হওয়ায় তার এত সেবা হয়েছে যে, গুণে মানে ও বৈচিত্রে পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষাকেই এর সাথে তুলনা করা যায় না। তো আলেমদের সামনে কাজের নমুনাও বিদ্যমান রয়েছে।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর কিতাব ‘আলমুযহির ফী আনওয়াইল লুগাতি ওয়া উলুমিহা’-এর শুধু সূচিপত্রে নজর বুলিয়ে দেখুন, ভাষার সেবা ও পরিচর্যার কত দিক হতে পারে-এ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান হয়ে যাবে। তেমনি আরবী ভাষার ইতিহাসের উপর যে দীর্ঘ গ্রন্থাবলি রচিত হয়েছে সেগুলোর পাতা উন্টিয়ে গেলেও অভিভূত হয়ে যেতে হয় যে, কাজের ক্ষেত্র কত বিস্তৃত! বাংলা ভাষায় এত বিচিত্র কাজের চিন্তাও কেউ করেনি।

যা হোক, মৌলিক দুএকটি কথা বললাম। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লেখার ইচ্ছা আছে। কোনো সুযোগে লিখব ইনশাআল্লাহ। তবে আপনার প্রশ্নের উত্তরে আশা করি এটুকুই যথেষ্ট হবে।

প্রশ্ন : আলেমরা যদি বাংলা ভাষার খেদমতে আত্মনিয়োগ করতে চান তাহলে তাদের লক্ষ্য, প্রেরণা ও কর্মপদ্ধতি কী হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

উত্তর : হ্যাঁ, বলেছিলাম যে, নিয়ত ও উসূল ঠিক থাকা জরুরি। কেননা, মুমিন তার সময় অযথা ব্যয় করতে পারে না। সময়-ব্যয়ের পেছনে অবশ্যই দ্বীনী প্রেরণা থাকতে হবে। বাংলা ভাষার কর্তৃত্ব হাতে নেওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জনের সংকল্প

যদি কেউ করে তবে তো তাকে জীবন ওয়াকফ করে দিতে হবে। অতএব এখানে যদি দ্বীনী প্রেরণা না থাকে, তবে তো তার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। আখেরাতে আল্লাহর কাছে সে কী জবাব দেবে? 'ওয়াআন উমরিহী ফীমা আফনাহ'? জীবন কোথায় ব্যয় করেছ-এই প্রশ্নের উত্তর সে কীভাবে দেবে? এজন্য নিয়ত সহীহ করতে হবে এবং উসূল মোতাবেক মেহনত করতে হবে।

নিয়তের জন্য যেমন বিশুদ্ধতা জরুরি তেমনি তাতে গভীরতা ও বিস্তৃতিও প্রয়োজন। নিয়তের বিশুদ্ধতা হল শুধু আল্লাহর জন্য হওয়া। পার্থিব কোনো হীনস্বার্থে নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, দ্বীনী প্রয়োজন পূরণ, আখেরাতে শান্তি ও মর্যাদা লাভ, আল্লাহর বান্দাদের খেদমত, এভাবে উঁচু উঁচু নিয়ত ও প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কাজ করতে হবে। আরো কী কী ফায়েদা এ কাজ দ্বারা হয় তা স্মরণ করে সেগুলোও নিয়তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এরপর নিয়ত সহীহ হলেই চলে না কাজের পদ্ধতিও সঠিক হতে হয়। আমি যেহেতু আল্লাহর জন্য কাজ করছি তাই যে পদ্ধতিতে কাজ করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যবে তা অনুসরণ করা আমার জন্য জরুরি। আলোচ্য বিষয়ে শরীয়তে কী কী নীতি আছে তা সব এই মুহূর্তে আলোচনা করা সম্ভব নয়, বিক্ষিপ্তভাবে কিছু নীতি উল্লেখ করছি।

প্রথম নীতি হল, ভাষাকে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও বিভক্তির কারণ বানানো যাবে না। ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। তেমনি ভাষা, বর্ণ, গোত্র ইত্যাদিকে মর্যাদার মাপকাঠিও বানানো যায় না। মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী সে যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী'। তাই ভাষা, বর্ণ, ভূখণ্ড, গোত্র, কবীলা ইত্যাদি বিভিন্নতাকে মর্যাদা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠি বানানো যাবে না। এসবের ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি ইসলামের শিক্ষা ও রুচির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত গর্হিত।

দ্বিতীয় নীতি হচ্ছে, মানুষকে যিনি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা দিয়েছেন, মানুষের মুখে ও কলমে ভাষা দিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল ও তাঁর দ্বীনের বিরুদ্ধে ভাষাকে ব্যবহার করা যাবে না।

তৃতীয় নীতি হচ্ছে, অশ্লীলতা ও অশালীনতার বিস্তারে ভাষাকে ব্যবহার করা যাবে না। ভাষা যিনি দান করেছেন তিনি অশ্লীলতা পছন্দ করেন না। অতএব ভাষাকে এই কাজে ব্যবহারের কোনো অবকাশ নেই।

এটা ঠিক যে, ভাষার ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য সব ধরনের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ওই ধরনের সাহিত্যও ইতিহাসের প্রয়োজন-অনুপাতে সংরক্ষণ করা হবে, কিন্তু ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য তা নবীনদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। এটি শরীয়তের একটি ফরয বিধান যে, আকীদা ও আখলাক বিনষ্টকারী কোনো সাহিত্য পাঠকের হাতে দেওয়া যাবে না।

চতুর্থ নীতি হচ্ছে, ভাষা চর্চায় নিমগ্ন হয়ে অপরিহার্য হকসমূহ নষ্ট করা যাবে না। যে কোনো কাজে সফলতার জন্য নিমগ্নতা জরুরি। এতে দোষ নেই, কিন্তু তা যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, খালেক ও মাখলুকের হকসমূহ নষ্ট করা হয় তাহলে তা আর আল্লাহর জন্য হল না। সারারাত সাহিত্য চর্চা করে যদি ফজরের নামায কাযা করে ফেলে (নাউযুবিল্লাহ) কিংবা পিতা-মাতার খেদমত, সন্তানের তরবিত ইত্যাদি বিষয়ে গাফেল হয়ে যায় তাহলে এটা শরীয়ত সমর্থন করে না।

এ রকম আরো নীতি আছে যেগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা অপরিহার্য।

প্রশ্ন : একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বইমেলায় আয়োজন হয়, তেমনি রবীউল আওয়াল মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বইমেলা হয়। এ বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

উত্তর : এটা ভালো উদ্যোগ। অনেক জায়গায় গিয়ে বই সংগ্রহ করা যেমন শ্রমসাধ্য তেমনি প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। তাই একস্থানে একত্রে অনেক বই পাওয়া গেলে সময় ও শ্রম দুটোই বেঁচে যায়। জ্ঞানচর্চার পক্ষে এটি একটি ভালো উদ্যোগ।

আরবেও ‘মা’রিয়ুল কুতুব’ নামে বইমেলা হয়ে থাকে।

এখানে একটি বিষয় হল, বইমেলায় বর্তমান রূপটি হয়তো নতুন, কিন্তু সহজে অনেক গ্রন্থ একত্রে প্রাপ্তির চিন্তা কিন্তু বেশ পুরানো। প্রেস আবিষ্কৃত হওয়ার আগের প্রাচীন ইসলামী কুতুবখানাসমূহের ইতিহাস পাঠ করলে এই মৌলিক চিন্তাটা পাওয়া যাবে। এটি ইতিহাসের একটি বিষয়। ইসলামী কুতুবখানা, ইসলামী প্রকাশনা। মিসরে একজন প্রকাশক ছিলেন শায়খ মুনির আবদুহু। তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল ‘ইদারাতুত তিবাতাতিল মুনীরিয়া।’ এটি মিসরের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান। ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে কী কী কিতাব প্রকাশিত হয়েছে-এ বিষয়ে তিনি একটি কিতাব লিখেছেন নমূযাজুম মিনাল আমালিল খায়রিয়াহ ফী ইদারাতিত তিবাতাতিল মুনীরিয়াহ। চমৎকার কিতাব। এতে সে সময়ের আদর্শ প্রকাশক, আদর্শ কিতাব-ব্যবসায়ী, ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত

ইতিহাস উল্লেখিত হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তাতে এসেছে। এ ধরনের আরো কিতাব আছে। এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ অন্য কোনো সুযোগে আলোচনা করব।

তো বইমেলা সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন হচ্ছে, এটি ভালো উদ্যোগ, তবে একে আরো সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বইমেলাও হওয়া দরকার। আন্তর্জাতিক বইমেলা নামে একটি মেলা অবশ্য আমাদের এখানেও হয়, কিন্তু যতটুকু শুনেছি, তা যথার্থ আন্তর্জাতিক নয়। কৃত্রিম আন্তর্জাতিক! সঠিক অর্থে আন্তর্জাতিক বইমেলা হওয়া দরকার। আমি কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের বইমেলা বলিনি, আন্তর্জাতিক বইমেলা বলেছি। এ ধরনের মেলা বৈরুতে হয়, মিসরে হয়, জিদ্দায় হয়, আমাদের দেশেও হওয়া দরকার।

প্রশ্ন : আরবের 'মারিয়ুল কুতুব' বা বইমেলাগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য বলবেন কি?

উত্তর : একটি ছোট বৈশিষ্ট্য হল, সেখানে ব্যবস্থাপনা খুব ভালো থাকে। সরকার বড় ভূমিকা রাখে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আমি রিয়াদে থাকা অবস্থায় দেখেছি, বই মেলা শুরু হওয়ার আগেই কী কী বই মেলায় পাওয়া যাবে এবং কোন প্রকাশনীতে পাওয়া যাবে অর্থাৎ গোটা মেলার একটি তালিকা মেলার আগেই প্রকাশ করা হয়। এতে গ্রন্থ সংগ্রহকারীদের সুবিধা হয়। আমার জানা নেই, এখানে এরকম কোনো উদ্যোগ আছে কি না। সম্ভবত নেই।

আরেকটি বিষয় হল, মেলায় যে বইগুলো যাবে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা দাওয়াহ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে পরীক্ষা করে দেওয়া হয়। মানুষের আকীদা বা আখলাক নষ্ট করে এমন কোনো বই যেন মেলায় আসতে না পারে সেজন্য এটা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রশ্ন : অনেকে বলতে পারেন যে, এটা তো মানবাধিকার বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী ...?

উত্তর : এটি মানবাধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় নয়; বরং মানবের মানবতা এবং মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্যই এটা জরুরি। যারা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ব্যক্তি তারা বিভিন্ন প্রয়োজনে ওইসব বই সংগ্রহ করতে পারেন, যেমন চিকিৎসককে অনেক ক্ষতিকর বিষয়ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ঘাঁটতে হয়। কিন্তু বইমেলা তো সবার কাছে সহজে জ্ঞানের বার্তা পৌঁছানোর জন্য। সবার হাতে কি আমরা চিন্তা ও চরিত্র বিধ্বংসী জিনিস তুলে দেব? এটা কী ধরনের যুক্তি? এজন্য সৌদী আরবের এই নিয়মটা খুবই যৌক্তিক। একটি স্বতন্ত্র বিভাগের মাধ্যমে

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মেলায় বই প্রবেশের ছাড়পত্র পাবে। বইমেলায় যাতে কোনো অশ্লীল, ঈমান-আকীদা বিধ্বংসী বই প্রবেশ না করে সে ব্যবস্থা নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতেও জরুরি।

প্রশ্ন : সেখানের মেলাগুলো কি বিশেষ কোনো সময়ে হয়?

উত্তর : এটা অবশ্য আমি লক্ষ করিনি। প্রতি বছর একই সময় হতে পারে বা একেক বছর একেক সময়ও হতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, এদেশের মতো কোনো রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে হয় না।

প্রশ্ন : আরবের বইমেলা সম্পর্কে শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু ওদ্দাহ (রহ.)-এর সঙ্গে আপনার কোনো স্মৃতি ...।

উত্তর : হ্যাঁ, একবার মুহাম্মাদ আর-রশীদ শায়খের সঙ্গে আমাকেও মেলায় নিয়ে গিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ আর-রশীদ হলেন শায়খের একজন ভক্ত। বর্তমান সৌদী হুকুমতের আগে যে পরিবার ক্ষমতায় ছিল সেই আ-লুর রশীদ পরিবারের সন্তান মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আর-রশীদ।

শায়খকে দেখলাম সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টা বইমেলায় ছিলেন। এরই মধ্যে বিশিষ্ট প্রকাশকদের সঙ্গে আলোচনা সারলেন এবং প্রয়োজনীয় কিতাবপত্রও সংগ্রহ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে বিচক্ষণতা দান করেছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে অনুমান করে ফেলতেন, কোন কিতাবটি কোন বিষয়ে তার কাজে লাগবে। খুব দ্রুত প্রয়োজনীয় কিতাব সংগ্রহ করলেন। তারাই প্যাকেট করে শায়খের বাসায় পাঠিয়ে দেবে। শায়খ দাঁড়ালেন না। সব মিলে সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টা। আসা-যাওয়ার সময়ও গাড়িতে ইলমী মোযাকারা। সময়ের বিষয়ে শায়খের শব্দ ছিল 'হাত্তা নাকছিবাল ওয়াকত।' অর্থাৎ সময়ের শুধু হেফায়ত নয়, সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার ছিল শায়খের নীতি। কিতাব সংগ্রহ করতে যাচ্ছি অতএব বসে থাকলেও তো সওয়াব হচ্ছে, কিন্তু এতে শায়খ সন্তুষ্ট থাকতেন না। সময়কে আরো কীভাবে ফলপ্রসূ করা যায় সে চেষ্টা করতেন।

প্রশ্ন : হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.) শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তকী উছমানী দামাত বারাকাতুহুম কিংবা আরো কোনো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বইমেলায় কোনো স্মৃতি থাকলে বলুন।

উত্তর : ঠিক বইমেলায় নয়, তবে বইমেলায় সময়ের একটি স্মৃতি আছে শায়খ ইসমাইল আনসারী (রহ.)-এর সঙ্গে। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু ওদ্দাহ (রহ.) ইত্তেকাল করলেন ৯ শাওয়াল ১৪১৭ হিজরী। এর ৪০ কি ৪১ দিন পর শায়খ

ইসমাইল আনসারীও ইন্তেকাল করেন। অনেক বড় আলেম ছিলেন। রিয়াদ কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সদস্য ছিলেন। শায়খ আলবানী যখন বিশ রাকাত তারাবীর বিরুদ্ধে লিখলেন তখন সালাফী আলেমদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম তার মত খণ্ডন করে কিতাব লেখেন—‘তাসহীহ সালাতিত তারাবীহ ইশরীনা রাকআতান।’ তেমনি শায়খ আলবানীর অন্যান্য গুযূ ও বিচ্যুতিরও প্রতিবাদ করেছেন। আর্থিকভাবে তেমন সচ্ছল ছিলেন না। কিন্তু কিতাবের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। একবার বইমেলা থেকে মুহাম্মাদ আর-রশীদ তার জন্য কিছু কিতাব সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন। মেলায় আমি যাইনি তবে তাঁর কাছে যাওয়ার সময় আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ওই কিতাবগুলোর মধ্যে একটি ছিল তাফসীরে কাশশাফের তাখরীজ। জামালুদ্দীন যায়লায়ী (রহ.) কৃত তাখরীজটি তখন নতুন প্রকাশিত হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার এ কিতাবের যে তালখীস করেছেন—‘আলকাফিশ শাফ’ আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু যায়লায়ী (রহ.)-এর ‘আলইসআফ বিতাখরীজি আহাদীছি ওয়া আছারিল কাশশাফ’ তখন নতুন প্রকাশিত হয়। আরেকটি কিতাব ছিল ‘আরুসুল আফরাহ’ বাহাউদ্দীন ছুবকী (রহ.)-এর বালাগাতের বুনিয়াদী কিতাব। তো এই কিতাবগুলো পাওয়ার পর তাঁর যে প্রতিক্রিয়া দেখেছি তা সত্যিই মনে রাখার মতো।

শায়খ নুমানী (রহ.) এবং শায়খ তকী উছমানী দামাত বারাকাতুহুমেস সঙ্গে বইমেলার কোনো স্থিতি এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না, তবে তাঁদের গ্রন্থানুরাগ ও অধ্যয়নপ্রীতি তো দীর্ঘ ইতিহাস।

প্রশ্ন : একুশের বইমেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও অন্য দু’একটি প্রকাশনী ছাড়া ইসলামপন্থী প্রকাশকদের অংশগ্রহণ তেমন চোখে পড়ে না। এর কারণ কী? এ বিষয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ বা মূল্যায়ন জানতে চাই।

উত্তর : আমাদের মেলার ব্যবস্থাপকদের মধ্যে ইসলাম যে পরিমাণে আছে তারই তো বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। যিনি ভাষা দান করেছেন তাঁর কথা যারা বলে, লেখে, প্রকাশ করে তাদেরকেই তো সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, কিন্তু যখন নেয়ামত পেয়ে নেয়ামত দানকারীকে ভুলে যাওয়া হয় তখন তো এমন হবেই। দাওয়াতের কাজ দৃঢ়ভাবে করা ছাড়া এ অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো উপায় নেই।

প্রশ্ন : কিছু সেক্যুলার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় যথা, সীরাতে, ইসলামী ইতিহাস, তাসাওউফ ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক ও অনুবাদ-গ্রন্থ

প্রকাশ করা হয়-এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য ও পাঠকদের প্রতি কোনো পরামর্শ থাকলে জানতে চাই?

উত্তর : এটা তো হবেই। যারা বইপত্রের প্রকাশনাকে নিছক একটি পেশা, বা খুব বেশি হলে শিল্পের বিষয় মনে করে তারা পেশার প্রয়োজনে বইপত্র প্রকাশ করবে। এরপর যার যে বিষয়ে আগ্রহ সে ওই বিষয়ের বইপত্র প্রকাশ করে। তাছাড়া মুসতাসরিক বা প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্রও আছে, যারা ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। আমাদের ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীর অনেকে তাদের বইপত্র পাঠে অভ্যস্ত। তারা আলেমদেরকে নির্বোধ মনে করে। তাই নিজেদের ইচ্ছেমতো বই পড়ে। অথচ ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে, দ্বীনী ইলম কোন সূত্র থেকে গ্রহণ করছি সে সম্পর্কে সাবধান থাকা কর্তব্য। যারা নিজেরাই দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ কিংবা দ্বীনকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে তাদের কিতাবে আর যাই থাকুক দ্বীন যে থাকবে না তা তো স্পষ্ট। এখানে আরেকটি বিষয়ও অবশ্য আছে। এখন তা অনেকটা কমছে। বাংলা ভাষায় আহলে হকের লিখিত বইপত্রের অপ্রতুলতা। মানুষের মধ্যে পাঠ-চাহিদা আছে। এই চাহিদা পূরণের উপকারী কিছু না পেলে ক্ষতিকর জিনিস দ্বারাই মানুষ তার নিবারণ করবে-এটাই স্বাভাবিক। এজন্য আহলে হকের দায়িত্ব আছে। তেমনি পাঠকের দায়িত্ব হল, সঠিক সূত্র থেকে দ্বীন অন্বেষণের চেষ্টা করা। অতএব আবার সেই আগের কথা। যে আলেমদের থেকে বিমুখ হয়ে আজ-বাজে বই পড়া শুরু করেছেন তাদের নিকটেই ফিরে যেতে হবে। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী পাঠ-সামগ্রী নির্বাচন করতে হবে। এ ছাড়া কোনো পথ নেই।

প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রকাশকদের দায়-দায়িত্ব কী? লেখক-নির্বাচন, বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে তাদের জন্য অনুসরণীয় বা অবশ্য পালনীয় কী কী বিধান ও নির্দেশনা শরীয়তে আছে?

উত্তর : সব বিষয় কি বইমেলায় সময়ই বলতে হবে? প্রকাশনা তো সারা বছরের বিষয়। অন্য কোনো সুযোগে এ সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন : বাংলা ভাষার খেদমতের জন্য আলেম ও তালেবে ইলমদের প্রতি আপনার কোনো সংক্ষিপ্ত বার্তা বা পরামর্শ আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, সংক্ষিপ্ত বার্তার বিষয় হলে আমি বলব, আমাদের হযরত মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দামাত বারাকাতুহুম, যিনি সদর ছাহেব (রহ.)সহ এ অঞ্চলের অন্যান্য বুয়ুর্গানে দ্বীনের এবং আকাবিরে দেওবন্দ ও আকাবিরে নদওয়ার রুহানী উত্তরসূরী, তাঁর দীর্ঘ সাধনা এ ময়দানে আছে, তাঁর সাহিত্য-কর্ম থেকে আমাদের

উপকৃত হওয়া কর্তব্য। তাঁর সম্পাদনায় যে পত্রিকা বের হয়, মাসিক আলকলম (পুষ্প) তা সামনে রেখে সাহিত্য-চর্চায় আগ্রহীরা কাজ শুরু করতে পারেন। পুষ্পের বিগত সংখ্যাগুলি পুষ্পসমগ্র নামে এসে গেছে। এছাড়া আরো যেসব রচনাকে তিনি সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সেগুলোর মাধ্যমে সাহিত্য-চর্চা আরম্ভ করা উচিত। এতে শুধু ভাষার চর্চাই হবে না, চিন্তা-চেতনা এবং আদব-আখলাকেরও উন্নতি হবে। সাহিত্য-চর্চার দ্বারা চিন্তা ও চরিত্র বিনষ্ট হওয়ার যে আশঙ্কা এতদিন ছিল, আলহামদু লিল্লাহ, তাঁর এই মেহনতের মাধ্যমে তা থেকে মুক্ত থাকার উপায় তৈরি হয়ে গেছে। প্রাথমিক পর্যায়ের মেহনতের জন্য, ইনশাআল্লাহ, তাঁর সাহিত্য-কর্ম পর্যাণ্ড বা পর্যাণ্ডের কাছাকাছি। এখন আর অনৈসলামিক সাহিত্যের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

যাকারিয়া : আপনি অনেক মূল্যবান সময় আমাদের দিয়েছেন। এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক : জাযাকাল্লাহু খায়রান। #

[ফেব্রুয়ারি '১০ঈ.]

ইসলাহী মাজালিস : একটি অনন্য উপহার

আমানত আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত, কিন্তু এখন তা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। আর এ কারণে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রতিটি বিভাগ জুলুম ও অবহেলার শিকার হয়ে চলেছে। অবস্থা এতই করুণ যে, দ্বীনের কোন্ অংশ সর্বাধিক অবহেলিত ও মাজলুম তা নির্ণয় করাও কঠিন। এক হিসাবে বলা যায়, দ্বীনের যে বিভাগ তাসাওউফ নামে পরিচিত অংশটিই সবচেয়ে বেশি জুলুমের শিকার। তাসাওউফ বা সুফীবাদের নামে বিদআতী ও মুলহিদ গোষ্ঠীর অনাচার ও স্বার্থ-হাসিলের কথা তো বলাই বাহুল্য, যারা এসব অনাচারকে প্রত্যাখানের পাশাপাশি সহীহ তাসাওউফের প্রয়োজন স্বীকার করেন তাদেরও অধিকাংশের অবস্থা এই যে, এ ময়দানের আমলী মেহনত ছেড়ে শুধু তাত্ত্বিক অংশের উপরই তারা সন্তুষ্ট কিংবা খুব বেশি হলে সামান্য কিছু রীতিনীতি পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ তাসাওউফের মূল অংশই হচ্ছে আমলী তাসাওউফ, অর্থাৎ তাযকিয়ায়ে নফস, ইসলাহে কলব, ইহসান-ইহতিসাব, তাকওয়া-তহারাত যিকির ও দুআ। তাযকিয়ায়ে নফস ও ইসলাহে কলবের উপায় হল, নিজেকে সর্বদা মুহাসাবার মধ্যে রাখা। কোন আচরণ কোন আত্মিক ব্যাধির প্রভাবে প্রকাশিত হল কিংবা কলবে ছালেহ-এর কোন বৈশিষ্ট্য আমার মাঝে অনুপস্থিত তা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা। এরপর কিতাব ও সুন্নাহ এবং সীরাতে নবী ও সীরাতে সাহাবা-তাবেয়ীন থেকে চিকিৎসার উপায় অব্বেষণ করা। এক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতের পাশাপাশি সাহাবা ও তাবেয়ীনের জীবনাদর্শের কথা এজন্য বলা হল যে, সেটিও প্রকৃতপক্ষে নবী জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।

এখান থেকে খুঁজে নিতে হবে যে, কীভাবে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় বা কীভাবে ওই উত্তম বৈশিষ্ট্য অর্জন করা যায়।

যেহেতু সবার পক্ষে আত্মিক ব্যাধি নির্ণয় করা এবং সরাসরি কিতাব ও সুন্নাহ থেকে চিকিৎসার উপায় খুঁজে বের করা সম্ভব নয়, তাই এমন একজন আল্লাহ-

ওয়ালার রাহনুমায়ী প্রয়োজন, যাঁকে আল্লাহ তাআলা ‘ছালাহ’ বা আদর্শ জীবন ও চরিত্রের সাথে সাথে হৃদয়বান মুসলিহের গুণাবলীও দান করেছেন।

এরপর রোগ-নির্ণয় এবং কিতাব ও সুন্নাহ থেকে নিরাময়ের উপায় খুঁজে বের করা বা বের করতে সক্ষম হওয়া যথেষ্ট নয়। সুস্থতার জন্য তো ওষুধ সেবন অপরিহার্য। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, বাতেনী রোগ-ব্যাদি দ্বারা যেহেতু প্রত্যক্ষ কোনো দৈহিক সমস্যা অনুভূত হয় না তাই এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসার নিয়ম-কানুন পালনের ঝামেলায় পড়বে কেন? এজন্য যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, একজন ছালিহ ও মুছলিহ মুরব্বীর সোহবতই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সহায়ক।

বুয়ুর্গানে দ্বীনের সোহবত থেকে ফায়েদা হাসিলের অনেক বিষয় রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মুহাসাবায়ে নফসের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নিজের হালত পেশ করে শায়খের নিকট থেকে একটি একটি করে বাতেনী রোগসমূহের চিকিৎসা করা।

এই শেষ যামানায় তাসাওউফের সংস্কার ও নব-নির্মাণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা যে কাজ আকাবিরে দেওবন্দের মাধ্যমে করিয়েছেন তার নযীর খুঁজে পাওয়া কঠিন। তারা এ বিষয়েও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সার্থক উত্তরসূরী। আর তাঁদের মধ্যেও কর্ম ও অবদানের বিচারে আকাবিরে দেওবন্দের তৃতীয় সারির বুয়ুর্গ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহ.) অনেক বেশি অগ্রগামী। তাঁর নিকটে তাসাওউফের কঠিনতম দু’টি বিষয়ের সর্বাধিক গুরুত্ব ছিল। তা হচ্ছে আচার-আচরণে ‘আদাবুল মুআশারা’ ও ‘আদাবে ইনসানিয়াতে’র অনুশীলন আর হৃদয় ও অন্তরের পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে নফসের রোগ-ব্যাদির চিকিৎসা ও পরিশুদ্ধ অন্তরের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন। এ বিষয়ে তাঁর রেখে যাওয়া বিপুল ভাণ্ডারে কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক নির্দেশনা এবং শত শত বছরের প্রয়োগ-অভিজ্ঞতার সারনির্ধাস বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত মাওলানা ঈসা ছাহেব হাকীমুল উম্মতের খুতবাত ও মাওয়াযিজ, মাকতূবাত ও মালফূযাত, রাসায়েল ও মুআললাফাত থেকে কিছু নির্বাচিত ব্যবস্থা ‘আনফাসে ঈসা’ নামে সংকলন করেছেন। কিতাবটি একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে। তবে তা ছিল বিশেষ বিশেষ আহলে ইলমের পাঠ-সামগ্রী। কেননা, এর উপস্থাপনা কিছুটা ইলমী এবং আলোচনা অত্যন্ত সারগর্ভ হলেও অতি সংক্ষিপ্ত। এজন্য সাধারণ পাঠক তো বটেই, তালেবে ইলম ও ইলমসংশ্লিষ্ট সাধারণ লোকদের পক্ষেও তা থেকে ফায়েদা হাসিল করা সহজ ছিল না।

আল্লাহ তাআলার লাখো শোকর, তাঁর ফযল ও করমে কিতাবের এমন একটি ভাষ্যগ্রন্থ তৈরি হয়েছে, যা বিস্তারিত প্রামাণ্য আলোচনায় সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত সহজ ও সর্বজনবোধ্য। আর তা উৎসারিত হয়েছে কলম থেকে নয়, যবান ও কলব থেকে। আমাদের উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুকে আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিয়েছেন, বহু দিন পর্যন্ত রমযানুল মোবারকের শেষ দশকে বাদ যোহর তাঁর ইসলাহী মজলিসে এই কিতাব সামনে থাকত। যার দ্বারা এই আযীমুশ-শান শরহ প্রস্তুত হয়েছে।

গ্রন্থটি তাসাওউফের ওই গুরুত্বপূর্ণ অংশকেও পুনরায় জীবিত করেছে, যা আহলে হক তাসাওউফপন্থীদের নিকট থেকেও হারিয়ে যাচ্ছে। তেমনি যারা সকল বিষয় দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে জানতে ইচ্ছুক তাদের জন্যও এতে পর্যাণ্ড খোরাক রয়েছে। পাশাপাশি উপস্থাপনা এতই আকর্ষণীয় যে, যারা নফসের সংশোধন-সাধনাকে তিক্ত ও বিরক্তিকর মনে করে এ ময়দানে প্রবেশে অনাগ্রহী তাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিতেও ইনশাআল্লাহ সফল।

নফসের বহুবিধ চক্রান্ত এবং ইসলাহে নফসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, যা কোনো বুয়ুর্গের সোহবতে থেকে মুহাসাবায়ে নফসের সামান্য চিন্তা-ভাবনাকারীকেও সম্মুখীন হতে হয়, তা সমাধানে আলহামদু লিল্লাহ এই কিতাব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত রাখবে।

করাচির মায়মান ইসলামিক পাবলিশার্সকে অভিনন্দন যে, তারা এই ভাষ্যগ্রন্থটি 'ইসলাহী মাজালিস' নামে ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেছে। বাংলা-ভাষার পাঠকদের প্রতি অনুগ্রহ করে 'মাকতাবাতুল আশরাফ' খুব দ্রুত এর বাংলা তরজমা প্রকাশ করেছে। প্রায় এক বছর হল 'ইসলাহী মাজালিস' নামেই এই অনুবাদ পাঠকবৃন্দের হাতে পৌঁছে গেছে। ইতিপূর্বে এর ইংরেজি তরজমাও প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের দেশে প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান অনেক, কিন্তু এখনো এমন প্রকাশকের বড় অভাব, যাদের প্রকাশনার উপর নজর বুলালে ধারণা হয় যে, তাদের সামনে কিছু দ্বীনী লক্ষ্য আছে, যা বাস্তবায়নে তারা সচেষ্ট। মাকতাবাতুল আশরাফের কিছু কিছু প্রকাশনা থেকে মনে হয়, সম্ভবত এই প্রতিষ্ঠান কিছুটা এই ধারার। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং মনয়িলে মাকসূদ পর্যন্ত পৌঁছে দিন। অন্যান্য প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের জন্য আদর্শ হওয়ার তাওফীক দান করুন আমীন।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু নির্বাচন এরপর সে বিষয়ের উপযোগী গ্রন্থ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে পাঠকের চাহিদার চেয়ে তার দ্বীনী প্রয়োজনকে

অগ্রাধিকার দেওয়া কর্তব্য। কেননা, অনেক সময় পাঠকের চাহিদা বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। আমার আনন্দ হয় যে, মাকতাবাতুল আশরাফের প্রকাশনায় একটা পর্যায় পর্যন্ত সুনির্বাচনের ছাপ লক্ষ করা যায়।

আশরাফুস সাওয়ানেহ, ইসলামী নেসাব, ইসলামী মাজালিস, দিল কী দুনিয়া, তাসাওউফ ক্যায়া আওর কেঁউ, তায়কিরাতুল আখিরাহ ... ইত্যাদি গ্রন্থের পর তাদের নতুন প্রকাশনা- 'নবীজীর নামায' ইনশাআল্লাহ পাঠকবৃন্দের জন্য উত্তম উপহার বলে গণ্য হবে। আমি আরো আনন্দিত হয়েছি এজন্য যে, তারা অতি শীঘ্রই উস্তাদে মুহতারাম (হযরত মাওলানা উছমানী)-এর সর্বজনবোধ্য তাফসীর-গ্রন্থ 'আছান তরজমায়ে কুরআন' (জনাব মাওলানা আবুল বাশার-আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম-এর মতো যোগ্য আলেম ও লেখকের হাতে অনূদিত) প্রকাশ করছেন। নিঃসন্দেহে তা বাংলা ভাষার পাঠকদের প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ।

আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন এবং জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমাদেরকে এই সকল মূল্যবান কিতাব থেকে ফায়েদা হাসিলের তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইসলামী মাজালিস তো কয়েক ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এখন দেখার বিষয় এই যে, আমরা ক'জন তা থেকে নিছক চিন্তার নয়, হৃদয় ও অন্তরের খোরাক গ্রহণ করি। আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দানকারী। #

[ফেব্রুয়ারি '১০ঈ.]

বইয়ের ভূবন

দুটি বই :

(১) তায়কিরাতুল আখিরাহ

(২) কুরআনের ডাক ও আমাদের জীবন

হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুল্হম-এর বয়ান-সমষ্টি

প্রকাশক : মাকতাবাতুল আশরাফ

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, মোবাইল : ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

মূল্য : ২০০ টাকা (প্রতিটি)

হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান-এর ব্যক্তিত্ব পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন রাখে না। উলামা-মাশায়েখ ও বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত সকল শ্রেণীতেই তাঁর পরিচিতি ও পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তিনি বহু বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও বুয়ুর্গানে দ্বীনের সোহবত গ্রহণ করেছেন। তবে যাঁর সাহচর্য সবচেয়ে বেশি পেয়েছেন এবং যাঁর সোহবত তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে তিনি হলেন হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এবং তাঁর পরে মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা আবরারুল হক হারদুঈ (রহ.)। তিনি এই উভয় বুয়ুর্গের পক্ষ হতেই খেলাফতপ্রাপ্ত।

এই দুই বুয়ুর্গ এবং অন্যান্য বুয়ুর্গানে দ্বীনের সাহচর্য থেকে আল্লাহ তাআলার ফযল ও করমে যে বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি লাভ করেছেন, তার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, উম্মতের দরদ ও দ্বীনী গাইরত। এ দুটি বৈশিষ্ট্যই তাঁকে তাঁর পূর্বসূরী বুয়ুর্গানের মত অস্তিত্ব করে রেখেছে। আর এ জন্যই তিনি কুরআনী শিক্ষার প্রচার, সুন্নতে নববীর প্রসার এবং উম্মতকে সব ধরনের ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার জন্য রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই দাওয়াত নিয়ে সফর করে চলেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বা তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মক্তব,

মাদরাসার সংখ্যা অনেক। তাঁর তরবিয়ত ও ইসলাম-সংশোধন ও জীবনগঠনমূলক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক এবং অনির্ধারিত আলোচনা মজলিসের সংখ্যাও প্রচুর।

আল্লাহ তাআলা তাঁর ছাত্র জনাব আবু মুয়াযকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, যিনি তাঁর বেশ কটি বয়ান টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করেন। এরপর তা বইয়ের রূপ দেন। ‘তায়কিরাতুল আখিরাহ’ ও ‘কুরআনের ডাক ও আমাদের জীবন’ নামে বই দুটি এই প্রয়াসেরই ফসল। অভিনন্দন জানাই ‘মাকতাবাতুল আশরাফ’কে যারা বই দুটি প্রকাশ করেছেন এবং কাগজ, প্রচ্ছদ, মুদ্রণ ও বাঁধাই ইত্যাদি সব বিষয়ে যথার্থ মান বজায় রেখেছেন। বইটির সম্পাদনাও পরিশ্রম করে করা হয়েছে, তবে এদিকে আরেকটু মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয়।

বই দুটির ভাষা, আবেদন, উপস্থাপনা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে এখানে শুধু একটি ঘটনাই উল্লেখ করছি। একবার আমি মাদরাসাতুল মদীনা, আশরাফাবাদ, ঢাকা-এ হযরত মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ দামাত বারাকাতুহুমে মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় দ্বিতীয় বইটি নতুন ছেপে বের হয়েছে এবং সেটা তাঁর মুতাল্লাআধীন ছিল। তিনি সেই মজলিসে এবং আমার সামনে ব্যক্তিগতভাবে এই সংকলনটির ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে, ‘বাংলাভাষায় কথাসাহিত্যের একটি উত্তম নমুনা।’

তিনি বলেন, ‘এর আগে এ ধরনের কোন বয়ান-সংকলন আমার চোখে পড়েনি। ‘ইসলাহী খুতুবাতে’ থেকে এর আবেদন ও উপকারিতা কোন অংশে কম নয়।’ হযরত মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ-এর এই অভিমতের পর বাড়তি কোন আলোচনার আর প্রয়োজন নেই।

‘তায়কিরাতুল আখিরাহ’ সংকলনটির ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রফেসর দামাত বারাকাতুহুমে ব্যাপারে মাওলানা আবু আহমাদ একটি দৈনিকে তাঁর অভিব্যক্তি এভাবে প্রকাশ করেছেন—

“প্রবীণ প্রফেসর। তড়িৎ প্রকৌশলী। বুয়েট ও গাজীপুর আইইউটির অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তাঁর ছাত্ররাও ইদানীং পৌঢ়ত্ব পেরুতে শুরু করেছেন। অথচ তিনি সুস্থ, শক্ত-সামর্থ্য, রাতদিন ব্যস্ত। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিজ্ঞান প্রযুক্তি নিয়ে নয়। তাঁর ব্যস্ততা ও তৎপরতা মানুষের ঈমান, আমল ও আখলাক নিয়ে। কোথায় কুরআন শিক্ষার সুব্যবস্থা করা যায়, ইসলামী জীবনাদর্শ নিয়ে দু’দশটা কথা বলা যায়। এসব হল তাঁর দৈনন্দিন চিন্তা। পবিত্র কুরআনের এমন জীবনের কাছাকাছি ব্যবহারও সাধারণত আমাদের দেশের ধর্মীয় আলোচনার অঙ্গনে দেখা যায় না। যুগের

মানসিকতা বুঝে তার উপযোগী করে কুরআনের আবেদনকে তুলে ধরা তাঁর অকৃত্রিম কুরআন ঘনিষ্ঠতারই নিদর্শন। আলেম, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ শিক্ষিত মানুষ সবার জন্যই ভাবনার খোরাক আছে এ বইয়ে। অনেক দিন পরে বাংলা কোন ধর্মীয় বই পড়ে আনন্দ বোধ করলাম। বইটির বহুল প্রচার কাম্য।”

বই দুটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া খুবই প্রয়োজন। বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ বই দুটি সংগ্রহ করে বন্ধু-বান্ধবদের উপহার দিতে পারেন। ইনশাআল্লাহ এতে উম্মাহর সংশোধনের পথে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যাবে।

মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

১৯.১০.১৪২৬হি.

[ডিসেম্বর '০৫ঈ.]

সাহিত্যের বাগানে আবারো ‘পুষ্প’র সুবাস

‘আলকাউসার’ যখন প্রকাশের পূর্বে কল্লনার জগতে ছিল, তখন থেকেই আদীব হুজুর (হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুল্লম)-এর নানামুখী সহযোগিতা পেয়ে আসছে। তাঁর অত্যধিক স্নেহ ও আন্তরিকতার কারণে আমি কখনো কখনো তাঁর কাছে নিজের প্রাপ্যের চেয়েও বেশি কিছু আবেদন করে বসি। তাঁর বিভিন্ন ব্যস্ততা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও আবেদন করেছিলাম যে, আপনি আলকাউসারের জন্য লিখতে শুরু করুন। একবার বলেছিলাম, আলকাউসারের জন্য লিখলে পুষ্পও পুনরায় চালু হয়ে যাবে। তিনি আলকাউসারের জন্য প্রথম যে লেখাটি লিখেছেন তার শেষে আমার এ কথা উল্লেখ করে পাঠকবৃন্দকে আমীন বলার আবেদন করেছিলেন। আমার মনে হয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর কারামত ও পাঠকদের নিষ্ঠাপূর্ণ আমীন-এর বরকতে সে দুআ কবুল করেছেন। ফলে গত শাবান ২৮ হিজরী পুষ্পের একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এরপর সাময়িক বিরতির পর এখন সফর ২৯ হিজরী (মার্চ ’০৮) সংখ্যা থেকে এর নিয়মিত প্রকাশ শুরু হয়েছে। আশা করি, পাঠকবৃন্দ এ নেয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করবেন। তা থেকে অনেক বেশি উপকৃত হবেন। আর তার ব্যাপক প্রচারে অংশ নিয়ে ওই ইসলামী আন্দোলনে শরীক হবেন, যা পুষ্পের মূল লক্ষ্য এবং সময়ের গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। পত্রিকাটির প্রচ্ছদের চতুর্থ পৃষ্ঠা হতে হুবহু তুলে দিচ্ছি :

“পুষ্প একটি আন্দোলন, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

* ঈমান ও উম্মাহকে সামনে রেখে মাতৃভাষা চর্চায় ও সাহিত্য সাধনায় যারা আত্মনিয়োগ করতে চায় তাদের পথ দেখানো।

* এ যুগের কলম-জাদুগরদের মোকাবেলায় মূসার আছা হাতে যারা মাঠে নামতে চায় তাদের সাহস যোগানো।

* যারা চায়, আমার কলমের কালিতে লেখা হোক উম্মাহর আগমী দিনের

সৌভাগ্য, তাদের চলার পথে আলো ছড়ানো।

* আর এখনো যারা ঘুমিয়ে আছে সম্ভাবনার দুয়ার বন্ধ করে, গাফলতের চাদর মুড়ি দিয়ে, তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো।

* হে বন্ধু! এ পথ চলায়, এ সংগ্রাম সাধনায় তুমিও আমাদের সঙ্গী হও। আমরা চলে যাবো, তোমাদের রেখে যাবো। তোমরাই হবে আগামী দিনের দিশারী, ভবিষ্যতের কাণ্ডারী।”

আলহামদুলিল্লাহ! ‘পুষ্পের পেছনের সবকটি সংখ্যা একত্রে ‘পুষ্পসমগ্র’ নামে প্রকাশিত হয়েছে। এতে আদীব হুজুরের দীর্ঘ ও সারগর্ভ যে ভূমিকাটি রয়েছে তার প্রতিটি বাক্য স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। সাহিত্যের বিচারে এই সমগ্রটির অবস্থান কী তা সাহিত্যিকরাই নির্ণয় করবেন। তবে আমার অনুভূতি হল, সমগ্রটি যে উল্লেখিত লক্ষ্যের পথে অনেক বড় পাথেয় এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সাহিত্যের মূলে হল কলব ও কলমের সমন্বয়। বিজ্ঞজনদের মতে, বাংলা সাহিত্যের অঙ্গণে এ সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বললে সত্য বলা হবে না, বলতে হবে রিক্ততা রয়েছে। ইনশাআল্লাহ পুষ্পের এই সংকলন এবং এর পরবর্তী সংখ্যাগুলো এই শূন্যতা পূরণ করবে।

পত্রিকাটি যখন বন্ধ ছিল তখন একবার হযরত মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ দামাত বারাকাতুহুকে এর উপর আফসোস করতে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন যে, এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যচর্চায় অনেক খেদমত হচ্ছিল। নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্র থেকে শুনেছি যে, বাংলা ভাষার উভয় ধারার কয়েকজন স্বীকৃত সাহিত্যিকদের সামনে আদীব হুজুরের কিছু প্রবন্ধ ও বই-পুস্তক পেশ করা হলে তারা বিস্মিত হয়েছেন এবং মুগ্ধ অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা হযরতের কলব ও কলমে আরো বেশি বরকত দান করুন এবং পূর্ণ সুস্থতার সাথে দীর্ঘ ও পবিত্র হায়াত দান করুন। আর আমাদেরকে তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

[পৃ. ১০, মার্চ '০৮ঈ.]

ভূমিকা : তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন (১ম খণ্ড)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد

আমাদের উপর কুরআন মাজীদের বহু হক রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হকসমূহ নিম্নরূপ-

১. কুরআনের প্রতি পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে ঈমান আনা

এ ঈমানের কয়েকটি দিক আছে। যথা-

(ক) বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এটি আল্লাহ তাআলার কালাম যা তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল করেছেন। এ কিতাব যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ এবং এর প্রতিটি বাণী সত্য এবং প্রতিটি শিক্ষা যথার্থ। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এক উজ্জ্বল আলো, যা ছাড়া অন্ধকার থেকে মুক্তির আর কোন পথ নেই; এই কুরআন এক আসমানী পথনির্দেশ, যা ছাড়া বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার আর কোন আর কোন উপায় নেই। এই কুরআন হল ফুরকান, যা সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, ন্যায়-অন্যায় ও সুপথ-কুপথের মাঝে পরিষ্কার পার্থক্যকারী। এতেও কোনও সন্দেহ নেই যে, নাযিলের সময় থেকে আজ অবধি এ কিতাব যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। সুতরাং আমরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, বর্তমানে গ্রন্থাকারে যে কুরআন আমাদের হাতে আছে, যা সূরা ফাতেহা দ্বারা শুরু হয়ে সূরা নাস-এ সমাপ্ত হয়েছে, এটিই আল্লাহ তাআলার সেই কিতাব যা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছিল এবং এর ভাব ও ভাষা এবং এর বিধান শিক্ষা ও তা পালনের পদ্ধতি, যা কিছু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পালনকর্তার আদেশে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছে, সবকিছু হুবহু সংরক্ষিত আছে।

(খ) বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মানুষের হেদায়াত ও সফলতা কুরআনের প্রতি ঈমান আনার মধ্যেই নিহিত। এ ঈমানের মাধ্যমেই মানুষ তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করতে ও আখেরাতের মুক্তি পেতে পারে। যে ব্যক্তি এ কুরআনকে নিজের দিশারী ও আদর্শরূপে গ্রহণ করবে দোজাহানের সফলতা শুধু তারই নসীব হবে।

(গ) কুরআনের প্রতি ঈমান শুধু তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন সম্পূর্ণ কুরআনের প্রতি ঈমান আনা হবে। কুরআন মাজীদের কিছু বিধান মানা ও কিছু না মানা এবং কুরআন মাজীদকে জীবনের ক্ষেত্র বিশেষে সিদ্ধান্তদাতা বলে স্বীকার করা ক্ষেত্র বিশেষে স্বীকার না করা, সম্পূর্ণ কুফরী আচরণ। গোটা কুরআনকে অস্বীকার করা যে পর্যায়ে কুফর এটাও ঠিক সে রকমেরই কুফর।

(ঘ) কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটিও শর্ত যে, তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা মোতাবেক হতে হবে, যে শিক্ষা মহান সাহাবীগণ হতে প্রজন্ম-পরম্পরায় চলে আসছে। সুতরাং কোন আয়াতকে তার প্রজন্ম-পরম্পরায় চলে আসা সর্ববাদীসম্মত ব্যাখ্যার পরিবর্তে নতুন কোনও ব্যাখ্যায় গ্রহণ করলে সেটা কুরআন মাজীদকে সরাসরি অস্বীকার করার নামান্তর এবং সেই রকমেরই কুফর বলে গণ্য হবে।

২. কুরআন মাজীদের আদব ও সম্মান রক্ষা করা

কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা, তেলাওয়াত করা, লেখা, দেখা ও রেখে দেওয়া ইত্যাদি কাজসমূহ আদব ও প্রযত্ন সহকারে করা, কুরআন মাজীদ সম্পর্কে কথাবার্তা বলার সময় এবং এর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে আলোচনাকালে আদব রক্ষায় যত্নবান থাকা, সামান্যতম বেদাআবী হয় কিংবা কিছুমাত্র অমর্যাদা প্রকাশ পায় এ জাতীয় আচরণ ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা। মোদাকথা অন্তরকে কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভক্তি-ভালোবাসায় পরিপূত রাখা এবং সর্বতোভাবে আদব-ইহতিরাম বজায় রাখা কুরআন মাজীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হক।

৩. কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত

এটি পবিত্র কুরআনের একটি স্বতন্ত্র হক এবং আল্লাহ তাআলার অতি বড়

একটি ইবাদত। এর বহু আদব রয়েছে। প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য হল যে, যথাযথ আদব রক্ষা করে প্রতিদিন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে।

তাজবীদের সাথে পড়া, মাখরাজ ও সিফাতের প্রতি লক্ষ রাখা এবং পাঠরীতির অনুসরণ করা তেলাওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অংগ। আজকাল এ ব্যাপারে চরম উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। কুরআন মাজীদের অর্থ ও তাফসীর বোঝার জন্য তো সময় বের করা হয়, কিন্তু তেলাওয়াত সহীহ করার জন্য মশক করা কিংবা মশকের জন্য সময় বের করার প্রয়োজন মনে করা হয় না। যেন মানুষের কাছে কুরআনের তেলাওয়াত সহীহ করা অপেক্ষা অর্থ বোঝাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ গলত। কুরআনের প্রতি ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম কাজই হল অবিলম্বে কুরআনের নিত্যকার ফরযসমূহের উপর আমল শুরু করে দেওয়া এবং সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শেখার জন্য মেহনতে লেগে যাওয়া।

এমনিভাবে লক্ষ করা যায়, অনেকে কুরআনের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্য তো সময় বরাদ্দ করে, কিন্তু কুরআন শেখার ও তাজবীদের সাথে তেলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন করার জন্য সময় দিতে চায় না। এটাও এক মারাত্মক অবহেলা।

আরও লক্ষ করা যায় যে, সহীহ-শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত জানা সত্ত্বেও অনেকে নিয়মিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে না কিংবা তেলাওয়াতের প্রতি লক্ষ্যই দেয় না। আর এক্ষেত্রে তাদের বাহানা হল দ্বীনী বা দুনিয়াবী কাজের ব্যস্ততা। বলাবাহুল্য এটাও গুরুতর অবহেলা। আল্লাহ তাআলা কুরআন তেলাওয়াতসংক্রান্ত যাবতীয় অবহেলা ও উদাসীনতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।

সম্প্রতি এক শ্রেণীর নব্যপন্থী এমন এক ফেতনার উদ্ভব ঘটিয়েছে যা কুরআন তেলাওয়াতের মত মহান ইবাদতের গুরুত্ব হ্রাস করার কিংবা তার গুরুত্ব অস্বীকার করার নিকৃষ্টতম উদাহরণ। তাদের মতে অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত করার কোনও ফায়দা নেই; বরং এরূপ তেলাওয়াত একটি গোনাহের কাজ (নাউযুবিল্লাহ)। কে তাদেরকে বোঝাবে যে, তেলাওয়াত ধর্তব্য হওয়ার জন্য যদি অর্থ বোঝা শর্ত হত, তবে যে ব্যক্তি অর্থ বোঝে না তার নামায শুদ্ধ হত না এবং এরূপ তেলাওয়াত পৃথক কোনও ইবাদতও হত না। কেননা অর্থ বোঝাই যখন একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন এর জন্য তো শুদ্ধ পাঠের কোনও প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় তেলাওয়াতকে ইবাদত গণ্য করা হবে কেন?

মনে রাখতে হবে, তাদের এ চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বেদ্বীনী চিন্তাধারা। আসলে তারা কুরআন মাজীদকে যা কিনা আল্লাহ তাআলার কালাম, মানব-রচিত বই-পুস্তকের সাথে তুলনা করে। আর সেখান থেকেই এ বিভ্রান্তির উৎপত্তি। তারা দেখছে

বই-পুস্তকে অর্থটাই আসল। অর্থ না বুঝলে পড়া নিরর্থক হয়ে যায়। কাজেই কুরআন পাঠের বিষয়টিও তেমনই হবে। তারা চিন্তা করেছে না যে, কুরআন কারও রচনা নয়। এটি আল্লাহ তাআলার কালাম, কোনও মাখলূকের বাণী নয়। এটি ওহী। এর শব্দ ও অর্থ উভয়টিই উদ্দেশ্য। এর শব্দমালার ভেতরও রয়েছে নূর ও হেদায়াত, বরকত ও প্রশান্তি এবং হৃদয়ের উদ্ভাস ও উদ্দীপন। এর শব্দমালার সাথে শরীয়তের বহু বিধান জড়িত আছে। আছে বহু সৎকর্মের সম্পৃক্ততা। সুতরাং কুরআন মাজীদের শুধু শব্দমালার তেলাওয়াতকে নিরর্থক কাজ মনে করা একটি গুরুতর অপরাধ ও চরম বেআদবী। আর একে গোনাহ বলাটা তো এক রকম মস্তিষ্ক-বিকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

হাঁ একথা সত্য যে, তেলাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হল কুরআন মাজীদকে বুঝে-শুনে, গভীর অনুধ্যানের সাথে পড়া এবং তার দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা। অর্থ বোঝা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি কে অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু অর্থ না বুঝলে তেলাওয়াতটিই যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে একথার কী ভিত্তি আছে? এটা যে একটা মারাত্মক ভুল ধারণা শুধু তাই নয়; বরং কুরআন মাজীদের প্রতি এক কঠিন বেআদবীও বটে।

কুরআন তেলাওয়াতের আদব সম্পর্কে ইমাম মুহীউদ্দীন নববী (রহ.) রচিত ‘আততিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন’ একখানি তথ্যবহুল পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকা। আগ্রহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন।

৪. কুরআন মাজীদের হেদায়াত ও বিধানাবলির অনুসরণ

এটিও কুরআন মাজীদের একটি পৃথক হক। কুরআনের প্রতি ঈমান আনার পর পরই এর পর্যায় চলে আসে। ঈমান ও ইসলামের আরকান (মৌলিক বিষয়সমূহ) ও অবশ্য পালনীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে নির্দেশনা তো কুরআন মাজীদে আছে, কিন্তু তার জ্ঞান ইসলামী সমাজে এমনিতেই চালু রয়েছে, যেমন প্রত্যেক মুসলিম জানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয, জুমার দিন যোহরের পরিবর্তে জুমার নামায পড়া ফরয, নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত আদায় করা ফরয, রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয, সামর্থ্যবানের উপর বাইতুল্লাহর হজ্ব ফরয, পর্দা করা ফরয, সুদ-ঘুষ হারাম, জুলুম করা হারাম ইত্যাদি।

এসব বিধান মানার নিয়ম এই নয় যে, আগে জানতে হবে এসবের কোন্টি কুরআন মাজীদের কোন্ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং তারপর সেই জ্ঞান অনুসারে তা পালন করা ফরয হবে। বরং ঈমানের পরই আমল শুরু করে দিতে হবে।

কুরআনী বিধানাবলির জ্ঞান কুরআনের তাফসীর শিখে অর্জন করা জরুরি নয় এবং এরূপ জ্ঞানার্জনের উপর হুকুম পালনকে মওকুফ রাখাও জায়েয নয়। সাহাবায়ে কেরাম যে বলেছেন-

تَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ، فَازْدَدْنَا إِيمَانًا.

“আমরা আগে ঈমান শিখেছি, তারপর কুরআন শিখেছি, ফলে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে।” এর অর্থ এটিই যে, তারা ঈমান, ঈমানের আরকান ও বিধানাবলি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছিলেন আমল ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। তারা এটিকে কুরআনের তাফসীর শেখার উপর মওকুফ রাখেননি। বস্তুত তাদের সে পন্থাই দ্বীন শেখার স্বভাবসিদ্ধ পন্থা।

৫. কুরআনে তাদাক্বুর এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مَبْرُكًا لِيَذْكُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُوا الْأَلْبَابِ

“হে নবী! এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি এই জন্য নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।” -সূরা সাদ ২৯

কুরআনের মাঝে তাদাক্বুর বা চিন্তা-ভাবনা করার অনেক বড় বড় ফায়েদা রয়েছে। সবচেয়ে বড় ফায়েদা তো এই যে, এর দ্বারা ঈমান নসীব হয়। দ্বিতীয় ফায়েদা হল, এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণের নেয়ামত লাভ হয়। এ জন্যই কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত চিন্তা ও ধ্যানমগ্নতার সাথে করা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে কোন কোন আয়াত বা আয়াতের অংশ বিশেষ বারবার পড়তে থাকা চাই। নামাযেও ধ্যানের সাথে তেলাওয়াত করা ও লক্ষ্য করে শোনা একান্ত কাম্য।

তবে তাদাক্বুর ও চিন্তা-ভাবনা করার ভেতরও স্তরভেদ রয়েছে। প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেক স্তরের চিন্তা-ভাবনা সমীচীন নয় এবং উপকারীও নয়। -মআরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) খ. ২, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯

ইদানীং লক্ষ্য করা যায়, এমন কিছু লোকও কুরআনের গবেষণায় নেমে পড়েছে যারা কুরআনের ভাষাও বোঝে না এবং কুরআন বোঝার বুনিয়াদী বিষয়সমূহ সম্পর্কেও খবর রাখে না। তাদের এ গবেষণা বিলকুল নীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং এটা কুরআনের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই এর দ্বারা উপদেশ

গ্রহণের ফায়েদা আদৌ হাসিল হয় না; উল্টো কুরআনের তাহরীফ তথা কুরআনকে বিকৃত করার পথ খুলে যায়।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের তাদাব্বুর শুধু অর্থ বোঝার নাম নয়। অর্থ তো আরবের কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকরাও বুঝত, কিন্তু তারা তাদাব্বুর আদৌ করত না। তাদাব্বুর না করার কারণে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের নিন্দা করেছেন। তাদাব্বুরের সত্তাসার হল— উপদেশ গ্রহণের লক্ষ্যে, ভক্তি ও ভালোবাসা সহকারে, চিন্তা ও ধ্যানমগ্নতার সাথে আয়াতসমূহ পাঠ করা, সেই সাথে সতর্ক থাকা, যাতে আল্লাহ তাআলার উদ্দিষ্ট মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মেজাজ-মর্জি, ভাবাবেগ ও চিন্তা-চেতনার কিছুমাত্র প্রভাব না পড়ে।

তাদাব্বুর ফলপ্রসূ ও ঝুঁকিমুক্ত হওয়ার জন্য একটি বুনিয়াদী শর্ত এই যে, লক্ষ রাখতে হবে তাদাব্বুরের ফল যেন প্রজন্ম-পরম্পরায় প্রাপ্ত আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, চূড়ান্ত শরয়ী বিধান ও সালাফে সালাহীন তথা মহান পূর্বসূরীদের ঐকমত্যভিত্তিক তাফসীরের পরিপন্থী না হয়, সে রকম হলে নিশ্চিত ধরে নিতে হবে তাদাব্বুর সঠিক হয়নি, ফলে তা থেকে সঠিক ফল উৎপন্ন হয়নি।

‘আশরাফুত তাফসীর’এর ভূমিকায় হযরাতুল উস্তায় লিখেছেন, “কুরআন মাজীদ সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে—

لا تنقضى عجائبه

অর্থাৎ এর শব্দমালা ও বর্ণনা শৈলীর ভেতর যে নিগূঢ় রহস্য ও অথৈ তাৎপর্য নিহিত আছে, তা কখনও শেষ হওয়ার নয়। এটি আল্লাহ তাআলার কালামের এক অলৌকিকত্ব যে, যখন অতি সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির কেউ সাদামাঠাভাবে এ কিতাব পড়ে তখন সাধারণ স্তরের হেদায়াত লাভের জন্য যতটুকু বোঝা দরকার, নিজ জ্ঞান মাফিক সে অতি সহজেই তা বুঝে ফেলে। আবার একজন পণ্ডিতমনস্ক ব্যক্তি যখন এ কালাম থেকেই বিধি-বিধান আহরণ এবং হেকমত ও রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে তখন একই কালাম তাকে সূক্ষ্ম ও গভীর তত্ত্ব-ভাণ্ডারের সন্ধান দেয়। প্রত্যেকের প্রতিভা ও জ্ঞানবত্তা অনুযায়ী এ তত্ত্ব-ভাণ্ডারের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ কারণেই কুরআন মাজীদ বিভিন্ন স্থানে তাদাব্বুরের আদেশ করেছে। কেননা এ তাদাব্বুরের ফলশ্রুতিতে অনেক সময় একেকজন আলেমের কাছে এমন কোন তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়, পূর্বে যে দিকে আর কারও নজর যায়নি।

তবে মনে রাখতে হবে নিত্য-নতুন তাৎপর্য খুঁজে বের করার বিষয়টি ওয়াজ-নসীহতের সাথে সম্পৃক্ত কিংবা সৃষ্টি-রহস্য, তত্ত্বজ্ঞান ও শরয়ী বিধানাবলির

হেকমতের সাথে। শুধু এ ময়দানেই এমন নতুন-নতুন রহস্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, যে দিকে প্রাচীনদের কারও দৃষ্টি যায়নি। এটিকেই হযরত আলী (রা.) এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

أَوْفَهُمْ أُعْطِيَهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ

“অথবা এমন উপলব্ধি, যা কোনও মুসলিম ব্যক্তিকে দান করা হয়।” মোটকথা বিষয়টা উপরিউক্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। আকায়েদ ও আহকামের ময়দান এর থেকে ভিন্ন। এখানেও যে চাইলেই কেউ গোটা উম্মতের ইজমার বিপরীতে এমন কোনও তাফসীর করতে পারবে, যা স্বীকৃত বিশ্বাস ও বিধানের পরিপন্থী, আদৌ সে সুযোগ নেই। কেননা তার অর্থ দাঁড়াবে কুরআন যে আকায়েদ ও আহকামের প্রচারার্থে এসেছিল, তা অদ্যাবধি অজ্ঞান ও দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। বলাবাহুল্য তাতে ‘ইসলাম’-ই বিলকুল অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়, নাউযুবিল্লাহ।”
—আশরাফুত তাফাসীর খ. ১, পৃ. ১০

৬ কুরআন মাজীদের তালীম ও তাবলীগ

এটিও কুরআন মাজীদের এক গুরুত্বপূর্ণ হক। এরও বিভিন্ন পর্যায় ও নানা রকম পদ্ধতি আছে এবং তার জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত-শারায়ত ও আদব-কায়েদা আছে। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে এ হক আদায়ের কাজে অংশগ্রহণে সক্ষম নয়, সে আদব ও বিনয়ের সাথে যে কোনভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে। এ পন্থায় তার জন্য সওয়াবের হকদার হওয়ার ও নিজের জন্য সৌভাগ্যের দুয়ার খোলার সুযোগ রয়েছে।

৭. নিজেকে, নিজের আওলাদকে এবং অধীনদেরকে কুরআনের শিক্ষা ও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত না রাখা

কুরআনের হুকুম সম্পর্কিত আলোচনা অনেক দীর্ঘ। এ প্রসঙ্গে এ স্থলে সর্বশেষ যে কথা আরম্ভ করতে চাচ্ছি তা এই যে, কোনও মুমিন কুরআন ও কুরআনের হেদায়াত থেকে নিজে বঞ্চিত থাকবে কিংবা নিজের আওলাদ ও অধীনদেরকে বঞ্চিত রাখবে— এটা কিছুতেই শোভনীয় ও গ্রহণীয় হতে পারে না। মাদ্রাসা ও উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যেসব প্রোপাগান্ডা চালানো হয়, তাতে প্রভাবিত হয়ে অথবা বিশেষ কোনও ছাত্র বা আলেমের ভ্রান্ত কর্মপন্থাকে অজুহাত বানিয়ে অথবা মাদ্রাসাগুলোর দুরবস্থার কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিংবা যে রিয়কের যিম্মাদারী স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের কাছে রেখেছেন, নিজেকে তার যিম্মাদার

মনে করে নিজ সন্তানকে কুরআন ও কুরআনের হেদায়াত শেখানো থেকে বঞ্চিত রাখাটা কিছুমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়; বরং এটা মারাত্মক রকমের লোকসান। আপনি পদ্ধতি যেটাই অবলম্বন করুন, নিজের আওলাদ ও অধীনদেরকে সহীহ তেলাওয়াত অবশ্যই শিক্ষা দিন এবং সালাফে সালেহীন (মহান পূর্বসূরীগণ) থেকে প্রজন্ম-পরম্পরায় প্রাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও কুরআনী হেদায়াত দ্বারা তাদেরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলুন।

পরিতাপের বিষয় হল, বহু লোক কুরআনী তালীমের কার্যক্রমে আর্থিক সাহায্য করছে, কুরআনী মকতব, হিফজখানা ও মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করছে, কিন্তু নিজের সন্তানকে ঈমান ও কুরআন শেখানোর ব্যাপারে তাদের কোনও আগ্রহ নেই। এটা নিজেদের লোকসান তো বটেই, সেই সাথে কুরআন মাজীদের প্রতি ভক্তি-ভালোবাসার সীমাহীন ঘাটতিরও দলীল।

কুরআন মাজীদের তালীম ও তাদাক্বুরকে ব্যাপক ও সহজ করার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা

কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্মের শিক্ষাদান এবং আয়াতের ভেতর তাদাক্বুর তথা চিন্তা-ভাবনার পথ সুগম করার জন্য আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় উলামায়ে কেরাম বিপুল খেদমত আগ্রাম দিয়েছেন। তাদের বহুমুখী সেবার মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের তরজমা ও ব্যাখ্যামূলক টীকা লেখার বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত এক্ষেত্রে উর্দু ভাষার পাল্লা অন্যসব ভাষা অপেক্ষা ভারী হবে। কেননা এ জাতীয় কাজ উর্দু ভাষায় অনেক বেশি হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা সাম্প্রতিককালে আমাদের মুহতারাম উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (তাঁর বরকত দীর্ঘস্থায়ী হোক)-এর দ্বারা এ ধারার অতি মূল্যবান কাজ নিয়েছেন। সম্প্রতি ‘আসান তরজমায়ে কুরআন’ নামে তাঁর তরজমা ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক টীকা প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশনার এক বছর পূর্ণ না হতেই তা একাধিক সংস্করণ বের হয়ে গেছে। নাম দ্বারাই এ তরজমার মূল বৈশিষ্ট্য অনুমান করা যায়। ব্যাখ্যামূলক টীকার উপকারিতা সম্পর্কে হযরাতুল উস্তাদ নিজেই বলেছেন, “ব্যাখ্যামূলক টীকায় শুধু এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে যে, যেখানে মর্ম অনুধাবনে কোন জটিলতা দেখা দেয়, সেখানে যেন পাঠক টীকার সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। দীর্ঘ তাফসীরী আলোচনা ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনার পেছনে পড়া হয়নি। কেননা আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে সে জন্য বড় বড় তাফসীরগ্রন্থ রয়েছে। হাঁ, সংক্ষিপ্ত টীকায় ছাঁকা-ছাঁকা কথা পেশ করার চেষ্টা করা

হয়েছে, যেসব কথা বিপুল পড়াশোনার পর অর্জিত হয়েছে।”

তরজমা ও টীকার উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যাবলির প্রতি লক্ষ করে গ্রন্থখানিকে বাংলা ভাষার পাঠকদের জন্য বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু অনুবাদের ভেতর কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্মের প্রতিস্থাপন খুব সহজ ব্যাপার নয়। বরং এটি অতি স্পর্শকাতর কাজ। এ জন্য এমন অনুবাদক দরকার, যিনি হবেন পরিপক্ব যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম এবং যিনি কুরআনের ভাষা, বর্ণনামূল্য ও কুরআনী উল্লে ভালো দখল রাখেন। সেই সাথে যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে, তাতে অন্ততপক্ষে এতটুকু দক্ষতা থাকতে হবে, যাতে কুরআনের অর্থ ও মর্মকে যতদূর সম্ভব কোন রকম হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া সাবলীল-স্বচ্ছন্দ ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। আবার এ স্থলে যেহেতু মাঝখানে উর্দু ভাষার মধ্যস্থতা রয়েছে, তাই উর্দু ভাষার সাথে পরিচয় থাকাও জরুরি। মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান ছাহেব এ খেদমত সম্পর্কে আমার সাথে মাশওয়ারা করলে আমি উপরে বর্ণিত ব্যাপারগুলোকে বিবেচনায় রেখে বললাম, জনাব মাওলানা আবুল বাশার সাহেব (আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম) যদি এ কাজটি করে দেন, তবে ইনশাআল্লাহ খুবই পছন্দসই কাজ হবে। কেননা তিনি যেমন সমঝদার, তেমনি দায়িত্বশীলও বটে। আবার এ রকম কাজে তাঁর অভিজ্ঞতাও ভালো। সুতরাং তিনি এ প্রস্তাব পছন্দ করলেন এবং আমাকেই তাঁর সাথে কথা বলার দায়িত্ব দিলেন। সে মতে আমি জনাব মাওলানার খেদমতে এ দরখাস্ত পেশ করলাম। তিনি সদয় সম্মতি জানালেন। অতপর আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে কাজ শুরু করে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ হয়ে এখন তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন, মাওলানার কলব ও কলমে অধিকতর বরকত দান করুন এবং তাঁর দ্বারা উম্মতের বেশি বেশি খেদমত নিন।

প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ করার পর তিনি কোন এক প্রসঙ্গে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছিলেন। তাতে বলছিলেন, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেবের এ কিতাব আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছে। এতে আমি তাঁর আদব ও ইহতিরামের যে পরাকাষ্ঠা লক্ষ করেছি তা আমাদের আকাবির ও আসলাফ তথা মহান পূর্বসূরীদের আখলাকী বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুধু নাম লিখেই ক্ষান্ত হন না, অবশ্যই ‘আল্লাহ তাআলা’ লেখেন; নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের নামের সাথে দরুদ শরীফ লিখতে ভুলেন না। আকাবির ও আসলাফের নামের

সাথে রহমতের দুআ লিখতে যত্নবান থাকেন। মোদাকথা সমগ্র কিতাব জুড়ে রয়েছে আদব ও বিনয়ের উৎকৃষ্টতম নমুনা। সবচেয়ে বড় কথা হল, অনুবাদকালে এতে আমার বড়ই নূরানিয়াতের স্পর্শ অনুভূত হতে থেকেছে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম সম্পর্কে মাওলানা যে অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, অন্যান্য সচেতন পাঠকের অনুভূতিও একই রকম। মুসলিম শরীফের উপর লেখা হযরতের ভাষ্যগ্রন্থ ‘তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম’ সম্পর্কে অনেক বড় বড় আলেম অভিমত লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে আমাদের শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ (রহ.) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজ অভিমতে উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা হযরতের এই বৈশিষ্ট্যাবলিসহ অন্যান্য গুণাবলিতে আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন।

কুরআন মাজীদের যে কোনও খেদমত সম্পর্কে কিছু লেখা আমার মত নিঃসম্বলের পক্ষে নিঃসন্দেহে অতি বড় ধৃষ্টতা। এই উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও জনাব মাওলানা আবুল বাশার সাহেবের নির্দেশ ও মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খানের পীড়াপীড়িতে নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে এই লাইন কটি লিখতে হয়েছে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার সাথে সাত্তার (দোষ আড়ালকারী) সুলভ আচরণ জারি রাখুন। আমাকে, আমার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ও সমস্ত মুসলিমকে কুরআনের আশ্বাদ ও আগ্রহ দান করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার বান্দার ও আপনার বাঁদীর পুত্র। আমি আপাদমস্তক আপনার কজার ভেতর। আমার সম্পর্কে আপনার হুকুম সতত কার্যকর। আমার সম্পর্কে আপনার ফয়সালা সম্পূর্ণ ন্যায্যভিত্তিক। আপনি যে সকল নামে নিজেকে অভিহিত করেছেন, যা আপনি নিজ কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন বা আপনার কোন সৃষ্টিকে অবহিত করেছেন কিংবা নিজের কাছেই গায়ব রেখে দিয়েছেন, সেই সকল নামের উসীলায় আমি আপনার কাছে দরখাস্ত করছি যে, কুরআন মাজীদকে আমার হৃদয়ের সজীবতা, আমার চোখের আলো, আমার দুঃখ-নিবারক ও আমার পেরেশানী বিদূরক বানিয়ে দিন, আল্লাহুম্মা আমীন! ছুম্মা আমীন।

وصلی الله تعالی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد خاتم النبیین وعلى اله وصحبه

أجمعین والحمد لله رب العالمین

বিনীত

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
শুক্রবার, ৩০/০৪/১৪৩১হি.

ভূমিকা : তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন (৩য় খণ্ড)

بسم الله الرحمن الرحيم

কুরআন বোঝার চেষ্টা : কিছু নিয়মকানুন

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد

কিছু বন্ধুর অনুরোধে আমাকে তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনের প্রথম খণ্ডের শুরুতে ভূমিকা লিখতে হয়েছে, যা আমার জন্য সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল। এখন আল্লাহর মেহেরবানীতে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে এবং ছাপার কাজও শেষ হয়েছে। এ অবস্থায় পুনরায় একই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমলটি কবুল করুন। আমাদের জন্য তা সাআদত ও সৌভাগ্যের কারণ বানিয়ে দিন এবং আমাদের সকলকে কুরআনওয়ালা বানিয়ে দিন। আমীন।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কুরআন মাজীদেবর কয়েকটিমাত্র হক আলোচনা করা হয়েছিল। কুরআন মাজীদেবর হক তো অনেক। মৌলিক হকগুলোরও সব কয়টি ওই আলোচনায় আসেনি। যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ হক হিফযে কুরআন। এ সম্পর্কে কিছু কথা আরজ করছি।

হিফযে কুরআন

কুরআন মাজীদেবর যতটুকু সম্ভব হিফয করা, সন্তান-সন্ততি ও অধীনদের হিফয করানো এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে হিফযে কুরআনের প্রচলন ও ব্যবস্থা করা কুরআন মাজীদেবর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হক।

হাদীস শরীফে কুরআন শেখা ও তার শেখানোর যে তাকিদ আছে তার উপর সাহাবায়ে কেলাম এভাবে আমল করেছেন যে, প্রথমে বারবার শুনে আয়াতটি মুখস্থ

করেছেন, এরপর তার মর্ম ও বিধান শিক্ষা করেছেন।

এখন আমাদের মাঝে হাফেযের সংখ্যা কম নয়; তবে তুলনা করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ মানুষ হিফযে কুরআনের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। এর মৌলিক কারণ তিনটি: প্রথম কারণ তো ঈমানের কমযোরি ও কুরআনের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার অভাব। দ্বিতীয় কারণ এই ভুল ধারণা যে, হাফেয হওয়া শিশুদের কাজ। সুতরাং শৈশবে যদি অভিভাবকরা হিফযখানায় ভর্তি করেন তাহলেই শুধু হাফেয হওয়া যায়; অন্যথায় যায় না। তৃতীয় কারণ এই ভুল ধারণা যে, হয় পূর্ণ কুরআনের হাফেয হও, নতুবা শুধু এতটুকু মুখস্থ কর যে, কোনোমতে নামাযগুলো আদায় করা যায়। মাঝামাঝি কোনো ছরত নেই!!

আসলে হিফযের কোনো বয়স নেই। যে কোনো বয়সের মানুষ হিফযে কুরআনের নিয়ত করতে পারে এবং ধীরে ধীরে পূর্ণ কুরআনের হাফেযও হয়ে যেতে পারে। আর পুরো কুরআন হিফয করা সম্ভব না হলেও শুধু নামায আদায়ের পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়; বরং যত বেশি সম্ভব হিফয করতে থাকাই হল মুমিনের শান ও সৌভাগ্য। বরং ঈমানের দাবি তো এই যে, প্রত্যেক মুমিন নিজ নিজ পরিবারে এই নীতি নির্ধারণ করবে যে, আমরা জীবিকার প্রয়োজনে পরবর্তী জীবনে যে পেশাই গ্রহণ করি না কেন আমাদের সূচনা ও ভিত্তি হবে কুরআন। ঈমান ও কুরআন শেখার পরই শুধু আমরা আমাদের সন্তানদের অন্য কোনো শিক্ষা প্রদান করব বা অন্য কোনো পেশায় নিয়োজিত করব। আমাদের এক বন্ধু (ভাই সেলিম সাহেব) আমাকে বলেছেন, ১৪২৮ হিজরীর হজের সফরে আব্দুর রহমান নামক একজন সুদানী ভদ্রলোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, যিনি একজন এয়ারোনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও রিয়াদে কর্মরত। তিনি তাঁকে বলেছেন, “দীর্ঘ কয়েকশ বছর যাবৎ আমাদের খান্দানের ঐতিহ্য হল, আমরা যে শিক্ষাই গ্রহণ করি না কেন এবং যে পেশাতেই নিয়োজিত হই না কেন প্রথমে আমাদের হাফেযে কুরআন হতে হয়। তাই আমাদের খান্দানের প্রত্যেকে, সে পৃথিবীর যে দেশেই থাকুক এবং যে পেশাতেই নিয়োজিত থাকুক, হাফেযে কুরআন।”

আমাদের দেশেও এর নজির আছে। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আযীযুল হক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমে (আল্লাহ তাঁকে ছিহহত ও আফিয়াত দান করুন) সকল সন্তান ও নাতি-নাতনি সবাই হাফেয এবং মাশাআল্লাহ এদের নতুন প্রজন্ম হাফেযে কুরআন হওয়াকে খান্দানের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আরব ও আজমের এই ব্যক্তিদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। হিফযে কুরআন যেন হয় আমাদেরও খান্দানের পরিচয়-চিহ্ন। আমীন!

হিফযে কুরআন সম্পর্কে ‘মিন সিহাহিল আহাদীসিল কিছার’ (হাদীসের আলো)এর ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ ওই আলোচনাটিও পাঠ করতে পারেন।

এখানে আমি শুধু কুরআন বোঝার চেষ্টা ও তার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা আরজ করতে চাই।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) সূরা নিসার বিরাশি নম্বর (৪/৮২) আয়াতের আলোচনায় লেখেন, “প্রতিটি মানুষ কুরআনের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুক এটিই কুরআনের দাবি। সুতরাং একথা মনে করা ঠিক নয় যে, কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করা শুধু ইমাম ও মুজতাহিদ (বা বড় বড় আলেমের) কাজ। অবশ্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পর্যায়ে মতই চিন্তা-ভাবনারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে।...

সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায় কুরআন মাজীদের তরজমা ও তাফসীর পড়বে এবং চিন্তা-ভাবনা করবে তখন তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব ও ভালবাসা এবং আখেরাতের ফিকির ও চিন্তা সৃষ্টি হবে। আর এটিই হচ্ছে সকল সফলতার চাবিকাঠি। তবে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মানুষের উচিত কোনো আলেমের কাছে অল্প অল্প করে পাঠ করা। এর সুযোগ না থাকলে কোনো নির্ভরযোগ্য তাফসীরের কিতাব পাঠ করবে এবং যেখানেই কোনো প্রশ্ন ও সংশয় দেখা দেবে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা উত্তর না খুঁজে বিজ্ঞ আলেমের সাহায্য নেবে। (মাআরিফুল কুরআন ২/৪৮৮)

কোন কোন বুয়ুর্গ মনে করেন যে, আরবী ভাষা ও দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন ছাড়া কুরআন মাজীদের তরজমা পাঠ করা ক্ষতিকর এবং এজন্য তা পরিহার করা উচিত। তাঁদের কথা একেবারে কারণহীন নয়। বর্তমানে তরজমা পাঠের বেশ প্রচলন আছে, কিন্তু যাকে বলে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ, সে সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। অনেকটা কুরআনের অর্থ বোঝার গৌরব অর্জনের প্রচেষ্টাই দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে তো শরীয়তের বিধিবিধান নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হওয়ারও প্রবণতা দেখা যায়। বলাবাহুল্য, এতে কুরআন বোঝার স্থলে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়।

এই বিপথগামিতার কারণেই ওইসব বুয়ুর্গ নিরুৎসাহিত করেছেন। তাই তাঁদের সম্পর্কে ভুল ধারণা করা উচিত নয়; বরং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ. ১২৮০হি.-১৩৬২হি.)এর মতে তাদের সম্পর্কেও সুধারণা রাখা জরুরি।

হাকীমুল উম্মত (রহ.) বলেন, “যে কাজে লাভের চেয়ে ক্ষতির দিকই প্রবল সে ক্ষেত্রে মূলনীতি হল কাজটি যদি শরীয়তে ‘কাম্য ও করণীয়’ পর্যায়ে না হয় তাহলে মূল কাজটি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি ‘কাম্য ও করণীয়’ হয় তাহলে মূল কাজটি নিষিদ্ধ করা হয় না, ক্ষতির দিকগুলো বন্ধ করা হয়। এজন্য যারা নিষেধ করেন তাদের খেদমতে এই মূলনীতি উপস্থাপন করে পরামর্শ দেওয়া যায় যে, তারা যেন পঠন-পাঠনের অনুমতি দেন, তবে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করে।” (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৮৪)

মোটকথা, কুরআন-তরজমা পাঠ করতে গিয়ে কিছু মানুষ নিয়ম রক্ষা করে না ও বিপথগামিতার শিকার হয় বলে কুরআন বোঝার প্রচেষ্টাকেই নিষেধ করে দেওয়া সমীচীন নয়।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত আলেমগণ যে বিভিন্ন ভাষায় তরজমা ও তাফসীর লিখেছেন তা তো পঠন-পাঠনের জন্যই লিখেছেন। তাই সম্পূর্ণ নিষেধ না করে এমন বলা ভাল যে, তরজমা পাঠ করুন এবং কুরআন বোঝার চেষ্টা করুন। তবে তা যেন হয় সঠিক পন্থায়। অন্যথায় লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি।

কিছু নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়েদা

প্রথমে কিছু আদব উল্লেখ করছি :

১. কুরআন মাজীদের উপর ঈমানকে দৃঢ় করুন এবং পুনঃপুনঃ তার নবায়ন করুন।

২. অন্তরে কুরআনের আকর্ষণ ও ভালবাসা বৃদ্ধি করুন।

৩. বিশ্বাস রাখুন যে, কুরআন মাজীদের বিধান ও শিক্ষা চিরন্তন ও শাস্বত, যা বিশেষ স্থান বা কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় কিংবা বিশেষ শ্রেণী ও জনগোষ্ঠীর জন্যও প্রদত্ত নয়; বরং স্থান-কাল নির্বিশেষে গোটা মানবজাতির জন্য তা অবশ্যগ্রহণীয় ও অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয়। এর প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান এবং এর মর্যাদা ও ইহতিরাম মানুষ মাত্রেরই অপরিহার্য কর্তব্য। বিশ্বাস রাখুন যে, ‘উন্নতি ও অগ্রগতি’ এর এই যুগেও সত্যিকারের উন্নতি শুধু কুরআনের পথেই অর্জিত হতে পারে এবং ‘জ্ঞান’ ও ‘আলো’র এই যুগেও প্রকৃত জ্ঞান ও আলো কুরআন থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

৪. বিশ্বাস রাখুন যে, আমাদের পূর্বসূরী সালাফে সালাহীন কুরআন আমাদের

চেয়ে বেশি বুঝতেন এবং কুরআনের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসাও তাঁদের বেশি ছিল। তেমনি জীবনের সকল অঙ্গনে কুরআনের অনুসরণ, কুরআনী বিধান বাস্তবায়ন এবং এ পথে সর্বস্ব ত্যাগের প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষাও তাঁদের অন্তরে বহুগুণ বেশি ছিল।

৫. ইয়াকীন করুন যে, দ্বীনের আমানত বহনকারী আলেমগণ, যারা রাতদিন কুরআন-হাদীস, সুন্নাহ ও সীরাতে পঠন-পাঠনে মশগুল তাঁরা আমাদের চেয়ে কুরআন বেশি বোঝেন। কুরআনের মর্যাদা ও ইহতিরাম তাঁদের অন্তরে আমাদের চেয়ে বেশি এবং সমাজে কুরআনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও তাঁদের অন্তরে প্রবল।

৬. বিশ্বাস রাখুন যে, কুরআন বোঝা, কুরআনের শিক্ষা ও বিধান মুখস্থ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা আজকের নতুন বিষয় নয়। কুরআন নাযিলের যুগ থেকেই তা চলে আসছে। আর ইসলামের প্রথম যুগে, বিশেষত খাইরুল কুরানে (সাহাবা-তাবেয়ী যুগে) তা হয়েছে সম্পূর্ণ নববী তরীকায়। এজন্য কুরআনের কোন আয়াত বা পরিভাষার এমন কোন ব্যাখ্যা যদি কেউ করে, যা ইসলামের কোন মুতাওয়াযাছ ও খাইরুল কুরান থেকে চলে আসা আকীদা কিংবা ইজমায়ী ও সর্বসম্মত বিধানের পরিপন্থী, তাহলে বুঝতে হবে, লোকটি হয় নিজেই বিভ্রান্তির শিকার কিংবা পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে লিপ্ত।

৭. ইয়াকীন রাখুন যে, কুরআন হল আসমানী ফরমান ও ইলাহী-নসীহতনামা, আহকামুল হাকিমীনের আইন-কানুন ও তাঁর দেওয়া বিধান-শরীয়ত। কুরআন হল আসমানী ওহীর শাস্ত, চিরন্তন ও সুসংরক্ষিত সূত্র। কুরআন হল নূর ও জ্যোতি এবং শিফা ও উপশম। কুরআন হল সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় এবং আলো-অন্ধকারের মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী। হেদায়েত ও গোমরাহি এবং সুনুত ও বেদআতের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্যরেখা। কুরআন হল মাওলার যিক্র ও স্মরণের সর্বোত্তম উপায়। যে আল্লাহকে ভালবাসে কুরআন তার প্রেম-যন্ত্রণার উপশম, যে আল্লাহকে পেতে চায় কুরআন তার সান্নিধ্য-পিপাসার 'আবে যমযম'।

কুরআন কি শুধু জ্ঞানের সূত্র? শুধু জ্ঞানার্জনের জন্যই কি আপনার কুরআন-অধ্যয়ন? বরং কুরআনের যতগুলো গুণ কুরআনে লেখা আছে সবগুলোকে চিন্তায় হাজির রাখুন এবং সে হিসাবেই কুরআনের সাথে আস্থা ও সমর্পণের সম্পর্ক গড়ুন।

কুরআনের জ্যোতিতে শুধু চিন্তা ও মস্তিষ্ক নয়, কর্ম ও হৃদয়কেও উদ্ভাসিত করুন। আপনার সর্বসত্তা ওই আদর্শ-মানবের অনুকরণে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন, যাঁর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং যাঁর চেয়ে কুরআনের সাথে অধিক অন্তরঙ্গ

ও কুরআনের প্রতি অধিক সমর্পিত আর কেউ নেই।

৮. বিশ্বাস রাখুন যে, কুরআনের সাথে যুক্ত হতে পারা মানব-সন্তানের পরম সৌভাগ্য এবং কুরআনকে শিক্ষক ও রাহনুমা এবং বিচারক ও সিদ্ধান্তদাতা বলে গ্রহণ করতে পারা ব্যক্তি ও সমাজের চূড়ান্ত সফলতা। সুতরাং এই মহাসৌভাগ্য কিছুমাত্র অর্জিত হলেও আপনার হৃদয় যেন আনন্দে উদ্বেলিত হয় এবং যবান আল্লাহর শোকরে তরতাজা হয়।

৯. কুরআনের নূর ও হেদায়েত থেকে বঞ্চিতকারী সকল দোষ ও দুর্বলতা পরিহার করুন। বিশেষত অহঙ্কার, বিবাদ-বিসংবাদ, দুনিয়ার মোহ ও আখেরাত-বিশ্বস্তির মত ব্যাধি থেকে দিল-দেমাগ ও আচরণ-উচ্চারণকে পবিত্র করুন।

১০. কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবনে সহায়ক সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টা করুন। বিশেষত সত্যিকারের অন্বেষণ, শ্রবণ ও সমর্পণ, গাইবের প্রতি ঈমান, তেলাওয়াত ও তাদাব্বুর (চিন্তা-ভাবনা) আল্লাহর ভয়, তাকওয়া ও তহরাত দ্বারা কুরআনের জ্যোতি লাভের চেষ্টা করুন।

কিছু উসূল ও নিয়মকানুন

১. সবার আগে সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে শিখুন। এটি খুবই জরুরি। কিছু সূরাও মুখস্থ করুন। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, যরুরিয়াতে দ্বীন বা দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদি এবং সার্বক্ষণিক ফরয আমলসমূহের জ্ঞান অর্জন করুন। এগুলো যেহেতু কুরআন মাজীদের বিধান ও আহকাম, তাই এগুলো যখন জানছেন তখন আপনি কুরআনের ইলমই হাসিল করছেন।

২. কোন্ তরজমা বা তাফসীর পাঠ করবেন তা আলেমের পরামর্শক্রমে নির্বাচন করুন। এক্ষেত্রে মনে রাখুন, সকল দ্বীনদার ব্যক্তি ‘মাওলানা’ নন। আর সকল ‘মাওলানা’ আলেম নন।

পরামর্শ না করলে এমন কারো তরজমা বা তাফসীর পাঠের আশঙ্কা থাকে, যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদার লোক নয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এ জাতীয় লোকেরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তরজমা ও তাফসীরের স্বীকৃত মূলনীতি লঙ্ঘন করে থাকেন। তাছাড়া লেখকের রুচি ও প্রবণতা এবং চিন্তা ও চরিত্র পাঠককে কিছু না কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেই থাকে। তাই এক্ষেত্রে সাবধানতা খুবই জরুরি।

৩. তরজমা ও তাফসীর পাঠের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ঝুঁকিমুক্ত নয়। তাই কোন আলেমের কাছে অল্প অল্প করে তরজমা ও তাফসীর পাঠ করুন। কারো মনে হতে পারে, তরজমা ও তাফসীর যখন মাতৃভাষায় করা আছে তখন আলেমের কাছে পড়ার আর প্রয়োজন নেই। এই ধারণা ভুল এবং একাধিক কারণে ভুল। সংক্ষেপে এটুকু কথা সবাই মনে রাখতে পারেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরআন শেখার আদেশ করেছেন। তাই আমরা যেমন সহীহ-শুদ্ধ তেলাওয়াত উস্তাদের কাছে শিখি, তেমনি কুরআনের অর্থ ও মর্মও উস্তাদের কাছেই শিখতে হবে। কুরআনের শব্দ উস্তাদের কাছে শিখব আর অর্থ ও মর্ম শিখব নিজে নিজে—এমন কথা তো নিবুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সাহাবায়ে কেরাম, কুরআনের ভাষাই ছিল যাদের মাতৃভাষা, তাঁরা তো কুরআনের মর্ম ও ব্যাখ্যা এবং কুরআনী বিধানের প্রয়োগিক রূপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকেই শিখেছিলেন। এরপর তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনও উস্তাদের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। তাহলে কুরআনের ভাষা যাদের মাতৃভাষা নয় তারা কীভাবে উস্তাদ থেকে বে-নিয়ায হবে?

বিভিন্ন ভাষায় আলেমগণ যে তরজমা ও তাফসীর লিখেছেন তা এজন্য লেখেননি যে, যার যেভাবে ইচ্ছা পাঠ করবে; বরং সঠিক পদ্ধতিতে পাঠ করার জন্যই ওই সব গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। অনেক আলেম তা স্পষ্ট ভাষায় বলেও গেছেন।

শাহ ওলীউল্লাহ (রহ. ১১১৪হি.-১১৭৬হি.) ‘ফাতহুর রহমান’ নামে ফার্সী ভাষায় (যা ছিল ওই সময়ের প্রচলিত ভাষা) কুরআন মাজীদের যে তরজমা করেছেন তার ভূমিকায় লিখেছেন, “এই তরজমাটি যেন নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সবাইকে পড়ানো হয়।” তিনি আরো বলেন, “কুরআন শুদ্ধ করে পড়তে শেখার পর সহজে ফার্সী ভাষা বোঝে এমন সকলকে এই তরজমা পড়ানো উচিত, যাতে সবার আগে তাদের অন্তরে প্রবেশ করে কুরআনের বাণী।” (সংক্ষিপ্ত)

তাঁর পুত্র হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী (রহ. ১১৬৭হি.-১২৩০হি.) ‘মুযীহুল কুরআন’ নামে উর্দু ভাষায় কুরআনের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত টীকা লিখেছেন। ভূমিকায় তিনিও বলেছেন, “লক্ষ করুন, মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য রবের পরিচয় লাভ করা, তাঁর গুণাবলি জানা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ ও সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির জ্ঞান অর্জন করা। কারণ এটা ছাড়া বন্দেগী হতে পারে না। আর যে বন্দেগী করে না সে বান্দা নয়। আর মানুষ আল্লাহর পরিচয় পাবে (শিক্ষকের) শেখানোর দ্বারা। কারণ মানব-সন্তান সম্পূর্ণ অজ্ঞ অবস্থায় জন্মলাভ করে, এরপর শেখানোর দ্বারা সব কিছু শিখে ফেলে। আর যদিও (উর্দু তরজমার দ্বারা) কুরআনের

অর্থ বোঝা সহজ হয়েছে তবুও উস্তাদের সনদ প্রয়োজন। কারণ একে তো সনদ ছাড়া কুরআনের মর্ম গ্রহণযোগ্য নয়, দ্বিতীয়ত পূর্বাপর মিলিয়ে সঠিক অর্থ বোঝা এবং ভুল ও বিচ্ছিন্ন অর্থ গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকা উস্তাদের সহায়তা ছাড়া হয় না। কুরআনের ভাষা আরবী হওয়ার পরও তো আরবদের উস্তাদের প্রয়োজন হয়েছে।”

একই কথা কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলেছেন শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ. ১২৬৮হি.-১৩৩৯হি.) তাঁর কুরআন-তরজমার ভূমিকায়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)এর কাছে এক ব্যক্তি একটি দীর্ঘ প্রশ্ন লিখেছিলেন এবং দলীল-প্রমাণের সাথে এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, ছেলে-মেয়েদেরকে (এবং বিশেষভাবে মযদুর ও শ্রমজীবী পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে) কুরআন তেলাওয়াত ও মাতৃভাষার শিক্ষা গ্রহণের পর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কোন আলেমের কুরআন-তরজমা পড়িয়ে দেওয়া উচিত, আরবী ভাষা ও নাহব-ছরফের জ্ঞান অর্জনের উপর তা মওকুফ রাখা ঠিক নয়।

হযরত (রহ.) জবাবে যা লিখেছেন তার সারকথা এই যে, কুরআন মাজীদের শিক্ষা সকল শ্রেণী-পেশার ও সকল বয়সের নারী-পুরুষের জন্য। এ কথা তরজমা শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে শরীয়তের নীতিমালা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তরজমার পঠন-পাঠন তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন নিম্নোক্ত শর্তগুলো পালন করা হয়:

১. শিক্ষককে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ আলেম হতে হবে, যাতে তরজমা বোঝানো ও তাফসীরের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে শ্রোতার বুঝ-বুদ্ধির দিকে লক্ষ রাখতে পারেন।

২. ছাত্রকে অনুগত ও মেধাসম্পন্ন হতে হবে। নিজের বুঝ-বুদ্ধি সম্পর্কে অতি আত্মবিশ্বাসী হওয়া যাবে না। অন্যথায় তাফসীর ভুল বুঝতে পারে কিংবা ‘তাফসীর বির রায়’-এর দুঃসাহস করতে পারে।

৩. কোন বিষয় যদি ছাত্রের ধারণ-শক্তির তুলনায় সূক্ষ্ম ও জটিল হয় তাহলে শিক্ষক তাকে উপদেশ দেবেন, “এই অংশের তরজমা শুধু বরকতের জন্য পড় বা আপাতত এটুকুই মনে রাখ। এর চেয়ে গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করো না।” ছাত্রও এই উপদেশ মান্য করবে। এরপর যখন সে তাফসীর বোঝার যোগ্য হবে, তা অধ্যয়নের দ্বারা হোক, জ্ঞান-বুদ্ধির কারণে হোক কিংবা আলেমগণের সাহচর্যের দ্বারা হোক তখন কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে ব্যাখ্যাসহ তরজমা পাঠ করবে। প্রাথমিক পাঠের উপর সমাপ্ত করবে না।

হযরত থানভী (রহ.) আরো লেখেন, “একইভাবে যারা (শিক্ষিত বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ) উস্তাদ ছাড়া তরজমা ও তাফসীর অধ্যয়ন করেন তাঁদের জন্যও অনেক

বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ এটাই। তবে যোগ্য শিক্ষক পাওয়া না গেলে তাঁরা পরামর্শ দেন যে, প্রথমে দ্বীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করবে, যাতে কুরআনের বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতি গড়ে ওঠে। এরপর অধ্যয়নের সময় কোথাও সামান্যতম খটকা হলেও নিজে নিজে চিন্তা না করে জায়গাটি চিহ্নিত করে রাখবে এবং কোন বিজ্ঞ আলেমের সাক্ষাৎ পেলে তাঁর কাছ থেকে সমাধান নেবে।” (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৭৯-৮৫)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা কুরআন মুখস্থ করা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সহজ করে দিয়েছেন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শিক্ষকের প্রয়োজন নেই। কুরআনের শব্দ তো আল্লাহ তাআলা অর্থের চেয়েও সহজ করে দিয়েছেন। এরপরও সহীহ-শুদ্ধ তেলাওয়াত শেখা এবং হিফয করার জন্য উস্তাদের প্রয়োজন হয় কেন? তাহলে অর্থ শেখার ক্ষেত্রে উস্তাদের প্রয়োজন অস্বীকার করার কী অবকাশ থাকতে পারে?

৪. কুরআন মাজীদের সাথে শুধু তরজমা ও তাফসীরভিত্তিক পরোক্ষ সম্পর্ক নয়, প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরিরও চেষ্টা করুন। এর প্রথম উপায় তেলাওয়াত। দৈনিক তারতীলের সাথে এবং অর্থ জানা থাকলে তারতীল ও তাদাব্বুরের সাথে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবশ্যই তেলাওয়াত করুন। দ্বিতীয় উপায় এই যে, কুরআনের ভাষা অন্তত এটুকু শেখার চেষ্টা করুন যে, আয়াতের অর্থ বোঝার সাথে সাথে কোন্ শব্দের অর্থ কী এবং কোন্ বাক্যের বিষয়বস্তু কী তাও যেন বুঝে আসে। কুরআনের ভাষার সাথে যদি এটুকু সম্পর্কও হয়ে যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ তেলাওয়াতের স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যাবে, নামাযে ইমামের তেলাওয়াত শুনতে আনন্দ লাগবে এবং কুরআনের মিষ্টতা আগের চেয়ে অনেক বেশি অনুভূত হবে। কুরআনের ভাষার এই প্রাথমিক ইলমের জন্য হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুমে ‘আতত্বরীক ইলাল আরাবিয়া’ (এসো আরবী শিখি) এর তিনটি খণ্ড ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হবে। এর সাথে যদি ‘আততামরীনুল কিতাবী আলাত ত্বরীক ইলাল আরাবিয়া’ অনুশীলনের সাথে সমাপ্ত করা যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। এরপর তাঁর কিতাব ‘আতত্বরীক ইলাল কুরআনিল কারীম’ (এসো কুরআন শিখি)-এর সবক নেওয়া যায়।

হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমও দীর্ঘদিন যাবৎ ‘আলইবতিদা মাআল মুবতাদিঈন’ (Learning the Language of Holy Quran (LLHQ) নামে কুরআনের ভাষা শিক্ষার একটি প্রাথমিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। বুয়েট বাইতুস সালাম মসজিদে প্রতি মঙ্গলবার বাদ ইশা তাঁর এই দরস

হয়ে থাকে। আলহামদু লিল্লাহ, এর দ্বারাও অনেক ফায়েদা হচ্ছে।

হযরত প্রফেসর ছাহেব সব সময় সাবধান করে থাকেন যে, এটি একটি প্রাথমিক মেহনত। এর উদ্দেশ্য শুধু কুরআনের শব্দাবলির প্রাথমিক অর্থ-জ্ঞান অর্জন করা, যাতে ভাষাগত দূরত্ব হ্রাস পায়। এটুকু শিখে না একথা ভাবার সুযোগ আছে যে, আমরা আরবী ভাষা শিখে ফেলেছি, আর না এই চিন্তার বিন্দুমাত্র অবকাশ আছে যে, নাউযুবিল্লাহ আমরা তাফসীরুল কুরআনের উপযুক্ত হয়ে গেছি!!!

এই সচেতনতা খুবই জরুরি। কুরআনের ভাষা বা কুরআনের তরজমার সাথে কিছুটা জানাশোনা ও পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে যারা আরবী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করবেন তাদের একথা সব সময় মনে রাখা উচিত। অন্যথায় যদি উজব ও অহঙ্কার সৃষ্টি হয় এবং এই সামান্য জেনে কেউ যদি আত্মবিশ্বস্তির শিকার হয়ে যায় তাহলে শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি!

উপরোক্ত ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের এমন কোন তরজমা, যাতে শব্দে শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে কিংবা লিসানুল কুরআন ও লুগাতুল কুরআন বিষয়ে বাংলা বা ইংরেজি কোন বইয়ের সহায়তা নেওয়া যায়। তবে গ্রন্থনির্বাচনে অবশ্যই কোন বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমে ওই কথাটিও স্মরণ রাখা কর্তব্য, যা তিনি মাসিক আলবালাগ (মুহাররম ১৩৯২হি.) লুগাতুল কুরআন বিষয়ের কোন কিতাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন। তিনি লেখেন, “যারা কুরআন মাজীদের সাধারণ নির্দেশনা, উপদেশ ও ঘটনাবলি বুঝতে চান এবং ধীরে ধীরে এতটুকু যোগ্যতা অর্জন করতে চান যে, তেলাওয়াতের সময় কুরআন মাজীদের বিষয়বস্তু থেকে যেন একদম বে-খবর থাকতে না হয় তাদের জন্য এই কিতাব অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও উত্তম সহযোগী হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, ভাষা বিষয়ক গ্রন্থাদির মাধ্যমে কুরআন বোঝার প্রয়াস শুধু ওই পর্যন্তই উপকারী হবে যে পর্যন্ত উদ্দেশ্য হয় উপদেশ গ্রহণ ও কুরআনের সাধারণ বিষয়াদির পরিচিতি। কিছু মানুষ শুধু ভাষার ভিত্তিতে কুরআনের বিধিবিধান ও আকীদা সংক্রান্ত বিষয়াদিতে ‘ইজতিহাদ’ আরম্ভ করেন। এটা একদিকে যেমন চরম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ অন্যদিকে যুক্তি ও ইনসাফেরও বিরোধী। এ ধরনের বিষয়ে কথা বলার জন্য কুরআন-হাদীসের সকল ইলম ও শাস্ত্রে পারদর্শী হতে হয়। শুধু লুগাতের মাধ্যমে ফয়সালা করা যায় না। এই বিষয়টি সামনে রেখে এই কিতাব থেকে যত পারুন উপকৃত হোন, ইনশাআল্লাহ ফায়েদাই ফায়েদা।” (তাবসেরে পৃ. ৪০২)

৫. সবশেষে যে কথাটি আরজ করতে চাই তা এই যে, কুরআন মাজীদের অর্থ শেখা অনেক বড় নেক আমল। তাই তা হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত তরীকায়। অর্থাৎ এই কাজেও ইখলাস ও ইহতিসাব এবং ইহসান ও ইত্তেবায়ে সুন্নত লাগবে। আরো চেষ্টা করতে হবে, কুরআন মাজীদের শিক্ষা গ্রন্থের পাতা থেকে গ্রহণ করার পাশাপাশি জীবনের পাতা থেকেও গ্রহণ করার, যেমনটি সাহাবা-তাবেয়ীদের যুগে ছিল। তাহলে ইলমের নূরের সাথে সাথে ঈমান ও আমলের নূরও হাসিল হতে থাকবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসও আমাদের সামনে থাকা চাই—

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَجْهَهُ النَّاسَ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ.

“যে আলেমদের সাথে (আলেম নামে) গর্ব করার জন্য কিংবা জাহিলদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য অথবা মানুষের মনোযোগ নিজের দিকে আকর্ষিত করার জন্য ইলম অন্বেষণ করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।” (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৫৪)

এই হাদীসের আলোকে একটি কথা আমি বলে থাকি, কিছুদিন আগে এক বন্ধু কথাটা ‘রাহে বেলায়েত’ নামক একটি বই থেকেও দেখালেন। আলোচনাটি ওই বই থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি—

বিশেষ সাবধানতা

আমরা সাধারণত আল্লাহর কিতাবের জন্য এত পরিশ্রম করার সময় পাই না। এত আগ্রহও আমাদের নেই। কিন্তু যদি কেউ সেই তাওফীক পান, তবে শয়তান অন্য পথে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করে। শয়তান তার মধ্যে অহঙ্কার প্রবেশ করায়। তিনি মনে করতে থাকেন যে, তিনি একজন প্রাজ্ঞ মানুষ, তিনি সমাজের অন্য অনেকের চেয়ে ইসলাম ভাল জানেন, সমাজের আলেমগণ কুরআন বুঝেন না, আলেমরাই ইসলাম নষ্ট করলেন ইত্যাদি।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, সকল প্রকারের অহঙ্কারই কঠিন পাপ ও ধ্বংসের কারণ। সবচেয়ে খারাপ অহঙ্কার জ্ঞান বা ধার্মিকতার অহঙ্কার। বস্তৃত মুমিন কুরআন পাঠ করেন ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগি পালন করেন একান্তই নিজের

জন্য। কুরআন পাঠ করে মুমিন আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার আশা করেন। মুমিন কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেন নিজের ভুলত্রুটি সংশোধন করে নিজের জীবনকে পরিচালিত করার জন্য। অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় অন্যের দিকে তাকানোর কারণে। মুমিন কখনোই অন্যের ভুল ধরার জন্য বা অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করার জন্য ইবাদত করেন না। যখনই মনে হবে যে, আমি একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ হয়ে কুরআন পড়ি, কয়েকখানা তাফসীর পড়েছি অথচ অমুক আলেম বা তমুক ব্যক্তি তা পড়েনি অথবা সমাজের আলেমগণ কুরআন পড়ে না ... ইত্যাদি তখনই বুঝতে হবে যে, শয়তান মুমিনের এত কষ্টের উপার্জন ধ্বংস করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বাঁচতে হলে সতর্ক হতে হবে। অন্য মানুষদের ভুলত্রুটি চিন্তা করা, অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করা সর্বোত্তমভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। সর্বদা আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে যে, আল্লাহ যেন কুরআন তেলাওয়াত, চর্চা ও (কুরআনের বিধান) পালনকে ইবাদত (হিসাবে) কবুল করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়ামত বহাল রাখেন।

অহঙ্কারের আরেকটি প্রকাশ হল, আল্লাহর তাওফীকে কিছুদিন কুরআন চর্চার পর নিজেকে বড় আলেম মনে করা এবং বিভিন্ন শরয়ী মাসআলা বা ফাতওয়া প্রদান করতে থাকা। কুরআন চর্চাকে নিজের আখেরাত গড়া ও আল্লাহর দরবারে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যবহার করতে হবে। নিজের জীবন সে অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। ফাতওয়ার দায়িত্ব আলেমদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, প্রত্যেক মুসলিমই কুরআন পড়বেন, শিখবেন ও চর্চা করবেন নিজের জন্য। তবে প্রত্যেক মুসলিমই বিশেষজ্ঞ আলেম হবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে চিরশত্রু শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করুন।” (রাহে বেলায়েত, ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির। পিএইচডি (রিয়াদ) এম.এ (রিয়াদ) এম এম (ঢাকা) অধ্যাপক, আলহাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। পৃষ্ঠা ১৭২-১৭৩)

আরেকটি কথা আরজ করেই শেষ করছি। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং বরকত ও ফযীলত সম্পর্কে যে কথাগুলো লেখা হয়েছে তা পাঠ করে আমাদের একজন সাধারণ শিক্ষিত দ্বীনী ভাই জনাব সেলিম সাহেব আমাকে বললেন, “আপনি খুব জরুরি কথা লিখেছেন। আমাদের অনেক ইংরেজি শিক্ষিত ভাইয়ের কাছে তেলাওয়াত শুদ্ধ করার গুরুত্ব নেই, অর্থ বোঝাকেই তারা প্রথম ও প্রধান কাজ মনে করেন।”

তিনি আরো বলেন, “শুধু কুরআনের অর্থ বোঝাই যদি কাম্য হত তাহলে মানুষ হিফযে কুরআনের জন্য এত কষ্ট কেন করে?” তিনি বলেন, “১৯৭৫ সালের

ঘটনা। আমাদের এক বন্ধু রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। ওই সময় সেখানে ইসলামের চর্চা ও প্রচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ঘটনাক্রমে এমন এক ব্যক্তির সাথে আমাদের ওই বন্ধুটির সাক্ষাৎ হল, যিনি একজন সাধারণ মানুষ হয়েও কুরআনের হাফেয ছিলেন। রাশিয়ার মত দেশে ওই সময় কীভাবে তিনি কুরআন মাজীদ হিফয করলেন জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে ওই ভদ্রলোক বললেন, আমি একজনের সাথে দর্জির কাজ করতাম। তিনি হাফেয ছিলেন। আমি দৈনিক তার কাছ থেকে দশ আয়াত করে শুনতাম এবং মুখস্থ করতাম। এভাবে আল্লাহর রহমতে পূর্ণ কুরআন হিফয হয়েছে। কিন্তু আফসোস! জীবন শেষ হয়ে এল, এক জিলদ কুরআন দেখার সৌভাগ্য আমার হল না।” আমাদের বন্ধুটির কাছে কুরআনের একটি জিলদ ছিল। তিনি তা হাদিয়া দিলেন। ওই হাফেযে কুরআন তখন জার জার হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং বার বার কুরআন মাজীদের জিলদটিতে চুষন করতে লাগলেন।”

ভাই সেলিম বলেন, “যদি কুরআনের শব্দে ও বাক্যে নূর ও বরকত না থাকত তাহলে তা স্মৃতিতে ধারণের জন্য মানব-হৃদয় এত ব্যাকুল হত না, বিশেষত যাদের অর্থ শেখার সুযোগ হয়নি তারা ও কুরআনের হিফয ও তেলাওয়াতের জন্য এমন কুরবান হত না এবং তাহাজ্জুদে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করতে পারত না। বান্দার জন্য সবচেয়ে লযযত ও আনন্দের বিষয়ই তো এই যে, গভীর রাতে কিংবা শেষ রাতে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে কালামে পাক পাঠ করবে। সুষুপ্ত রজনীর গভীর নির্জনতায় শুধু সে ও তার মাওলা! বান্দা পড়বে, মাওলা শুনবেন! মাওলার একান্ত সান্নিধ্যে বান্দা তাঁর হৃদয়ের দুয়ার খুলে দেবে।”

তিনি আরো বলেন, “এ অনুপম স্বাদ ও লযযত প্রমাণ করে, কুরআন আল্লাহর মাখলুক নয়, তাঁর সিফাত ও কালাম। পৃথিবীতে আল্লাহর অসংখ্য মাখলুক রয়েছে, কিন্তু কোথাও তো নেই এত স্বাদ, এত লযযত!”

এই হল একজন সাদাসিধা আল্লাহর বান্দার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি, যিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত তবে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আছরমুক্ত একজন ভদ্র ও সুশীল মানুষ এবং ইনশাআল্লাহ উলুল আলবাবের (বুদ্ধিমান) অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজেদের অবস্থান বোঝার তাওফীক দিন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিনয় ও আদব রক্ষা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে ওই দুআই করছি, যা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় করেছিলাম। হে আল্লাহ! আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমার সাথে সান্তার (দোষ আড়ালকারী) সুলভ আচরণ জারি রাখুন। আমাকে, আমার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-

স্বজন, দোস্ত-আহবাব ও সমস্ত মুসলিমকে কুরআনের আশ্বাদ ও আগ্রহ দান করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার বান্দার ও আপনার বাঁদীর পুত্র। আমি আপাদমস্তক আপনার কজার ভেতর। আমার সম্পর্কে আপনার হুকুম সতত কার্যকর। আমার সম্পর্কে আপনার ফয়সালা সম্পূর্ণ ন্যায্যভিত্তিক। আপনি যে সকল নামে নিজেকে অভিহিত করেছেন, বা আপনি নিজ কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন বা আপনার কোন সৃষ্টিকে অবহিত করেছেন কিংবা নিজের কাছেই গায়েব রেখে দিয়েছেন, সেই সকল নামের উসীলায় আমি আপনার কাছে দরখাস্ত করছি যে, কুরআন মাজীদকে আমার হৃদয়ের সজীবতা, আমার চোখের আলো, আমার দুঃখ-নিবারক ও আমার পেরেশানী বিদূরক বানিয়ে দিন, আল্লাহুমা আমীন। ছুয়া আমীন।

وصلی الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبیین وعلى آله وصحبه
أجمعین، والحمد لله رب العالمین.

বিনীত

তারিখ : ১৩-০৫-১৪৩২ হিজরী

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

প্রধান প্রাঙ্গণ : হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

ভূমিকা : ফেরেশতাদের বিস্ময়কর জীবনকথা
ফেরেশতাদের উপর ঈমান, ইমাম সুয়ূতী (রহ.) ও
আলহাবায়িক গ্রন্থের অনুবাদ সম্পর্কে কিছু কথা

কুরআন কারীমে মহান রাক্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ.

“সৎকর্ম (শুধু) এই নয় যে, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং
সৎকাজ এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কেয়ামত দিবসের উপর,
ফেরেশতাদের উপর, কিতাবের উপর এবং সমস্ত নবীর উপর।” -সূরা বাকারা ১৭৭

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ.

“রাসূল বিশ্বাস রাখেন ওই বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর
প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য মুমিনগণও। সকলেই বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর প্রতি,
তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গাম্বরগণের প্রতি।
তাঁরা বলেন যে, আমরা তাঁর পয়গাম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না।” -সূরা
বাকারা ২৮৫

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা
দ্বীনের একটি মৌলিক বিশ্বাসের ব্যাপার। যেমনিভাবে মহান আল্লাহ, পরকাল,
আম্বিয়াগণ (আলাইহিসুস সালাম) এবং তাঁদের উপর অবতীর্ণ আসমানী
কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা ব্যতিরেকে কেউ মুমিন বা ঈমানদার হতে পারে না,
ঠিক তেমনিভাবে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা ছাড়াও কেউ মুমিন হতে পারে

না। তাই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا.

“যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে না সে পথ হারিয়ে বহুদূরে পতিত হবে।” —সূরা নিসা ১৩৬

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, মহান আল্লাহ, পরকাল ও আখিরা (আ.)কে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা যেমনিভাবে কুফর, ঠিক তেমনিভাবে ফেরেশতাদেরকে অস্বীকার করাও কুফর।

তাই প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দাবি এটাই যে, সে ফেরেশতা সম্পর্কে কুরআন হাদীসে বর্ণিত আকীদাসমূহ জানবে এবং সে অনুযায়ী নিজেদের ঈমান শুদ্ধ করবে।

পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে এখানে ফেরেশতাদের ব্যাপারে মৌলিক আকীদাগুলো লেখা হল।

ফেরেশতাদের সম্পর্কে মৌলিক আকীদাসমূহ

১. ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর সম্মানিত বান্দা।

২. মহান আল্লাহ তাঁদেরকে ‘নূর’ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা আল্লাহ পাকের নূরানী মাখলুক।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত কুদরতবলে তাঁরা যেভাবেই চান সেভাবেই আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।

৩. পানাহার করা, নারী-পুরুষ হওয়া এবং সন্তান জন্ম দেওয়া থেকে তাঁরা পবিত্র।

৪. দুনিয়া ও আখেরাতের বিভিন্ন কাজে মহান আল্লাহ তাঁদেরকে নিযুক্ত করেছেন।

৫. তাঁরা সবাই আল্লাহ তাআলার নাফরমানী হতে পবিত্র, তাঁদেরকে যে কাজেরই নির্দেশ দেওয়া হয় সেটাকেই পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে আজ্ঞাম দেন এবং তাঁরা আল্লাহ পাকের নিষ্পাপ বান্দা।

৬. তাঁদের মধ্যে অনেককে (যেমন হযরত জিবরাঈল আ.কে) আল্লাহ তাআলা রিসালাত তথা আল্লাহ ও নবী-রাসূল বা আল্লাহ ও অন্যান্য ফেরেশতাদের মাঝে মধ্যস্থতা এবং আহকামের তাবলীগের সুমহান দায়িত্বে সম্মানিত করেছেন; পয়গাম্বরগণের উপর মহান আল্লাহর কিতাব ও সহীফাসমূহ তাঁদের মাধ্যমেই

অবতীর্ণ হয়েছে।

এ কাজ তাঁরা পূর্ণ আমানতদারীর সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রেও তাঁরা যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত।

তাই তাঁরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু পৌঁছিয়েছেন তা সবই হক, এখানে বিন্দুমাত্র ভুলের আশঙ্কা নেই।

৭. ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত, তাঁদের পূর্ণ সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন।

৮. তাঁরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত, তাসবীহ-তাহলীলে ব্যস্ত থাকেন, কোন সময়েই ইবাদতে অলসতা করেন না; বরং তাদের মধ্যে অনেককে তো শুধুমাত্র ইবাদত-তাসবীহ ইত্যাদি কাজের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

৯. ফেরেশতাদের মধ্যে অনেক শ্রেণীভেদ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ আরশবহনকারী, কেউ আরশের পাশে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, আবার অনেকেই মশগুল আছেন আরশের তওয়াফে। কেউ জান্নাতের খাজাঞ্চী, আবার কেউ জাহান্নামের খাজাঞ্চী। কিছু সংখ্যক ফেরেশতা আছেন রহমতের দায়িত্বে, আর কিছু সংখ্যক আযাবের দায়িত্বে। কিছু ফেরেশতা আছেন রুহসমূহের দায়িত্বে, আর কিছু আছেন মানুষের দায়িত্বে। কিছু ফেরেশতা আমল লেখার দায়িত্বে আছেন, আর কিছু আছেন মানুষকে শয়তান ও ক্ষতিকর জিনিস থেকে হেফাজতের দায়িত্বে। কিছু আছেন কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার দায়িত্বে। আর কিছু আছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠকারীদের দরুদ ও সালাম পৌঁছানোর দায়িত্বে। আর তাঁদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক রয়েছেন যিকিরের মজলিস অব্বেষণ এবং তাতে হাযিরা দেওয়ার দায়িত্বে। আবার অনেকে আছেন বিভিন্ন আমলকারীদের জন্য ইস্তিগফার ও গায়েবানা দুআর উপর আমীন বলার দায়িত্বে।

মোটকথা এই যে, দুনিয়া ও আখেরাতে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ফেরেশতা দায়িত্বপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলাই বিভিন্ন কাজ তাঁদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। যেমনটি কুরআন হাদীসের কোথাও বিস্তারিতভাবে আর কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

১০. কিছু ফেরেশতার আলোচনা কুরআন হাদীসে তাঁদের প্রকৃত নাম বা গুণবাচক নামের সাথে এসেছে। তাঁদের উপর ওই ভাবে নাম নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে ঈমান আনা ফরয। যেমন জিবরাঈল (আ.) মীকাইল (আ.) ইসরাফীল (আ.) ও মালাকুল মাউত (আ., মৃত্যুর ফেরেশতা, যাকে ইয়রাঈল বা আয়রাঈল নামে স্মরণ করা হয়।)

১১. মোটকথা, ফেরেশতাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে অথবা বিস্তারিত যা কিছু কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসসমূহে উল্লেখ আছে তার সবটুকুই অকাট্য সত্য।

বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী (রহ.)এর ‘আকায়িদুল ইসলাম’ এবং আকায়েদ সংক্রান্ত অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ দেখা যেতে পারে।

এসব আকায়েদ সম্পর্কে কুরআন কারীমের ইরশাদসমূহ এবং সহীহ হাদীসসমূহ আপনি এ কিতাবেই পেয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ।

ফেরেশতাদের ব্যাপারে কুফরী বিশ্বাসসমূহ

ফেরেশতাদের ব্যাপারে ইসলামী আকায়েদের সাথে সাথে তাঁদের ব্যাপারে কুফরী আকীদাসমূহের আলোচনাও জরুরী মনে করছি। কেননা ওই সব কুফরী আকায়েদের কোন একটিতেও বিশ্বাস রাখলে ঈমান থাকবে না।

ওই সব কুফরী আকায়েদের সংক্ষিপ্ত সারকথা এই যে—

১. কুরআন কারীম, মুতাওয়াতিহ হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত ফেরেশতাদের সম্পর্কে যেকোন কথা অস্বীকার করা কুফর।

২. ফেরেশতাদের অস্তিত্বের অস্বীকার করাও প্রকাশ্য কুফর।

কেননা এতে আল্লাহ তাআলা, আশ্বিয়ায়ে কেরাম ও কুরআন হাদীসকে প্রকাশ্যে মিথ্যাচার করা হয়।

এমনিভাবে একথা বলাও কুফর যে, ফেরেশতা কোন নির্দিষ্ট মাখলুক নয়, বরং একটি সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক শক্তির নাম মাত্র। বলা বাহুল্য যে, এর দ্বারাও আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল ও কুরআন হাদীসের সাথে সরাসরি মিথ্যাচার করা হয়।

অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ ফেরেশতাদের অস্তিত্ব এ জন্যই অস্বীকার করে যে, তাঁদেরকে দেখা যায় না; আমরা তাঁদের দেখতে পারি না, কিন্তু এ যুক্তি নিতান্তই হাস্যকর ও অসার। কেননা কোন বস্তু অদৃশ্য হওয়া জ্ঞানী মানুষের নিকট সেটার অস্তিত্ব অস্বীকারের কারণ হতে পারে না। বরং দলীল দ্বারা প্রমাণিত জিনিসকে মেনে নেওয়া হল সুস্থ রুচি ও বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাজ।

এসব অবিশ্বাসীরা ‘ধর্মের বাইরে’ অন্য সব ব্যাপারে এ মূলনীতি মেনে চললেও ধর্মীয় ব্যাপারে আশ্চর্যজনকভাবে তাদের বিবেক উন্মাদ হয়ে যায়, যার দরুন তারা একগুঁয়েমি করে হককে অস্বীকার করতে থাকে।

যাহোক, যে ব্যক্তির স্রষ্টার উপর, তাঁর রাসূলের উপর এবং তাঁর কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস আছে, সে কখনো ফেরেশতার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হতে পারে না।

আর যে আল্লাহ, রাসূল বা কুরআন হাদীসে বিশ্বাসী নয় তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই।

৩. ফেরেশতাদেরকে মাসুম বা নিষ্পাপ মনে না করা অথবা তাঁদের সাথে শত্রুতা রাখা সরাসরি কুফরী কাজ।

৪. ফেরেশতাদের ইবাদত করা, তাঁদেরকে পূর্ণ ক্ষমতাবান বা সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী মনে করা সরাসরি শিরক।

৫. ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার সন্তান মনে করা জঘন্যতম কুফর ও শিরক, যা ছিল মুশরেকদের আকীদা। ফেরেশতাগণ আল্লাহর মাখলুক এবং তাঁর সম্মানিত বান্দা।

৬. এটা ভাবাও সরাসরি কুফর যে, আল্লাহ তাআলা এ সৃষ্টিজগতের পরিচালনার জন্য কারো মুখাপেক্ষী। আর এ জন্যই তিনি পৃথিবীর রাজা-বাদশাহদের মত (নাউযুবিল্লাহ) ফেরেশতাদেরকে বিভিন্ন কাজ সোপর্দ করেছেন!! এরূপ আকীদা পোষণকারী কাফের।

যিনি কুল জাহানের স্রষ্টা, খালেক ও পালনকর্তা তিনি আবার কার মুখাপেক্ষী? বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর শান তো এই-*انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له- كن فيكون* “তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে শুধু বলে দেন ‘হও’ তখনই তা হয়ে যায়।” -সূরা ইয়াসীন ৮২

সারকথা এই যে, ফেরেশতাদের সৃষ্টি এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন যিম্মাদারি সোপর্দ করার মধ্যে আল্লাহ তাআলার সামান্য থেকে সামান্যতম মুখাপেক্ষী ভাব নেই, বরং এখানে আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন হেকমত ও উদ্দেশ্য নিহিত আছে, সে সবার বিস্তারিত জ্ঞান শুধু আল্লাহ তাআলারই আছে।

‘আলহাবায়িক ফী আখবারিল মালায়িক’ ও তার অনুবাদ

বক্ষমান গ্রন্থ ‘আলহাবায়িক ফী আখবারিল মালায়িক’ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহ. ৮৪৯-৯১১হি.)এর বিখ্যাত একটি গ্রন্থ। এটা ফেরেশতাদের জীবনকথা, তাঁদের চাঞ্চল্যকর সংবাদ ও ঘটনার ব্যাপারে একটি সারগর্ভ কিতাব।

গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে আপনি ফেরেশতাজগতের ব্যাপারে বিস্তারিত অবগতি লাভ করবেন। আপনি জানতে পারবেন যে, আরশ থেকে ফরাশ (আসমান থেকে জমিন) পর্যন্ত, জান্নাত থেকে জাহান্নাম পর্যন্ত কোন একটি স্থানও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব- মুক্ত নয়। মাতৃগর্ভ থেকে আরম্ভ করে কবর ও হাশর পর্যন্ত তাঁদের যিম্মাদারি বিস্তৃত।

গ্রন্থটির মাধ্যমে ফেরেশতাদের আশ্চর্যজনক অবস্থা, আর বিস্ময়কর ঘটনাবলী জানার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার সুমহান কুদরতের ব্যাপারেও ঈমান বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, মূলগ্রন্থ ‘আলহাবায়িক ফী আখবারিল মালায়িক’ আরবীতে রচিত। যার উর্দু তরজমা পাকিস্তানের মাওলানা ইমদাদুল্লাহ আনওয়ার সাহেব (মু. আ.) করেছেন। বাংলা অনুবাদ ওই উর্দু অনুবাদের ভিত্তিতেই করা হয়েছে।

প্রকাশক ও অনুবাদক চেষ্টা করা সত্ত্বেও মূল আরবী গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারেননি। তাহলে আরবী থেকেই সরাসরি বাংলা অনুবাদ পেশ করা যেত।

গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) গ্রন্থটিতে নিজ স্বভাবসুলভ পন্থায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সবধরনের বর্ণনা জমা করে দিয়েছেন। কারণেই গ্রন্থটিতে ‘সহীহ’ রেওয়ায়েতের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে ‘মুনকার’, ‘বাতিল’ ও ‘মওয়ূ’ (জাল) রেওয়ায়েতও এসে গেছে।

এর দ্বারা সুয়ূতী (রহ.)এর উদ্দেশ্য এই যে, বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত উপকরণ ও তথ্য একত্র হলে তা পরিমার্জন ও (সহীহ রেওয়ায়েত) নির্বাচনের কাজ অন্য আলেমগণ করতে পারবেন। কিন্তু তাই বলে এ জাতীয় গ্রন্থকে হুবহু অনুবাদ করে সাধারণ পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দেওয়া কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কেননা সাধারণ পাঠকদের মধ্যে সহীহকে গাইরে সহীহ থেকে (শুদ্ধ-অশুদ্ধ বর্ণনা) পৃথক করার যোগ্যতাই বা কোথায়?

দুঃখজনক বিষয় হল এই যে, বর্তমানে (অধিকাংশ) অনুবাদক ও প্রকাশক এ জাতীয় সহীহ গাইরে-সহীহর বাছ-বিচার না করে পাইকারিভাবে প্রদত্ত সব ধরনের রেওয়ায়েতে পূর্ণ কিতাবের যাচ্ছে-তাই অনুবাদ করে পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। ফলে ‘বাতিল’, ‘মুনকার’ আর ভিত্তিহীন কথাবার্তা সাধারণের মাঝে খুব বেশি ছড়িয়ে পড়ছে।

আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় প্রদান করুন ‘মাকতাবাতুল আশরাফ’এর স্বত্বাধিকারী মুহতারাম মাওলানা হাবীবুর রহমান খান সাহেবকে যিনি গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ‘মুনকার’, বানোয়াট ও ‘বাতিল’ রেওয়ায়েতগুলো ছেঁটে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।

তাই আমি তাঁর অনুরোধের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার রহমতে এ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

এখন সংক্ষিপ্ত ও অনূদিতরূপ-এ গ্রন্থে আমার জানা মতে কোন ‘মুনকার’ ও

‘মওযু’ বা বাতিল রেওয়ায়েত নেই। অবশ্য প্রচুর সংখ্যক রেওয়ায়েত এমনও আছে যা সনদের দিক থেকে দুর্বল হলেও শরীয়তের মূলনীতি, কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের দৃষ্টিকোণে বাতিল বা আপত্তিকর নয়।

হাদীসের পাশাপাশি আল্লামা সুযুতী (রহ.) ফেরেশতাদের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কীয় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবয়ীদের প্রচুর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।^১

আর ওই সব বক্তব্যের মধ্যে কিছু রয়েছে এরূপ, যা কুরআন হাদীসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইশারা থেকে সংগৃহীত। আবার এর মধ্যে প্রচুর বক্তব্য এরূপও রয়েছে, যার ভিত্তি হল কোন ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বা বর্ণনা। তবে ওই ইসরাঈলী বর্ণনাটাও এরূপ যা কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী নয়। যদিও কুরআন সুন্নাহ-এ সেসবের সমর্থনও নেই। এ জাতীয় ইসরাঈলী বর্ণনা রেওয়ায়েত করার অনুমতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ

“বনী ইসরাঈল থেকে তোমরা (ঘটনাবলী) বয়ান করতে পার, এতে কোন অসুবিধা নেই।” -সহীহ বুখারী ১/৪৯১

এর সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও ইরশাদ করেছেন-

إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تَكْذِبُوهُمْ، وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَكُتِبَهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تَكْذِبُوهُمْ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ.

“যখন আহলে কিতাবগণ (ইহুদী-খৃষ্টান) তোমাদের সামনে কোন কিছু বর্ণনা করে তখন তাদেরকে সত্যবাদীও বলো না আর মিথ্যাবাদীও বলো না, বরং তোমরা বল ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর; কাজেই যদি তা সত্য হয় তবে তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হল না; যদি বানোয়াট হয় তবে তাদের কথার সত্যায়নও করা হল না।” -মুসনাদে আহমদ ৪/১৩৬; সুনানে বায়হাকী ২/১০

উল্লেখ্য যে, ফেরেশতা সম্পর্কীয় আকায়েদের ভিত্তি অন্যান্য দ্বীনী আকায়েদের মত কুরআন কারীম, সহীহ হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া

১- وفيها ما صحت نسبته إليهم وفيها ما لم تصح نسبته، بل هو من قسم الضعيف والمنكر والواهي، وقد حذفت المناكير منها في هذا المختصر المترجم حسب علمي.

যেসব দুর্বল বর্ণনা বা ইসরাঈলী বয়ান কিতাবে পাওয়া যায়, তার মর্যাদা সাধারণ ঐতিহাসিক বর্ণনার চেয়ে বেশি কিছু নয়। এসবের উপর আকায়েদের ভিত্তি কখনোই হতে পারে না।

এ গ্রন্থে উল্লেখিত প্রতিটি হাদীস, রেওয়ায়েত ও বক্তব্যের সাথে সাথে লেখক আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) দুএকটি উদ্ধৃতিও পেশ করেছেন। আর কিতাবের উর্দু অনুবাদক মাওলানা ইমদাদুল্লাহ আনওয়ার সাহেব অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি বৃদ্ধি করেছেন। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে মাওলানা হাসান সিদ্দীকুর রহমান লেখক ও উর্দু অনুবাদক উভয়ের উল্লেখকৃত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে বাছাই করে কিছু প্রসিদ্ধ উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন।

(وقد روعي في هذا العزو مجرد الإعلام ببعض مصادر الروايات، ولهذا فلم

يلاحظ فيه المترجم أصول العزو والتخريج المراعي عند أهل الحديث وطلبته، فليتنبه)

এ বাংলা গ্রন্থটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রন্থের শুরুতে কুরআন কারীমে ফেরেশতা সম্পর্কীয় অধিকাংশ আয়াত পরিষ্কার অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ পেশ করা হয়েছে। সেগুলো বুঝে পাঠ করলে ফেরেশতাদের ব্যাপারে ইসলামী আকায়েদ সম্বন্ধে আর কোন সংশয় ও সন্দেহ থাকবে না, ইনশাআল্লাহ।

والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.

আল্লাহ তাআলা লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশক সবাইকে নিজ নিজ খেদমতের উত্তম বিনিময় দিন এবং আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

দারুল তাসনীফ

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইলামিয়া ঢাকা

মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

তারিখ : ০৬/০৪/১৪২১ হিজরী

ভূমিকা : কিতাবুল জিহাদ জিহাদের হাকীকত, হেকমত ও কিছু ভ্রান্তির নিরসন

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব, আলইমামুল মুজাহিদ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)এর মুবারক সংকলন ‘কিতাবুল জিহাদ’এর অনুবাদ প্রকাশ করার সংকল্প করলে আমাকে এর একটি ভূমিকা লিখতে বলেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে, এর বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তিনি ইতিপূর্বে ‘আয়াতুল জিহাদ’ নামে একটি কিতাব প্রকাশ করেছেন, যাতে জিহাদ সংক্রান্ত অধিকাংশ আয়াত তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরসহ সন্নিবেশিত হয়েছে। জিহাদের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা এবং এর ফলাফল ও যথার্থতার ব্যাপারে যেকোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর উক্ত কিতাবেই পাওয়া যেতে পারে। থাকল জিহাদের ফযীলত সম্পর্কীয় দিক, তো এর সিংহভাগ বিষয়ই বক্ষমান কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। জিহাদের মাসায়েলের জন্য ফিকহের কিতাবসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। ‘কুরআন’ ও ‘সুন্নাহ’এ স্পষ্টভাবে উল্লেখিত মাসায়েল বলুন বা কুরআন সুন্নাহ থেকে আহরিত মাসায়েলই বলুন, অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে ফিকহের কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। মুজাহিদগণের পবিত্র সীরাতের একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা বক্ষমান কিতাবের দ্বিতীয় অংশে পাওয়া যাবে।

মোটকথা ভূমিকা লিখার তেমন কোন প্রয়োজন আমার কাছে অনুভূত হচ্ছিল না, তারপরও তাঁর বারবার বলায় পাঠকবৃন্দের সামনে কিছু কথা পেশ করছি। আল্লাহ তাআলা একে কবুল করুন আমীন।

জিহাদের পরিচয়, উদ্দেশ্য ও ফলাফল

‘জিহাদ’ শব্দটির একটি সাধারণ অর্থ এবং একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে।

‘জিহাদ’এর সাধারণ অর্থ হল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়তের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কালেমা বুলন্দ করার জন্য যে ত্যাগ-তিতিক্ষা, কষ্ট ও মুশাক্কাত সহ্য করা হয় তাই জিহাদ; তা যেকোন পথেই হোক বা যেকোন পন্থায়ই হোক না কেন।

কিন্তু ‘জিহাদ’ যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা, তার অর্থ হল আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা ও কাফের-মুশরেকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফের-মুশরেকদের সাথে যুদ্ধ করা।

‘জিহাদে শরয়ী’এর আসল অর্থ তাই, যা সাধারণ অবস্থায় ফরযে কেফায়া এবং বিশেষ অবস্থায় ফরযে ‘আইন’ হয়ে যায়।

জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

১. জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিউত্তর দেওয়া।
 ২. অত্যাচারিত মুসলমানদের সাহায্য করা।
 ৩. অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি প্রদান করা।
 ৪. ফেতনা-ফাসাদ নির্মূল করা এবং ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।
 ৫. কুফরের কর্তৃত্ব নির্মূল করা এবং আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা।
- এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করুন—

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. أَذِنَ
لِلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

১. “আল্লাহ মুমিনদের উপর থেকে (কাফেরদের কর্তৃত্ব ও কষ্ট দেওয়ার ক্ষমতা) হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

তাদেরকে কাফেরদের সাথে লড়াই করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে; যারা

আক্রান্ত হয়েছে। কেননা তারা নির্যাতিত হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের বিজয়ী করার ব্যাপারে সামর্থ্যবান। তাদের অন্যায়ভাবে নিজনিজ গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ।

যদি আল্লাহ একের মাধ্যমে অপরের শক্তি খর্ব না করতেন তবে স্ব স্ব যুগে (খ্রীষ্টানদের) গির্জা (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং (মুসলমানদের) মসজিদসমূহ যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, সব গুড়িয়ে দেওয়া হত। (জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার উপকারিতা ও প্রতি যুগে এর বিদ্যমানতার ইতিহাস উল্লিখিত হল।)

অবশ্যই আল্লাহ তার সাহায্য করবেন যে আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করবে (অর্থাৎ আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার বিশুদ্ধ নিয়তে জিহাদ করবে) নিঃসন্দেহে আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। এরা এমন যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তবে তারা নিজেরাও নামাযের পাবন্দী করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং (অন্যকে) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং সকল কাজের পরিণতি আল্লাহরই আয়ত্তাধীন।” -সূরা হজ্ব ৩৮-৪১

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا.

২. “সুতরাং যারা আল্লাহর কাছে আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দেয় তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুক এবং যে কেউ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এরপর নিহত হোক বা বিজয়ী, আমি তাকে মহাপুণ্য দান করব। তোমাদের কী হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য, যারা বলে ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে অন্যত্র নিয়ে যাও, এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী করে দাও। যারা মুমিন তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে এবং যারা

কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। অতএব তোমরা শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের সাথে যুদ্ধ কর, শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।” -সূরা নিসা ৭৪-৭৬

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাক্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ দুই কারণে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা তোমাদের কর্তব্য—

এক. আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা।

দুই. কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলমানদেরকে মুক্ত করা।

মক্কায় অনেক লোক এমন ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হিজরত করতে পারেননি। তাঁদের আত্মীয়-স্বজন তাঁদের উপর নির্যাতিত-নিপীড়ন করত, যাতে তাঁরা পুনরায় কাফের হয়ে যান, তখন আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বললেন, ‘তোমাদের দুই কারণে যুদ্ধ করা উচিত। আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য এবং মক্কার কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলমানদেরকে মুক্ত করার জন্য।’

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَوُكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ. اتَّخَشَرْنَاهُمْ، قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَاتِلُوهُمْ
يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ
مُّؤْمِنِينَ. وَيَذْهَبْ غِيْظَ قُلُوبِهِمْ. وَتَوَّبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ
يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ.

৩. “তোমরা কি সেই সব লোকদের সাথে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বহিস্কার করার সংকল্প করেছে? এবং এরাই তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? আল্লাহ হলেন তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য, যদি তোমরা মুমিন হও।

যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করবেন এবং মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন।

এবং তাদের মনের জ্বালা দূর করবেন এবং আল্লাহ যাকে চান তাকে তওবা

নসীব করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে যাবৎ না আল্লাহ জানবেন তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।” -সূরা তওবা ১৩-১৬

হযরত উসমানী (রহ.) বলেন, জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার মূল হেকমত এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতের কাফের ব্যক্তিদের ঔদ্ধত্য যখন সীমা অতিক্রম করত তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ব্যাপক আযাব দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিতেন, কিন্তু এই উম্মতের কাফেরদের জন্য জিহাদ বিধিবদ্ধ হয়েছে। এর মাধ্যমে খোদাদ্রোহী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগত বান্দাদের হাতে শাস্তি প্রদান করেন। এতে একদিকে যেমন কাফেরদের লাঞ্ছনা হয়, অপরদিকে আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে এবং তাদের বিজয় ও কর্তৃত্ব প্রকাশিত হয় এবং মুমিনদের অন্তর এই ভেবে প্রশান্ত হয় যে, গতকাল পর্যন্ত যেসব কাফের তাদের উপর নির্যাতন করত আজ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তারাই তাদের অনুকম্পা বা ইনসাফের মুখাপেক্ষী হয়েছে। অপরদিকে কাফেরদের জন্যও এই শাস্তি বিধানের মধ্যে একটি উপকারী দিক এই রয়েছে যে, এতে করে শাস্তি লাভের পরও তাদের জন্য তওবার দরজা খোলা থাকে এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকে। এসব আয়াতে জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার আরো একটি পরীক্ষা এই উল্লেখিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা জিহাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান, কারা শুধু মৌখিক বন্দেগীর দাবীদার আর কারা প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহ তাআলার জন্য জান-মাল বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত এবং সাথে সাথে কারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নেক আমল করে আল্লাহ পাক তাও জানেন। -তাকসীরে উসমানী ২৪৪-২৪৫

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ... فَإِذَا لَقِيتُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ. حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَانَ، فَمَا
مِنَّا بَعْدَ وَامٍ فِدَاءٍ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، ذَلِكَ. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ
مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ
يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سِيْهِدِيْهِمْ وَيُصْلِحْ بِأَلْهِمْ، وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَفَهَا لَهُمْ،
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وَالَّذِينَ
كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.

৪. “যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। ... অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে মোকাবেলা কর তখন তাদের গরদানে আঘাত কর। পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বেঁধে ফেল। এরপর হয় অনুগ্রহ, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ অব্যাহত রাখবে যাবৎ না যুদ্ধ তার অন্ত্র নামিয়ে ফেলে। এই বিধান এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে প্রতিশোধ নিতে পারতেন কোন আযাব প্রেরণ করে, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরজন দ্বারা পরীক্ষা করতে। (মুমিনদের মধ্যে কারা খাঁটি এবং কাফেরদের মধ্যে কারা শিক্ষা গ্রহণ করে) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না। তিনি তাদেরকে (জান্নাতের পানে) পথ দেবেন এবং (আখেরাতের সকল মঞ্জিলে) তাদের অবস্থা ভাল করে দেবেন এবং তাদেরকে দাখেল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন।

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখবেন। যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন।” –সূরা মুহাম্মাদ ১, ৪-৮

وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُوَلِّمُكُمْ نَعْمَ الْمَوْلَى وَنَعْمَ النَّصِيرُ.

৫. “এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যাবৎ না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ তা সম্যক দ্রষ্টা।

যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখ, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।” –সূরা আনফাল ৩৯-৪০

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) বলেন, “দ্বীন অর্থ বিজয় ও কর্তৃত্ব। এই অর্থে আয়াতের তাফসীর এই হবে যে, মুসলমানদের জন্য কাফেরদের সাথে ওই সময় পর্যন্ত লড়াই জারি রাখা উচিত যতক্ষণ না মুসলমানরা তাদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ হয়ে যায় এবং দ্বীন ইসলামের বিজয় অর্জিত হয় যাতে সে অন্যদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।”

কিছুদূর গিয়ে লেখেন, “এই তাফসীরের সারকথা হল, মুসলমানদের উপরে

ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দুশমনদের সাথে জিহাদ ও কিতাল জারি রাখা ওয়াজিব যতক্ষণ না মুসলমানদের উপরে তাদের অত্যাচারের ফেতনা বন্ধ হয় এবং ইসলাম সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হয়। এই অবস্থা কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সৃষ্টি হবে। তাই জিহাদের বিধানও কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।” -মাআরিফুল কুরআন ৪/২৩৩

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

৬. “যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যাবৎ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয়্যা দেয়।” -সূরা তওবা ২৯

হযরত উসমানী (রহ.) বলেন, মুশরেকদের বিষয় খতম এবং দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কিছুটা শৃঙ্খল হয়ে যাওয়ার পর নির্দেশ আসল, আহলে কিতাবের শক্তি ও দর্প চূর্ণ কর। মুশরেকদের তো অস্তিত্ব হতেই আরবকে পবিত্র করা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ইয়াহুদী নাসারার ক্ষেত্রে তখন পর্যন্ত শুধু এতটুকুই লক্ষ্য ছিল যে, তারা যেন ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে না পারে এবং তার প্রচার-প্রসার ও উন্নতির পথে অন্তরায় হতে না পারে। তাই অনুমতি দেওয়া হয় যে, তারা যদি অধিনস্ত প্রজা হয়ে জিয়্যা দিতে রাজি থাকে তবে কোন অসুবিধা নেই প্রজা করে নাও। তারপর ইসলামী সরকারের দায়িত্ব তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা। পক্ষান্তরে তারা যদি জিয়্যা দিতে সম্মত না হয় তবে মুশরেকদের অনুরূপ ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধেও নেওয়া হবে। অর্থাৎ জিহাদ ও লড়াই চালিয়ে যাওয়া হবে।” -তফসীরে উসমানী (অনূদিত) ২/১৯১

শরয়ী জিহাদ ও অন্যান্য লড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকেই শরয়ী জিহাদ ও অন্যান্য যুদ্ধের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা-

১. অন্যান্য যুদ্ধ তাওতের পথে হয়, পক্ষান্তরে জিহাদ হয় আল্লাহ তাআলার পথে। আল্লাহর পথে হওয়ার অর্থ কী তা নিম্নোক্ত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে-

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! ما

الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنْ أَحَدُنَا يَقَاتِلْ غَضَبًا، وَيَقَاتِلْ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

“এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর পথে লড়াইয়ের পরিচয় কী? আমরা কেউ ক্রোধান্বিত হয়ে লড়াই করি, কেউ জাত্যাভিমানের বশবর্তী হয়ে লড়াই করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি মুখ তোলে তাকালেন, এরপর বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে সে আল্লাহর পথে।” -সহীহ বুখারী ১/২৩; সহীহ মুসলিম ১/১৪০

অন্যত্র এসেছে-

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يَقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يَقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

“এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, কেউ গনীমতের আশায় লড়াই করে; কেউ খ্যাতির জন্য লড়াই করে আর কেউ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে-এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে? তিনি উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে সে আল্লাহর পথে।” -সহীহ বুখারী ১/৩৯৪; সহীহ মুসলিম ১/১৩৯

২. অন্যান্য যুদ্ধ হয় মানুষের উপর নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালানোর জন্য এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য। আগের ইতিহাস ও আজকের বাস্তবতা এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। অপরদিকে জিহাদ হয়ে থাকে ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য। জিহাদ ও মুজাহিদগণের সোনালী ইতিহাস এরই সাক্ষ্য দেয়।

৩. জিহাদের উদ্দেশ্য-যা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে, তা হল-

إِخْرَاجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، وَمِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ إِلَى نُورِ الْعِلْمِ، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ.

“মানুষকে মুক্ত করা মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বের প্রতি, দুনিয়ার

সংকীর্ণতা থেকে এর প্রশস্ততার প্রতি, অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর প্রতি এবং সকল মত ও ধর্মের নিপীড়ন থেকে ইসলামের ইনসাফের প্রতি।”

অথচ অন্যান্য যুদ্ধের উদ্দেশ্য হল মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, অত্যাচার ও অনাচারের পুঞ্জিভূত অন্ধকারে পৃথিবীকে নিমজ্জিত করা।

৪. অন্যান্য যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয় সাম্রাজ্য বিস্তার করা, অপরদিকে জিহাদের উদ্দেশ্য হল ভূমিকে তার হকদারের নিকট প্রত্যর্পণ করা। ভূমির মালিক আল্লাহ তাআলা। তিনি নেনকার মুমিনগণকেই এর হকদার সাব্যস্ত করেছেন। যারা এতে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আমার বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করবে। ইরশাদ হয়েছে—

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصالحون،
ان فى هذا لبلغا لقوم عبيدين، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

“এবং আমি ‘উপদেশের’ পর যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে। এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাণ্ড বিষয়বস্তু রয়েছে। আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।” -সূরা আশিয়া ১০৫-১০৭

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وقال الملاء من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الارض
ويذكرك والهلك، قال سنقتل ابناهم ونستحيى نساءهم، وانا فوقهم
قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله، يورثها
من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين.

“ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধান বলল, আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদেরকে বর্জন করতে দেবেন? সে বলল, আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করব এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখব আর আমরা তো তাদের উপর প্রবল। মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর, যমীন তো আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।” -সূরা আরাফ ১২৭-১২৮

আরো ইরশাদ হয়েছে—

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) দান করেছিলেন তার পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না। অতপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী।” -সূরা নূর ৫৫

৫. অন্যান্য যুদ্ধ হল বিনা উদ্দেশ্যে বা হীন উদ্দেশ্যে নিরপরাধ মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু উপর আঘাত হানার নাম, পক্ষান্তরে ইসলামী জিহাদ শুধু তাদের সাথেই হয়ে থাকে যারা নিজেদের অপরাধের কারণে হত্যাযোগ্য হয়ে গিয়েছে।

৬. অন্যান্য যুদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মৃত্যু-বিভীষিকার নামান্তর, পক্ষান্তরে ইসলামী জিহাদ সমাজকে দান করে নবজীবন, কিসাসযোগ্য ব্যক্তির উপর কিসাস কার্যকর করা সমাজকে নবজীবন দানেরই নামান্তর।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

“হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন।” -সূরা বাকারা

৭. অন্যান্য যুদ্ধ লাগামহীন হত্যাযজ্ঞের নাম, অপরদিকে ইসলামী জিহাদের জন্য রয়েছে বহু শর্ত, বহু বিধি-নিষেধ এবং নির্ধারিত সীমারেখা। তাই জিহাদ কর্মপন্থার দিক থেকেও অন্যান্য যুদ্ধের চেয়ে ভিন্নতর। কেননা জিহাদের উদ্দেশ্যই হল পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করা এবং অত্যাচার ও অনাচারের মূলোৎপাটন করা।

মোটকথা, শুধু এবং শুধু ইসলামী যুদ্ধকেই ‘জিহাদ’ বলা হয়, যা উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা উভয়দিক থেকে অন্যান্য যুদ্ধ থেকে পুরোপুরি ভিন্নতর এবং শুধু মুত্তাকী মুমিনই এ কাজের উপযুক্ত। কেননা ইনসাফ ও ইসলাহের ঝাঞ্জা বহনের অধিকার একমাত্র তাদেরই আছে এবং একমাত্র তারাই পৃথিবী-ত্তরাধিকারী। মানব

সমাজের নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা এবং মানবতার শিক্ষক হওয়ার গৌরবও শুধু তাঁদেরই প্রাপ্য।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় জিহাদের গুরুত্ব, ফাযায়েল, তাৎপর্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি এখানে শুধু কয়েকটি ভুল ধারণার অপনোদন করতে চাই, আমাদের অনেক বন্ধুই যার শিকার হয়ে থাকেন।

১. দীন প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই কি ‘জিহাদ’

কোন কোন বন্ধুকে বলতে শোনা যায় যে, ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ, দীন প্রতিষ্ঠা বা দীনের প্রচার-প্রসারের নিমিত্ত যেকোন কর্ম-প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। বলাবাহুল্য, ‘জিহাদ’ আভিধানিক অর্থে শরীয়তসম্মত সকল দ্বীনী প্রচেষ্টাকেই বোঝায় এবং শরীয়তের নুসূসসমূহের (কুরআন হাদীসের ভাষ্য) কোথাও কোথাও এই শব্দটি জিহাদ ছাড়া অন্যান্য দ্বীনী মেহনতের ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু জিহাদ যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা এবং যার অপর নাম ‘কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ’ তা কখনো এই সাধারণ কর্ম প্রচেষ্টার নাম নয়, বরং এই অর্থে ‘জিহাদ’ হল ‘আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য, ইসলামের হেফাজত এবং এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, কুফরের শক্তি চূরমার করার জন্য এবং এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করার জন্য কাফের মুশরেকদের সাথে যুদ্ধ করা।

ফিকহের কিতাবসমূহে এই জিহাদের বিধি-বিধানই উল্লেখিত হয়েছে। সীরাতে গ্রন্থসমূহে এই জিহাদেরই নববী যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে, কুরআন হাদীসে জিহাদের ব্যাপারে যে বড় বড় ফযীলতের কথা বলা হয়েছে তা এই জিহাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে এবং এই জিহাদে শাহাদতের মর্যাদায় বিভূষিত ব্যক্তিই হলেন প্রকৃত ‘শহীদ’।

শরীয়তের ভাষ্য এবং শরীয়তের পরিভাষাসমূহের উপর নেহায়েত জুলুম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যান্য সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক জিহাদের আহকাম ও ফাযায়েল দ্বীনের অন্যান্য মেহনত ও কর্ম প্রচেষ্টার ব্যাপারে আরোপ করা হয়। এটা এক ধরনের অর্থগত বিকৃতি সাধন, যা থেকে বেঁচে থাকা ফরয। তালীম, তায়কিয়া, দাওয়াত ও তাবলীগ, ওয়াজ-নসীহত বা দীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক ভাবে কোন কর্মপ্রচেষ্টা (যদি শরীয়তের নীতিমালা ও ইসলামী নির্দেশনা মোতাবেক হয় তবে তা ‘আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার’-এর একটি নতুন পদ্ধতি) এসবই স্ব স্ব স্থানে কাম্য, বরং এসব কর্মপ্রচেষ্টার প্রত্যেকটিই দ্বীনী খেদমতের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এসবের ভিন্ন ফাযায়েল, ভিন্ন আহকাম এবং ভিন্ন মাসায়েল

“আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, কাফেরদের সাথে লড়াই করা জিহাদে আসগর (ছোট জিহাদ) এবং নফসের মুজাহাদা (কুপ্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি) জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ)। যেন তারা নিভূতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফেরদের সাথে লড়াই করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে।

এই ধারণা ঠিক নয়, বরং বাস্তব কথা হল কাফেরদের সাথে লড়াই করা ইখলাস-শূন্য হলে বাস্তবিকপক্ষেই তা নফসের মুজাহাদা থেকে নিম্নস্তরের কাজ। এ ধরনের লড়াইকেই জিহাদে আসগর এবং এর বিপরীত নফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে।

কিন্তু কাফেরদের সাথে লড়াই যদি ইখলাসপূর্ণ হয় তবে এই লড়াইকে জিহাদে আসগর বলা গাইরে মুহাককিক (অগতীর জ্ঞানের অধিকারী) সুফীদের বাড়াবাড়ি, বরং এই লড়াই অবশ্যই জিহাদে আকবর এবং তা নিভূতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এতে উভয় জিহাদের ফযীলতই একত্র হচ্ছে।” -আলইফাযাতুল ইয়াওমিয়া খণ্ড ৪, হিসসা ৫, পৃষ্ঠা ৮২, মালফূয ১০৪১

৩. জিহাদ কি ইকদামী (আক্রমণমূলক)

না শুধুই দিফায়ী (প্রতিরোধমূলক)

এই শেষ যামানার কোন কোন লেখকের রচনা থেকে, যা তারা জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও জিহাদের তাৎপর্য, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করার জন্য লিখেছেন, এই ধারণা জন্মায় যে, ইসলামে শুধু দিফায়ী জিহাদ (প্রতিরোধমূলক জিহাদ) অনুমোদিত; ইকদামী জিহাদের (আক্রমণমূলক জিহাদ) অনুমোদন ইসলামে নেই। তাদের এ জাতীয় কথাবার্তার কারণ হয়ত জিহাদ সম্পর্কীয় কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের বরকতময় জীবনচরিত সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা পাশ্চাত্যের অন্যায় আপত্তিসমূহের কারণে ভীত-কম্পিত মানসিকতা।

বাস্তবতা হল জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ বা ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুফরের প্রভাব-প্রতিপত্তি চূরমার করা। এতদুদ্দেশ্যে ইকদামী বা আক্রমণমূলক জিহাদ শুধু অনুমোদিতই নয় বরং কখনো কখনো তা ফরয ও প্রভূত সওয়াবের কারণও বটে। কুরআন সুন্নাহর দলীলসমূহের পাশাপাশি পুরো ইসলামী ইতিহাস (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ

থেকে) এ ধরনের জিহাদের ঘটনায় পরিপূর্ণ। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী (দা. বা.)এর ভাষায়—

“অমুসলিমদের আপত্তিতে ভীত হয়ে এসব বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করা বা এতে ওয়রখাহীমূলক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা একটি অর্থহীন কাজ। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একজন ব্যক্তিকেও জবরদস্তি করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়নি এবং এর অনুমোদনও শরীয়তে নেই। অন্যথায় জিয্যার পুরো ব্যবস্থাপনাই অর্থহীন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই তরবারি ওঠানো হয়েছে। কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কুফরের অন্ধকারে যদি নিমজ্জিত থাকতে চায় থাকুক, কিন্তু আল্লাহ তাআলার এই পৃথিবীতে বিধান আল্লাহ তাআলারই চলা উচিত এবং মুসলমান আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য এবং আল্লাহদ্রোহীদের প্রভাব প্রতিপত্তি চুরমার করার জন্যই জিহাদ করে। আমরা এই বাস্তব সত্য প্রকাশ করতে ওই সব লোকের সামনে কেন লজ্জাবনত হব যাদের পুরো ইতিহাস সাম্রাজ্য বিস্তারের উন্মত্ত নেশায় হত্যাযজ্ঞ সংঘটনের ইতিহাস এবং যারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির জাহান্নাম পূর্ণ করার জন্য কোটি কোটি মানুষের প্রাণ সংহার করেছে! যাদের নিক্ষিপ্ত গোলামীর জিজিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির দেহ আজও রক্তাক্ত!” —জিহাদ ইকদামী ইয়া দিফায়ী? ফিকহী মাকালাত ৩/২৮৮-২৮৯, ৩০৩

৪. তাবলীগের অনুমতি পেয়ে যাওয়াই কি জিহাদ পরিত্যাগের জন্য যথেষ্ট

কোন কোন বন্ধুর এই ভুল ধারণাও আছে যে, কোন অমুসলিম সরকার তার দেশে তাবলীগের অনুমতি দিলে তাদের সাথে ইকদামী (আক্রমণমূলক) জিহাদ ঠিক নয়। এ জাতীয় ভুল ধারণার শিকার এক ব্যক্তি হযরত মাওলানা তকী উসমানী (দা. বা.)কে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। হযরত মাওলানা পত্র-লেখকের ভ্রান্তি দূর করেন এবং এ বিষয়ে শরীয়তের নির্দেশনার ব্যাপারে তাকে অবহিত করেন। তাঁর পুরো উত্তর ‘ফিকহী মাকালাত’ ৩/২৮৭-৩০৪-এ মুদ্রিত আছে। উত্তরের নির্বাচিত অংশ পাঠকের সামনে পেশ করা হল—

“আপনি জিহাদের ব্যাপারে যা লিখেছেন তার সারাংশ আমি এই বুঝি যে, কোন অমুসলিম সরকার তার দেশে তাবলীগের অনুমতি প্রদান করলে তার সাথে আর জিহাদ করার বৈধতা থাকে না। যদি এই আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে আমি আপনার সাথে একমত নই। ইসলাম প্রচারের পথে প্রতিবন্ধকতা শুধু এই

নয় যে, সরকার ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে আইনি নিষেধাজ্ঞা জারি করে, বরং মুসলমানদের বিপরীতে কোন অমুসলিম রাষ্ট্র অধিক প্রতিপত্তির মালিক হওয়াও দ্বীনে হক-এর প্রচারে অনেক বড় বাধা। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে তাবলীগের ব্যাপারে কোন আইনি নিষেধাজ্ঞা নেই, কিন্তু পৃথিবীতে তাদের বর্তমান প্রতিপত্তির কারণে বিশ্বব্যাপী সাধারণভাবে এমন একটি মানসিকতা তৈরি হয়ে গেছে যা সত্য প্রচারের ব্যাপারে কোন আইনি নিষেধাজ্ঞার চেয়ে কোন অংশে কম নয়, বরং বেশি। তাই কাফেরদের প্রতিপত্তি চুরমার করা জিহাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম। যাতে তাদের বিদ্যমান এই প্রতিপত্তির কারণে যে মানসিক ভীতি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীভূত হয় এবং সত্য গ্রহণের পথ উন্মুক্ত হয়। যতদিন পর্যন্ত তাদের এই প্রতিপত্তি বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষের মনে এই ভীতিও অটুট থাকবে এবং দ্বীনে হক কবুল করতে পুরোপুরি অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। অতএব জিহাদ জারি থাকবে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে—

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية
عن يد وهم صاغرون.

“যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছে তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যাবৎ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্যা দেয়।” —সূরা তওবা ২৯

উপরোক্ত আয়াতে ততদিন পর্যন্ত কিতাল জারি রাখার আদেশ করা হয়েছে যতদিন না কাফেররা অবনত হয়ে জিয্যা প্রদান করে। যদি কিতালের উদ্দেশ্য শুধু তাবলীগের আইনি অনুমতি অর্জনই হত তবে বলা হত ‘যাবৎ না তারা তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে।’ কিন্তু জিয্যা ওয়াজিব করা এবং এর পাশাপাশি তাদের অবনত হওয়ার উল্লেখ এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তাদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করাই আসল উদ্দেশ্য, যাতে কুফরের রাজনৈতিক প্রভুত্বের কারণে ভীতির যে পর্দায় মনমানস আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা উন্মোচিত হয়। এরপর মানুষের পক্ষে ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি স্বাধীন ও মুক্ত মনে চিন্তা করার সুযোগ ঘটে। ইমাম রাযী (রহ.) এই আয়াতের আলোচনায় তাফসীরে কাবীরে (৬/২৩) বলেন—

ليس المقصود من أخذ الجزية تقريره على الكفر، بل المقصود منها حقن دمه،

وإمهاله مدة، رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الإسلام، وقوة دلائله، فينتقل من الكفر إلى الإيمان ... فإذا أمهل الكافر مدة، وهو يشهد عز الإسلام، وسمع دلائل صحته، وشاهد الذل والصغار في الكفر فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال إلى الإسلام، فهذا هو المقصود من شرع الجزية.

অর্থাৎ জিয্যার উদ্দেশ্য কাফেরকে কুফরীর হালতে বাকি রাখা নয়, বরং উদ্দেশ্য হল তাকে বাঁচিয়ে রেখে কিছু দিন সময় দেওয়া, যে সময়ের মধ্যে তার ব্যাপারে এই আশা হবে যে, সে ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করে কুফর থেকে ইসলামের দিকে আসবে ...। অতএব যখন কাফেরকে কিছু দিন সময় দেওয়া হবে এবং সে ইসলামের প্রভাব দেখবে, তার সত্যতার দলীলসমূহ শুনবে এবং কুফরের লাঞ্ছনা দেখবে তখন এসব বিষয় তাকে ইসলামের প্রতি অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে। বস্তুত জিয্যা বিধিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য এই।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি ভাবার তা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বা সাহাবায়ে কেরামের যুগে কোথাও কি একটি নযীরও এমন পাওয়া যায় যে, তিনি বা সাহাবায়ে কেরাম কোন রাষ্ট্রে জিহাদের আগে কোন তাবলীগী মিশন পাঠিয়েছেন এবং অপেক্ষা করে দেখেছেন যে, তারা তাবলীগী কাজকর্মের অনুমতি দেয় কিনা? এরপর তাবলীগী কাজের অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জানানোর ক্ষেত্রেই শুধু জিহাদ করেছেন?... বলাবাহুল্য এমন কখনো হয়নি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ ছাড়া আর কি ফলাফল বের করা সম্ভব যে, শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভ করাই উদ্দেশ্য ছিল না। অন্যথায় বহু রক্তক্ষয়ী লড়াই শুধু এই এক শর্ত দিয়েই বন্ধ করা সম্ভবপর হত যে, মুসলমানদের তাবলীগের ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু অন্তত অধমের সীমাবদ্ধ অধ্যয়নে পুরো ইসলামী ইতিহাসের কোথাও এমন একটি ঘটনাও নেই যাতে এটুকু সুযোগ চেয়ে লড়াই বন্ধ করার ব্যাপারে অগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ এর পরিবর্তে কাদেসিয়্যার যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ নিজেদের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন তা এই ছিল— إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله অর্থাৎ মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করা। -কামিল, ইবনে আসীর ২/১৭৮

অনুরূপ কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে—

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

“তাদের সাথে ওই সময় পর্যন্ত লড়াই কর যখন আর ফেতনা বিদ্যমান না থাকে এবং যে সময় বিজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়।” -সূরা আনফাল ৩৯

এই আয়াতের তাফসীরে আমার পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) লেখেন-

“দ্বীন অর্থ বিজয় ও কর্তৃত্ব। এই অর্থে আয়াতের তাফসীর এই হবে যে, মুসলমানদের জন্য কাফেরদের সাথে ওই সময় পর্যন্ত লড়াই জারি রাখা উচিত যতক্ষণ না মুসলমানগণ তাদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ হয়ে যায় এবং দ্বীন ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়, যাতে সে অন্যদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে পারে।”

“এই তাফসীরের সারকথা হল মুসলমানদের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দুশমনদের সাথে জিহাদ ও কিতাল করা ওয়াজিব যতক্ষণ না সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হয় এবং এই অবস্থা কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সৃষ্টি হবে। তাই জিহাদের বিধানও কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।” -মাআরিফুল কুরআন ৪/২৩৩

মোটকথা, জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু তাবলীগের আইনগত অনুমতি লাভ করা নয়, বরং কাফেরদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করে মুসলমানদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা, যাতে একদিকে মুসলমানদের প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে তাকানোর সাহস তাদের না হয় এবং অন্যদিকে কাফেরদের প্রতিপত্তিতে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ এই মানসিক ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত মনে ইসলামের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে আগ্রহী হতে পারে। এজন্য যে উলামায়ে কেরাম জিহাদের জন্য ‘হেফাজত’এর শব্দ অবলম্বন করেছেন তাদের উদ্দেশ্যও তাই। মনে রাখতে হবে কুফরের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করা ও ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা হেফাজতে ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ। অতএব এই মৌলিক স্তম্ভটিকে ‘হেফাজত’এর আওতা থেকে কোনভাবেই বের করা যায় না।

আমার মতে সকল বড় বড় আলেম জিহাদের উদ্দেশ্য এই বিষয়টিকেই সাব্যস্ত করেছেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্দলভী (রহ.) লেখেন-

“জিহাদের আদেশ প্রদান করার পেছনে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এক মুহূর্তে সকল কাফেরের প্রাণ সংহার করা হবে, বরং উদ্দেশ্য হল আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীতে কর্তৃত্ববান হবে, মুসলমান মর্যাদার সাথে জীবন-যাপন করবে এবং নিরাপত্তার সাথে আল্লাহর ইবাদতে সক্ষম হবে। কাফেরদের ব্যাপারে এই আশঙ্কা থাকবে না যে তারা দ্বীনের ব্যাপারে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। ইসলাম তার দুশমনদের অস্তিত্বের দুশমন নয়, বরং তাদের এমন প্রতিপত্তির দুশমন যা

ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য হুমকির কারণ হয়।” –সীরাতে মুস্তফা ২/৩৮৮

অন্যত্র লেখেন, “আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

এ আয়াতে এ ধরনের জিহাদই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে মুসলমান জাতি! তোমরা কাফেরদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই কর, যখন আর কুফরের ফেতনা বিদ্যমান না থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই আয়াতে ফেতনা বলতে কুফরের শক্তি ও প্রতিপত্তির ফেতনা উদ্দেশ্য এবং وَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ থেকে দ্বীনের বিজয় ও কর্তৃত্ব উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে এসেছে- لِيُظْهَرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ অর্থাৎ দ্বীনের এ পরিমাণ শক্তি ও কর্তৃত্ব অর্জিত হবে যে, কুফরী শক্তির সামনে তার আর পরাস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না এবং দ্বীন ইসলাম কুফরের ফেতনা থেকে পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত ২/৩৮৬)

যদি শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভের পর জিহাদের প্রয়োজন বাকি না থাকে তবে তো আজ দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই তাবলীগের অনুমতি আছে (এবং আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অনুমতি না থাকলে কিছু মুসলিম দেশেই নেই)। অতএব বলতে হবে এখন আর মুসলমানদের জন্য অস্ত্র ধারণ করার প্রয়োজন নেই। বিশ্ববাসীর মন-মগজে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বসতে থাকুক, তাদের নীতিমালা প্রচলিত হতে থাকুক, বিধি-বিধানও তাদেরই চলুক, তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও মতবাদই প্রচারিত হোক আর আমাদের মুবালাগগণের প্রবেশাধিকার তো আর বন্ধ হয়নি! প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীতে কুফর তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের জয়ভেরি বাজিয়ে চলেছে সেখানে যদি আপনাকে তাবলীগের অনুমতি প্রদান করা হয় তবে কয়জন লোক এমন পাবেন যারা এই তাবলীগেরই স্থির চিন্তে শোনার জন্য এবং এতে চিন্তা-ফিকির করার জন্য প্রস্তুত হবে?

যে পরিবেশে রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতার সাহায্যে ইসলাম ও তার শিক্ষার পুরো বিপরীত চিন্তা-ভাবনা পূর্ণ শক্তিতে প্রচারিত হচ্ছে এবং এসবের প্রচারের জন্য এমন সব মাধ্যমও ব্যবহৃত হচ্ছে যা মুসলমানদের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, সেখানে তাবলীগের অনুমতি লাভ হলেও তা কী পরিমাণ ফলদায়ক হতে পারে?

হাঁ, যদি ইসলাম ও মুসলমানদের এমন শক্তি সামর্থ্য অর্জিত হয়ে যায়, যার মোকাবেলায় কাফেরের শক্তিমত্তা পরাস্ত হয় বা অন্তত তারা ওই ফেতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম না হয় যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তো সে ক্ষেত্রে অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে নিরাপদ চুক্তির মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখা জিহাদের বিধানের

পরিপন্থী নয়। অনুরূপ যে পর্যন্ত কুফরের প্রতিপত্তি নির্মূল করার মত প্রয়োজনীয় শক্তি মুসলমানদের অর্জিত না হয় ততদিন পর্যন্ত শক্তি অর্জনের পাশাপাশি অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে নিরাপদ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়াও নিঃসন্দেহে জায়েয। মোটকথা অমুসলিমদের সাথে শান্তি চুক্তি দুই অবস্থায় হতে পারে।

(ক) যেসব রাষ্ট্রের শক্তি মুসলমানদের শক্তির জন্য বিপজ্জনক নয় তাদের সাথে সন্ধিমূলক ও নিরাপত্তা চুক্তি করা যেতে পারে যাবৎ না তারা দ্বিতীয়বার মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) মুসলমানদের কাছে সশস্ত্র জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে সামর্থ্য অর্জিত হওয়া পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ থাকা যেতে পারে।” -ফিকহী মাকালাত ৩/৩৫১

৫. জিহাদের বিধান কি বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে ছিল

জিহাদের হাকীকত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও এর বিধানাবলী সম্পর্কে যিনিই অবহিত হবেন তিনিই নিঃসংশয় হবেন যে, জিহাদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ‘আলমী ইসলামী’ (আন্তর্জাতিক সংশোধনমূলক) দায়িত্ব। জিহাদের ফরযিয়্যত এখনও বাকি আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে এবং তা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের নিকট অতি পছন্দনীয় আমলসমূহের অন্যতম। ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

“বল তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত, আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।” -সূরা তওবা ২৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ،

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ،
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ، ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. وَيُشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.

“হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদের রক্ষা করবে মর্মভুদ শাস্তি হতে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলে বিশ্বাস করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে দাখেল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে এবং এই মহা সাফল্য এবং তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ- আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।” -সূরা সফফ ১০-১৩

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتَلُ.

“আমার পছন্দ যে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হব পুনরায় জীবিত হব ও পুনরায় নিহত হব এবং পুনরায় জীবিত হয়ে নিহত হব।” -সহীহ বুখারী ১/১০; সহীহ মুসলিম ২/১৩৩

মোটকথা, জিহাদের ফযীলত সংক্রান্ত আয়াতে পৃষ্ঠাসমূহ পরিপূর্ণ এবং শত শত সহীহ হাদীসে এর ফযীলত উল্লেখিত হয়েছে।

কিন্তু ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশনা থেকে দূরত্বের কারণে অথবা না জানি অন্য কী কারণে কোন কোন লোককে বলতে শোনা যায় যে, “যেহেতু তখন কিতাল ছাড়া ক্ষমতার পট পরিবর্তনের অন্য কোন মাধ্যম ছিল না তাই ইসলাম এই পন্থাটিকেই বহাল রেখেছে, কিন্তু বর্তমান অবস্থা ভিন্ন। অর্থাৎ এখন রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই ক্ষমতা দখল করে পৃথিবীতে ইসলামের মর্যাদা ও কৃর্ত্ব স্থাপন সম্ভব। অতএব এখন জিহাদের প্রয়োজন নেই। জিহাদের বিধান মনসুখ বা রহিত হয়ে যাওয়া উচিত। নাউযবিলাহ! কেউ তো এই ধারণাও প্রকাশ করেছে যে, ‘যে সরকার তার নিজেদের দেশে দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে তাদের সাথে ইকদামী বা আক্রমণাত্মক জিহাদ করা উচিত নয়, বিশেষত বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে, যখন সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়, কিন্তু যখন

রাজ্যজয়ের সাধারণ প্রচলন ছিল এবং এ বিষয়টি রাজ-রাজড়ার কীর্তি ও গুণাবলীর মধ্যে পরিগণিত হত তখনকার কথা ভিন্ন। যেসব ইকদামী জিহাদের ঘটনাবলীতে ইসলামী ইতিহাস পরিপূর্ণ তা সবই ওই সময়কার।”

এই দুইটি মত যে ভ্রান্ত এবং কিতাব ও সুন্নাহর জিহাদ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী এবং শরীয়তের ইজমায়ী বিধানাবলীর পরিপন্থী তা তো একেবারেই স্পষ্ট, কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এই দুই মতের মধ্যে অজান্তেই ইসলামী শরীয়তের প্রতি কত বড় অপবাদ আরোপ করা হল যে, একটি সাময়িক বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট বিধানকে ইসলামী শরীয়ত কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য চলমান একটি বিধান বানিয়ে দিয়েছে এবং তার এত এত ফাযায়েল বর্ণনা করেছে এবং এর প্রতি এত বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে, যার দ্বারা তা একটি সাময়িক বিধান নয়, বরং চিরন্তন বিধান হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

আর দ্বিতীয় মতটি তো আরো বেশি ভয়াবহ। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী (দা. বা.)এর ভাষায়, “যদি এই মতটি ঠিক ধরে নেওয়া হয় তবে এর অর্থ এই হবে যে, কোন বস্তু ভাল বা মন্দ হওয়ার জন্য ইসলামের নিজস্ব কোন মাপকাঠি নেই। যদি কোন যুগে কোন একটি মন্দ বিষয়কে ‘ভাল ও কীর্তিমূলক’ গণনা করা হয় তবে ইসলামও তার অনুসরণ করে এবং যে যুগে মানুষ একে মন্দ মনে করে ইসলামও সেখানে থেমে যায়!

প্রশ্ন হল, ‘ইকদামী জিহাদ’ কোন ভাল বিষয় কিনা? যদি ভাল হয় তবে মুসলমান এ থেকে শুধু এ জন্য কেন বিরত থাকবে যে, আজকাল সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়? আর যদি বিষয়টি আসলেই ভাল না হয় তবে বিগত সময়ে ইসলাম কেন এ কাজ থেকে বাধা প্রদান করেনি! ইসলাম কি শুধু এজন্যই একে অবলম্বন করেছিল যে, তা রাজা-বাদশাহর কীর্তির মধ্যে পরিগণিত হত?

আমার মতে ইসলামী ইতিহাসের ইকদামী জিহাদসমূহের এই ব্যাখ্যা নিতান্তই ভুল ও বাস্তববিরোধী। বাস্তব কথা হল, কুফরের প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্য ওই যুগেও জিহাদ করা হয়েছে যখন তা ‘রাজ-রাজড়ার কীর্তি হিসাবে পরিগণিত হত’, কিন্তু তা এ জন্য হয়নি যে, ওই যুগে তার ব্যাপক প্রচলন ছিল, বরং এজন্য ছিল যে, আল্লাহর দ্বীনের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিষয়টি বাস্তবিক পক্ষেই উপযোগী ও ভাল। অন্যথায় রাজা-বাদশাহর বীরত্ব প্রদর্শনের মধ্যে তো এও পরিগণিত হত যে, তারা জয়ের নেশায় চুর হয়ে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরও রেহাই দিত না, কিন্তু ব্যাপক প্রচলনের কারণে এসব বিষয়কে ইসলাম কখনো সমর্থন করেনি, বরং লড়াইয়ের এমন সব বিধি-নিষেধ ও সীমা-রেখা নির্ধারণ করেছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে

তা অনুসরণ করে দেখিয়েছে যা তখনকার রাজা-বাদশাহর কল্পনারও অতীত ছিল; বরং তা ওই সব নিপীড়িত মানবশ্রেণীর জন্যও অকল্পনীয় ছিল যারা শুধু রাজা-বাদশাহর এ জাতীয় জুলুম-অত্যাচারে শুধু অভ্যস্তই ছিল না, বরং এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল।

যে উদ্দেশ্যে ইকদামী জিহাদ অতীতে জায়েয ছিল ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে আজও তা জায়েয এবং শুধু এজন্য এই বৈধতাকে আড়াল করার কোন অর্থ নেই যে, ‘এটম বোমা’ ও ‘হাইড্রোজেন বোমা’ আবিষ্কার ও উৎপাদনকারী শান্তিপ্রিয় (?) ব্যক্তিবর্গ একে নিতান্তই অপছন্দ করেন এবং এতে ওই সব মহান (?) ব্যক্তিবর্গের নাক-মুখ কুঁচকে যায় যাঁদের নিষ্ক্ষিপ্ত গোলামীর জিজ্ঞাসে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির শরীর রক্তে রঞ্জিত।

মূলত এই বিষয়টিও কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তিরই অবাঞ্ছিত ফলাফল বলে আমার বিশ্বাস যে, মানুষ ভাল-মন্দ নির্ধারণের মাপকাঠিও এই বিশ্বব্যাপী প্রচারণাকেই বানিয়ে নিয়েছে যা দিনকে রাত ও রাতকে দিন করে মানুষের মন-মগজে স্থাপন করেছে এবং শুধু অমুসলিমই নয় খোদ মুসলমানরাও এই প্রচারণায় কাবু হয়ে নিজেদের দ্বীন ও ধর্মের বিধানাবলীর ব্যাপারে ওজরখাহীর পথ অবলম্বন করতে আরম্ভ করেছে। যদি অন্যায় ও অসত্যের এই প্রতিপত্তিকে চুরমার করা ‘সাম্রাজ্যবাদের’ সংজ্ঞায় আসে তবে এ জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের অভিযোগ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে মাথা পেতে গ্রহণ করা উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমরা ওই সব অভিযোগকারীদের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে যাব এবং বলব, জনাব! যখন আপনি ইকদামী জিহাদকে নন্দিত মনে করতেন তখন আমরাও তা ভাল মনে করতাম এবং তা কর্মে রূপ দিতাম এবং যখন আপনি আপনার লিখনীতে এবং শুধুই লিখনীতে একে মন্দ বলছেন এবং শুধুই বলছেন তখন আমরাও একে নন্দিত মনে করছি এবং নিজেদের জন্য একে হারাম করে নিচ্ছি। এ জাতীয় চিন্তারীতির পথে একমত হওয়া এই অধমের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। -ফিকহী মাকালাত ৩/৩০২-৩০৫

পরিশিষ্ট

মোটকথা, জিহাদের উভয় প্রকার-ইকদামী ও দিফায়ী ইসলামের চিরন্তন ফরযসমূহের অন্যতম। যতদিন ভূপৃষ্ঠে কুফর ও শিরকের প্রভাব প্রতিপত্তির ফেতনা বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত সত্য-ন্যায়ের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের দায়িত্বও অবশ্যপালনীয় থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الْجِهَادُ مَاضٍ مِّنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتَلَ آخِرُ أُمَّتِي الدِّجَالُ، لَا يُبْطِلُهُ عَدْلٌ عَادِلٌ وَلَا جَوْرٌ جَائِرٌ.

“আমার বি‘ছতের (প্রেরিত হওয়ার) সময় থেকে নিয়ে আমার উম্মতের শেষ ভাগ দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে। কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায়পরায়ণতা এবং কোন জালেমের জুলুম একে রহিত করবে না।”
-সুনানে আবু দাউদ ১/৩৪৩

এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনদের নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য-

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ.

“তাদের মোকাবেলার জন্য তোমরা যা কিছু শক্তি ও পালিত ঘোড়া সংগ্রহ করতে সক্ষম হও, তা তৈরি রাখ। তা দ্বারা ত্রাস সৃষ্টি হবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের উপর এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদের উপর, যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তোমরা তা পুরোপুরিই লাভ করে, তোমাদের প্রাপ্য বাকি থাকবে না।” -সূরা আনফাল ৬০

মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের সেনাবাহিনী শুধু রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার জন্যই নয়, বরং ইসলাম ও ইসলামী ‘শাআয়ের’ (নিদর্শনাবলী) সংরক্ষণ করা, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তি নির্মূল করাও তাদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

প্রত্যেক মুসলিম দেশের সরকার এবং প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রসংঘকে জিহাদের এ সবক পুনরায় ইয়াদ করা অপরিহার্য যদি তারা নিজেদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আগ্রহী হন এবং দুনিয়া থেকে জুলুম-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার আশা রাখেন।

জাতির অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা সংঘসমূহকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায় না। কেননা যদি তাদের আহ্বানে সাড়া না দেওয়া হয় এবং জিহাদের সুন্নত পুনরায় জীবিত না করা হয় তবে তাদের আরো কিছু দায়িত্ব বাকি থেকে যায়। কী দায়িত্ব বাকি থাকে? এর উত্তর

পাওয়া যাবে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) শাহ ইসমাইল শহীদ (রহ.) এবং সালাফ ও খালাফের এ প্রকৃতির জানবাজ মুজাহিদগণের জীবনীতে।

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، اللهم قونا على الجهاد في
سبيلك، وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
والحمد لله رب العالمين.

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

তারিখ ১৭/০৭/১৪২৫ হিজরী

ভূমিকা : তাসাওউফ কী ও কেন

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বীনী বিধান ও নির্দেশনার একটি বড় অংশ ইসলাহে কলব তথা অন্তরজগতের পরিশুদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট। দ্বীনের এই অংশটি অতীতের কোন এক সময়ে 'তাসাওউফ' নামে পরিচিতি পেয়ে গেছে। আবার আমাদের উপমহাদেশে তা প্রসিদ্ধি লাভ করে 'পীর-মুরীদী' নামে। যে স্থানে অবস্থান করে মাশায়েখগণ আত্মশুদ্ধির মেহনত-মুজাহাদা করিয়ে থাকেন তার নাম হয়ে গেছে খানকা। এই পারিভাষিক শব্দগুলো যেমন অনেকের জন্য সুফল বয়ে এনেছে তেমনি অনেকের জন্য ক্ষতিরও কারণ হয়েছে। তাই পরিভাষা ও নিয়ম-পদ্ধতির মত পরিবর্তনযোগ্য বিষয়াদিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার পরিবর্তে এ কাজের মূল লক্ষ্য এবং এই সাধনার প্রকৃত মর্মবাণী অনুধাবন করার চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য। তাহলে ইনশাআল্লাহ দ্বীনের এই অঙ্গনটি সম্পর্কে আমাদের অনেকের মধ্যে যে ভীতি বা অবহেলা কাজ করে তা দূর হয়ে যাবে এবং মনযিলের উদ্দেশ্যে এ পথের সফর আরম্ভ করার জন্য অন্তর অস্থির না হোক, প্রস্তুত তো অবশ্যই হয়ে যাবে।

এই মেহনতের উদ্দেশ্য

এই মেহনতের উদ্দেশ্য একটিই, তবে তা বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করা যায়। সংক্ষেপে এটাও বলা যায় যে, বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় যে হুকু অর্থাৎ তাওহীদ, তা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করা এবং বিশ্বাস থেকে কর্মে এবং উচ্চারণ থেকে আচরণে একে বিকশিত করা আর শুধু ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনের সকল অঙ্গনে একে পরিব্যাপ্ত করে দেওয়াই হল এই মেহনতের উদ্দেশ্য।

তাওহীদ যখন পূর্ণতা লাভ করবে তখন 'ইখলাস'ও পূর্ণাঙ্গ হবে, আল্লাহর

মহব্বত পূর্ণাঙ্গ হবে, তাওয়াক্কুল পূর্ণাঙ্গ হবে, আল্লাহভীরুতা ও লজ্জাশীলতা পূর্ণাঙ্গ হবে এবং ইহসান ও ইহতিসাব চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হবে।

তাওহীদে পূর্ণতার সূচনা এই চিন্তা-মুরাকাবা এবং অন্তরের ওই অবস্থা থেকে হয় যা নিচের আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে—

وَمَا مِنْ خَافٍ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.

“আর যে আপন প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তি (অবৈধ চাহিদা পূরণ করা) থেকে বিরত রাখে, নিশ্চয় তার ঠিকানা জান্নাত।” -সূরা নাজিয়া

আর তার পরিণতি ঘটে ইখলাসের পূর্ণতায়, ব্যাপকতায় ও সার্বক্ষণিকতায় এবং ইহসান ও ইহতিসাবের অতল গভীরতায়। ইহসানের এ অতলান্ত ও চূড়ান্ত স্তরেরই সারকথা হাদীস শরীফে এভাবে বলা হয়েছে—

أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

“তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এমনভাবে কাজ করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে না দেখ তবে তিনি তো অবশ্যই তোমাকে দেখেন।” -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১৭৩

তাওহীদ পূর্ণতায় পৌঁছার পরেই আল্লাহর প্রতি বান্দার এই আত্মনিবেদন শাদ্বিক অর্থেই সত্য ও সঠিক হয়ে যায়—

أَنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمَسْلُومِينَ.

“আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমার প্রতি এ হুকুমই হয়েছে এবং আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম।” -সূরা আনআম ১৬২-১৬৩

যদিও মুখের ভাষায় প্রত্যেক মুমিন ঈমানের প্রথম মুহূর্তেই এ অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকেন তবে সেটা তখন সীমাবদ্ধ থাকে বিশ্বাসের নিছক উচ্চারণ ও স্বীকৃতির গণ্ডিতে। এরপর যখন তাওহীদ পূর্ণতার স্তরে পৌঁছায় তখন এটা হয়ে যায় বান্দার মুখের ও অন্তরের এবং বিশ্বাসের ও আচরণের স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনি। সে সময় তার সমগ্র সত্তায় এই অভিব্যক্তিই মূর্ত হয়ে ওঠে যে—

اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.

“হে আল্লাহ, নিজেকে আমি সমর্পণ করেছি আপনার সমীপে, আমার চেহারা আপনার দিকে করেছি এবং আমার সকল বিষয় আপনার নিকট সমর্পণ করেছি এবং নিজের পৃষ্ঠদেশকে আশ্রিত করেছি আপনার দিকে, আপনার প্রীতি ও ভীতির কারণে, আপনি ছাড়া আপনার থেকে বাঁচার এবং আশ্রয় গ্রহণের কোন স্থান নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনার কিতাবের প্রতি যা আপনি নাযিল করেছেন এবং আপনার নবীর প্রতি যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন।” -জামে তিরমিযী

উপরের দুআ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। বস্তুত তাওহীদের পূর্ণতাই হচ্ছে ওই মাকাম, যাতে উপনীত হওয়ার পরই একজন সালেক (বা আত্মশুদ্ধির সাধক) নিজেকে মাওলার দরবারে নিবেদন করতে পারে, কবির ভাষায়-

بجز تیرے نہ آئے کچھ نظریں ☆ میرے مولیٰ مجھے حسن نظر دے

“তোমাকে ছাড়া যেন আর কিছুই আমি না দেখি

মাওলা! আমাকে দান কর দৃষ্টির পবিত্রতা।”

تیرے یاد میں سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھے یاد رہے

سب خوشیوں کو آگ لگا دوں خانہء دل آباد رہے

اب تو رہے بس تادم آخروں رزباں اے میرے الہ

لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ

“তোমার স্মরণে সবকিছু যাই যেন ভুলে, যেন আর কিছু না থাকে মনে।

সকল খুশি ভস্মীভূত করে দেব, তবু দিলের জাহান যেন আবাদ থাকে।

এখন থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যবানে যেন জারী থাকে

শুধু ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

প্রশ্ন এই যে, তাওহীদে পূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতা একজন মুসলিম কীভাবে অর্জন করবে এবং কীভাবে তার সমগ্র জীবন তাওহীদের ধারায় সিক্ত ও সিদ্ধিগত হবে।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর জবাব অত্যন্ত স্পষ্ট। অর্থাৎ এ উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে যত্নবান হতে হবে-

- (ক) নেক আমলের প্রতি মনোযোগী হওয়া।
 (খ) গুনাহ থেকে সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকা।
 (গ) সকল বিষয়ে সুনুতের অনুসরণ করা এবং শিরক ও বেদআত থেকে বেঁচে থাকা।
 (ঘ) নিজের কর্ম ও অবস্থার হিসাব যথাযথভাবে করা।

অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় এবং প্রত্যেকের কর্ম ও অবস্থা এই প্রমাণ বহন করে যে, শুধু ইচ্ছা ও আগ্রহ দ্বারাই উপরোক্ত বিষয়গুলোকে অর্জন করা যায় না। ‘মুহাছাবায়ে নফস’ তথা নিজ কর্ম ও অবস্থার পর্যালোচনা ও হিসাব-নিকাশ, যা ইসলাম ও সংশোধনের অনেক বড় উপায়, তা থেকে অন্তর শুধু পলায়নই করতে ভালবাসে। আমলের সওয়াব ও ফযীলত জানা থাকা সত্ত্বেও তা আদায় করতে শরীর ও মন প্রস্তুত হয় না। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কী পন্থা অলম্বন করা হবে এবং অলসতা ও উদাসীনতার মোকাবেলা করে উপরোক্ত বিষয়গুলোতে কীভাবে সফল হওয়া যাবে?

এই প্রশ্নের জবাব ইসলামী নির্দেশনার আলোকে খুবই পরিষ্কার এবং তা এই যে, অন্তর পরিশুদ্ধ হয়—

১. উত্তম গুণাবলি অর্জন ও মন্দ প্রবণতাগুলো বর্জনের মাধ্যমে।
২. অধিক পরিমাণে ও নিয়মিত যিকিরের মাধ্যমে।
৩. আহলুল্লাহর (আল্লাহওয়ালাদের) সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে।

তৃতীয় কাজটি অত্যন্ত সহজ। এর জন্য খুব সহজেই নিজেকে প্রস্তুত করা যায় এবং এরই মাধ্যমে ধীরে ধীরে অধিক পরিমাণে ও নিয়মিত যিকিরেরও অভ্যাস হয়ে যায়। এরপর অন্তরে নিজে থেকেই সংশোধন ও পরিশুদ্ধির প্রেরণা জাগ্রত হয় এবং প্রয়োজনীয় মেহনত-মুজাহাদার জন্যও মানুষ প্রস্তুত হয়ে যায়। এরপর যতই অন্তর সংশোধিত হবে যবানও সে অনুপাতে সংযত হবে, কাজ কর্মও শুদ্ধ ও সঠিক হবে। হাদীস শরীফে এসেছে—

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ جَلَسَانِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكَرَكُم بِاللَّهِ رُؤْيَتْهُ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ وَذَكَرَكُم بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ

“প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কার সান্নিধ্য সর্বোত্তম? উত্তরে বললেন, যাকে দেখলে তোমাদের অন্তরে আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত হয়, যার কথা তোমাদের ইলমকে বৃদ্ধি করে এবং যার কর্ম তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।”

—আব্দু ইবনে হুমাইদ, আবু ইয়াল্লা—আলমাতালিবুল আলিয়া ৮/১৬৩

উপরোক্ত হাদীস এবং এ বিষয়ের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের আলোকে আকাবের বুয়ুর্গগণ ওই সমস্ত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে দিয়েছেন, যেগুলো কোন শায়খের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে তার সান্নিধ্য অবলম্বন করা যায়। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহ.)এর ‘কাসদুস সাবীল’ কিতাবে এর বিবরণ দেখা যেতে পারে।

সুলূকের জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল সোহবতে আহলুল্লাহ-আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্য। উপরোক্ত হাদীস থেকেও এ কথা জানা গেল যে, আল্লাহ-ওয়ালাদের সোহবত অন্তরকে সজীব করে, আখেরাতের ফিকির জাগ্রত করে এবং কর্মের নতুন প্রেরণা দান করে। এ প্রসঙ্গে পাহাড়পুরী হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, “আমরা আসরের নামাযের পরে হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)এর মজলিসে বসতাম। কখনো কখনো এই উপস্থিতির উদ্দেশ্যেও হযরতকে বলতাম যে, আমরা এ মজলিসে উপস্থিত হই আগামী তেইশ ঘণ্টার জন্য পেট্রোল সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে।”

পাহাড়পুরী হুজুরের শাগরিদ মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম বলেন, “কিছুদিন হুজুরের সান্নিধ্য না পেলে এক ধরনের শূন্যতা বোধ করতে থাকি। এরপর যখন তাঁর মজলিসে উপস্থিত হই তখন মনে হয় জ্বালানী সংগ্রহ করতে পেরেছি।”

বাস্তবিকই আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য অর্জন করা হলে এ বিষয়টি অনুভূত হতে থাকে যে, সোহবতে আহলুল্লাহ হচ্ছে মানুষের কর্মজীবনের চালিকাশক্তি।

যিকিরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হচ্ছে দুআ। আদইয়ায়ে মাছূরা দু ধরনের—বিশেষ সময় ও অবস্থার দুআ এবং সাধারণ দুআ। প্রথমোক্ত দুআগুলো জানার জন্য ‘হিসনে হাসীন’ কিংবা অন্য কোন সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা তথা ‘তাতিম্মায়ে মুনাজাতে মাকবুল’ সাথে রাখা যায়। শেষোক্ত দুআগুলোর জন্য ‘হিসনে হাসীন’এর বাবে খামেছ (পঞ্চম অধ্যায়), ‘আলহিয়বুল আযম’ বা ‘মুনাজাতে মাকবুল’ সাথে রাখা উচিত।

অন্তরকে ভাল গুণ দ্বারা ভূষিত করা এবং মন্দ প্রবণতাগুলো থেকে পবিত্র করার প্রেরণা জাগ্রত হওয়ার পর মূল কাজ হল শায়খকে নিজ অবস্থা জানিয়ে নির্দেশনা গ্রহণ করা এবং দৃঢ়তার সাথে তা অনুসরণ করা। আরেকটি কাজ হল অন্তরের ওই দোষ-গুণগুলোর পরিচয় জেনে তা অর্জন ও বর্জন সংক্রান্ত শরীয়তের আহকাম ও বিধান এবং শরীয়তের আলোকে পেশকৃত ইলমে তাসাওউফের ব্যবস্থা ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা। এ জন্য নিম্নোক্ত কিতাবসমূহের মধ্য থেকে

নির্বাচন করে যেকোন একটি কিতাব মুতাল্লাআ (অধ্যয়ন) করা যেতে পারে—

১. ইমাম গাযালী (রহ.)এর ‘আলআরবাঈন’। হযরত থানভী (রহ.) মাওলানা আশেকে ইলাহী মিরাতী (রহ.)এর মাধ্যমে এ কিতাবের উর্দু তরজমা করিয়েছিলেন। ‘তাবলীগে দ্বীন’ নামে তা প্রকাশিত হয়। বাংলা তরজমাও একই নামে এমদাদিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা অনুবাদকের নাম কিতাবে নেই। আসলে এটি তরজমা করেছেন জনাব মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ ছাহেবের নানা হযরত মাওলানা আবদুল জলীল মাজাহেরী (রহ.)। এ তথ্য আমি পেয়েছি মরহুমের ছাহেবদাদা জনাব হাফেয খালেদ ছাহেবের কাছ থেকে। এ কিতাবের প্রতিটি কথা প্রত্যেক পাঠকের জন্য আমলযোগ্য হবে এটি অপরিহার্য নয়, তাই সর্বাবস্থায়ই শায়খের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২. শরীয়ত ওয়া তরীকত।

এ কিতাবটি মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ ছাহেব (রহ.) হাকীমুল উম্মত (রহ.)এর মাওয়ায়েজ ও রচনাবলি থেকে সংকলন করেছেন। এর বাংলা অনুবাদ করেছেন উস্তাযুল আসাতেয়া হযরত মাওলানা আব্দুল মজীদ ঢাকুবী (রহ.)।

৩. দিল কী দুন্য়া, মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)।

এর বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা হাবীবুর রহমান খান ছাহেব এবং তা ‘আত্মশুদ্ধি’ নামে মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. ইমদাদুস সুলূক।

৫. ইকমালুশ শিয়াম।

৬. এ প্রসঙ্গে বুনিয়াদি জ্ঞান-অর্জনের জন্য ইমাম বুখারী (রহ.)এর ‘আলআদাবুল মুফরাদ’ এবং ইমাম নববী (রহ.)এর ‘রিয়ায়ুস সালেহীন’ অধ্যয়ন করা জরুরী। এ দুটো কিতাব বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

৭. আনফাসে ঈসা।

হযরত মাওলানা ঈসা (রহ.) হাকীমুল উম্মত (রহ.)এর বিভিন্ন রচনা ও মাওয়ায়েজ ও মাকতূবাত থেকে সংকলন করেছেন। আনন্দের বিষয় এই যে, দীর্ঘ দিন যাবৎ উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এই কিতাবকে বুনিয়াদ বানিয়ে তাঁর ইসলামী মজলিসগুলোতে বয়ান করেছেন। ওই বয়ানগুলোতে শুধু এ কিতাবেরই নয়, বরং মূল বিষয়েরও দীর্ঘ ও

বিশদ ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। হযরতের ওই বয়ানগুলো 'ইসলাহী মাজালিস' নামে প্রকাশিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ছয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং ইংরেজীতেও অনুবাদ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। বাংলা অনুবাদও শুরু করা হয়েছে। যারা এ বিষয়ের গভীরে পৌছতে আগ্রহী তাদের জন্য ইনশাআল্লাহ এই কিতাব রাহনুমা ও পথপ্রদর্শক সাব্যস্ত হবে।

আহলে ইলমের জন্য তো এ বিষয়ে সালাফ ও খালাফের (পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের) প্রস্তুতকৃত বিশাল কুতুবখানাই বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলোর মধ্য থেকে নিম্নে উল্লিখিত সবগুলো কিতাব কিংবা নির্বাচন করে কতিপয় কিতাব অধ্যয়ন করা যেতে পারে—

১. 'বাসাইরে হাকীমুল উম্মত' সংকলনে ডা. আব্দুল হাই আরেফী (রহ.)।
২. 'তায়কিরাতুন নুফুস' যা সংকলন করা হয়েছে ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কায়্যিম ও ইবনে রজব (রহ.)এর কিতাবসমূহ থেকে।
৩. 'আদাবুদ দ্বীন ওয়াদদুনুয়া' আবুল হাসান মাওয়ারদী (রহ.)।
৪. 'আলমুহাযযাব মিন ইহইয়াই উলুমিদীন' সংকলনে, ছালেহ আহমদ আশশামী।
৫. 'তারবিয়াতুস সালিক ওয়া তানজিয়াতুল হালিক', হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)এর কিছু ইসলামী পত্র।
৬. 'ইসলাহী মাকাতিব' শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)এর কিছু ইসলামী পত্র।

এ ছাড়া আরো অধিক জানার জন্য ইবনুল কায়্যিম (রহ.)এর 'মাদারিযুস সালেকীন শরহ মানাযিলিস সাযীরীন' এবং হাকীমুল উম্মত (রহ.)এর 'আত্‌তাকাসাশুফ আন-মুহিম্মাতিত তাসাওউফ' ও 'আত্‌তাশাররুফ বিমারিফাতি আহাদীসিত তাসাওউফ' অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ পথে উন্নতির সব'চে বড় উপায় আত্মনিমগ্নতা ও মর্মচিন্তার সাথে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা এবং মহব্বতের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও শামায়েল অধ্যয়ন করা।

শামায়েলের উপর সর্বোত্তম কিতাব হল শায়খ ছালেহ আহমদ শামী রচিত 'মিন মায়ীনিশ শামায়েল'। এ কিতাবটি অনুবাদযোগ্য।

এই পথে হিম্মতের প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, হিম্মত কোথায় পাওয়া যায়। হযরত মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী দামাত বারাকাতুহম বলেছেন, কিছু

না কিছু হিম্মত আল্লাহ তাআলা সবার মধ্যেই দিয়ে রেখেছেন। এই বিদ্যমান হিম্মত কাজে লাগাতে থাকলে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটাই হিম্মত বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় 'নুসখা'। দ্বিতীয় নুসখা হল বুলন্দ হিম্মতের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের সোহবত অবলম্বন করা।

নিয়মিত ও অধিক পরিমাণে যিকিরে অভ্যস্ত হওয়ার পথে বড় প্রতিবন্ধক হল বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও নানামুখী ব্যস্ততা থেকে সৃষ্ট পেরেশানী। যৌক্তিক ও অযৌক্তিক উভয় ধরনের পেরেশানীর কারণেই যিকিরের পাবন্দী ছুটে যায়। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বলেছেন, ভাই, পেরেশানীর সমাধানও তো আল্লাহর যিকির। অতএব পেরেশানী দূর করার নিয়তে হলেও যিকিরের পাবন্দী করতে থাক। নির্ধারিত পরিমাণ পূর্ণ করা সম্ভব না হলে যতটুকু সম্ভব যিকির কর, কিন্তু একদম ছুটে দিয়ে না।

তরক্কীর আরেকটি উপায় বলেছেন হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ নুমানী (রহ.)। তিনি বারবার বলতেন যে, প্রতিদিন দিনের শুরুতে নিয়তকে তাজা করবে। অর্থাৎ এই নিয়ত করবে যে, আজ আমি কোন গুনাহের কাজ করব না এবং প্রত্যেক কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করব। আল্লাহর অনুগ্রহে দুনিয়া বা আখেরাতের যতটুকু ভাল কাজ করার সুযোগ হবে তা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করব।

হযরত মাওলানা জমীরুদ্দীন ছাহেব নানুপুরী দামাত বারাকাতুহুম শায়খে কামেলের সান্নিধ্যে অবস্থান করে কর্ম ও অন্তরের পরিশুদ্ধির তাকীদ সাধারণত নিম্নোক্ত পংক্তিগুলোর মাধ্যমে করে থাকেন—

يُحِبُّ كُنْجَ بَدْرٍ وَبَدْرٌ دَامَ نَيْسٌ ☆ جَزْ خُلُوتِ غَاوِ حَقِّ آ رَامَ نَيْسٌ

পৃথিবীর কোন স্থান ফেরিব ও মোহজাল থেকে মুক্ত নয়
আসল শান্তি শুধু মাওলার সঙ্গে একান্ত নির্জনতায়।

অন্য কবির ভাষায়—

چند در کثرت نمائی خویش را در یک زمانه خانه وحدت بیا

মানুষের মাহফিলে তো অনেক প্রদর্শন করেছ নিজের
এখন কিছুক্ষণ এস ঘরের নির্জন কোণায়।

সুলুক ও তাসাওউফ বিষয়ে অনেক কিতাব-পত্র লেখা হয়েছে, কিন্তু আজকাল মানুষ সংক্ষিপ্তই অধিক পছন্দ করে। তাদের উপকারার্থে আমার ও মুহতারাম ভাই জনাব শামসুল আরেফীন-এর অনুরোধে জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

খান ছাহেব এ বিষয়ে সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী (রহ.) কৃত 'তাসাওউফ ক্যায়া হ্যায়' উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এরপর নিজের প্রকাশনী থেকে শানদার আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর খেদমত কবুল করুন, তাঁর পরিবার-পরিজনকে কবুল করুন এবং তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

পুস্তিকাটি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করা অতিপ্রয়োজন। ইনশাআল্লাহ লেখকের ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের কারণে এবং পুস্তিকা সহজ ও সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে বাংলা ভাষার পাঠকগণ এ থেকে তেমনি উপকৃত হবেন যেমন মূল উর্দু পুস্তিকা থেকে উর্দুভাষীগণ উপকৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

সবশেষে পাঠকবৃন্দের কাছে আমার নিজের জন্য এবং সন্তানদের জন্য দুআ প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে এই দৌলত নসীব করেন। মারকাযুদ দাওয়াহ এবং এর সংশ্লিষ্ট সবার জন্য দুআ প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাআলা যেন মারকাযে যিকির ও রোনাযারীর পরিবেশ পয়দা করে দেন এবং তাকে ইলমে যাহের ও ইলমে বাতেন দুটোরই মারকায বানিয়ে দেন। হযরত মাওলানা জমীরুদ্দীন ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম মারকাযের জন্য এই দুআই করে থাকেন।

এই বিষয়ের কিতাবের উপর ভূমিকা লেখা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। জনাব খান সাহেব ও ভাই শামসুল আরেফীন সাহেবের বারবার অনুরোধের কারণে অত্যন্ত লজ্জার সাথে এই কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করলাম। আল্লাহ তাআলা এ কথাগুলো যেন আমার উপকারের কারণ বানান, আমার বিপক্ষে দলীল না বানান। আমীন।

وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ

أجمعین والحمد لله رب العالمین.

বিনীত

তারিখ : ০২/০৮/১৪২৯ হিজরী

সোমবার, বাদ ফজর

মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

পল্লবী, ঢাকা-১২১৬

ভূমিকা : মাযহাব ও তাকলীদ কী ও কেন

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

হাদীস থাকতে ফিকহের প্রয়োজন হয় কেন

প্রশ্নটির উত্তর জানতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে ‘ফিক্‌হ’ কাকে বলে। ফিক্‌হ বলা হয়—

১. কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানাবলীর সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপকে।

কেননা ফিকহের মধ্যে তাহারাত (পবিত্রতা) থেকে ফরায়েজ (মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মাসায়েল) পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রের মাসায়েল বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অধীনে এক স্থানে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে।

২. এবং ইসলামী ইবাদতসমূহের নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতির সুবিন্যস্ত রূপকে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে শিখিয়েছিলেন; তাঁরা তাবয়ীগণকে এবং তাঁরা তাঁদের পরবর্তী লোকদের শিখিয়েছেন।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে, আমরা প্রতিদিন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, তার তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত মাসআলাসমূহ যদি আপনি হাদীসের কিতাব থেকে সংগ্রহ করতে চান তাহলে হাদীসের একটি দু’টি কিতাব নয়, দশ বিশ কিতাবেও তা পাবেন না। নামাযের বিবরণ সংক্রান্ত হাদীস যা একশতেরও অধিক কিতাবে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে তা যদি আপনি এক জায়গায় একত্র করেন তারপরও এ সংক্রান্ত মাসায়েল জানার জন্য আপনাকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে—

(ক) নামাযের কাজসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া তৈরি করা। কেননা কোন

হাদীসেই স্পষ্টভাবে এই পূর্ণাঙ্গ খসড়া উল্লেখ করা হয়নি।

(খ) জমাকৃত হাদীসসমূহের মধ্যে সহীহ-যয়ীফ নির্ণয় করা।

(গ) এই হাদীসসমূহের মধ্যে যেসব হাদীসের মর্ম শুধু আরবী ভাষার সাহায্যে নির্ধারণ করা যায় না তার সঠিক মর্ম নির্ধারণ করা। কেননা অনেক হাদীস এমন আছে যেখানে ভাষার বিচারে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে।

(ঘ) কিছু হাদীস এমনও আছে যার বিধান মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে, কিন্তু এর দলীল সেই হাদীসে উল্লেখ নেই। শরীয়তের অন্যান্য দলীলের আলোকে এ ধরনের হাদীসসমূহ সনাক্ত করাও জরুরী।

(ঙ) অনেক হাদীসে সাধারণ পাঠকবৃন্দ দেখবেন যে, কোন হাদীসে রাফয়ে ইয়াদাইন করার কথা আছে, কোন হাদীসে না-করার কথা। কোথাও আমীন জোরে বলার কথা এসেছে আবার কোথাও আস্তে বলার কথা। কোন হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে ইমামের পেছনে কুরআন (সূরা ফাতেহা ও অন্য কোন সূরা) পড়তে হয়। আবার কোন হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে ইমামের পেছনে কুরআন পড়তে হয় না। এ ধরনের অনেক বিষয় আছে। এখন এসব বিষয়ে কী কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে এবং কোন্ হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে—এর ফয়সালা শুধু হাদীসের অনুবাদ পড়ে করা সম্ভব নয়।

(চ) উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে নামাযের মধ্যকার যেসব কাজের কথা জানা গেল তার মধ্যে কোন্ কাজটি ফরয, কোন্টি ওয়াজিব, কোন্টি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আর কোন্টি সুন্নাতে যায়েদা-মুস্তাহাব; অনুরূপ যেসব কাজ নামাযে নিষিদ্ধ তার মধ্যে কোন্ কাজটি দ্বারা নামায একদম নষ্ট হয়ে যায়, কোন্ কাজটি দ্বারা নামায নষ্ট না হলেও নামাযের মধ্যে তা মাকরুহ-মাকরুহে তাহরীমী বা মাকরুহে তানযীহী কিংবা অনুত্তম ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণও হাদীস শরীফে উল্লেখ নেই।

এবার আপনি চিন্তা করে দেখতে পারেন, ফুকাহায়ে কেরাম কত বড় কাজ করেছেন এবং সাধারণ মানুষের কত বড় উপকার করে গেছেন। পাশাপাশি এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, ফিকহ কাকে বলে।

ফুকাহায়ে কেরাম নামায সংক্রান্ত হাদীসসমূহ একত্র করে তার আলোকে নামাযের ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ রূপটি সংকলন করেছেন। একজন সাধারণ মানুষ শুধু নয় একজন আলেমও হাদীসের অসংখ্য কিতাব থেকে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ একত্র করার পরও নামাযের পূর্ণাঙ্গ রূপ-রেখা এবং এর মাসায়েল আহরণ করতে উপরোক্ত যে জটিল সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হত, ফুকাহায়ে কেরাম শরীয়তের

দলীল-প্রমাণের আলোকে তার সমাধান দিয়ে গেছেন। একইভাবে যাকাতের ব্যাপারে চিন্তা করুন, হজ্জের ব্যাপারে চিন্তা করুন। প্রত্যেকটি অধ্যায়েই এসব শাস্ত্রীয় সমস্যা রয়েছে এবং উম্মাহর ফকীহগণ এসব সমস্যার সাগর পাড়ি দিয়ে কুরআনী বিধি-বিধানের একটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপ উপযুক্ত বিন্যাস ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে পেশ করেছেন। তাই বলা যায়, ফিক্‌হ হল শরীয়তের হুকুম-আহকামের সুবিন্যস্ত ও একস্থানে সংকলিত এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ সমষ্টির নাম।

৩. অনুরূপ ফিকহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, ওই সব মাসআলার সুবিন্যস্ত সমষ্টি যা কুরআন হাদীসে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান নেই। শরীয়তের নীতিমালা থেকে বা কিয়াসে শরয়ীর মাধ্যমে শরীয়তের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে ওই সব মাসআলা আহরণ করার কাজটি সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে সকল যুগের ফকীহগণই করে গেছেন। ওই সব মাসআলাকেও ফিকহের মধ্যে উপযুক্ত বিন্যাসের সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ফিকহের পরিচয় জানার পর এ প্রশ্নটির উত্তরও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীস থাকা অবস্থায় ফিকহের প্রয়োজন কী? কেননা—

যখন ফিক্‌হ হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়, বরং হাদীস শরীফেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং হাদীস শরীফের হুকুম-আহকামেরই সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপ, তাই খোদ হাদীসের জন্যই এবং সহজভাবে সঠিক পন্থায় হাদীস শরীফের অনুসরণের জন্যই ফিকহের প্রয়োজন। এজন্যেই খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সহীহ হাদীসে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং ফুকাহায়ে কেরামের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। আর এজন্যই ফিক্‌হ-বিমুখ ব্যক্তির কখনো হাদীসের অনুসারী হতে পারে না। হাদীসের সঠিক অনুসারী তারাই যারা ফকীহগণের নির্দেশনাক্রমে এবং ফিকহের আলোকে হাদীস শরীফের অনুসরণ করেন। হাদীস অনুসরণের এই পদ্ধতিটিই খায়রুল কুর্রন (সাহাবী-তাবেয়ীদের যুগ) থেকে চলে আসছে এবং ইসলামের সকল যুগেই মুসলিম জাতি এই পদ্ধতিতেই হাদীস শরীফের অনুসরণ করে ধন্য হয়েছেন। তাই এটিই হল হাদীস অনুসরণের সুন্নাহ-নির্দেশিত পন্থা।

আজকাল হাদীস অনুসরণের নামে ফিকহে ইসলামী এবং ফুকাহায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যে প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে এটা কখনো হাদীস অনুসরণ নয়, এটা সুন্নতে মুতাওয়ারাছার বিরুদ্ধাচরণ। অন্য ভাষায় বললে, এটা হল হাদীস অনুসরণের একটি বেদআতী বা নব-আবিষ্কৃত পন্থা।

‘মায়হাব’ কী এবং ‘তাকলীদ’ কাকে বলে

আপনি যদি ফিকহের পরিচয় পেয়ে থাকেন তবে এবার আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করুন। আমরা ইতিমধ্যেই শুনেছি যে, কুরআন-সুন্নাহর হুকুম-আহকামের সুবিন্যস্ত সংকলনই হচ্ছে ফিকহ। এই ফিকহের একাধিক সংকলন বিদ্যমান ছিল, যার মধ্যে বর্তমান কাল পর্যন্ত শুধু চারটি সংকলনই স্থায়িত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সেই সংকলনগুলো হচ্ছে—

১. ‘ফিকহে হানাফী’— যার সংকলনের ভিত্তি স্থাপনের কাজটি ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ., জন্ম ৮০ হিজরী, মৃত ১৫০ হিজরী)এর হাতে সুসম্পন্ন হয়েছে।

২. ‘ফিকহে মালেকী’— যার সংকলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ইমাম মালেক (রহ., জন্ম ৯৪ হিজরী, মৃত ১৭৯ হিজরী)এর হাতে।

৩. ‘ফিকহে শাফেয়ী’— ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী (রহ., জন্ম ১৫০ হিজরী, মৃত ২০৪ হিজরী) যার ভিত্তি রেখেছেন।

৪. ‘ফিকহে হাম্বলী’— ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ., জন্ম ১৬৪ হিজরী, মৃত ২৪১ হিজরী) এর ভিত্তি রেখেছেন।

সাধারণ পরিভাষায় ফিকহের প্রত্যেকটি সংকলন ‘মায়হাব’ নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য এখানে ‘মায়হাব’ শব্দটির অর্থ ‘ফিকহের মায়হাব’ তথা ফিকহের নির্দিষ্ট একটি সংকলন। এখানে মায়হাব অর্থ দ্বীন বা আকায়েদ বিষয়ে মতবিরোধকারী কোন ‘ফেরকা’ নয়। কেননা ফিকহের এই মায়হাবগুলোর প্রতিটিই দ্বীন ইসলাম এবং শরীয়তের অধীন এবং শরীয়ত অনুযায়ী চলারই একাধিক পথ। এই মায়হাবের ইমামগণ সবাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদার উপরই ছিলেন এবং সব ধরনের ভ্রান্ত আকীদা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাদের অনুসারীরা সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত ও পথেরই অনুগামী। তবে বিভিন্ন সময় এমন হয়েছে যে, আকীদাগতভাবে বিভ্রান্ত বেদআতী লোকেরা ফিকহের ক্ষেত্রে এসে উপরোক্ত চার মায়হাবের কোন একটির অনুসারী হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাদের বেদআতী আকীদা-বিশ্বাসের সব দায়-দায়িত্বই তাদের; মায়হাবের ইমাম, তাঁদের সংকলিত ফিকহ এবং তাঁদের অনুসারীদের উপর বর্তায় না।

তাকলীদে অর্থ : এই ফিকহী মায়হাবের মাধ্যমে কুরআন হাদীসের আহকাম জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করাকে সাধারণ পরিভাষায় ‘তাকলীদ’ বলে। অর্থাৎ দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে ফকীহগণের শরণাপন্ন হওয়ার যে আদেশ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে করেছেন এবং নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর

উম্মতকে করেছেন তাদেরই সংকলিত ফিকহ থেকে কুরআন হাদীসের হুকুম জেনে সে অনুযায়ী আমল করাকেই সাধারণ পরিভাষায় ‘তাকলীদ’ বা ‘মাযহাব মানা’ কিংবা ‘ফিকহ অনুসরণ’ করা বলা হয়।

আপনি যদি ফিকহের পরিচয় পেয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে আর বলে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না যে, ‘তাকলীদ’ বৈধ কি অবৈধ বা ফিকহ অনুযায়ী আমল করার বিধান কী? কিংবা কোন ফিকহী মাযহাবের অনুসরণ করা ভাল না মন্দ? ফিকহের পরিচয় জানার সাথে সাথেই এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুরআন হাদীস অনুসরণ করার সঠিক, সহজ ও নিরাপদ পথটি হল ফিকহের আলোকে ফুকাহায়ে কেরামের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই পদ্ধতিই সর্বজন স্বীকৃত ও অনুসৃত।

তাকলীদ-বিরোধীরা কী বলতে চান

মুসলিম উম্মাহর এই সর্বসম্মত কর্মধারার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম দলবদ্ধ আওয়াজ ওঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সাড়ে বারশো বছর পরে। আর তা-ও এই উপমহাদেশে এবং ইংরেজদের শাসনামলে, যাদের রাজ্য-শাসনের পলিসিই ছিল *Devide and rule* ‘বিভেদ সৃষ্টি কর এবং রাজ্যশাসন কর।’

এই বিরোধী আওয়াজটির হাকীকত বড়ই অস্পষ্ট অথবা সীমাহীন স্ববিরোধিতার এক সমষ্টি। আমি আমাদের দেশের গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের (যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস নামে পরিচয় দেন) অনেক পুস্তিকা ও লিফলেট পড়েছি, তাদের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনেছি, কারো কারো সাথে আলোচনাও হয়েছে, কিন্তু এসব কিছু পরও তাদের বিভ্রান্তি বা অসাধুতাই আমার সামনে পরিস্ফুট হয়েছে।

এরা তাকলীদ করা বা মাযহাব মানাকে নাজায়েয, হারাম এমনকি শিরক পর্যন্ত বলে থাকে। তাদের কেউ কেউ বলে, সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ জায়েয, আলেমদের জন্য নাজায়েয। কেউ বলে, তাকলীদ জায়েয তবে নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাকলীদ নাজায়েয। আবার কেউ ‘মাযহাব মানা ফরয নয়’ এটুকু বলে চূপ করে থাকে। ফরয না হলে কী-এ কথাটা আর বলে না।

এখানে আমি এই সব ভ্রান্ত কথাগুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা করতে চাই না বা তার প্রয়োজনও নেই। কেননা এ বিষয়ে দলীল-প্রমাণ সমৃদ্ধ, যথোপযুক্ত আলোচনা বক্ষমান গ্রন্থেই রয়েছে। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, তাকলীদবিরোধী লোকদের বিভিন্ন বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে এবং তাদের বেশ কিছু ক্যাসেট শুনে এ

বিষয়টিই জানা গেছে যে, তারা—

১. ‘তাকলীদে’র পরিচয় দেয় ‘অন্ধ অনুসরণ’ দ্বারা।

২. তাদের মতে, কারো দলীলবিহীন কথাকে শর্তহীনভাবে মেনে নেওয়ার নাম তাকলীদ, তা কুরআন হাদীসের অনুকূলে হোক বা কুরআন হাদীস পরিপন্থী।

৩. তাদের বক্তব্য হল, মুকাল্লিদগণ তাদের ইমামদেরকে ‘মাসূম’ তথা ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে মনে করে। অর্থাৎ তারা যেন ইমামগণকে রাসূলের স্থানে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ ধরনের আরো কিছু কথা তারা বলে যার সাথে তাকলীদকারী বা মাযহাব অনুসারীদের কোনই সম্পর্ক নেই। আমরা নিজেরাও মুকাল্লিদ, ফিক্‌হে হানাফীর তাকলীদ করি। ওই সব বন্ধুরা তাকলীদের যে অর্থ করেছেন এবং মুকাল্লিদদের অবস্থার যে চিত্র অংকন করেছেন এর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা আশিয়া আলাইহিমুস সালাম ছাড়া আর কাউকে মাসূম-ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে মনে করি না। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন উম্মতি এবং তাঁর শরীয়তের খাদেম মনে করি। তাঁর ফিকহের অনুসরণ আমরা এজন্যই করি যে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়তের হুকুম-আহকাম জানার জন্য ফকীহগণের শরণাপন্ন হওয়ার আদেশ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)এর কোন কথা যদি শরীয়তের দলীল দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে সেটা হানাফী ফিকহের মধ্যে ‘ফতোয়া যোগ্য’ বিবেচিত হয় না। তাহলে আমরা কীভাবে কুরআন হাদীসের বিরোধিতা করে তাঁর তাকলীদ করলাম? আমরা তো কুরআন হাদীসের সত্যিকার অনুসরণের জন্যই, নিজেদের ‘কাঁচা বুঝ’ বা কোন অযোগ্য লোকের ‘কাঁচা বুঝ’এর উপর নির্ভর না করে উম্মাহর সর্বজন স্বীকৃত ফকীহ ইমাম আবু হানীফা (রহ.)এর ফিকহের অনুসরণ করছি।

মোটকথা, মাযহাব ও ফিকহের হাকীকত সম্পর্কে এই নিবন্ধের শুরুর দিকে আলোচনা করা হয়েছে। তাকলীদ-বিরোধীগণ যদি এই অর্থেই ‘তাকলীদ’ বা ‘ফিকহ’এর বিরোধিতা করে থাকেন তাহলে বাস্তবিকই মুকাল্লিদদের সাথে তাদের বিরোধিতা হতে পারে, কিন্তু তাকলীদ বা মাযহাবের এমন অর্থ বয়ান করা, যে অর্থে তাকলীদ ও মাযহাব ভুল প্রমাণিত হয়, এরপর অন্যায়ভাবে তা মুকাল্লিদদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া-এসব কাজের কোন বৈধতা হতে পারে কি? নাকি তাদের উদ্দেশ্যই হল মুসলিম জাতির মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য ছড়ানো। এতে অবশ্য এই বাস্তবতা বিরোধী বয়ান-বক্তৃতার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে!

আমরা সেই সব বন্ধুদের খেদমতে আরম্ভ করতে চাই, আপনারা তাকলীদ ও ফিকহের সেই পরিচয় নিয়ে একবার ভাবুন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যে নিয়ম অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহর বৃহৎ অংশের আমল চলে আসছে, এরপর বলুন, এ ধরনের তাকলীদ বা এই অর্থে মাযহার মানার ব্যাপারে আপনাদের কোন আপত্তি আছে কি-না? যদি থাকে তাহলে কেন? এটাই হবে যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত পন্থা। শুধু শুধু নিজেদের পক্ষ থেকে একটা মতবাদ তৈরি করে তা কারো কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে এরপর মনের সুখে তার খণ্ডন কার্যে নিমগ্ন হওয়া তো কোন ন্যায়সঙ্গত পন্থা হতে পারে না। আর না এধরনের কাজে লিপ্ত হওয়া কোন হাদীস অনুসরণকারী মুসলমানের পক্ষে শোভা পায়!

বন্ধুবর্গের খেদমতে শুধু একটি প্রশ্নই করতে চাই, যে সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য আমরা উম্মাহর ফকীহগণের সংকলিত ফিকহের শরণাপন্ন হয়েছি আপনারা যখন ফিকহের প্রয়োজন বোধ করেন না তো এই সব সমস্যার সমাধান আপনারা কীভাবে করেন? শুধুই নিজের মত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে? না পরবর্তী যুগের কোন আলেমের 'বুঝ'এর উপর নির্ভর করে? না তৃতীয় কোন পথ অবলম্বন করে? এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবুন। এরপর ইনসাফের সাথে বলুন, ফিকহের অনুসারীরাই সরল-সঠিক পথের উপর আছেন, না আপনারা?

আর একটি বিষয়েও ভাবুন, মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ ব্যক্তি এবং আপনাদের মধ্যে মতপার্থক্যটি হচ্ছে হাদীস অনুসরণের পন্থা ও পদ্ধতি নিয়ে। আপনারা এ ব্যাপারে একটি নব-আবিষ্কৃত কর্ম-পন্থা অবলম্বন করতে চান আর মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ মানুষ থাকতে চান সুন্নাহ-নির্দেশিত পন্থার উপরই। হাদীস অনুসরণের মূল কথাটিতে তো কারো কোন দ্বিমত নেই। তাহলে এই গোটা মুসলিম জাতির বিপরীতে আপনারা কীভাবে নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' নামে পরিচয় দেন আর তাদেরকে আখ্যা দেন হাদীস অমান্যকারীরূপে? হাদীস অনুসরণের পন্থা ও পদ্ধতি নিয়ে যে মতবিরোধ তাকে আপনারা কোন্ যুক্তিতে খোদ হাদীস অনুসরণের মতবিরোধ সাব্যস্ত করেন? আল্লাহর ওয়াস্তে একটু ভাবুন এবং কোন হানাফী মাযহাবের অনুসারীকে তওবা করিয়ে গাইরে মুকাল্লিদ বানানোর এই না-জায়েয বা অন্তত অর্থহীন কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে অমুসলিম ও মুশরেকদেরকে মুসলমান বানানোর চেষ্টা করুন। কিন্তু যদি আপনারাও আপনাদের কোন কোন বেইলম অনুসারীর মত হানাফী থেকে গাইরে মুকাল্লিদ হওয়াকে কাফের থেকে মুসলমান হওয়ার সমর্থক মনে করেন তাহলে তো এসব কথা আপনাদেরকে বলাও একটা

অর্থহীন পরিশ্রমই হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন এবং ইসলামের এই দুর্দিনে বহুধা বিভক্ত উম্মতকে একত্র ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

বক্ষমান বইটির ব্যাপারে কিছু কথা

তাকলীদে মাহমূদ (প্রশংসিত তাকলীদ) শরীয়তসম্মত হওয়া এবং শরীয়তে কাম্য হওয়া আর তাকলীদে মায়মূম (নিন্দিত তাকলীদ) নিষিদ্ধ ও হারাম হওয়ার বিষয়টি শরীয়তের দলীল-প্রমাণের আলোকে স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য উম্মাহর আকাবির উলামা অনেক কিতাব রচনা করেছেন। তার মধ্যে আমাদের উস্তাদ ও মুর্শিদ শায়ইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমে কিতাব ‘তাকলীদ কী শারয়ী হাইছিয়াত’ অন্যতম। কিতাবটি আকারে ছোট হলেও অতিমূল্যবান এবং মানের বিচারে এ বিষয়ের অধিকাংশ কিতাবের চেয়ে উন্নত। কোন কোন দিক দিয়ে তো অপূর্ব। মূল কিতাবটি উর্দু ভাষায় ছিল। এখন মাকতাবাতুল আশরাফ এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে। অনুবাদ করেছেন ফায়েলে মুকাররম, বেরাদারে মুহতারাম জনাব মাওলানা যাইনুল আবিদীন (যাদা মাজদুহুম)। আল্লাহ তাআলা অনুবাদক ও প্রকাশক উভয়কে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং দীর্ঘ হায়াতে তাইয়েবা নসীব করুন। আমীন।

কিতাবের বৈশিষ্ট্যাদি আলোচনার প্রয়োজন এজন্য অনুভূত হয়নি যে, কিতাবটি আপনাদের হাতেই আছে, আর তা সৎক্ষিপ্তও। মনোযোগের সাথে পড়ে নিয়ে এর বৈশিষ্ট্যাদি আপনারা নিজেরাই জানতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা কিতাবটিকে আমাদের জন্য এবং গোটা উম্মতের জন্য উপকারী করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

বিনীত

বান্দা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
৬ জুমাদাল উখরা ১৪২৬ হিজরী
১২ জুলাই ২০০৫ ইসায়ী



নির্বাচিত প্রবন্ধ -২

মাসিক আলকাউসার-এ প্রকাশিত গবেষণামূলক
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-সংকলন

[মহররম ১৪২৬ হি.-১৪৩২ হি.=ফেব্রু. '০৫ ঈ.-ডিসে. '১০ ঈ. পর্যন্ত]

প্রকাশনা বিভাগ
মারকায়ুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

ডিজাইন, সাদ্দাসসীল : ০১৭১১-২৬৬৮৫